জীববিজ্ঞান

দাখিল

নবম–দশম শ্রেণি

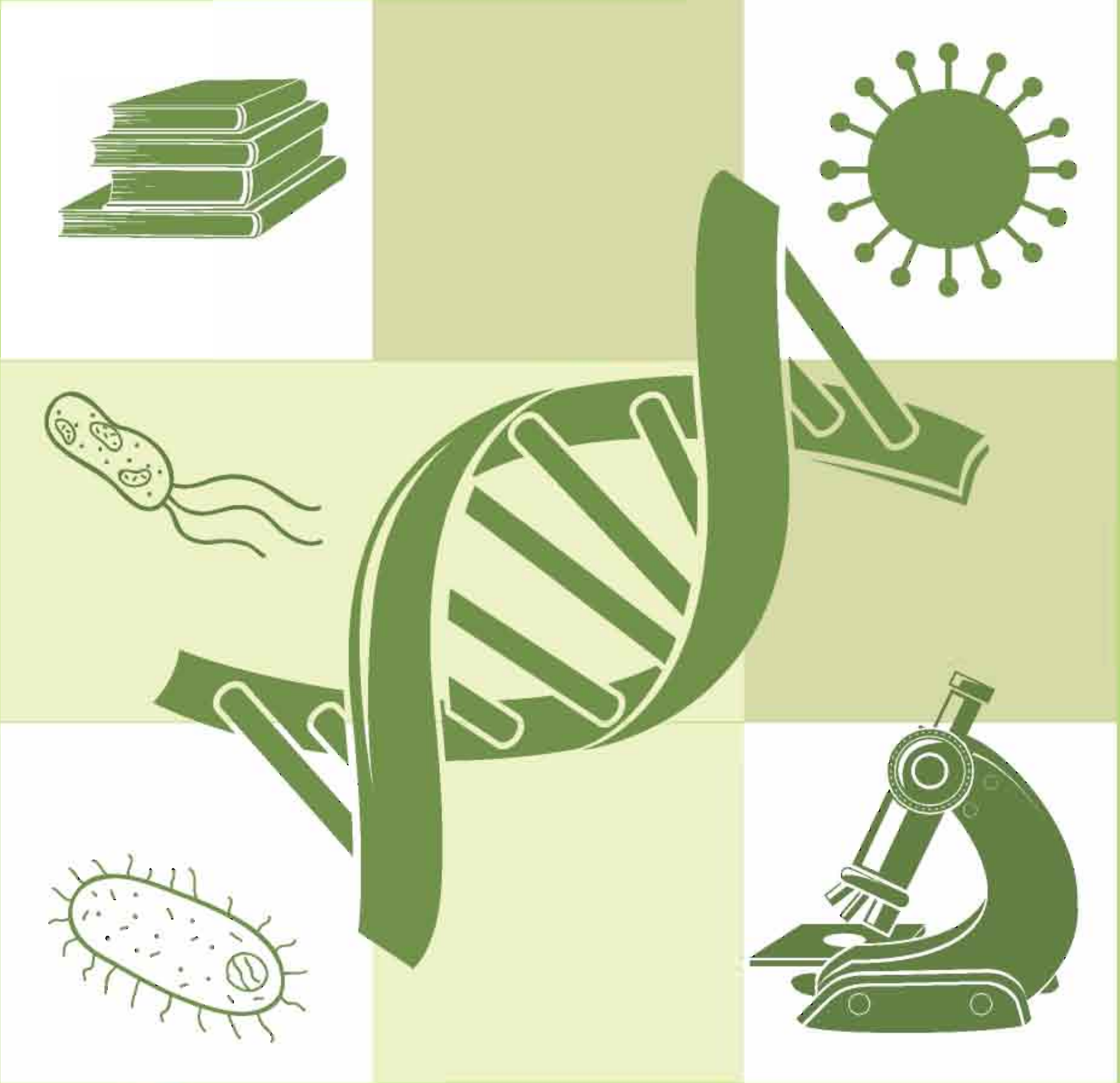

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

জীববিজ্ঞান

দাখিল

নবম-দশম শ্রেণি

সহজপাঠ্য, আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করার জন্য পরিমার্জিত সংস্করণে
প্রয়োজনীয় সংযোজন, পরিবর্ধন, পুনর্লিখন ও সম্পাদনা

ডা. সৌমিত্র চক্রবর্তী
ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ

পূর্ববর্তী সংস্করণ রচনা
এস. এম. হায়দার
ড. এম. নিয়ামুল নাসের
গুল আনার আহমেদ
মোঃ ইদ্রিস হাওলাদার

পূর্ববর্তী সংস্করণ সম্পাদনা
ড. সৈয়দ মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির
ড. মোঃ ইমদাদুল হক

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ২০১৭
পুনর্মুদ্রণ: ২০১৮

প্রচ্ছদ: মেহেদী হক

চিত্রাঙ্কন: নাসরীন সুলতানা মিতু, মেহেদী হক

আলোকচিত্র: সাস্ট SUPA ও সংগৃহিত

ফন্ট প্রণয়ন: মো. তানবিন ইসলাম সিয়াম

বুক ডিজাইন: মেহেদী হক, নাসরীন সুলতানা মিতু

পেইজ মেকাপ: মাহবুবুর রহমান খান

সমন্বয় ও সার্বিক সহযোগিতা: (পরিমার্জিত সংস্করণ) মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

জীববিজ্ঞান শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে জীবন ও তার পরিবেশ সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক শিক্ষা গ্রহণ। জীববিজ্ঞানকে বোঝার জন্য বৈজ্ঞানিক ধারণা ও তত্ত্বের পাশাপাশি জীবনভিত্তিক প্রায়োগিক ক্ষেত্রের উপর গুরুত্ব দেওয়ায় জীববিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ এবং ব্যক্তি, সমাজ ও মানব কল্যাণে অবদান রাখতে দক্ষতা অর্জন করবে। সেই সাথে জীবনের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধ তৈরি হবে এবং তারা জীব সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হবে। জীববিজ্ঞানের প্রতিটি অধ্যায়ে বিভিন্ন ধরণের কাজ রাখা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে কাজ করার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পাঠটি সহজেই বুঝতে পারে। হাতে কলমে কাজ করার ফলে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে এবং চিন্তন দক্ষতা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে সহজপাঠ্য, আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করার জন্য ২০১৭ সালে পাঠ্যপুস্তকটিতে পরিমার্জন, সংযোজন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে।

২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তক মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করে দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রবর্তন করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম	জীবন পাঠ	১-১৬
দ্বিতীয়	জীবকোষ ও টিস্যু	১৭–৪৯
তৃতীয়	কোষ বিভাজন	৫০–৬৩
চতুর্থ	জীবনীশক্তি	৬৪–৮৩
পঞ্চম	খাদ্য, পুষ্টি এবং পরিপাক	৮৪–১২৪
ষষ্ঠ	জীবে পরিবহন	১২৫–১৫৯
সপ্তম	গ্যাসীয় বিনিময়	১৬০–১৭৭
অষ্টম	রেচন প্রক্রিয়া	১৭৮–১৮৯
নবম	দৃঢ়তা প্রদান ও চলন	১৯০–২০৩
দশম	সমন্বয়	২০৪–২৩০
একাদশ	জীবের প্রজনন	২৩১–২৫৩
দ্বাদশ	জীবের বংশগতি ও বিবর্তন	২৫৪–২৭৮
ত্রয়োদশ	জীবের পরিবেশ	২৭৯–৩০১
চতুর্দশ	জীবপ্রযুক্তি	৩০২–৩১৪

প্রথম অধ্যায়

জীবন পাঠ

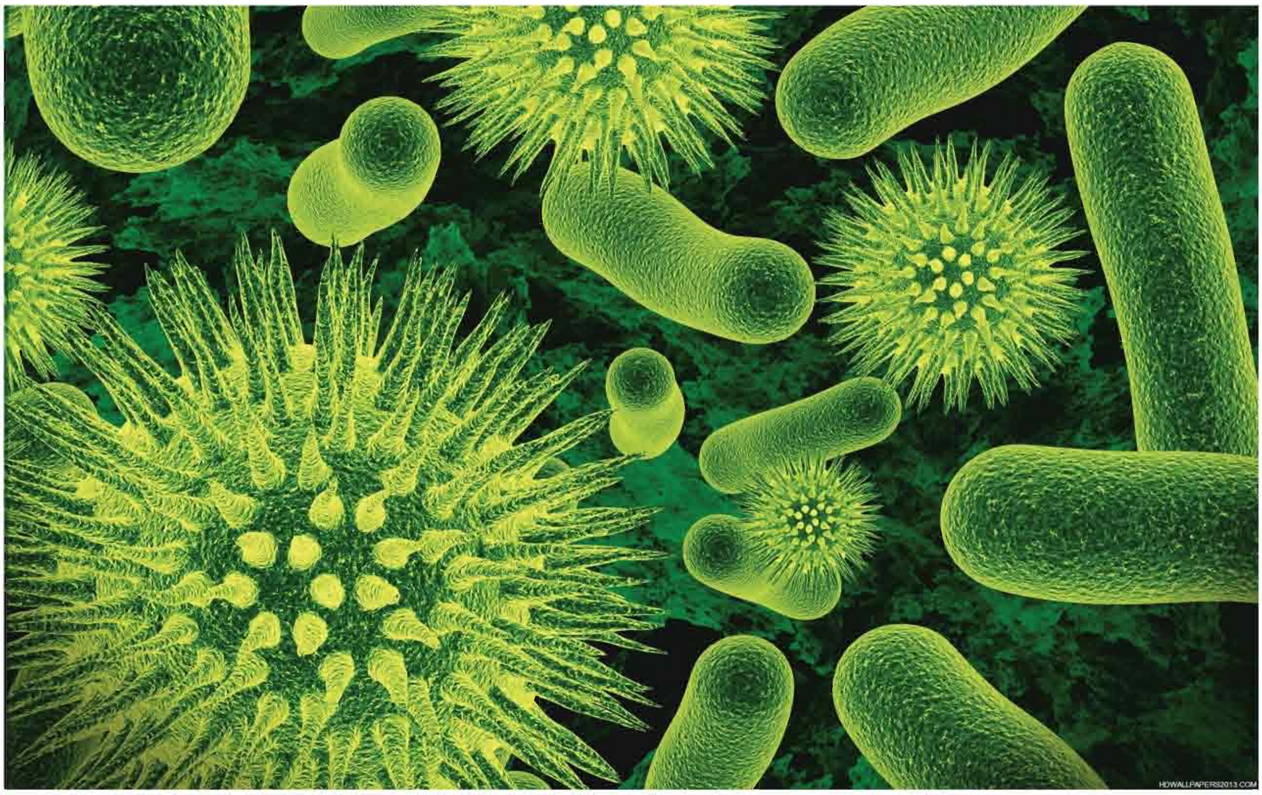

মানবসভ্যতা বিকাশে বর্তমান শতকের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে খাদ্য উৎপাদন, চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নয়ন এবং বিরূপ পরিবেশে জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা। এসব ক্ষেত্রে জীববিজ্ঞানের ভূমিকা অপরিসীম। এই অধ্যায়ে জীববিজ্ঞানের সংজ্ঞা, শাখাসমূহের নাম এবং জীবের নামকরণের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- জীববিজ্ঞানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীববিজ্ঞানের প্রধান শাখাগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- জীবের শ্রেণিবিন্যাসের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীবের শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করতে পারব।
- জীবের শ্রেণিবিন্যাসকরণ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- দ্বিপদ নামকরণের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাস্তবজীবনে জীবের শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হব ।

1.1 জীববিজ্ঞানের ধারণা

আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি যে যাদের জীবন আছে তারা জীব, আর যেসব জিনিসের জীবন নেই সেগুলো জড়। মোটা দাগে বোঝার জন্য বিশ্বের সব পদার্থকে এরকম দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিচারে কোথায় জড়-অচেতনের শেষ আর কোথায় জীবনের শুরু, তা অনেক সময়ই বলা মুশকিল। আসলে, জীবনের ভিত্তিমূলে কাজ করে পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নের সেই একই নিয়ম, যা কিনা জড় জগৎকেও নিয়ন্ত্রণ করে। তাই জীবজগৎকে বুঝতে হলে ভৌতবিজ্ঞান, তথা পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের জ্ঞান জরুরি। কিন্তু এটা ভাবলে ভুল হবে যে ভৌতবিজ্ঞান জানলে আলাদা করে জীববিজ্ঞান পাঠ নিষ্প্রয়োজন। বরং জীবনকে ভাবা যেতে পারে অনেকগুলো জড়ের এমন এক জটিল সমাবেশ হিসেবে, যেখানে ঐ জটিলতার কারণে নতুন কিছু গুণের উদ্ভব ঘটেছে। ঠিক যেমন হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের নির্দিষ্ট আনুপাতিক সংযোগে পানি তৈরি হয়, যার বৈশিষ্ট্য হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন কোনোটার মতোই হয় না। তাই জড়ের সুনির্দিষ্ট সন্নিবেশে জীব গঠিত হলেও তার মধ্যে এমন সব নতুন ধরনের বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটে, যা তার জড় গাঠনিক উপাদানগুলোর মধ্যে ছিল না।

জীববিজ্ঞান বেশ প্রাচীন বিজ্ঞান। জীববিজ্ঞানকে ইংরেজিতে Biology বলে। এটি গঠিত হয়েছে গ্রিক bios (জীবন) এবং logos (জ্ঞান) শব্দ দুটির সংযোগের মাধ্যমে। যেহেতু চিকিৎসা ও কৃষিসংক্রান্ত ব্যাপারে জীববিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, সেহেতু সভ্যতার একেবারে আদিকাল থেকে গ্রিস, মিশর, মধ্যপ্রাচ্য, ভারতবর্ষ ও চীনসহ বিভিন্ন অঞ্চলের সভ্যতায় জীববিজ্ঞানের কিছু না কিছু চর্চা হয়েছে। যদিও সেসব চর্চাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিচারে ঠিক বিজ্ঞান বলা যায় না, তবু জ্ঞানের এই শাখার বিকাশের জন্য তা অপরিহার্য ছিল।

1.2 জীববিজ্ঞানের শাখাগুলো

জীবের যে দুটি ধরন আমরা চারপাশে তাকালেই দেখতে পাই, সেগুলো হলো উদ্ভিদ এবং প্রাণী। তাই বহুদিন পর্যন্ত জীববিজ্ঞান পাঠের সুবিধার জন্য একে দুটি শাখায় ভাগ করে নেওয়ার প্রচলন ছিল: উদ্ভিদবিজ্ঞান এবং প্রাণিবিজ্ঞান। এ রীতি এখনও কিছুটা চালু আছে। যদিও জীববিজ্ঞান আজ এতটাই বিস্তৃতি লাভ করেছে যে শুধু দুটি শাখায় ভাগ করে এখন এর পাঠ আর চলবে না। এমন অনেক জীব আছে যা উদ্ভিদ বা প্রাণী কোনোটাই নয়। যেমন: ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি। আবার কখনো কখনো প্রাণী, উদ্ভিদ, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, ভাইরাস প্রভৃতির কোনো সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে একসাথে বিশ্লেষণ করার দরকার হয়, তখন আর জীবের ধরনভিত্তিক শাখা লাগসই হয় না। তাই প্রয়োজনের তাগিদে জীববিজ্ঞান এখন বহুসংখ্যক শাখায় বিভক্ত হয়েছে। জ্ঞানের প্রায় প্রতিটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত শাখাগুলোকে ভৌত বা মৌলিক এবং ফলিত এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। জীববিজ্ঞানও তার ব্যতিক্রম নয়।

ভৌত শাখা বলতে সেসব শাখা বোঝানো হয়, যেখানে তার তাত্ত্বিক ভিত্তি অনুসন্ধান করাটা প্রয়োগ-সংক্রান্ত দিকের তুলনায় বেশি গুরুত্ব পায়। আর যেখানে প্রয়োগটাই বড়, সেটা হচ্ছে ফলিত শাখা।

1.2.1 ভৌত জীববিজ্ঞান

ভৌত জীববিজ্ঞান শাখায় তত্ত্বীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে। এতে সাধারণত নিচে উল্লিখিত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়:

(a) অঙ্গসংস্থান (Morphology): জীবের সার্বিক অঙ্গসংস্থানিক বা দৈহিক গঠন বর্ণনা এ শাখার আলোচ্য বিষয়। দেহের বাহ্যিক বর্ণনার বিষয়কে বহিঃ অঙ্গসংস্থান (External Morphology) এবং দেহের অভ্যন্তরীণ বর্ণনার বিষয়কে অন্তঃ অঙ্গসংস্থান (Internal Morphology) বলা হয়।

(b) শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা বা ট্যাক্সোনমি (Taxonomy): জীবের শ্রেণিবিন্যাস এবং তার রীতিনীতিগুলো এ শাখার আলোচিত বিষয়।

(c) শারীরবিদ্যা (Physiology): জীবদেহের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জৈবরাসায়নিক কার্যাদি, যেমন: শ্বসন, রেচন, সালোকসংশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয় এ শাখায় আলোচিত হয়। এছাড়া জীবের যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় কাজের বিবরণ এ শাখায় পাওয়া যায়।

(d) হিস্টোলজি (Histology): জীবদেহের টিস্যুসমূহের গঠন, বিন্যাস এবং কার্যাবলি এ শাখায় আলোচনা করা হয়।

(e) ভ্রূণবিদ্যা (Embryology): জনন কোষের উৎপত্তি, নিষিক্ত জাইগোট থেকে ভ্রূণের সৃষ্টি, গঠন, পরিস্ফুটন, বিকাশ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা এ শাখার প্রধান বিষয়।

(f) কোষবিদ্যা (Cytology): জীবদেহের কোষের গঠন, কার্যাবলি ও বিভাজন সম্পর্কে যাবতীয় আলোচনা এ শাখার বিষয়।

(g) বংশগতিবিদ্যা বা জেনেটিক্স (Genetics): জিন ও জীবের বংশগতিধারা সম্পর্কে এ শাখায় আলোচনা করা হয়।

(h) বিবর্তনবিদ্যা (Evolution): পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ, জীবের বিবর্তন এবং ক্রমবিকাশের তথ্যসমূহের আলোচনা এ শাখার বিষয়।

(i) বাস্তুবিদ্যা (Ecology): এ শাখায় প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে জীবের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

(j) এন্ডোক্রাইনোলজি (Endocrinology): জীবদেহে হরমোনের (hormone) কার্যকারিতা বিষয়ক আলোচনা এ শাখার বিষয়।

(k) জীবভূগোল (Biogeography): এ শাখায় পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক সীমারেখায় জীবের বিস্তৃতি

এবং অভিযোজন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। জীবের ভৌগোলিক বিস্তারের সাথে ভূমণ্ডলের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কিত বিদ্যা।

1.2.2 ফলিত জীববিজ্ঞান

এ শাখায় রয়েছে জীবন-সংশ্লিষ্ট প্রায়োগিক বিষয়গুলো। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শাখার কথা নিচে উল্লেখ করা হলো:

(a) **জীবাশ্মবিজ্ঞান** (Palaeontology): প্রাগৈতিহাসিক জীবের বিবরণ এবং জীবাশ্ম সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

(b) **জীবপরিসংখ্যানবিদ্যা** (Biostatistics): জীবপরিসংখ্যান-বিষয়ক বিজ্ঞান।

(c) **পরজীবীবিদ্যা** (Parasitology): পরজীবিতা, পরজীবী জীবের জীবনপ্রণালি এবং রোগ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

(d) **মৎস্যবিজ্ঞান** (Fisheries): মাছ, মাছ উৎপাদন, মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

(e) **কীটতত্ত্ব** (Entomology): কীটপতঙ্গের জীবন, উপকারিতা, অপকারিতা, ক্ষয়ক্ষতি, দমন ইত্যাদি সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

(f) **অণুজীববিজ্ঞান** (Microbiology): ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, আণুবীক্ষণিক ছত্রাক এবং অন্যান্য অণুজীব সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

(g) **কৃষিবিজ্ঞান** (Agriculture): কৃষিবিষয়ক বিজ্ঞান।

(h) **চিকিৎসাবিজ্ঞান** (Medical Science): মানবদেহ, রোগ, চিকিৎসা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

(i) **জিনপ্রযুক্তি** (Genetic Engineering): জিনপ্রযুক্তি ও এর ব্যবহার সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

(j) **প্রাণরসায়ন** (Biochemistry): জীবের প্রাণরাসায়নিক কার্যপ্রণালি, রোগ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

(k) **পরিবেশবিজ্ঞান** (Environmental Science): পরিবেশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

(l) **সামুদ্রিক জীববিজ্ঞান** (Oceanography): সামুদ্রিক জীব সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

(m) **বনবিজ্ঞান** (Forestry): বন, বন সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

(n) **জীবপ্রযুক্তি** (Biotechnology): মানব এবং পরিবেশের কল্যাণে জীব ব্যবহারের প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

(o) **ফার্মেসি** (Pharmacy): ঔষধশিল্প ও প্রযুক্তিবিষয়ক বিজ্ঞান।

(p) **বন্য প্রাণিবিদ্যা** (Wildlife): বন্যপ্রাণী বিষয়ক বিজ্ঞান।

(q) **বায়োইনফরমেটিকস্** (Bioinformatics): কম্পিউটার প্রযুক্তিনির্ভর জীববিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য, যেমন ক্যান্সার বিশ্লেষণ বিষয়ক বিজ্ঞান।

একক কাজ

কাজ : নিচের চিত্রটি দেখে কোনটি জীববিজ্ঞানের কোন শাখার অন্তর্ভুক্ত তার একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

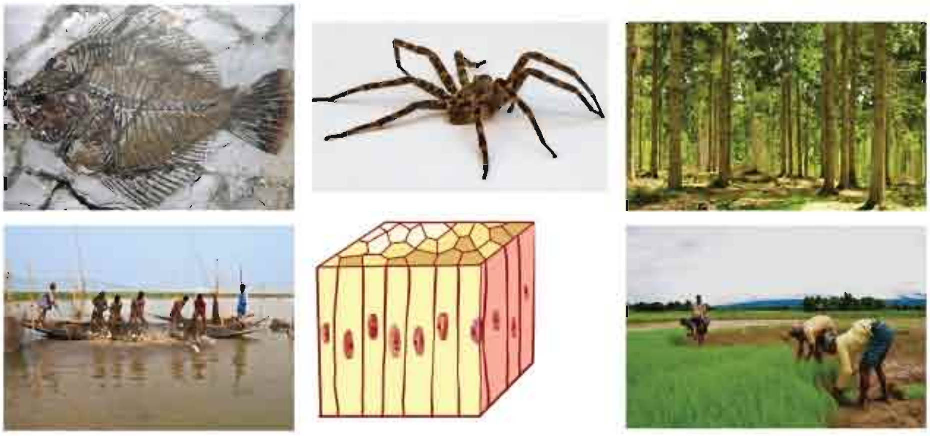

চিত্র 1.01: জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উদাহরণ

একক কাজ

কাজ: দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত জীববিজ্ঞানের খবর থেকে জীবিবিজ্ঞানের শাখার তালিকা তৈরি।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: দৈনিক সংবাদপত্র/সাময়িকী, কাঁচি/কাটার, আঠা, আর্টপেপার, সাইনপেন।

পদ্ধতি : 3-5 জনের ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যাও।

দৈনিক পত্রিকা বা সাময়িকী থেকে প্রতিটি দল একটি করে খবর খুঁজে বের করবে যেখানে জীববিজ্ঞানের একাধিক শাখার সম্পৃক্ততা রয়েছে এবং সেই খবরের সাথে সংশ্লিষ্ট জীববিজ্ঞানের ভৌত এবং ফলিত শাখার তালিকা করবে। তারপর আর্ট পেপারে খবরটির পেপার কাটিং আঠা দিয়ে লাগিয়ে তার পাশে বা নিচে সাইনপেন দিয়ে শাখাগুলোর সেই তালিকা লিখে প্রদর্শন করবে।

1.3 জীবের শ্রেণিবিন্যাস

আজ পর্যন্ত বিভিন্ন উদ্ভিদের প্রায় চার লক্ষ এবং প্রাণীর প্রায় তের লক্ষ প্রজাতির নামকরণ ও বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এ সংখ্যা চূড়ান্ত নয়, কেননা প্রায় প্রতিদিনই আরও নতুন নতুন প্রজাতির বর্ণনা সংযুক্ত হচ্ছে। অনুমান করা হয়, ভবিষ্যতে সব জীবের বর্ণনা শেষ হলে (যদি সত্যি কখনো শেষ করা যায়) এর সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় এক কোটিতে। জানা, বোঝা এবং শেখার সুবিধার জন্য এই অসংখ্য জীবকে

সুষ্ঠুভাবে বিন্যাস করা বা সাজানোর প্রয়োজন। জীবজগৎকে একটি স্বাভাবিক নিয়মে শ্রেণিবিন্যাস করার প্রয়োজনীয়তা অবশ্য অনেক আগে থেকেই প্রকৃতিবিদগণ অনুভব করেছিলেন। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই জীববিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা গড়ে উঠেছে, যার নাম ট্যাক্সোনমি বা শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা। শ্রেণিবিন্যাসের লক্ষ্য মূলত একটাই। তা হচ্ছে এই বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় জীবজগৎকে সহজভাবে অল্প পরিশ্রমে এবং অল্প সময়ে সঠিকভাবে জানা।

শ্রেণিবিন্যাসে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন সুইডিস প্রকৃতিবিদ ক্যারোলাস লিনিয়াস (1707-1778)। 1735 সালে আপসালা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভের পর তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমির অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ, বিশেষ করে ফুল সংগ্রহ আর জীবের শ্রেণিবিন্যাসে তার অনেক আগ্রহ ছিল। তিনিই প্রথম জীবের পূর্ণ শ্রেণিবিন্যাসের এবং নামকরণের ভিত্তি প্রবর্তন করেন। অসংখ্য নমুনা জীবের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে তিনি জীবজগৎকে দুটি ভাগে যথা উদ্ভিদজগৎ এবং প্রাণিজগৎ হিসেবে বিন্যস্ত করেন।

শ্রেণিবিন্যাসের উদ্দেশ্য

শ্রেণিবিন্যাসের উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি জীবের দল ও উপদল সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা। জীবজগতের ভিন্নতার দিকে আলোকপাত করে আহরিত জ্ঞানকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা, পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানকে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা এবং প্রতিটি জীবকে শনাক্ত করে তার নামকরণের ব্যবস্থা করা, সর্বোপরি জীবজগৎ এবং মানবকল্যাণে প্রয়োজনীয় জীবগুলোকে শনাক্ত করে তাদের সংরক্ষণে সচেতন হওয়া।

জীবজগৎ

ক্যারোলাস লিনিয়াসের সময়কাল থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত জীবজগৎকে উদ্ভিদজগৎ এবং প্রাণিজগৎ হিসেবে বিবেচনা করে দুটি রাজ্যে (Kingdom) শ্রেণিবিন্যাস করা হতো। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় বর্তমানে কোষের DNA এবং RNA-এর প্রকারভেদ, জীবদেহে কোষের বৈশিষ্ট্য, কোষের সংখ্যা ও খাদ্যাভ্যাসের তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে আর. এইচ. হুইট্টেকার (R. H. Whittaker) 1969 সালে জীবজগৎকে পাঁচটি রাজ্য বা ফাইভ কিংডমে (Five Kingdom) ভাগ করার প্রস্তাব

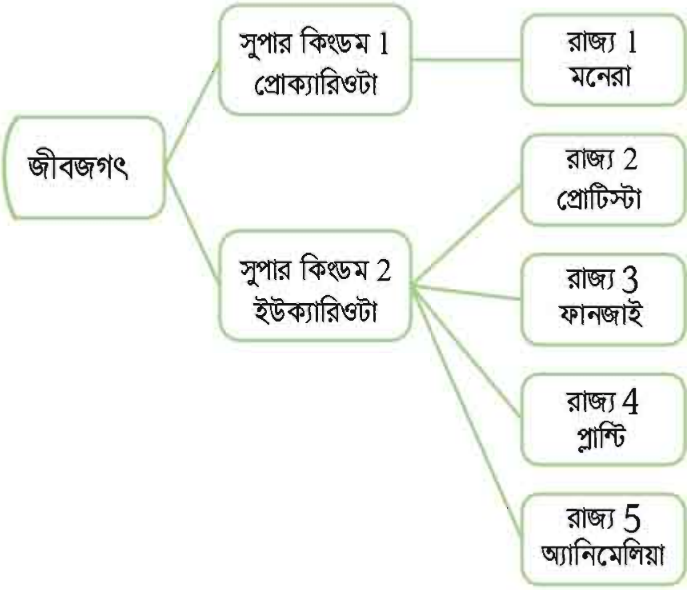

করেন। পরবর্তীকালে মারগুলিস (Margulis) 1974 সালে Whittaker-এর শ্রেণিবিন্যাসের পরিবর্তিত ও বিস্তারিত রূপ দেন। তিনি সমস্ত জীবজগৎকে দুটি সুপার কিংডমে ভাগ করেন এবং পাঁচটি রাজ্যকে এই দুটি সুপার কিংডমের আওতাভুক্ত করেন।

(a) সুপার কিংডম 1

প্রোক্যারিওটা (Prokaryotae): এরা আদিকোষ (নিউক্লিয়াস সুগঠিত নয়) বিশিষ্ট এককোষী, আণুবীক্ষণিক জীব।

(i) রাজ্য 1: মনেরা (Monera)

বৈশিষ্ট্য: এরা এককোষী, ফিলামেন্টাস (একটির পর একটি কোষ লম্বালম্বিভাবে যুক্ত হয়ে ফিলামেন্ট গঠন করে), কলোনিয়াল। কোষে ক্রোমাটিন বস্তু থাকে কিন্তু নিউক্লিওলাস ও নিউক্লিয়ার পর্দা নেই। এদের কোষে প্লাস্টিড, মাইটোকন্ড্রিয়া, এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা ইত্যাদি নেই, কিন্তু রাইবোজোম আছে। কোষ বিভাজন দ্বিবিভাজন প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। প্রধানত শোষণ পদ্ধতিতে খাদ্যগ্রহণ করে। তবে কেউ কেউ ফটোসিনথেসিস বা সালোকসংশ্লেষণ পদ্ধতিতে খাদ্য প্রস্তুত করে।

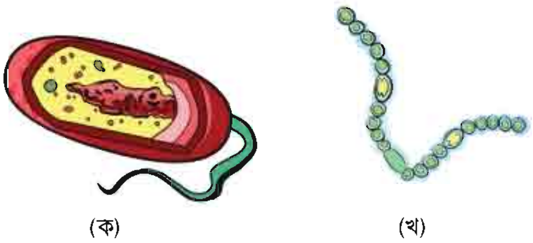
(ক) (খ)

চিত্র 1.02: (ক) ব্যাকটেরিয়া, (খ) *Nostoc* (নীলাভ সবুজ শৈবাল)

উদাহরণ: নীলাভ সবুজ শৈবাল, ব্যাকটেরিয়া।

(b) সুপার কিংডম 2

ইউক্যারিওটা (Eukaryota): এরা প্রকৃতকোষ (নিউক্লিয়াস সুগঠিত) বিশিষ্ট এককোষী বা বহুকোষী জীব। এরা এককভাবে অথবা কলোনি আকারে দলবদ্ধভাবে বসবাস করে।

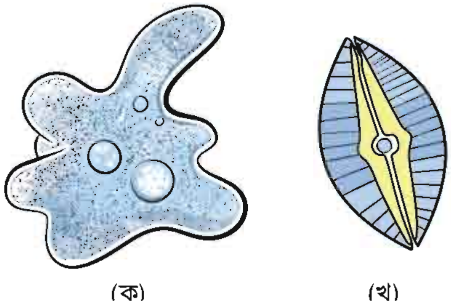
(ক) (খ)

চিত্র 1.03: (ক) অ্যামিবা (খ) ডায়াটম (এককোষী শৈবাল)

(i) রাজ্য-2: প্রোটিস্টা (Protista)

বৈশিষ্ট্য: এরা এককোষী বা বহুকোষী, একক বা কলোনিয়াল (দলবদ্ধ) বা ফিলামেন্টাস এবং সুগঠিত নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট। কোষে ক্রোমাটিন বস্তু নিউক্লিয়ার পর্দা দ্বারা পরিবৃত্ত থাকে। ক্রোমাটিন বস্তুতে DNA, RNA এবং প্রোটিন থাকে। কোষে সকল ধরনের অঙ্গাণু থাকে। খাদ্য গ্রহণ শোষণ, গ্রহণ বা ফটোসিনথেটিক পদ্ধতিতে ঘটে। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে অযৌন প্রজনন ঘটে

এবং কনজুগেশনের মাধ্যমে অর্থাৎ জৈবনিকভাবে ভিন্ন কিন্তু গঠনগতভাবে এক, এইরূপ দুটি গ্যামেটের মিলনের মাধ্যমে যৌন প্রজনন ঘটে। কোনো ভ্রূণ গঠিত হয় না।

উদাহরণ: অ্যামিবা, প্যারামেসিয়াম, এককোষী ও বহুকোষী শৈবাল।

(ii) রাজ্য 3: ফানজাই (Fungi)

বৈশিষ্ট্য: অধিকাংশই স্থলজ, মৃতজীবী বা পরজীবী। দেহ এককোষী অথবা মাইসেলিয়াম (সরু সুতার মতো অংশ) দিয়ে গঠিত। এগুলোর নিউক্লিয়াস সুগঠিত। কোষপ্রাচীর কাইটিন বস্তু দিয়ে গঠিত। খাদ্যগ্রহণ শোষণ পদ্ধতিতে ঘটে। ক্লোরোপ্লাস্ট অনুপস্থিত। হ্যাপ্লয়েড স্পোর দিয়ে বংশবৃদ্ধি ঘটে।

উদাহরণ: ইস্ট, *Penicillium*, মাশরুম ইত্যাদি।

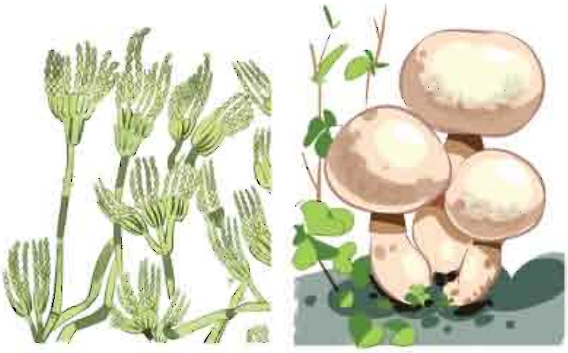
(ক) (খ)

চিত্র 1.04: (ক) *Penicillium* (খ) মাশরুম

(iii) রাজ্য 4: প্লানটি (Plantae)

বৈশিষ্ট্য: এরা প্রকৃত নিউক্লিয়াসযুক্ত সালোকসংশ্লেষণকারী উদ্ভিদ। এদের দেহে উন্নত টিস্যুতন্ত্র বিদ্যমান। এদের ভ্রূণ সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে ডিপ্লয়েড পর্যায় শুরু হয়। প্রধানত স্থলজ, তবে অসংখ্য জলজ প্রজাতি আছে। এদের যৌন জনন অ্যানাইসোগ্যামাস (anisogamous) অর্থাৎ আকার, আকৃতি অথবা শারীরবৃত্তীয় পার্থক্যবিশিষ্ট ভিন্নধর্মী দুটি গ্যামেটের মিলনের মাধ্যমে যৌন জনন সম্পন্ন হয়। এরা আর্কিগোনিয়েট অর্থাৎ আর্কিগোনিয়াম বা স্ত্রীজনন অঙ্গাবিশিষ্ট উদ্ভিদ। এরা সপুষ্পক।

চিত্র 1.05: কাঁঠাল গাছ (আবৃতবীজী উদ্ভিদ)

উদাহরণ: উন্নত সবুজ উদ্ভিদ। প্লানটির বিভাগগুলো ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো :

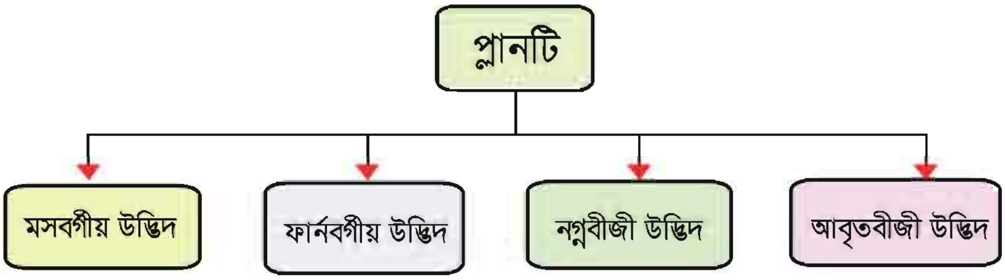

(iv) রাজ্য 5: অ্যানিমেলিয়া (Animalia)

চিত্র 1.06: রয়েল বেঙ্গাল টাইগার

বৈশিষ্ট্য: এরা নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট ও বহুকোষী প্রাণী। এদের কোষে কোনো জড় কোষপ্রাচীর, প্লাস্টিড ও কোষগহ্বর নেই। প্লাস্টিড না থাকায় এরা হেটারোট্রোফিক অর্থাৎ পরভোজী এবং খাদ্য গলাধঃকরণ করে, দেহে জটিল টিস্যুতন্ত্র বিদ্যমান। এরা প্রধানত যৌন জননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। পরিণত ডিপ্লয়েড পুরুষ এবং স্ত্রী প্রাণীর জনানঙ্গ থেকে হ্যাপ্লয়েড গ্যামেট উৎপন্ন হয়। ভ্রূণ বিকাশকালীন সময়ে ভ্রূণীয় স্তর সৃষ্টি হয়।

উদাহরণ: প্রোটোজোয়া ব্যতীত সকল অমেরুদণ্ডী এবং মেরুদণ্ডী প্রাণী।

2004 সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের টমাস কেভলিয়ার-স্মিথ (Thomas Cavalier-Smith) জীবজগতের প্রোটিস্টাকে প্রোটোজোয়া (Protozoa) এবং ক্রোমিস্টা (Chromista) নামে দুইটি ভাগে ভাগ করেন এবং মনেরাকে ব্যাকটেরিয়া রাজ্য হিসেবে পুনঃ নামকরণ করেন। এভাবে তিনি জীবজগৎকে মোট ছয়টি রাজ্যে ভাগ করেছেন। এ বিষয়ে তোমরা উপরের শ্রেণিতে আরও বিস্তারিত জানবে। এখানে বিভিন্ন রাজ্যের প্রাণীগুলোর যে বৈশিষ্টগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তোমরা এই বইটি পড়ার সময়ে পরবর্তী অধ্যায়ে সেগুলোর সাথে ধীরে ধীরে পরিচিত হবে।

1.4 শ্রেণিবিন্যাসের বিভিন্ন ধাপ

শ্রেণিবিন্যাসের প্রতিটি ধাপে তার আগের ধাপের বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য যোগ হয়। যত উপরের ধাপ, তার অন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা তত কম এবং অন্তর্ভুক্ত জীবের সংখ্যা তত বেশি। আবার যত নিচের ধাপ, তার অন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা তত বেশি এবং অন্তর্ভুক্ত জীবের সংখ্যা তত কম। একটি জীবকে প্রজাতি পর্যায়ে বিন্যাসে মূলত আন্তর্জাতিক কোড চিহ্নিত সাতটি ধাপ আছে।

রাজ্য (Kingdom)
পর্ব (Phylum)/ বিভাগ (Division)
শ্রেণি (Class)
বর্গ (Order)
গোত্র (Family)
গণ (Genus)
প্রজাতি (Species)

উপরের ধাপ যেন বড় একটা সেট আর তার নিচের ধাপ হলো তার উপসেট। রাজ্যের উপসেট হলো পর্ব, পর্বের উপসেট হলো শ্রেণি, শ্রেণির উপসেট হলো বর্গ... ইত্যাদি। শ্রেণিবিন্যাসের এই পদ্ধতিকে বলে নেস্টেড হায়ারার্কি (nested hierarchy)। অনেক সময় পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য আগের ধাপের যেসব বৈশিষ্ট্য পরের ধাপেও থাকে, সেগুলো উহ্য রাখা হয়। সেভাবে লিখলে মানুষের (*Homo sapiens*) শ্রেণিবিন্যাস হবে এরকম:

রাজ্য (Kingdom): Animalia; কারণ,
সুকেন্দ্রিক কোষবিশিষ্ট, বহুকোষী,
পরভোজী এবং জটিল টিস্যুতন্ত্র আছে।

পর্ব (Phylum): Chordata; কারণ,
জীবনের কোনো এক পর্যায়ে নটোকর্ড থাকে।

শ্রেণি (Class): Mammalia; কারণ,
বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ায় এবং
লোম/চুল আছে।

বর্গ (Order): Primate; কারণ,
আঁকড়ে ধরার উপযোগী হাত এবং
ঘ্রাণ অপেক্ষা দৃষ্টিশক্তি বেশি উন্নত।

গোত্র (Family): Hominidae; কারণ,
শিম্পাঞ্জি, গরিলা, বানর প্রভৃতির সাথে সাদৃশ্য আছে।

গণ (Genus): *Homo*; কারণ,
দেহের অনুপাতে মস্তিষ্ক সবচেয়ে বড় এবং
খাড়াভাবে দুই পায়ে হাঁটতে পারে।

প্রজাতি (Species): *Homo sapiens*; কারণ,
চওড়া এবং খাড়া কপাল, খুলির হাড় Homo গণের অন্য প্রজাতির তুলনায় পাতলা এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে উন্নত।

কোনো প্রজাতিকে শ্রেণিবিন্যাসের কোন ধাপে কেন অন্তর্ভুক্ত করা হলো, তার কারণগুলো জীববিজ্ঞানের শিক্ষার্থী হিসেবে জেনে নিতে হয়, কারণ কোনো একটা প্রজাতির শ্রেণিবিন্যাস লেখার সবচেয়ে প্রচলিত রীতি এটাই, যেখানে আলাদা করে কারণগুলো লেখা হয় না।

1.5 দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি

একটি জীবের বৈজ্ঞানিক নাম দুটি অংশ বা পদ নিয়ে গঠিত হয়। প্রথম অংশটি তার গণের নাম এবং দ্বিতীয় অংশটি তার প্রজাতির নাম। যেমন গোল আলুর বৈজ্ঞানিক নাম *Solanum tuberosum*। এখানে *Solanum* গণ নাম এবং *tuberosum* প্রজাতির নাম বুঝায়, এরূপ দুটি পদ নিয়ে গঠিত নামকে দ্বিপদ নাম এবং নামকরণের প্রক্রিয়াকে দ্বিপদ নামকরণ (binomial nomenclature) পদ্ধতি বলে। দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতির লক্ষ্য একটাই, তা হচ্ছে এই বৈচিত্র্যময় জীবজগতের প্রতিটি জীবকে আলাদা নামে সঠিকভাবে জানা। আন্তর্জাতিকভাবে কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি মেনে জীবের বৈজ্ঞানিক নাম নির্ধারণ করা হয়। উদ্ভিদের নাম International Code of Botanical Nomenclature (ICBN) কর্তৃক এবং প্রাণীর নাম International Code of Zoological Nomenclature (ICZN) কর্তৃক স্বীকৃত নিয়মানুসারে হতে হবে। প্রকৃত পক্ষে এই code পুস্তকাকারে লিখিত একটি দলিল। নামকরণ ল্যাটিন শব্দে হওয়ায় কোনো জীবের বৈজ্ঞানিক নাম সারা বিশ্বে একই নামে পরিচিত হয়।

1753 সালে সুইডিশ বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস Species plantarum বইটি রচনা করেন। এই বইটি উদ্ভিদবিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে, কারণ এর প্রকাশনার মাধ্যমে তিনি দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন এবং গণ ও প্রজাতির সংজ্ঞা দেন। তিনিই প্রথম ঐ গ্রন্থে জীবের শ্রেণি, বর্গ, গণ এবং প্রজাতি ধাপগুলো ব্যবহার করেন। লিনিয়াসের এই দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি নিঃসন্দেহে একটি চমৎকার উদ্ভাবন। এ পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিটি জীবের:

(a) নামকরণ ল্যাটিন ভাষায় কিংবা ল্যাটিন ভাষার মতো করে উপস্থাপন করতে হবে। (তরুণ প্রাণিবিজ্ঞানী সাজিদ আলী হাওলাদার সম্প্রতি নতুন প্রজাতির এক ব্যাঙ আবিষ্কার করেছেন, যা কেবল ঢাকায় পাওয়া যায়। ব্যাঙটির বৈজ্ঞানিক নামকরণ হয়েছে *Zakerana dhaka*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা কাজী জাকের হোসেনের প্রতি সম্মান দেখিয়ে এই গণের নাম জাকেরানা রাখা হয়েছে।)

(b) বৈজ্ঞানিক নামের দুটি অংশ থাকবে, প্রথম অংশটি গণ নাম এবং দ্বিতীয় অংশটি প্রজাতি নাম। যেমন: *Labeo rohita*। এটি রুই মাছের বৈজ্ঞানিক নাম, এখানে *Labeo* গণ এবং *rohita* প্রজাতিক পদ।

(c) জীবজগতের প্রতিটি বৈজ্ঞানিক নামকে অনন্য (unique) হতে হয়। কারণ, একই নাম দুটি পৃথক জীবের জন্য ব্যবহারের অনুমতি নেই।

(d) বৈজ্ঞানিক নামের প্রথম অংশের প্রথম অক্ষর বড় অক্ষর হবে, বাকি অক্ষরগুলো ছোট অক্ষর

হবে এবং দ্বিতীয় অংশটির নাম ছোট অক্ষর দিয়ে লিখতে হবে। যেমন- পিঁয়াজ *Allium cepa*, সিংহ *Panthera leo*।

(e) বৈজ্ঞানিক নাম মুদ্রণের সময় সর্বদা ইটালিক অক্ষরে লিখতে হবে। যেমন; ধান *Oryza sativa*, কাতল মাছ *Catla catla*।

(f) হাতে লেখার সময় গণ ও প্রজাতিক নামের নিচে আলাদা আলাদা দাগ দিতে হবে। যেমন: Oryza sativa, Catla catla ।

(g) যদি কয়েকজন বিজ্ঞানী একই জীবকে বিভিন্ন নামকরণ করেন, তবে অগ্রাধিকার আইন অনুসারে প্রথম বিজ্ঞানী কর্তৃক প্রদত্ত নামটি গৃহীত হবে।

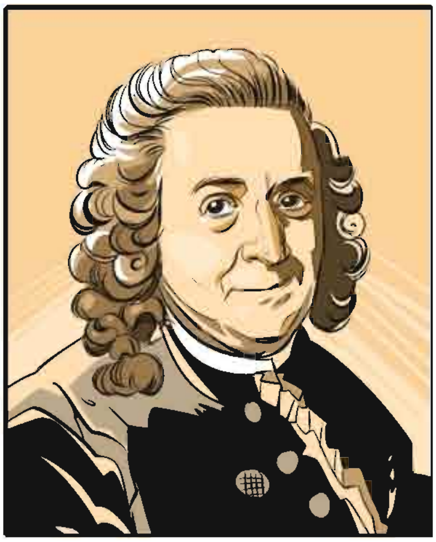

চিত্র 1.07: ক্যারোলাস লিনিয়াস

(h) যিনি প্রথম কোনো জীবের বিজ্ঞানসম্মত নাম দিবেন। তাঁর নাম প্রকাশের সালসহ উক্ত জীবের বৈজ্ঞানিক নামের শেষে সংক্ষেপে সংযোজন করতে হবে। যেমন: *Homo sapiens L.,1758, Oryza sativa L.,1753* (এখানে L লিনিয়াসের নামের সংক্ষিপ্ত রূপ, তবে দৈনন্দিন গবেষণা ও পাঠে এটুকু অনেক সময় লেখা হয় না)।

কয়েকটি জীবের দ্বিপদ নাম:

সাধারণ নাম	**বৈজ্ঞানিক নাম**
ধান	*Oryza sativa*
পাট	*Corchorus capsularis*
আম	*Mangifera indica*
কাঁঠাল	*Artocarpus heterophyllus*
শাপলা	*Nymphaea nouchali*
জবা	*Hibiscus rosa-sinensis*
কলেরা জীবাণু	*Vibrio cholerae*
ম্যালেরিয়া জীবাণু	*Plasmodium vivax*
আরশোলা	*Periplaneta americana*
মৌমাছি	*Apis indica*
ইলিশ	*Tenualosa ilisha*
কুনো ব্যাঙ	*Duttaphrynus melanostictus (Bufo melanostictus)*
দোয়েল	*Copsychus saularis*
রয়েল বেঙ্গল টাইগার	*Panthera tigris*
মানুষ	*Homo sapiens*

একক কাজ

কাজ : মনে কর তুমি তোমার এলাকায় একটি নতুন প্রজাতির ফড়িং আবিষ্কার করেছ। তুমি এটিকে কী নাম দেবে? তোমার নামকরণের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

1. জীববিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব কী?
2. জীববিজ্ঞানের ভৌত শাখাগুলোর নাম লিখ।
3. জীববিজ্ঞানের ফলিত শাখাগুলোর নাম লিখ।
4. দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি কী?
5. শ্রেণিবিন্যাসের ধাপগুলো উল্লেখ কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

1. জীবের শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা কী?

২০১৯

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. জীববিজ্ঞানের কোন শাখায় কীটপতঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়?

ক. এন্টোমোলজি
খ. ইকোলজি
গ. এন্ডোক্রাইনোলজি
ঘ. মাইক্রোবায়োলজি

2. শ্রেণিবিন্যাসের উদ্দেশ্য হলো-

i. জীবের উপদল সম্পর্কে জানা
ii. জীবের এককের নামকরণ করতে পারা
iii. বিস্তারিতভাবে জ্ঞানকে উপস্থাপন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও iii
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

পাশের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং 3 এবং 4 নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

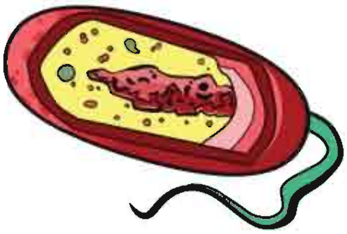

3. চিত্রে প্রদর্শিত জীবটির নাম কী?

ক. অ্যামিবা
খ. ডায়াটম
গ. প্যারামেসিয়াম
ঘ. ব্যাকটেরিয়া

4. উদ্দীপকে প্রদর্শিত জীবটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

i. এরা চলনে সক্ষম
ii. এরা খাদ্য তৈরিতে অক্ষম
iii. তাদের নিউক্লিয়াস সুগঠিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

1.

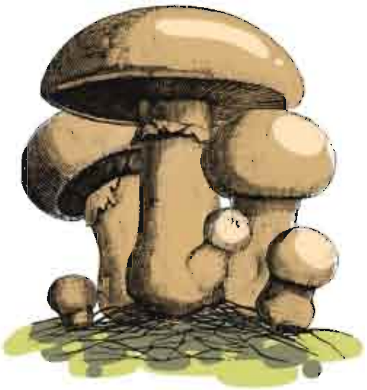

চিত্র- ১

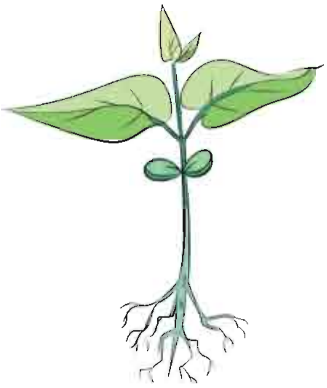

চিত্র- ২

ক. শ্রেণিবিন্যাসের একক কী?

খ. বংশগতিবিদ্যাকে জীববিজ্ঞানের ভৌত শাখা বলা হয় কেন?

গ. চিত্র-2-এর উদ্ভিদটির নামকরণের ক্ষেত্রে কীভাবে তুমি ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্র-1 এবং চিত্র-2-এর মধ্যে কোন জীবটি অধিক উন্নত, কারণসহ বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবকোষ ও টিস্যু

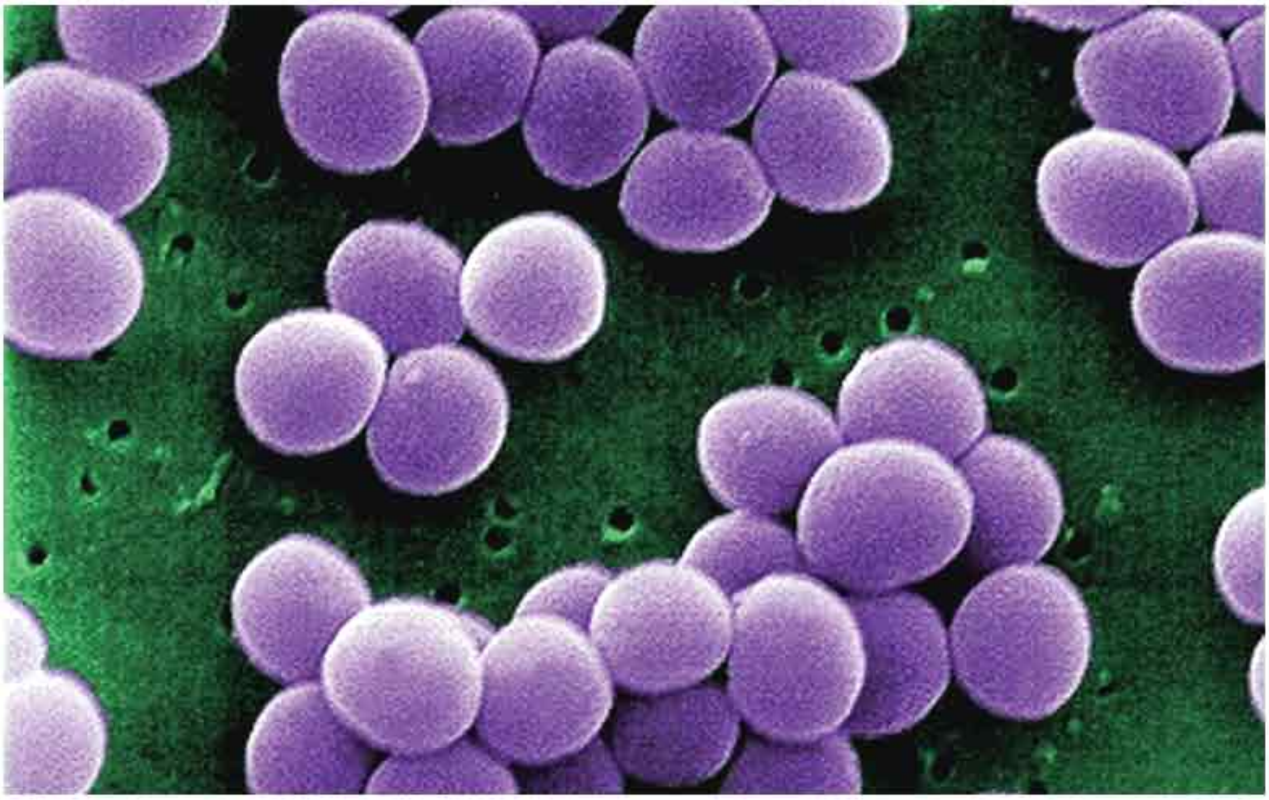

আগের শ্রেণিতে তোমরা জীবকোষ সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিলে। সেই সব ধারণার উপর ভিত্তি করে তোমরা এই অধ্যায়ে জীবকোষ সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে পারবে। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা একটি জীবকোষ আর ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা ঐ একই জীবকোষের গঠন কি এক রকম? এই অধ্যায়ে তোমরা এই ধরনের প্রশ্নগুলোর উত্তরগুলোও খুঁজে পাবে।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের প্রধান অঙ্গাণুর কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের তুলনা করতে পারব।
- স্নায়ু, পেশি, রক্ত, ত্বক এবং অস্থির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে বিভিন্ন প্রকার কোষের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব।
- জীবদেহে কোষের উপযোগিতা মূল্যায়ন করতে পারব।
- উদ্ভিদ টিস্যু ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাণি টিস্যু ব্যাখ্যা করতে পারব।
- একই রকম কোষ সমষ্টির ও একই কাজ সম্পন্ন করার ভিত্তিতে টিস্যুর কাজ মূল্যায়ন করতে পারব।
- টিস্যু, অঙ্গ এবং তন্ত্রে কোষের সংগঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- টিস্যুতন্ত্রের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অঙ্গ ও অঙ্গাতন্ত্রের ধারণা এবং গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদকোষ (পেঁয়াজ) ও প্রাণিকোষ (প্রোটোজোয়া) পর্যবেক্ষণ করে চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করতে পারব।
- উদ্ভিদ ও প্রাণিটিস্যুর চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত করতে পারব।
- সঠিকভাবে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করতে পারব।
- জীবের নানা কার্যক্রমে কোষের অবদান অনুধাবন করতে পারব।

2.1 জীবকোষ

আগের শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ যে জীবকোষ হচ্ছে জীবদেহের একক। এই জীবকোষ কী? কোনো কোনো বিজ্ঞানী জীবকোষকে জীবদেহের গঠন ও জীবজ ক্রিয়াকলাপের একক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। লোয়ি (Loewy) এবং সিকেভিজ (Siekevitz) 1969 সালে বৈষম্য ভেদ্য (selectively permeable) পর্দা দিয়ে আবৃত এবং জীবজ ক্রিয়াকলাপের একক যা অন্য সজীব মাধ্যম ছাড়াই নিজের প্রতিরূপ তৈরি করতে পারে, এমন সত্তাকে কোষ বলেছেন।

কোষের প্রকারভেদ

সকল জীবকোষ এক রকম নয়। এদের মধ্যে গঠনগত পার্থক্য যেমন আছে তেমনই আছে আকৃতি ও কাজের পার্থক্য। নিউক্লিয়াসের গঠনের ভিত্তিতে কোষ দুই ধরনের, আদি কোষ এবং প্রকৃত কোষ।

(a) আদিকোষ বা প্রাককেন্দ্রিক কোষ (Prokaryotic cell):
এ ধরনের কোষে কোনো সুগঠিত নিউক্লিয়াস (nucleus) থাকে না। এ জন্য এদের আদি নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষও বলা হয়। এসব কোষের নিউক্লিয়াস কোনো পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে না, তাই নিউক্লিও-বস্তু সাইটোপ্লাজমে ছড়ানো থাকে। এসব কোষে মাইটোকন্ড্রিয়া, প্লাস্টিড, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইত্যাদি অঙ্গাণু থাকে না তবে রাইবোজোম থাকে। ক্রোমোজোমে কেবল DNA থাকে। নীলাভ সবুজ শৈবাল বা ব্যাকটেরিয়ায় এ ধরনের কোষ পাওয়া যায়।

(b) প্রকৃত কোষ বা সুকেন্দ্রিক কোষ (Eukaryotic cell):
এসব কোষের নিউক্লিয়াস সুগঠিত অর্থাৎ নিউক্লিয়ার ঝিল্লি (nuclear membrane) দিয়ে নিউক্লিও-বস্তু পরিবেষ্টিত ও সুসংগঠিত। এসব কোষে রাইবোজোমসহ সকল অঙ্গাণু উপস্থিত থাকে। ক্রোমোজোমে DNA, প্রোটিন, হিস্টোন এবং অন্যান্য উপাদান থাকে। অধিকাংশ জীবকোষ এ ধরনের হয়।

কাজের ভিত্তিতে প্রকৃত কোষ দুই ধরনের, দেহকোষ এবং জননকোষ।

দেহকোষ (Somatic cell): বহুকোষী জীবের দেহ গঠনে এসব কোষ অংশগ্রহণ করে। মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজনের মাধ্যমে দেহকোষ বিভাজিত হয় এবং এভাবে দেহের বৃদ্ধি ঘটে। বিভিন্ন তন্ত্র ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠনে দেহকোষ অংশ নেয়।

জননকোষ (Gametic cell): যৌন প্রজনন ও জনঃক্রম দেখা যায়, এমন জীবে জননকোষ উৎপন্ন হয়। মিয়োসিস পদ্ধতিতে জনন মাতৃকোষের বিভাজন ঘটে এবং জনন কোষ উৎপন্ন হয়। অপত্য জননকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃজনন কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক থাকে। পুং ও স্ত্রী জননকোষ মিলিত

হয়ে নতুন জীবের দেহ গঠনের সূচনা করে। পুং ও স্ত্রী জননকোষের মিলনের ফলে সৃষ্ট এই প্রথম কোষটিকে জাইগোট (Zygote) বলে। জাইগোট বারবার বিভাজনের মাধ্যমে জীবদেহ গঠন করে।

2.2 উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের প্রধান অঙ্গাণু এবং তাদের কাজ

উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ ও প্রাণীরা সকলেই প্রকৃত কোষী। প্রতিটি কোষ কতগুলো অঙ্গাণু নিয়ে তৈরি হয়।

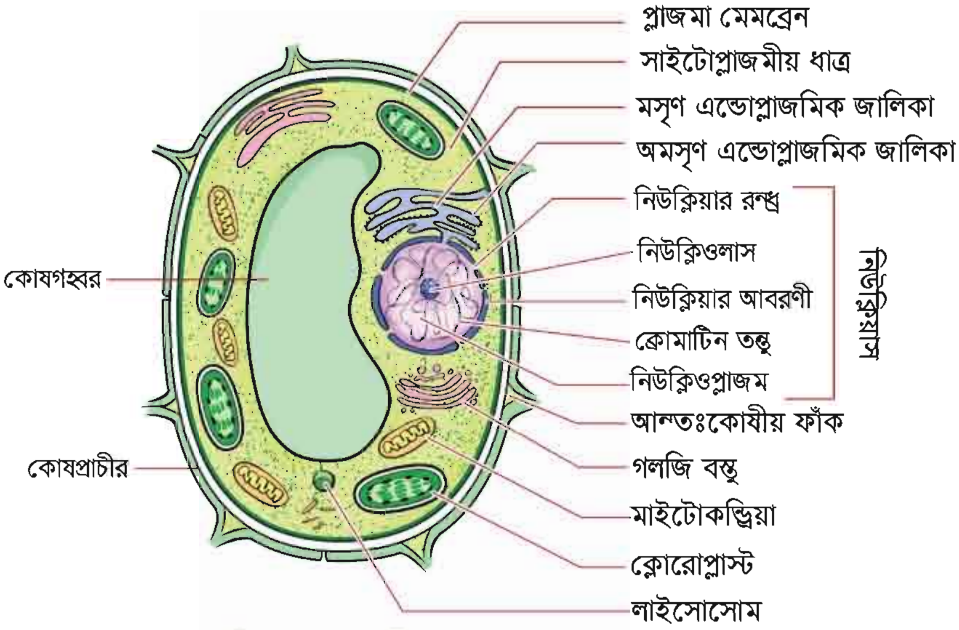
প্লাজমা মেমব্রেন
সাইটোপ্লাজমীয় ধাত্র
মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা
অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা
নিউক্লিয়ার রন্ধ্র
নিউক্লিওলাস
নিউক্লিয়ার আবরণী
ক্রোমাটিন তন্তু
নিউক্লিওপ্লাজম
নিউক্লিয়াস
আন্তঃকোষীয় ফাঁক
গলজি বস্তু
মাইটোকন্ড্রিয়া
ক্লোরোপ্লাস্ট
লাইসোসোম
কোষগহ্বর
কোষপ্রাচীর

চিত্র 2.01: উদ্ভিদকোষের প্রধান অঙ্গাণুসমূহ

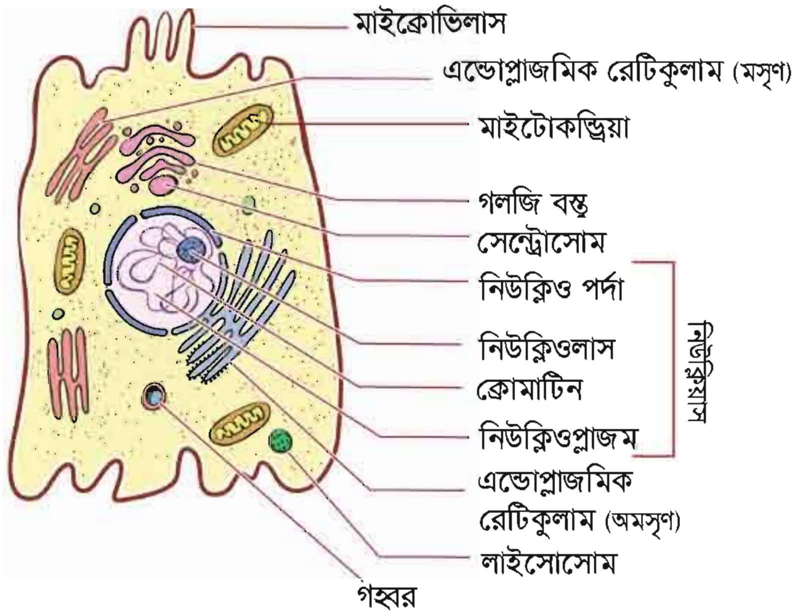
মাইক্রোভিলাস
এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (মসৃণ)
মাইটোকন্ড্রিয়া
গলজি বস্তু
সেন্ট্রোসোম
নিউক্লিও পর্দা
নিউক্লিওলাস
ক্রোমাটিন
নিউক্লিওপ্লাজম
নিউক্লিয়াস
এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (অমসৃণ)
লাইসোসোম
গহ্বর

চিত্র 2.02: প্রাণিকোষের প্রধান অঙ্গাণুসমূহ

এসব অঙ্গাণুর অধিকাংশই উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের কোষে থাকলেও কিছু অঙ্গাণু আছে, যা কেবল উদ্ভিদকোষে অথবা কেবল প্রাণিকোষে পাওয়া যায়।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়, এমন কিছু কোষ অঙ্গাণুর সাথে এবার আমরা পরিচিত হব।

কোষপ্রাচীর (cell wall)

কোষপ্রাচীর উদ্ভিদ কোষের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এটি মৃত বা জড়বস্তু দিয়ে তৈরি। প্রাণিকোষে কোষপ্রাচীর থাকে না। কোষপ্রাচীরের রাসায়নিক গঠন বেশ জটিল, এতে সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, লিগনিন, পেকটিন, সুবেরিন নামক রাসায়নিক পদার্থ থাকে। তবে ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীর প্রোটিন, লিপিড ও পলিস্যাকারাইড দিয়ে এবং ছত্রাকের কোষপ্রাচীর কাইটিন দিয়ে তৈরি। প্রাথমিক কোষপ্রাচীরটি একস্তরবিশিষ্ট। মধ্য পর্দার উপর প্রোটোপ্লাজম থেকে নিঃসৃত কয়েক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য জমা হয়ে ক্রমশ গৌণপ্রাচীর সৃষ্টি হয়। এ প্রাচীরে মাঝে মাঝে ছিদ্র থাকে, যাকে কূপ বলে। কোষপ্রাচীর কোষকে দৃঢ়তা প্রদান করে, কোষের আকার ও আকৃতি বজায় রাখে। পাশের কোষের সাথে প্লাজমোডেজমাটা (আণুবীক্ষণিক নালি) সৃষ্টির মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং পানি ও খনিজ লবণ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

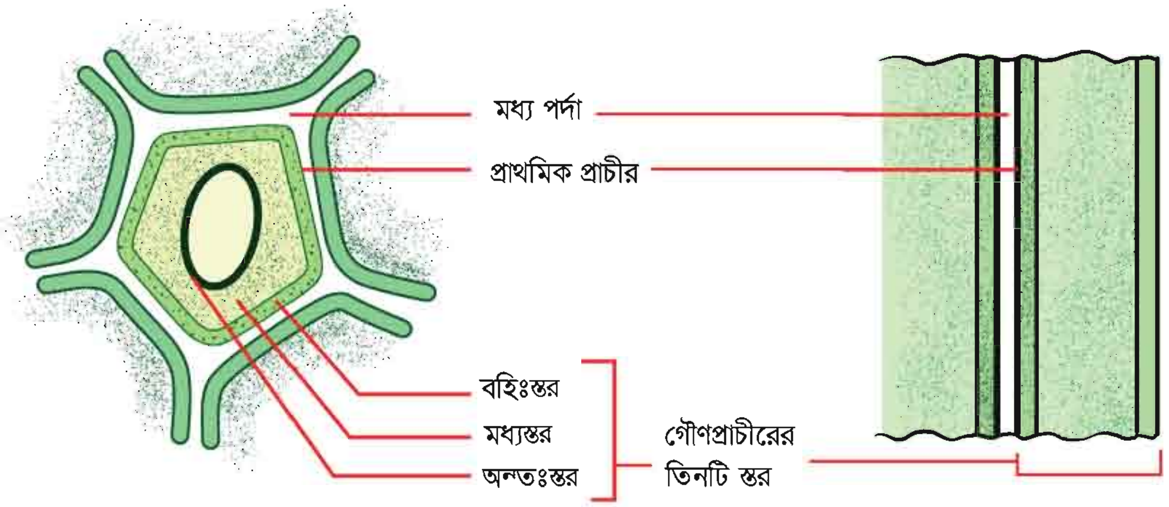

(ক) প্রস্থচ্ছেদ (খ) লম্বচ্ছেদ

চিত্র 2.03: কোষ প্রাচীরের আণুবীক্ষণিক চিত্র

প্রোটোপ্লাজম

কোষের ভিতরে যে অর্ধস্বচ্ছ, থকথকে জেলির মতো বস্তু থাকে তাকে প্রোটোপ্লাজম বলে। কোষঝিল্লি দিয়ে ঘেরা সবকিছুই প্রোটোপ্লাজম, এমনকী কোষঝিল্লি নিজেও প্রোটোপ্লাজমের অংশ। কোষঝিল্লী ছাড়াও এখানে আছে সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণুগুলো এবং নিউক্লিয়াস।

2.2.1 কোষঝিল্লি (Plasmalemma):

প্রোটোপ্লাজমের বাইরে দুই স্তরের যে স্থিতিস্থাপক পর্দা থাকে, তাকে কোষঝিল্লি বা প্লাজমালেমা বলে। কোষঝিল্লির ভাঁজকে মাইক্রোভিলাই বলে। এটি প্রধানত লিপিড এবং প্রোটিন দিয়ে তৈরি। কোষঝিল্লি একটি বৈষম্যভেদ্য পর্দা হওয়ায় অভিস্রবণের মাধ্যমে পানি ও খনিজ লবণ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে এবং পাশাপাশি কোষগুলোকে পরস্পর থেকে আলাদা করে রাখে।

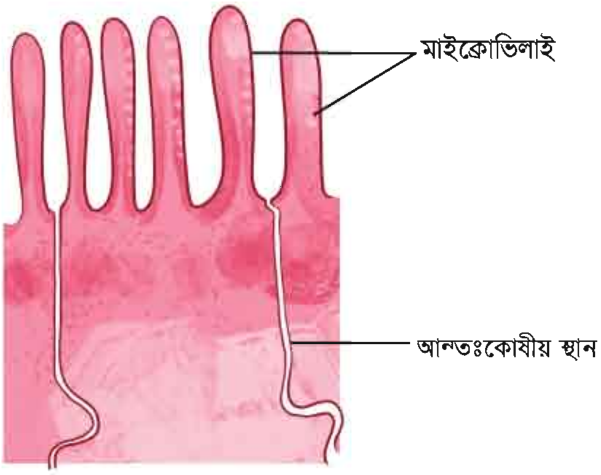

চিত্র 2.04: কোষঝিল্লি

2.2.2 সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু (Cytoplasmic organelles):

প্রোটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকাটিকে সরিয়ে দিলে যে জেলির মত বস্তুটি থেকে যায় সেটিই সাইটোপ্লাজম। এই সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অনেক ধরনের অঙ্গাণু থাকে। এদের প্রত্যেকের কাজ আলাদা হলেও একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এই অঙ্গাণুগুলো কোনো কোনোটি ঝিল্লিযুক্ত আবার কোনো কোনোটি ঝিল্লিবিহীন। অঙ্গাণুগুলো হচ্ছে:

ঝিল্লিযুক্ত সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু:

(a) মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria)

শ্বসনে অংশগ্রহণকারী এ অঙ্গাণুটি 1898 সালে বেনডা (Benda) আবিষ্কার করেন। এটি দুই স্তরবিশিষ্ট আবরণী বা ঝিল্লি দিয়ে ঘেরা। ভিতরের স্তরটি ভিতরের দিকে ভাঁজ হয়ে থাকে। এদের ক্রিস্টি (cristae) বলে। ক্রিস্টির গায়ে বৃন্তযুক্ত গোলাকার বস্তু থাকে, এদের অক্সিজোম (oxisomes) বলে। অক্সিজোমে উৎসেচকগুলো (enzymes) সাজানো থাকে। মাইটোকন্ড্রিয়নের ভিতরে থাকে ম্যাট্রিক্স (matrix)। জীবের শ্বসনকার্যে সাহায্য করা মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রধান কাজ। তোমরা পরে দেখবে যে শ্বসন ক্রিয়ার ধাপ চারটি; গ্লাইকোলাইসিস, অ্যাসিটাইল কো-এ সৃষ্টি, ক্রেবস চক্র এবং ইলেকট্রন প্রবাহ তন্ত্র। এর প্রথম

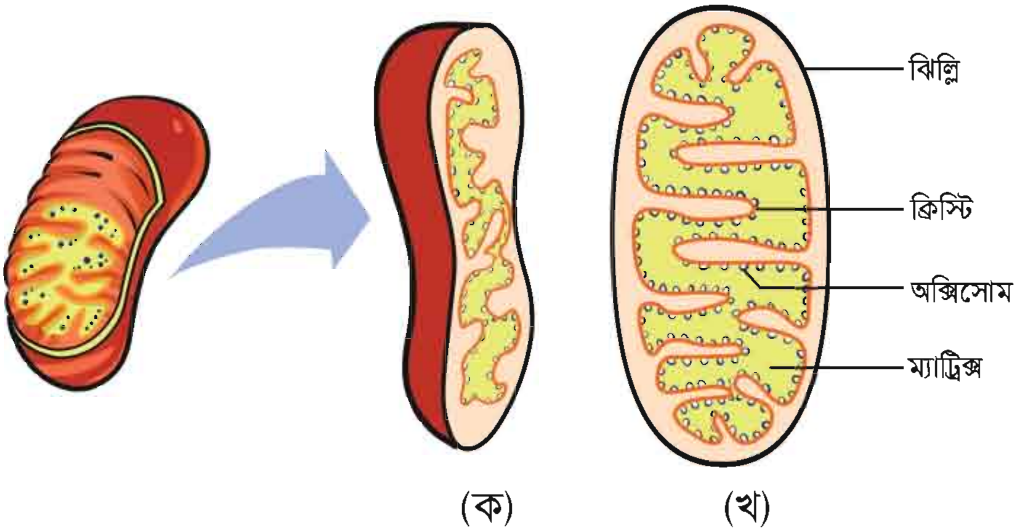

চিত্র 2.05: (ক) মাইটোকন্ড্রিয়া (খ) লম্বচ্ছেদ

ধাপ (গ্লাইকোলাইসিসের বিক্রিয়াগুলো) মাইটোকন্ড্রিয়ায় ঘটে না। তবে দ্বিতীয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ক্রেবস চক্রের বিক্রিয়াগুলো এই অঙ্গাণুর মধ্যেই সম্পন্ন হয়। ক্রেবস চক্রে অংশগ্রহণকারী সব উৎসেচক এতে উপস্থিত থাকায় এ বিক্রিয়াগুলো মাইটোকন্ড্রিয়াতেই সম্পন্ন হয়। তোমরা দেখবে, ক্রেবস চক্রে সবচেয়ে বেশি শক্তি উৎপাদিত হয়। এ জন্য মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র বা পাওয়ার হাউস বলা হয়। এই শক্তি জীব তার বিভিন্ন কাজে খরচ করে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকল উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষে মাইটোকন্ড্রিয়া পাওয়া যায়।

প্রাককেন্দ্রিক কোষে মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে না। এমনকি কিছু সুকেন্দ্রিক কোষেও (যেমন: *Trichomonas*, *Monocercomonoides* ইত্যাদি প্রোটোজোয়াতে) মাইটোকন্ড্রিয়া অনুপস্থিত। তাহলে এমন কি হতে পারে যে বিবর্তনীয় ইতিহাসের কোনো এক সময়ে সুকেন্দ্রিক কোষের ভিতর মাইটোকন্ড্রিয়া (কিংবা তার পূর্বসূরী) ঢুকে পড়েছিল এবং তারপর থেকে সেটি কোষের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে? এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্য-উপাত্ত থেকে এই ব্যাখ্যাটিই অনুমান করা হয়।

(b) প্লাস্টিড (Plastid)

প্লাস্টিড উদ্ভিদ কোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু। প্লাস্টিডের প্রধান কাজ খাদ্য প্রস্তুত করা, খাদ্য সঞ্চয় করা এবং উদ্ভিদদেহকে বর্ণময় এবং আকর্ষণীয় করে পরাগায়নে সাহায্য করা। প্লাস্টিড তিন ধরনের— ক্লোরোপ্লাস্ট, ক্রোমোপ্লাস্ট এবং লিউকোপ্লাস্ট।

(i) ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast): সবুজ রঙের প্লাস্টিডকে ক্লোরোপ্লাস্ট বলে। পাতা, কচি কাণ্ড ও অন্যান্য সবুজ অংশে এদের পাওয়া যায়। প্লাস্টিডের গ্রানা (grana) অংশ সূর্যালোককে আবদ্ধ করে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এই আবদ্ধ সৌরশক্তি স্ট্রোমাতে (stroma) অবস্থিত উৎসেচক

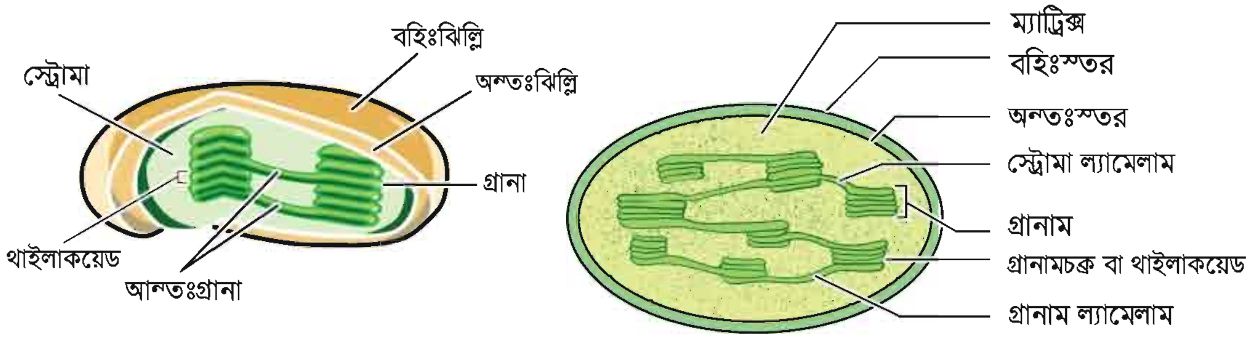
বহিঃঝিল্লি
স্ট্রোমা
অন্তঃঝিল্লি
গ্রানা
থাইলাকয়েড
আন্তঃগ্রানা
ম্যাট্রিক্স
বহিঃস্তর
অন্তঃস্তর
স্ট্রোমা ল্যামেলাম
গ্রানাম
গ্রানামচক্র বা থাইলাকয়েড
গ্রানাম ল্যামেলাম

চিত্র 2.06: একটি প্লাস্টিড কণা (খণ্ডিত)। ক্লোরোপ্লাস্টের বিভিন্ন অংশ
(ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দেখা এবং সরলভাবে উপস্থাপিত।)

সমষ্টি, বায়ু থেকে গৃহীত কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং কোষের ভিতরকার পানি ব্যবহার করে সরল শর্করা তৈরি করে। এই প্লাস্টিডে ক্লোরোফিল থাকে, তাই এদের সবুজ দেখায়। এছাড়া এতে ক্যারোটিনয়েড নামে এক ধরনের রঞ্জকও থাকে।

(ii) ক্রোমোপ্লাস্ট (Chromoplast): এগুলো রঙিন প্লাস্টিড তবে সবুজ নয়। এসব প্লাস্টিডে জ্যান্থফিল, ক্যারোটিন, ফাইকোএরিথ্রিন, ফাইকোসায়ানিন ইত্যাদি রঞ্জক থাকে, তাই কোনোটিকে হলুদ, কোনোটিকে নীল আবার কোনোটিকে লাল দেখায়। এদের মিশ্রণজনিত কারণে ফুল, পাতা এবং উদ্ভিদের অন্যান্য অংশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। রঙিন ফুল, পাতা এবং গাজরের মূলে এদের পাওয়া যায়। ফুলকে আকর্ষণীয় করে পরাগায়নে সাহায্য করা এদের প্রধান কাজ। এরা বিভিন্ন ধরনের রঞ্জক পদার্থ সংশ্লেষণ করে জমা করে রাখে।

(iii) লিউকোপ্লাস্ট (Leucoplast): যেসব প্লাস্টিডে কোনো রঞ্জক পদার্থ থাকে না, তাদের লিউকোপ্লাস্ট বলে। যেসব কোষে সূর্যের আলো পৌঁছায় না, যেমন মূল, ভ্রূণ, জননকোষ ইত্যাদি সেখানে এদের পাওয়া যায়। এদের প্রধান কাজ খাদ্য সঞ্চয় করা। আলোর সংস্পর্শে এলে লিউকোপ্লাস্ট ক্লোরোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হতে পারে।

একক কাজ

কাজ : প্লাস্টিডের চিত্র আঁকা।

উপকরণ : বিভিন্ন রকমের প্লাস্টিডের চিত্র, পোস্টার পেপার, সাইন পেন।

পদ্ধতি : বিভিন্ন রকমে প্লাস্টিডের চিত্র এঁকে বোর্ডে ঝুলিয়ে দাও এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

(c) গলজি বস্তু (Golgi body)

গলজি বস্তু (কিংবা গলগি বস্তু) প্রধানত প্রাণিকোষে পাওয়া যায়, তবে অনেক উদ্ভিদকোষেও এদের দেখা যায়। এটি সিস্টার্নি ও কয়েক ধরনের ভেসিকল নিয়ে তৈরি। এর পর্দায় বিভিন্ন উৎসেচকের পানি বিয়োজন সম্পন্ন হয়। জীবকোষে বিভিন্ন পদার্থ নিঃসৃতকরণের সাথে এর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। হরমোন নিঃসরণেও এর ভূমিকা লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো বিপাকীয় কার্যের সাথেও এরা সম্পর্কিত এবং কখনো কখনো এরা প্রোটিন সঞ্চয় করে রাখে।

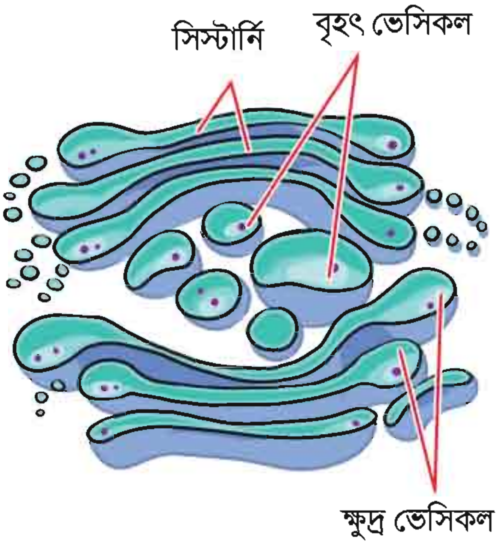

চিত্র 2.07: গলজি বস্তু

(d) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (Endoplasmic reticulum)

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এর আবরণীর গায়ে প্রায়ই রাইবোজোম লেগে থাকে, তাই স্বাভাবিকভাবেই এই সব স্থানে প্রোটিন সংশ্লেষণের ঘটনা ঘটে। কোষে উৎপাদিত পদার্থগুলোর প্রবাহ পথ হিসেবে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ব্যবহৃত হয়। এগুলো কখনো কখনো প্লাজমা মেমব্রেনের সাথে যুক্ত থাকে, তাই ধারণা করা হয় যে এক কোষ থেকে অন্য কোষে উৎসেচক ও কোষে উৎপাদিত অন্যান্য দ্রবাদি এর মাধ্যমে চলাচল করে। মাইটোকন্ড্রিয়া, কোষগহ্বর এগুলো সৃষ্টিতে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয় কোষেই এরা উপস্থিত থাকে।

(e) কোষগহ্বর (Vacuole)

সাইটোপ্লাজমে কোষের মধ্যে যে আপাত ফাঁকা স্থান দেখা যায়, সেগুলোই হচ্ছে কোষগহ্বর। বৃহৎ কোষগহ্বর উদ্ভিদ কোষের বৈশিষ্ট্য। এর প্রধান কাজ কোষরস ধারণ করা। বিভিন্ন ধরনের অজৈব লবণ, আমিষ, শর্করা, চর্বিজাতীয় পদার্থ, জৈব এসিড, রঞ্জক পদার্থ, পানি ইত্যাদি এই কোষরসে থাকে। প্রাণিকোষে কোষগহ্বর সাধারণত অনুপস্থিত থাকে, তবে যদি কখনো থাকে, তবে সেগুলো আকারে ছোট হয়।

(f) লাইসোজোম (Lysosome)

লাইসোজোম জীবকোষকে জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে। এর উৎসেচক আগত

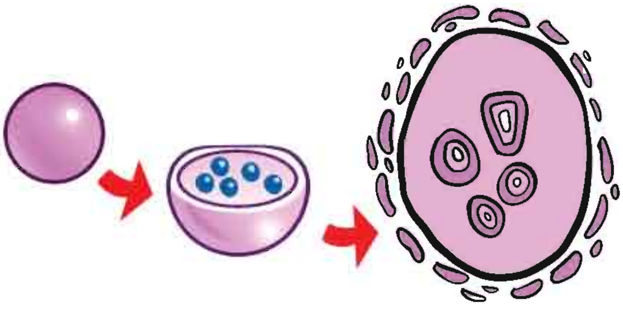

চিত্র 2.08: লাইসোজোম কণা

জীবাণুগুলোকে হজম করে ফেলে। এর পরিপাক করার উৎসেচকগুলো একটি পর্দা দিয়ে আলাদা করা থাকে, তাই অন্যান্য অঙ্গাণু এর সংস্পর্শে এলেও হজম হয় না। দেহে অক্সিজেনের অভাব হলে বা বিভিন্ন কারণে লাইসোজোমের পর্দা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তখন এর আশেপাশের অঙ্গগুলো নষ্ট হয়ে যায়। কখনো কোষটিই মারা যায়।

ঝিল্লিবিহীন সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু

(a) কোষকঙ্কাল (Cytoskeleton)

কোষঝিল্লি অতিক্রম করে কোষের ভিতরে ঢুকলে প্রথমেই কোষকঙ্কাল নজরে পড়বে, সেটি লম্বা এবং মোটা-চিকন মিলিয়ে অসংখ্য দড়ির মতো বস্তু কোষের চারদিকে জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। কোষকঙ্কাল ভিতর থেকে কোষটাকে ধরে রাখে। এগুলো অ্যাকটিন, মায়োসিন, টিউবিউলিন ইত্যাদি প্রোটিন দিয়ে কোষকঙ্কালের বিভিন্ন ধরনের তন্তু নির্মিত হয়। মাইক্রোটিউবিউল, মাইক্রোফিলামেন্ট কিংবা ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট এ ধরনের তন্তুর উদাহরণ।

(b) রাইবোজোম (Ribosome)

প্রাণী এবং উদ্ভিদ উভয় ধরনের কোষেই এদের পাওয়া যায়। এই ঝিল্লিবিহীন বা পর্দাবিহীন অঙ্গাণুটি প্রধানত প্রোটিন সংশ্লেষণে সাহায্য করে। প্রোটিনের পলিপেপটাইড চেইন সংযোজন এই রাইবোজোমে হয়ে থাকে। এছাড়া রাইবোজোম এ কাজে প্রয়োজনীয় উৎসেচক সরবরাহ করে থাকে। উৎসেচক বা এনজাইমের কাজ হলো প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি বাড়িয়ে দেওয়া।

(c) সেন্ট্রোজোম (Centrosome)

এটি প্রাণিকোষের বৈশিষ্ট্য, প্রধানত প্রাণিকোষে এদের পাওয়া যায়। নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদ কোষে কদাচিৎ এদের দেখা যায়। প্রাণিকোষের নিউক্লিয়াসের কাছে দুটি ফাঁপা নলাকার বা দণ্ডাকার অঙ্গাণু দেখা যায়, তাদের সেন্ট্রিওল বলে। সেন্ট্রিওলের চারপাশে অবস্থিত গাঢ় তরলকে সেন্ট্রোস্ফিয়ার এবং সেন্ট্রোস্ফিয়ারসহ সেন্ট্রিওলকে সেন্ট্রোজোম বলে। সেন্ট্রোজোমে থাকা সেন্ট্রিওল কোষ বিভাজনের সময় অ্যাস্টার রে তৈরি করে। এছাড়া স্পিন্ডল যন্ত্র সৃষ্টিতেও সেন্ট্রোজোমের অবদান রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ফ্লাজেলা সৃষ্টিতে এরা অংশগ্রহণ করে।

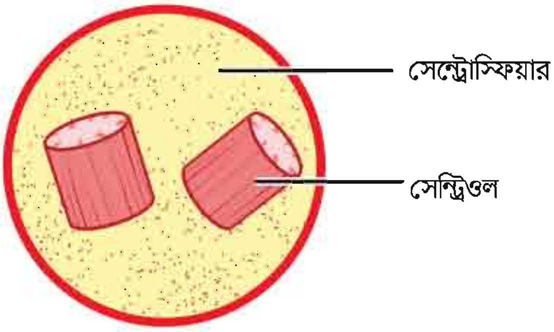

চিত্র 2.09: সেন্ট্রোজোম

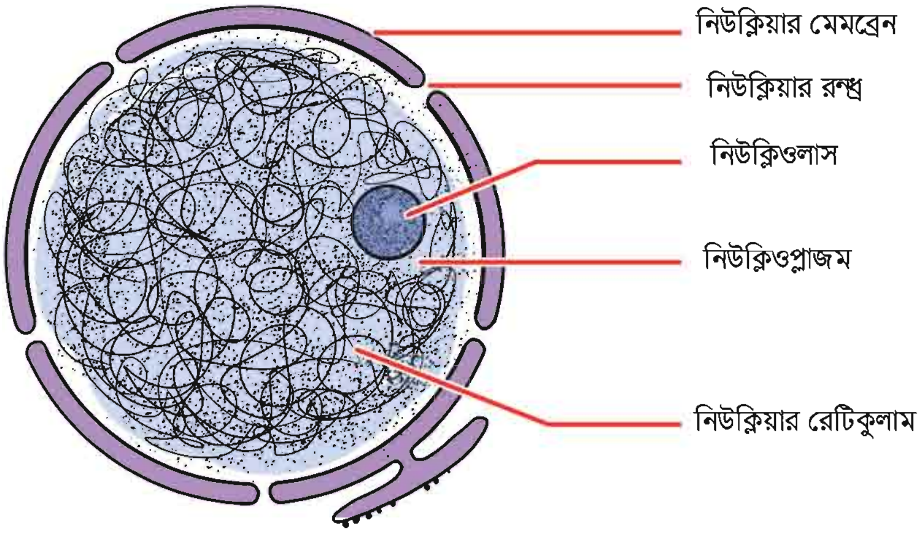

চিত্র 2.10: নিউক্লিয়াস

2.2.3 নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকা (Nucleus):

জীবকোষের প্রোটোপ্লাজমে নির্দিষ্ট পর্দাঘেরা ক্রোমোজোম বহনকারী সুস্পষ্ট যে বস্তুটি দেখা যায় সেটিই হচ্ছে নিউক্লিয়াস। এর আকৃতি গোলাকার, ডিম্বাকার বা নলাকার। সিভকোষ এবং লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না। নিউক্লিয়াসে বংশগতির বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে। এটি কোষে সংঘটিত বিপাকীয় কার্যাবলিসহ সব ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। সুগঠিত নিউক্লিয়াসে নিচের অংশগুলো দেখা যায়।

(a) নিউক্লিয়ার ঝিল্লি (Nuclear membrane)

নিউক্লিয়াসকে ঘিরে রাখে যে ঝিল্লি, তাকে নিউক্লিয়ার ঝিল্লি বা কেন্দ্রিকা ঝিল্লি বলে। এটি দুই স্তর বিশিষ্ট। এই ঝিল্লি লিপিড ও প্রোটিনের সমন্বয়ে তৈরি হয়। এই ঝিল্লিতে মাঝে মাঝে কিছু ছিদ্র থাকে, যেগুলোকে নিউক্লিয়ার রন্ধ্র বলে। এই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কিছু বস্তু চলাচল করে। নিউক্লিয়ার ঝিল্লি সাইটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াসের অন্যান্য বস্তুকে পৃথক রাখে এবং বিভিন্ন বস্তুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

(b) নিউক্লিওপ্লাজম (Nucleoplasm)

নিউক্লিয়ার ঝিল্লির ভিতরে জেলির মতো বস্তু বা রস থাকে। একে কেন্দ্রিকারস বা নিউক্লিওপ্লাজম বলে। নিউক্লিওপ্লাজমে নিউক্লিক এসিড, প্রোটিন, উৎসেচক ও কতিপয় খনিজ লবণ থাকে।

(c) নিউক্লিওলাস (Nucleolus)

নিউক্লিওপ্লাজমের মধ্যে ক্রোমোজোমের সাথে সংলগ্ন গোলাকার বস্তুকে নিউক্লিওলাস বা কেন্দ্রিকাণু বলে। ক্রোমোজোমের রংঅগ্রাহী অংশের সাথে এরা লেগে থাকে। এরা RNA ও প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয়। এরা রাইবোজোম সংশ্লেষণ করে।

(d) ক্রোমাটিন জালিকা (Chromatin reticulum)

কোষের বিশ্রামকালে অর্থাৎ যখন কোষ বিভাজন চলে না, তখন নিউক্লিয়াসে কুন্ডলী পাকানো সূক্ষ্ম সুতার মতো অংশই হচ্ছে ক্রোমাটিন জালিকা বা নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম। কোষ বিভাজনের সময় এরা মোটা এবং খাটো হয়, তাই তখন তাদের আলাদা আলাদা ক্রোমোজোম হিসেবে দেখা যায়। ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলো বংশগতির গুণাবলি বহন করে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে নিয়ে যায়। কোনো একটি জীবের ক্রোমোজোম সংখ্যা ঐ জীবের জন্য নির্দিষ্ট। এসব ক্রোমোজোমে বংশধারা বহনকারী জিন (gene) অবস্থান করে এবং বংশের বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় বহন করা ক্রোমোজোমের কাজ।

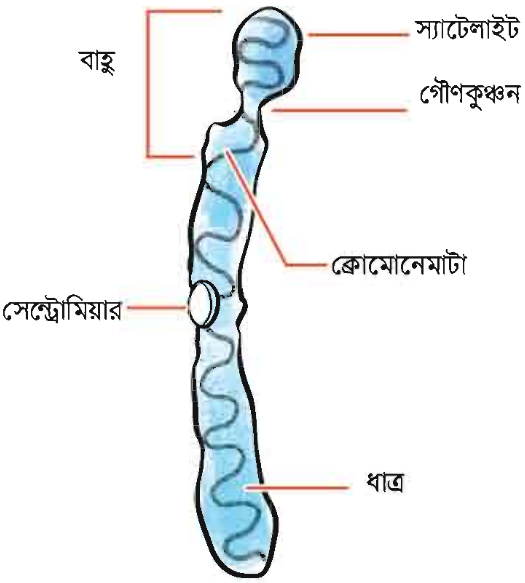

চিত্র 2.11: ক্রোমোজোম

একক কাজ

কাজ: এখানে আলোচিত কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুর শ্রেণি বিভাগ একটি চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।

2.3 উদ্ভিদ ও প্রাণীর কাজ পরিচালনায় বিভিন্ন প্রকার কোষের ভূমিকা

কোষ জীবদেহের (উদ্ভিদ ও প্রাণী) গঠনের একক। এককোষী ও বহুকোষী প্রাণীদের কোষের কাজ ভিন্ন ভিন্নভাবে পরিচালিত হয়। পৃথিবীর আদি প্রাণের আবির্ভাবের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত এককোষী প্রাণী প্রোটোজোয়া পর্বের প্রজাতিগুলো তাদের দেহের সব ধরনের ক্রিয়াকলাপ—যেমন খাদ্যগ্রহণ, দেহের বৃদ্ধি ও প্রজনন ঐ একটি কোষের মাধ্যমেই সম্পন্ন করে থাকে। বহুকোষী প্রাণীদের দেহকোষের মাঝে ভিন্নতা আছে, আছে বৈচিত্র্য।

2.3.1 উদ্ভিদ টিস্যু (Plant tissue)

একই বা বিভিন্ন প্রকারের একগুচ্ছ কোষ একত্রিত হয়ে যদি একই কাজ করে এবং তাদের উৎপত্তিও যদি অভিন্ন হয়, তখন তাদের টিস্যু বা কলা বলে। টিস্যু দুই ধরনের, ভাজক টিস্যু এবং স্থায়ী টিস্যু। ভাজক টিস্যুর কোষগুলো বিভাজনে সক্ষম কিন্তু স্থায়ী টিস্যুর কোষগুলো বিভাজিত হতে পারে না। স্থায়ী

টিস্যু তিন ধরনের, সরল টিস্যু, জটিল টিস্যু এবং নিঃস্রাবী (ক্ষরণকারী) টিস্যু। এখানে শুধু সরল এবং জটিল টিস্যু নিয়ে আলোচনা করা হবে।

(a) সরল টিস্যু (Simple tissue)

যে স্থায়ী টিস্যুর প্রতিটি কোষ আকার, আকৃতি ও গঠনের দিক থেকে অভিন্ন, তাকে সরল টিস্যু বলে। কোষের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে সরল টিস্যুকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা, প্যারেনকাইমা, কোলেনকাইমা এবং স্ক্লেরেনকাইমা।

প্যারেনকাইমা (Parenchyma): উদ্ভিদদেহের সব অংশে এদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এ টিস্যুর কোষগুলো জীবিত, সমব্যাসীয়, পাতলা প্রাচীরযুক্ত এবং প্রোটোপ্লাজম দিয়ে পূর্ণ। এই টিস্যুতে আন্তঃকোষীয় ফাঁক দেখা যায়। কোষপ্রাচীর পাতলা এবং সেলুলোজ দিয়ে তৈরি হয়। এসব কোষে যখন ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে, তখন তাকে ক্লোরেনকাইমা (Chlorenchyma) বলে। জলজ উদ্ভিদের বড় বড় বায়ুকুঠুরিযুক্ত প্যারেনকাইমাকে অ্যারেনকাইমা (Aerenchyma) বলে। প্যারেনকাইমা টিস্যুর প্রধান কাজ দেহ গঠন করা, খাদ্য প্রস্তুত করা, খাদ্য সঞ্চয় করা এবং খাদ্যদ্রব্য পরিবহন করা।

কোলেনকাইমা (Collenchyma): এগুলো বিশেষ ধরনের প্যারেনকাইমা কোষ দিয়ে তৈরি হয়। কোষপ্রাচীরে সেলুলোজ এবং পেকটিন জমা হয়ে পুরু হয়। তবে এদের কোষপ্রাচীর অসমভাবে পুরু এবং কোণাগুলো অধিক পুরু হয়। এ টিস্যুর কোষগুলো লম্বাটে ও সজীব। এরা প্রোটোপ্লাজমপূর্ণ কোষ দিয়ে তৈরি হয়। এতে আন্তঃকোষীয় ফাঁক থাকতে পারে। কোষপ্রান্ত চৌকোনাকার, সরু বা তির্যক হতে পারে। খাদ্য প্রস্তুত এবং উদ্ভিদদেহকে দৃঢ়তা প্রদান করা এদের প্রধান কাজ। পাতার শিরা এবং পত্রবৃন্তে এদের দেখা যায়। কচি ও নমনীয় কাণ্ড, যেমন কুমড়া ও দণ্ডকলসের কাণ্ডে এ টিস্যু দৃঢ়তা প্রদান করে। এ কোষে যখন ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে, তখন এরা খাদ্য প্রস্তুত করে।

স্ক্লেরেনকাইমা (Sclerenchyma): এ টিস্যুর কোষগুলো শক্ত, অনেক লম্বা এবং পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট হয়। প্রোটোপ্লাজমবিহীন, লিগনিনযুক্ত এবং যান্ত্রিক কাজের জন্য নির্দিষ্ট কোষ দিয়ে গঠিত টিস্যুকে

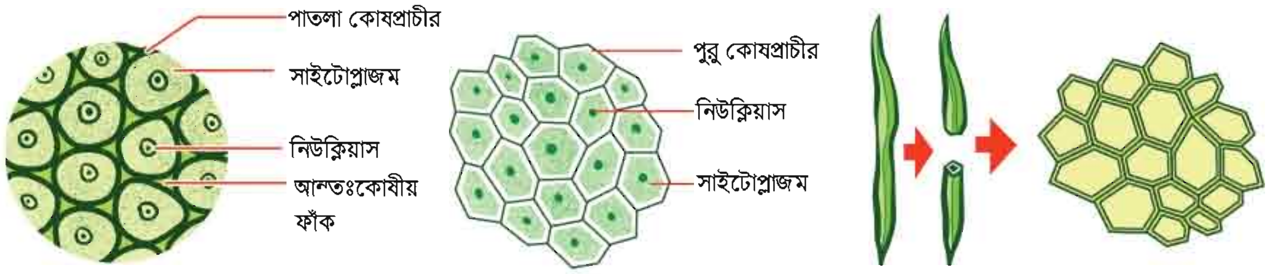

(ক) (খ) (গ)

চিত্র 2.12: বিভিন্ন প্রকারের সরল টিস্যু, (ক) প্যারেনকাইমা (খ) কোলেনকাইম (গ) স্ক্লেরেনকাইমা।

স্ক্লেরেনকাইমা টিস্যু বলে। প্রাথমিক অবস্থায় কোষগুলোতে প্রোটোপ্লাজম উপস্থিত থাকলেও খুব তাড়াতাড়ি তা নষ্ট হয়ে মৃত কোষে পরিণত হয়। কোষগুলো প্রধানত দুই ধরনের, ফাইবার এবং স্ক্লেরাইড। উদ্ভিদদেহে দৃঢ়তা প্রদান এবং পানি এবং খনিজ লবণ পরিবহন করা এর মূল কাজ।

(i) ফাইবার বা তন্তু (Fibre): এরা অত্যন্ত দীর্ঘ, পুরু প্রাচীরযুক্ত, শক্ত এবং দুই প্রান্ত সরু। তবে কখনো কখনো ভোঁতা হতে পারে। প্রাচীরের গায়ে ছিদ্র থাকে, এ ছিদ্রকে কূপ বলে। অবস্থান এবং গঠনের ভিত্তিতে এদের বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে, যেমন বাস্ট ফাইবার, সার্ফেস ফাইবার, জাইলেম তন্তু বা কাষ্ঠতন্তু।

(ii) স্ক্লেরাইড (Sclereids): এদেরকে স্টোন সেলও বলা হয়। এরা খাটো, সমব্যাসীয়, কখনো লম্বাটে আবার কখনো তারকাকার হতে পারে। এদের গৌণপ্রাচীর খুবই শক্ত, অত্যন্ত পুরু এবং লিগনিনযুক্ত। পরিণত স্ক্লেরাইড কোষ সাধারণত মৃত থাকে এবং এদের কোষপ্রাচীর কূপযুক্ত হয়।

নগ্নবীজী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কর্টেক্স, ফল ও বীজত্বকে স্ক্লেরাইড টিস্যু দেখা যায়। বহিঃত্বক জাইলেম এবং ফ্লোয়েমের সাথে একত্রে পত্রবৃন্তে কোষগুচ্ছরূপে থাকতে পারে।

একক কাজ

কাজ : তিন ধরনের সরল টিস্যুর চিত্র অঙ্কন।

উপকরণ : পোস্টার পেপার, সাইনপেন।

পদ্ধতি : তিন ধরনের সরল টিস্যুর চিহ্নিত চিত্র আঁক এবং এদের পার্থক্যগুলো উপস্থাপন কর।

(b) জটিল টিস্যু (Complex tissues)

বিভিন্ন ধরনের কোষের সমন্বয়ে যে স্থায়ী টিস্যু তৈরি হয়, তাকে জটিল টিস্যু বলে। এরা উদ্ভিদে পরিবহনের কাজ করে, তাই এদের পরিবহন টিস্যুও বলা হয়। এ টিস্যু দুই ধরনের, জাইলেম এবং ফ্লোয়েম। জাইলেম এবং ফ্লোয়েম একত্রে উদ্ভিদের পরিবহন টিস্যুগুচ্ছ (vascular bundle) গঠন করে।

জাইলেম (Xylem): জাইলেম দুই ধরনের, প্রাথমিক ও গৌণ জাইলেম। প্রোক্যাম্বিয়াম থেকে সৃষ্ট জাইলেমকে প্রাথমিক জাইলেম বলে। প্রাথমিক বৃদ্ধি শেষে যেসব ক্ষেত্রে গৌণবৃদ্ধি ঘটে, সেখানে গৌণ জাইলেম সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক জাইলেম দুই ধরনের।

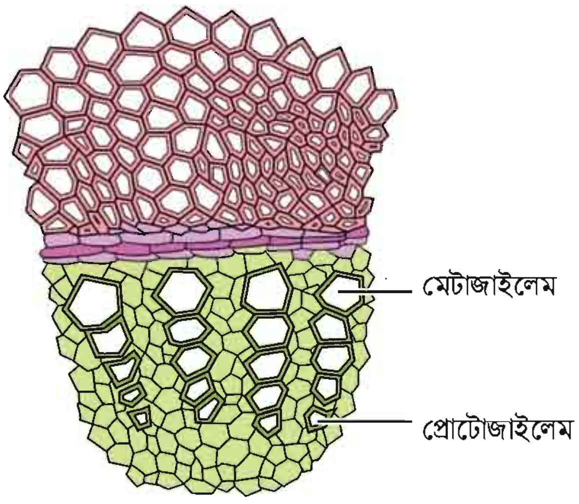

চিত্র 2.13: একটি পরিবহন টিস্যু গুচ্ছ

প্রাথমিক অবস্থায় একে প্রোটোজাইলেম এবং পরিণত অবস্থায় মেটাজাইলেম বলে। মেটাজাইলেমের অভ্যন্তরীণ ফাঁকা গহ্বরটি বড় থাকে। জাইলেমে কয়েক ধরনের কোষ থাকে, যেমন: ট্রাকিড, ভেসেল, জাইলেম প্যারেনকাইমা ও জাইলেম ফাইবার।

(i) ট্রাকিড (Tracheids): ট্রাকিড কোষ লম্বা। এর প্রান্তদ্বয় সরু এবং সুচালো। প্রাচীরে লিগনিন জমা হয়ে পুরু হয় এবং অভ্যন্তরীণ গহ্বর বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পানির চলাচল পাশাপাশি জোড়া কূপের (paired pits) মাধ্যমে হয়ে থাকে। প্রাচীরের পুরুত্ব কয়েক ধরনের হয়, যেমন- বলয়াকার, সর্পিলাকার, সোপানাকার, জালিকাকার কিংবা কূপাঙ্কিত। ফার্নবর্গ, নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদের প্রাথমিক ও গৌণ জাইলেম কলায় ট্রাকিড দেখা যায়। কোষরসের পরিবহন এবং অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করা এদের প্রধান কাজ। তবে কখনো খাদ্য সঞ্চয়ের কাজও এই টিস্যু করে থাকে।

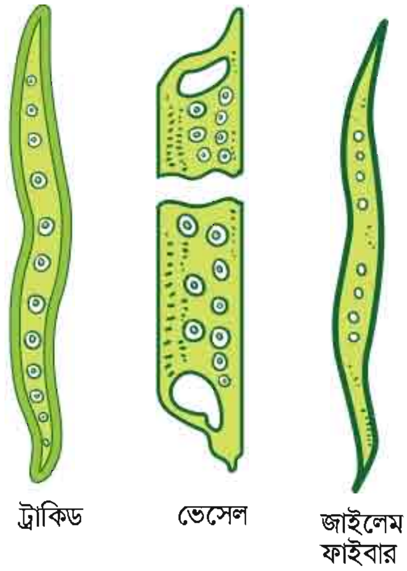

চিত্র 2.14: বিভিন্ন ধরনের জাইলেম

(ii) ভেসেল (Vessels): ভেসেল কোষগুলো খাটো চোঙের মতো। কোষগুলো একটির মাথায় আরেকটি সজ্জিত হয় এবং প্রান্তীয় প্রাচীরটি গলে গিয়ে একটি দীর্ঘ নলের মতো অঙ্গের সৃষ্টি করে। এর ফলে কোষরসের উপরে ওঠার জন্য একটি সরু পথ সৃষ্টি হয়ে যায়। প্রাথমিক অবস্থায় এ কোষগুলো প্রোটোপ্লাজমপূর্ণ থাকলেও পরিণত বয়সে এরা মৃত এবং প্রোটোপ্লাজমবিহীন হয়। ভেসেলের প্রাচীর ট্রাকিডের মতো বিভিন্নরূপে পুরু হয়, যেমন- সোপানাকার, সর্পিলাকার, বলয়াকার, কূপাঙ্কিত ইত্যাদি। ভেসেল সাধারণত কয়েক সেন্টিমিটার লম্বা হয়। তবে বৃক্ষ বা আরোহী উদ্ভিদে আরও অনেক লম্বা হতে পারে। এদের প্রধানত গুপ্তবীজী উদ্ভিদের সব অঙ্গে দেখা যায়। নগ্নবীজী উদ্ভিদের মধ্যে উন্নত উদ্ভিদ, যেমন নিটামে *(Gnetum)* প্রাথমিক পর্যায়ের ভেসেল থাকে। পানি এবং খনিজ লবণ পরিবহনে এবং অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করা এর প্রধান কাজ।

(iii) জাইলেম প্যারেনকাইমা (Xylem parenchyma): জাইলেমে অবস্থিত প্যারেনকাইমা কোষকে জাইলেম প্যারেনকাইমা বা উড প্যারেনকাইমা (wood parenchyma) বলে। এদের প্রাচীর পুরু বা পাতলা হতে পারে। প্রাইমারি জাইলেমে অবস্থিত প্যারেনকাইমার কোষ পাতলা প্রাচীরযুক্ত । তবে গৌণ জাইলেমে এরা পুরু প্রাচীরযুক্ত হয়ে থাকে। খাদ্য সঞ্চয় এবং পানি পরিবহন করা এদের প্রধান কাজ।

(iv) জাইলেম ফাইবার (Xylem fibre): জাইলেমে অবস্থিত স্ক্লেরেনকাইমা কোষই হচ্ছে জাইলেম ফাইবার। এদের উড ফাইবারও বলে। এ কোষগুলো লম্বা, এদের দুপ্রান্ত সরু। পরিণত কোষে প্রোটোপ্লাজম থাকে না বলে এরা মৃত। উদ্ভিদে এরা যান্ত্রিক শক্তি যোগায়। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের সব জাইলেমে এরা অবস্থান করে। পানি ও খনিজ পদার্থ পরিবহন, খাদ্য সঞ্চয়, উদ্ভিদকে যান্ত্রিক শক্তি আর দৃঢ়তা প্রদান করা জাইলেম টিস্যুর প্রধান কাজ।

ফ্লোয়েম (Phloem): উদ্ভিদ কাণ্ডে এরা জাইলেমের সাথে একত্রে পরিবহন টিস্যুগুচ্ছ তৈরি করে। সিভনল, সঙ্গীকোষ, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা এবং ফ্লোয়েম তন্তু নিয়ে ফ্লোয়েম টিস্যু গঠিত হয়।

জাইলেম যেমন খাদ্যের কাঁচামাল পানি সরবরাহ করে, তেমনি ফ্লোয়েম পাতায় প্রস্তুত খাদ্য উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন স্থানে পরিবহন করে।

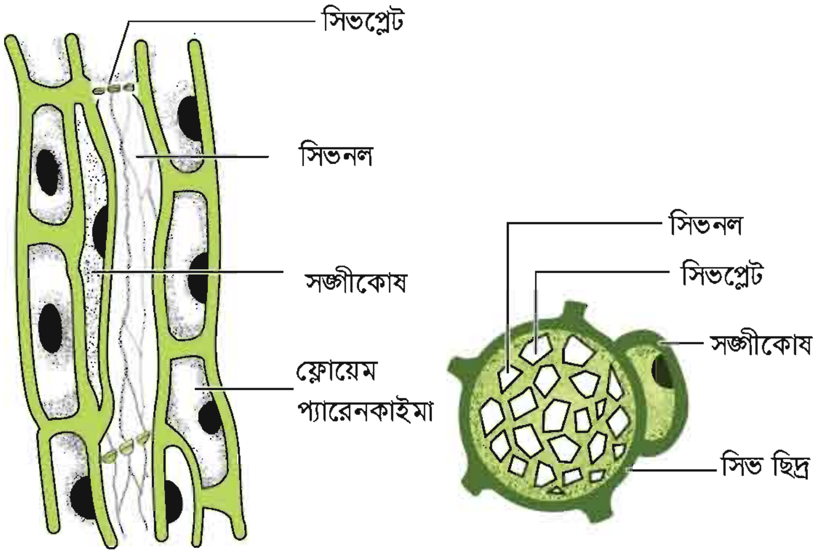

(ক) লম্বচ্ছেদ (খ) প্রস্থচ্ছেদ

চিত্র 2.15: ফ্লোয়েম টিস্যু

(i) সিভকোষ (Sieve cell): এরা বিশেষ ধরনের কোষ। দীর্ঘ, পাতলা কোষপ্রাচীরযুক্ত এবং জীবিত এ কোষগুলো লম্বালম্বিভাবে একটির উপর একটি সজ্জিত হয়ে সিভনল (Sieve tube) গঠন করে। এ কোষগুলো চালুনির মতো ছিদ্রযুক্ত সিভপ্লেট দিয়ে পরস্পর থেকে আলাদা থাকে। সিভকোষে প্রোটোপ্লাজম প্রাচীর ঘেঁষে থাকে বলে একটি কেন্দ্রীয় ফাঁপা জায়গার সৃষ্টি হয়, যেটা খাদ্য পরিবহনের নল হিসেবে কাজ করে। এদের প্রাচীর লিগনিনযুক্ত। পরিণত সিভকোষে কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না। সকল ধরনের গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ফ্লোয়েমে সঙ্গীকোষ এবং সিভনল থাকে। পাতায় প্রস্তুত খাদ্য উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন অংশে পরিবহন করা এদের প্রধান কাজ।

(ii) সঙ্গীকোষ (Companion cell): প্রতিটি সিভকোষের সাথে একটি করে প্যারেনকাইমা জাতীয় কোষ অবস্থান করে। এদের কেন্দ্রিকা বা নিউক্লিয়াস বেশ বড়। ধারণা করা হয় এই

নিউক্লিয়াস সিভকোষের কার্যাবলি কিছু পরিমাণে হলেও নিয়ন্ত্রণ করে। এ কোষ প্রোটোপ্লাজম দিয়ে পূর্ণ এবং পাতলা প্রাচীরযুক্ত। ফার্ন ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে এদের উপস্থিতি নেই।

(iii) ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা (Phloem parenchayma): ফ্লোয়েমে উপস্থিত প্যারেনকাইমা কোষগুলোই ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা। এদের কোষ সাধারণ প্যারেনকাইমার মতো পাতলা কোষপ্রাচীরযুক্ত এবং প্রোটোপ্লাজমযুক্ত। এরা খাদ্য সঞ্চয় করে এবং খাদ্য পরিবহনে সহায়তা করে। ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ (Pteridophyta), নগ্নবীজী উদ্ভিদ এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ফ্লোয়েম টিস্যুতে ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা থাকে। একবীজপত্রী উদ্ভিদে ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা থাকে না।

(iv) ফ্লোয়েম ফাইবার বা তন্তু (Phloem fibre): স্ক্লেরেনকাইমা কোষ সমন্বয়ে ফ্লোয়েম ফাইবার তৈরি হয়। এগুলো একধরনের দীর্ঘ কোষ, যাদের প্রান্তদেশ পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে। এদের বাস্ট ফাইবারও বলে। পাটের আঁশ এক ধরনের বাস্ট ফাইবার। উদ্ভিদ অঙ্গের গৌণবৃদ্ধির সময় এ ফাইবার উৎপন্ন হয়। এসব কোষের প্রাচীরে কূপ দেখা যায়। ফ্লোয়েম টিস্যুর মাধ্যমে পাতায় উৎপাদিত শর্করা এবং মূলে সঞ্চিত খাদ্য একই সাথে উপরে নিচে পরিবাহিত হয়।

2.3.2 প্রাণিটিস্যু

বহুকোষী প্রাণিদেহে অনেক কোষ একত্রে কোনো বিশেষ কাজে নিয়োজিত থাকে। একই ভ্রূণীয় কোষ থেকে উৎপন্ন হয়ে এক বা একাধিক ধরনের কিছুসংখ্যক কোষ জীবদেহের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে সমষ্টিগতভাবে একটা কাজে নিয়োজিত থাকলে ঐ কোষগুলো সমষ্টিগতভাবে টিস্যু (Tissue) বা তন্ত্র তৈরি করে। একটি টিস্যুর কোষগুলোর উৎপত্তি, কাজ এবং গঠন একই ধরনের হয়। টিস্যু নিয়ে আলোচনাকে টিস্যুতত্ত্ব (Histology) বলে। কোষ এবং টিস্যুর মধ্যে পার্থক্য খুবই নির্দিষ্ট। কোষ হচ্ছে টিস্যুর গঠনগত ও কার্যকরী একক, যেমন লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা বিভিন্ন ধরনের রক্তকোষ। আবার এরা একত্রে তরল যোজক টিস্যু নামে এক ধরনের টিস্যু হিসেবে পরিচিত। তরল যোজক টিস্যু রক্ত দেহের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শারীরবৃত্তীয় কাজে অংশ নেয়।

মানবদেহে নানা ধরনের কোষ আছে, যারা ভিন্ন ভিন্ন কাজে নিয়োজিত। মানবদেহের স্নায়ুকোষ দেহজুড়ে জালের মতো ছড়িয়ে থাকে। দেহের যে কোনো অংশের উদ্দীপনা গ্রহণ করে মস্তিষ্কে প্রেরণ করা, আবার মস্তিষ্কের কোনো বার্তা শরীরের নির্দিষ্ট অংশে পৌঁছে দেওয়াই এদের কাজ। চোখের স্নায়ুকোষগুলো দেখতে এবং কানের স্নায়ুকোষগুলো শুনতে সাহায্য করে। মানুষের চোখের মতো বিভিন্ন ধরনের স্নায়ুকোষ না থাকায় বেশিরভাগ প্রাণীই পৃথিবীর দৃশ্যমান বস্তুগুলো রঙিন হিসেবে দেখতে পারে না, অনেক প্রাণী শুধু দিনে বা রাতে দেখতে পায়। আমাদের কাজকর্মে, হাঁটা-চলায় এবং নড়াচড়ায় পেশিকোষ ব্যবহৃত হয়। তিন ধরনের রক্তকোষ মানব দেহের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত। লোহিত রক্তকণিকা কোষগুলো ফুসফুসে অক্সিজেন গ্রহণ করে হৃদ্‌যন্ত্রের সাহায্যে ধমনির মাধ্যমে কৈশিকনালি হয়ে দেহের প্রতিটি

কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে। শ্বেত রক্তকণিকা দেহের রোগ প্রতিরোধ করে। রক্তের অণুচক্রিকা কোষগুলো শরীরের কেটে যাওয়া অংশ থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে সাহায্য করে। শরীরের ত্বকীয় কোষগুলো দেহের আবরণ দেওয়া ছাড়াও শরীরের অবস্থানভেদে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। মাথার ত্বকীয় কোষগুলো থেকে চুল গজিয়ে থাকে। শরীরের ত্বকীয় কোষগুলো নির্দিষ্ট স্থানে ঘাম নির্গমন কোষ থেকে ঘাম নির্গত করে। অস্থিকোষ দেহে অস্থি অথবা কোমলাস্থি তৈরি করে দেহের দৃঢ়তা দিয়ে থাকে। দেহের আকার, গঠন, অস্থির বৃদ্ধি ইত্যাদিতে অস্থিকোষের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রাণি টিস্যুর প্রকারভেদ: প্রাণি টিস্যু তার গঠনকারী কোষের সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য এবং তাদের নিঃসৃত পদার্থের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রধানত চার ধরনের হয়— আবরণী টিস্যু, যোজক টিস্যু, পেশি টিস্যু এবং স্নায়ু টিস্যু।

(a) আবরণী টিস্যু (Epithelial Tissue)

এই টিস্যু বিভিন্ন অঙ্গের আবরণ (lining) হিসেবে কাজ করে। তবে অঙ্গকে আবৃত রাখাই আবরণী টিস্যুর একমাত্র কাজ নয়। এই টিস্যুর আরও চারটি কাজ হলো: অঙ্গকে আবৃত রাখা, সেটিকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করা (protection), প্রোটিনসহ বিভিন্ন পদার্থ ক্ষরণ বা নিঃসরণ করা (secretion), বিভিন্ন পদার্থ শোষণ করা (absorption) এবং কোষীয় স্তর পেরিয়ে সুনির্দিষ্ট পদার্থের পরিবহন (transcellular transport)।

আবরণী টিস্যুর কোষগুলো ঘন সন্নিবেশিত এবং একটি ভিত্তিপর্দার উপর বিন্যস্ত থাকে। কোষের আকৃতি, প্রাণিদেহে তার অবস্থান এবং কাজের প্রকৃতিভেদে এ টিস্যু তিন ধরনের হয়। যেমন:

(i) স্কোয়ামাস আবরণী টিস্যু (Squamous Epithelial Tissue): এই টিস্যুর কোষগুলো মাছের আঁশের মতো চ্যাপটা এবং এদের নিউক্লিয়াস বড় আকারের হয়। উদাহরণ: বৃক্কের বোম্যান্স ক্যাপসুল প্রাচীর। এই টিস্যু প্রধানত আবরণ ছাড়াও ছাঁকনির কাজ করে থাকে।

(ii) কিউবয়ডাল আবরণী টিস্যু (Cuboidal Epithelial Tissue): এই টিস্যুর কোষগুলো ঘনাকার বা কিউব আকৃতির অর্থাৎ কোষগুলোর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা প্রায় সমান। উদাহরণ: বৃক্কের সংগ্রাহক

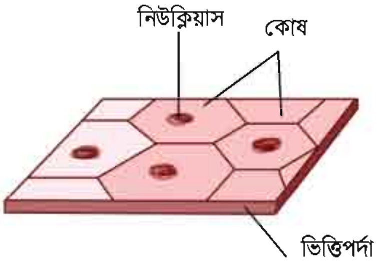

চিত্র 2.16: স্কোয়ামাস (আঁইশাকার) আবরণী টিস্যু

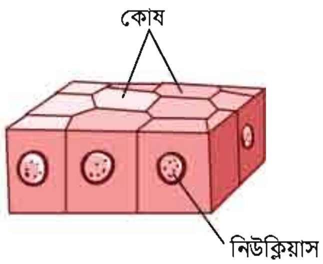

চিত্র 2.17: কিউবয়ডাল (ঘনাকৃতি) আবরণী টিস্যু

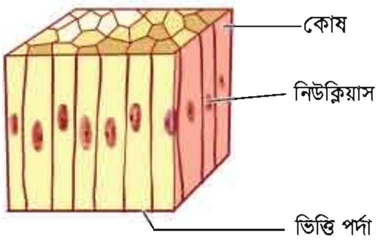

চিত্র 2.18: কলামনার (স্তম্ভাকার) এপিথেলিয়াল টিস্যু

নালিকা। এই টিস্যু প্রধানত পরিশোষণ এবং আবরণ কাজে লিপ্ত থাকে।

(iii) কলামনার আবরণী টিস্যু (Columnar Epithelial Tissue): এই টিস্যুর কোষসমূহ স্তম্ভের মতো সরু এবং লম্বা। উদাহরণ: প্রাণীর অন্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরের কোষগুলো প্রাধনত ক্ষরণ, রক্ষণ এবং শোষণ কাজ করে থাকে।

প্রাণিদেহে ভিত্তিপর্দার উপর সজ্জিত কোষগুলোর সংখ্যার ভিত্তিতে এপিথেলিয়াল বা আবরণী টিস্যুকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

(i) সাধারণ আবরণী টিস্যু: ভিত্তিপর্দার উপর কোষসমূহ একস্তরে সজ্জিত। উদাহরণ: বৃক্কের বোম্যান্স ক্যাপসুল, বৃক্কের সংগ্রাহক নালিকা, অন্ত্র প্রাচীর।

(ii) স্ট্র্যাটিফাইড আবরণী টিস্যু: ভিত্তিপর্দার উপর কোষগুলো একাধিক স্তরে সজ্জিত। এমন স্ট্র্যাটিফাইড আবরণী টিস্যুও আছে, যার স্তরের সংখ্যা মিনিটের মধ্যে পাল্টে যেতে পারে—কখনো দেখা যায় তিন-চারটি স্তর আবার পরক্ষণেই দেখা যায় সাত-আটটি। তাই একে বলে ট্রানজিশনাল আবরণী। উদাহরণ: মেরুদণ্ডী প্রাণিদের ত্বক।

(iii) সিউডো-স্ট্র্যাটিফাইড আবরণী টিস্যু: এই টিস্যুর কোষগুলো ভিত্তিপর্দার উপর একস্তরে বিন্যস্ত থাকে। তবে কোষগুলো বিভিন্ন উচ্চতার হওয়ায় এই টিস্যুকে দেখতে স্তরীভূত টিস্যু মনে হয়। উদাহরণ ট্রাকিয়া।

আবরণী টিস্যুর কোষগুলো আবার বিভিন্ন কাজের জন্য নানাভাবে রূপান্তরিত হয়। যেমন-

(i) সিলিয়াযুক্ত আবরণী টিস্যু: মেরুদণ্ডী প্রাণীদের শ্বাসনালির প্রাচীরে দেখা যায়।

(ii) ফ্লাজেলাযুক্ত আবরণী টিস্যু: হাইড্রার এন্ডোডার্মে থাকে।

(iii) ক্ষণপদযুক্ত আবরণী টিস্যু: হাইড্রার এন্ডোডার্মে এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অন্ত্রে দেখা যায়।

(iv) জনন অঙ্গের আবরণী টিস্যু: বিশেষভাবে রূপান্তরিত আবরণী টিস্যু যা থেকে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু কোষ উৎপন্ন হয়। এরা প্রজননে অংশগ্রহণ করে প্রজাতির ধারা অক্ষুন্ন রাখে।

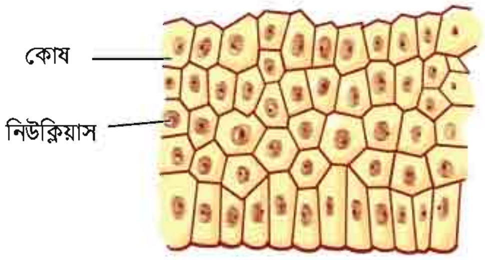

চিত্র 2.19: স্ট্র্যাটিফাইড (স্তরীভূত) বা যৌগিক আবরণী টিস্যু

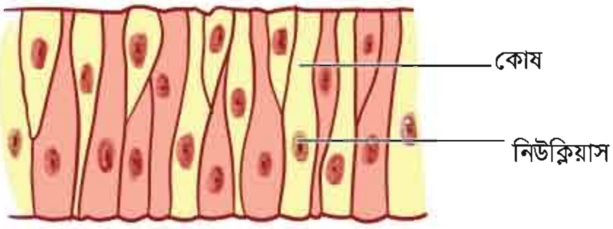

চিত্র 2.20: সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড এপিথেলিয়াল টিস্যু

(v) গ্রন্থি আবরণী টিস্যু: বিভিন্ন ধরনের রস নিঃসরণ করে।

দেখা যাচ্ছে যে আবরণী টিস্যু কোনো অঙ্গের বা নালির ভিতরের ও বাইরের অংশ তৈরি করে থাকে। আবার এই টিস্যু রূপান্তরিত হয়ে রক্ষণ, ক্ষরণ, শোষণ, ব্যাপন, পরিবহন এই সব কাজে অংশ নেয়। আবরণী টিস্যু রূপান্তরিত হয়ে গ্রন্থি টিস্যু এবং জনন টিস্যুতে পরিণত হয় এবং দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে।

(b) যোজক টিস্যু (Connective Tissue)

যোজক বা কানেকটিভ টিস্যুতে মাতৃকার (Matrix) পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি এবং কোষের সংখ্যা কম। গঠন এবং কাজের ভিত্তিতে কানেকটিভ টিস্যু প্রধানত তিন ধরনের হয়। যথা-

(i) ফাইব্রাস যোজক টিস্যু (Fibrous Connective Tissue): এই ধরনের যোজক টিস্যু দেহত্বকের নিচে পেশির মধ্যে থাকে। এদের মাতৃকায় বিভিন্ন ধরনের তন্তুর আধিক্য দেখা যায়।

(ii) স্কেলিটাল যোজক টিস্যু (Skeletal Connective Tissue): দেহের অভ্যন্তরীণ কাঠামো গঠনকারী টিস্যুকে স্কেলিটাল যোজক টিস্যু বলে। এই টিস্যু দেহের অভ্যন্তরীণ কাঠামো গঠন করে। দেহকে নির্দিষ্ট আকৃতি এবং দৃঢ়তা দেয়। অঙ্গ সঞ্চালন এবং চলনে সহায়তা করে। মস্তিষ্ক, মেরুরজ্জু, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড এরকম দেহের নরম ও নাজুক অঙ্গগুলোকে রক্ষা করে। বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা উৎপাদন করে। ঐচ্ছিক পেশিগুলোর সংযুক্তির ব্যবস্থা করে। গঠনের ভিত্তিতে স্কেলিটাল যোজক টিস্যু দুধরনের হয়। যেমন: কোমলাস্থি এবং অস্থি।

কোমলাস্থি (Cartilage): কোমলাস্থি এক ধরনের নমনীয় স্কেলিটাল যোজক টিস্যু। মানুষের নাক ও কানের পিনা কোমলাস্থি দিয়ে তৈরি।

অস্থি: অস্থি বিশেষ ধরনের দৃঢ়, ভঙ্গুর এবং অনমনীয় স্কেলিটাল কানেকটিভ টিস্যু। এদের মাতৃকায় ক্যালসিয়াম-জাতীয় পদার্থ জমা হয়ে অস্থির দৃঢ়তা প্রদান করে।

(iii) তরল যোজক টিস্যু (Fluid connective tissue): তরল টিস্যুর মাতৃকা তরল। মাতৃকায় বিভিন্ন ধরনের জৈব পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এই টিস্যুর প্রধান কাজ দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন দ্রব্যাদি পরিবহন করা, রোগ প্রতিরোধ করা এবং রক্ত জমাট বাঁধায় বিশেষ ভূমিকা রাখা। তরল যোজক টিস্যু দুই ধরনের, রক্ত এবং লসিকা।

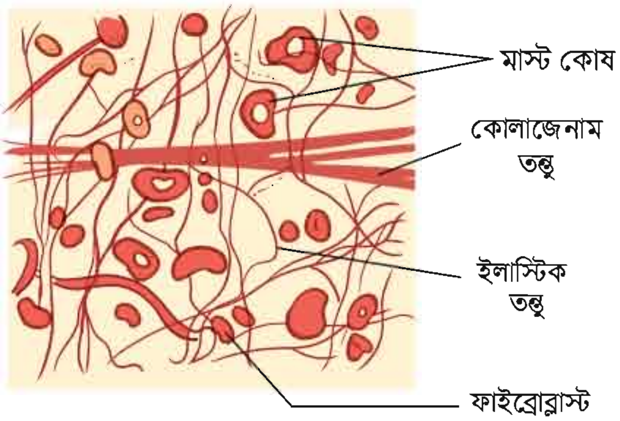

চিত্র 2.21: কানেক্টিভ টিস্যু

রক্ত: রক্ত এক ধরনের ক্ষারীয়, ঈষৎ লবণাক্ত এবং লালবর্ণের তরল যোজক টিস্যু। ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রক্ত অভ্যন্তরীণ পরিবহনে অংশ নেয়। উষ্ণ রক্তবাহী প্রাণীর দেহে রক্ত তাপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষা করে। রক্তের উপাদান দুটি— রক্তরস এবং রক্তকণিকা। রক্তরস (Plasma) রক্তের তরল অংশ, এর রং ঈষৎ হলুদাভ। এর প্রায় 91-92% অংশ পানি এবং 8-9% অংশ জৈব ও অজৈব পদার্থ। এসব রক্তরসের ভিতর বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন এবং বর্জ্য পদার্থ থাকে। রক্তকণিকা তিন ধরনের, যথা- লোহিত রক্তকণিকা (Erythrocyte বা Red blood corpuscles বা RBC), শ্বেত রক্তকণিকা (Leukocyte বা white blood corpuscles বা WBC) এবং অণুচক্রিকা (Thrombocytes বা Blood platelet)। লোহিত রক্তকণিকায় হিমোগ্লোবিন নামে একটি লৌহজাত যৌগ থাকে, যার জন্য রক্ত লাল হয়। হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি অক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন করে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে অক্সিজেন পরিবহন করে। শ্বেত রক্তকণিকা জীবাণু ধ্বংস করে দেহের প্রকৃতিগত আত্মরক্ষায় অংশ নেয়। মানবদেহে বেশ কয়েক ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধায় অংশ নেয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে রক্ত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

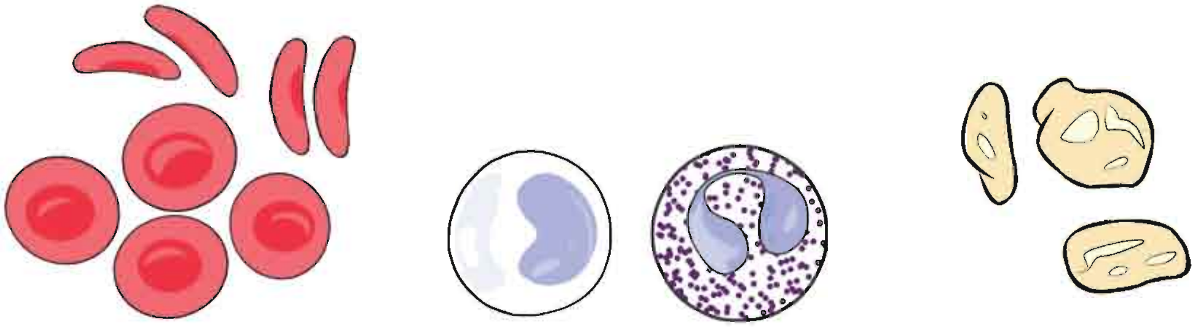

লোহিত রক্তকণিকা শ্বেত রক্তকণিকা অণুচক্রিকা

চিত্র 2.22: বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা

লসিকা: মানবদেহে বিভিন্ন টিস্যুর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে (Intercellular space) যে জলীয় পদার্থ জমা হয় তাকে লসিকা বলে। এগুলো ছোট নালির মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে একটি আলাদা নালিকাতন্ত্র গঠন করে, যাকে লসিকাতন্ত্র (Lymphatic system) বলে। লসিকা ঈষৎ ক্ষারীয় স্বচ্ছ হলুদ বর্ণের তরল পদার্থ। এর মধ্যে কিছু রোগপ্রতিরোধী কোষ থাকে, এদের লসিকাকোষ (Lymphoid cell) বলে।

(c) পেশি টিস্যু (Muscular Tissue)

ভ্রূণের মেসোডার্ম থেকে তৈরি সংকোচন ও প্রসারণশীল বিশেষ ধরনের টিস্যুকে পেশি টিস্যু বলে। এদের মাতৃকা প্রায় অনুপস্থিত। পেশিকোষগুলো সরু, লম্বা এবং তন্তুময়। যেসব তন্তুতে আড়াআড়ি ডোরাকাটা থাকে, তাদের ডোরাকাটা পেশি (Striated muscle) এবং ডোরাবিহীন তন্তুকে মসৃণ পেশি (Smooth muscle) বলে। পেশিকোষ সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালন, চলন ও

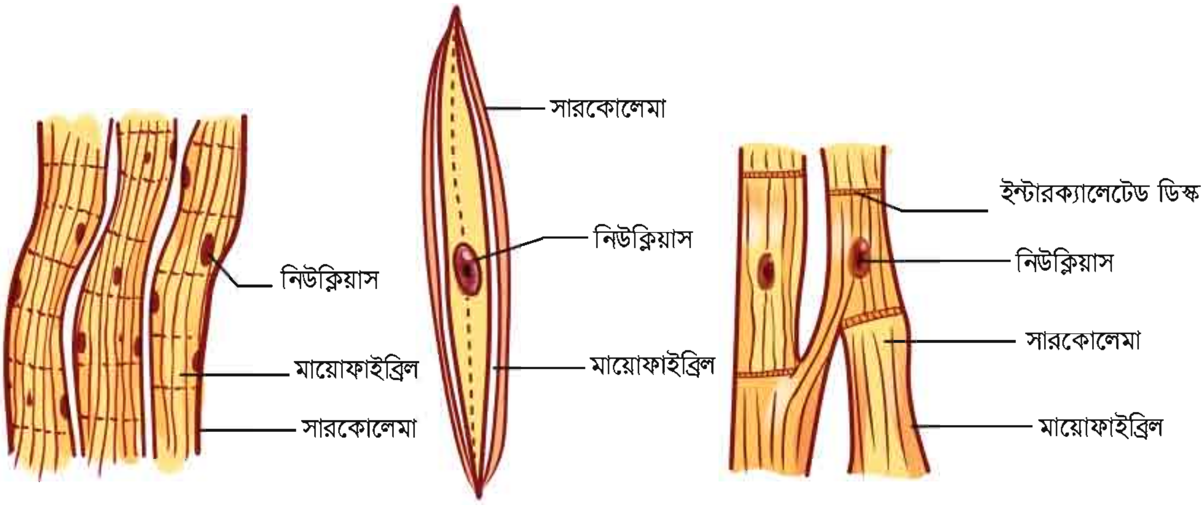

ঐচ্ছিক পেশি অনৈচ্ছিক পেশি হৃৎপেশি

চিত্র 2.23: বিভিন্ন ধরনের পেশি

অভ্যন্তরীণ পরিবহন ঘটায়। অবস্থান, গঠন এবং কাজের ভিত্তিতে পেশি টিস্যু তিন ধরনের, ঐচ্ছিক পেশি, অনৈচ্ছিক পেশি এবং হৃৎপেশি।

(i) ঐচ্ছিক পেশি (Voluntary) বা ডোরাকাটা পেশি (Striated muscle): এই পেশি প্রাণীর ইচ্ছানুযায়ী সংকুচিত বা প্রসারিত হয়। ঐচ্ছিক পেশিটিস্যুর কোষগুলো নলাকার, শাখাবিহীন ও আড়াআড়ি ডোরাযুক্ত হয়। এদের সাধারণত একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে। এই পেশি দ্রুত সংকুচিত এবং প্রসারিত হতে পারে। ঐচ্ছিক পেশি অস্থিতন্ত্রে সংলগ্ন থাকে। উদাহরণ: মানুষের হাত এবং পায়ের পেশি।

(ii) অনৈচ্ছিক পেশি (Involuntary muscle) বা মসৃণ পেশি (Smooth muscle): এই পেশি টিস্যুর সংকোচন ও প্রসারণ প্রাণীর ইচ্ছাধীন নয়। এ পেশি কোষগুলো মাকু আকৃতির। এদের গায়ে আড়াআড়ি দাগ থাকে না। এজন্য এ পেশিকে মসৃণ পেশি বলে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্তনালি, পৌষ্টিকনালি ইত্যাদির প্রাচীরে অনৈচ্ছিক পেশি থাকে। অনৈচ্ছিক পেশি প্রধানত দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গাদির সঞ্চালনে অংশ নেয়। যেমন খাদ্য হজম প্রক্রিয়ায় অন্ত্রের ক্রমসংকোচন।

(iii) কার্ডিয়াক পেশি বা হৃৎপেশি (Cardiac muscle): এই পেশি মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি। এই টিস্যুর কোষগুলো নলাকৃতি (অনেকটা ঐচ্ছিক পেশির মতো), শাখান্বিত ও আড়াআড়ি দাগযুক্ত। এ টিস্যুর কোষগুলোর মধ্যে ইন্টারক্যালাটেড ডিস্ক (Intercalated disc) থাকে। এদের সংকোচন ও প্রসারণ প্রাণীর ইচ্ছাধীন নয়। অর্থাৎ কার্ডিয়াক পেশির গঠন ঐচ্ছিক পেশির মতো হলেও কাজ অনৈচ্ছিক পেশির মতো। কার্ডিয়াক পেশির কোষগুলো শাখার মাধ্যমে পরস্পর যুক্ত থাকে। হৃৎপিণ্ডের সব কার্ডিয়াক পেশি সমন্বিতভাবে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। মানব ভ্রূণ সৃষ্টির একটা বিশেষ পর্যায় থেকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত হৃৎপিণ্ডের কার্ডিয়াক পেশি একটা নির্দিষ্ট গতিতে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে দেহের মধ্যে রক্ত চলাচলের প্রক্রিয়া সচল রাখে।

(d) স্নায়ু টিস্যু (Nerve tissue)

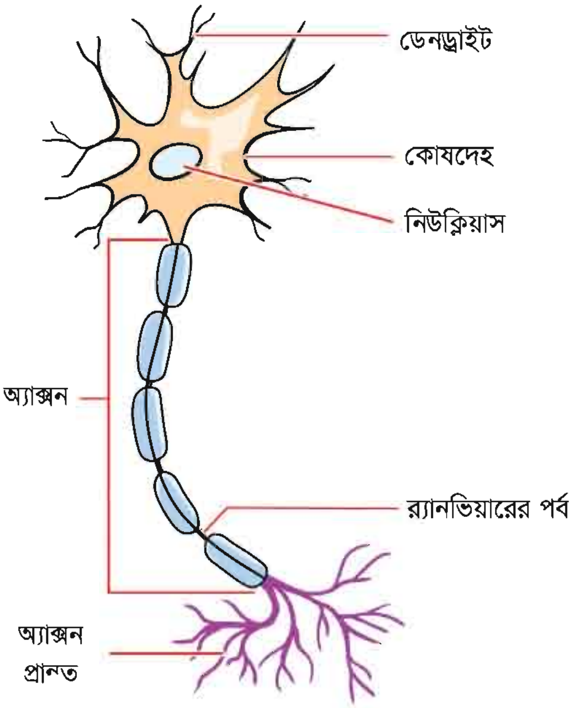

চিত্র 2.24: একটি নিউরন

দেহের বিশেষ সংবেদী কোষ নিউরন বা স্নায়ুকোষগুলো একত্রে স্নায়ু টিস্যু গঠন করে। স্নায়ু টিস্যু অসংখ্য নিউরন দিয়ে গঠিত। এর গঠন সম্পর্কে তোমরা দশম অধ্যায়ে আরও বিস্তারিতভাবে জানতে পারবে। স্নায়ু টিস্যু পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা, যেমন তাপ, স্পর্শ, চাপ ইত্যাদি গ্রহণ করে দেহের ভিতরে মস্তিষ্কে বহন করে এবং মস্তিষ্কের বিশ্লেষণের পর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপযুক্ত কাজ করে থাকে। একটি আদর্শ নিউরনের তিনটি অংশ থাকে, কোষদেহ, ডেনড্রাইট এবং অ্যাক্সন। নিউরন কোষ বহুভুজাকৃতি এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত। কোষের সাইটোপ্লাজমে মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজিবডি, রাইবোজোম, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইত্যাদি থাকে, তবে নিউরনের সাইটোপ্লাজমে সক্রিয় সেন্ট্রিওল থাকে না বলে নিউরন বিভাজিত হয় না। কোষদেহের চারদিকের শাখাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রলম্বিত অংশকে ডেনড্রন বলে। ডেনড্রন থেকে যে শাখা বের হয়, তাদের ডেনড্রাইট বলে। ডেনড্রাইটের সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে। নিউরনের কোষদেহ থেকে একটি লম্বা স্নায়ুতন্তু পরবর্তী নিউরনের ডেনড্রাইটের সাথে যুক্ত থাকে, তাকে অ্যাক্সন বলে। একটি নিউরনের একটি মাত্র অ্যাক্সন থাকে। পরপর দুটি নিউরনে প্রথমটির অ্যাক্সন এবং পরেরটির ডেনড্রাইটের মধ্যে একটি স্নায়ুসন্ধি গঠিত হয়, তাকে সিন্যাপস (Synapse) বলে। সিন্যাপসের মধ্য দিয়েই একটি নিউরন থেকে উদ্দীপনা পরবর্তী নিউরনে পরিবাহিত হয়। স্নায়ুটিস্যু উদ্দীপনা গ্রহণ করে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে এবং মস্তিষ্ক তাতে সাড়া দেয়। উচ্চতর প্রাণীতে স্নায়ুটিস্যু স্মৃতি সংরক্ষণ (Memorise) করাসহ দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজ নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

অনেকের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে আমরা আমাদের মস্তিষ্কের মাত্র দশ শতাংশ ব্যবহার করতে পারি। ধারণাটি সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ বা অন্য সব প্রাণী তার মস্তিষ্কের একশো শতাংশ ব্যবহার করে থাকে। এটা ঠিক যে সবসময় একই সাথে মস্তিষ্কের সকল অংশ সমানভাবে সক্রিয় থাকে না। কিন্তু মস্তিষ্কের সবগুলো অংশ কখনো না কখনো আমরা কোনো না কোনোভাবে ব্যবহার করে থাকি। এমনকি এটাও ঠিক নয় যে একটা নির্দিষ্ট সময়ে মস্তিষ্কের দশ শতাংশের বেশি ব্যবহার করা যায় না। এরকম কোনো সীমা নেই। বিবর্তনগতভাবে এরকম কোনো সীমা আরোপিত হওয়ার কোনো কারণও নেই।

2.4 অঙ্গ ও তন্ত্র

এক বা একাধিক টিস্যু দিয়ে তৈরি এবং একটা নির্দিষ্ট কাজ করতে সক্ষম প্রাণিদেহের অংশবিশেষকে অঙ্গ (Organ) বলে। অর্থাৎ কোনো অঙ্গে একই অথবা একাধিক ধরনের টিস্যু থাকে এবং সেই অঙ্গ কোনো না কোনো নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে। দেহের অঙ্গসমূহ নিয়ে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয়, তাকে অঙ্গসংস্থানবিদ্যা (Morphology) বলে।

অবস্থানভেদে মানবদেহে দুধরনের অঙ্গ আছে। চোখ, কান, নাক, হাত, পা, মাথা— এগুলো বাহ্যিক অঙ্গ। বাহ্যিক অঙ্গসংস্থান সম্বন্ধে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়, তাকে বহিঃঅঙ্গসংস্থান (External Morphology) বলে। আর জীবদেহের ভিতরের অঙ্গগুলো সম্বন্ধে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়, তাকে অন্তঃঅঙ্গসংস্থান (Internal morphology বা Anatomy) বলে। পাকস্থলী, ডিওডেনাম, ইলিয়াম, মলাশয়, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, প্লীহা, ফুসফুস, বৃক্ক, শুক্রাশয়, ডিম্বাশয়— এগুলো হচ্ছে মানবদেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ।

পরিপাক, শ্বসন, রেচন, প্রজনন ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কাজ করার জন্য প্রাণিদেহে কতগুলো অঙ্গের সমন্বয়ে বিভিন্ন তন্ত্র গঠিত হয়। নিচে মানবদেহের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তন্ত্রের ধারণা দেওয়া হলো। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

(a) পরিপাকতন্ত্র (Digestive system)

এই তন্ত্র খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক, শোষণ এবং অপাচ্য খাদ্যাংশ নিষ্কাশনের সাথে জড়িত। পরিপাকতন্ত্রের দুটি প্রধান অংশ থাকে, যথা: পৌষ্টিক নালি (digestive canal) এবং পৌষ্টিক গ্রন্থি (digestive glands)। মুখছিদ্র, মুখগহ্বর, গলবিল, অন্ননালি, পাকস্থলী, ডিওডেনাম, ইলিয়াম, রেকটাম বা মলাশয় এবং পায়ুছিদ্র নিয়ে পৌষ্টিক নালি গঠিত। মানুষের লালাগ্রন্থি, যকৃৎ এবং অগ্ন্যাশয় পৌষ্টিক গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে। এসব গ্রন্থির নিঃসৃত রস খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।

(b) শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system)

নাসারন্ধ্র, গলবিল, ল্যারিংস, ট্রাকিয়া, ব্রঙ্কাস, ব্রঙ্কিওল, অ্যালভিওলাই এবং একজোড়া ফুসফুস নিয়ে মানুষের শ্বসনতন্ত্র গঠিত। এই তন্ত্র মানুষের দেহের সঞ্চিত খাদ্যকে পরিবেশ থেকে গৃহীত অক্সিজেনের সাহায্যে জারণ প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদন করে। এ শক্তি দেহের দৈনন্দিন কাজে সহায়তা করে।

(c) স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system)

দেহের বাইরের এবং ভিতরের উদ্দীপনা গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা এই তন্ত্রের কাজ। মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড এবং করোটিক স্নায়ু নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। এছাড়া স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র নামে স্নায়ুতন্ত্রের আরও একটি অংশ আছে। স্নায়ুতন্ত্রের এই অংশ দেহের অনৈচ্ছিক পেশির কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করে।

(d) রেচনতন্ত্র (Excretory system)

বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় বিপাক ক্রিয়ার ফলে শরীরে উপজাত দ্রব্য হিসেবে নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয়। এসব বর্জ্য পদার্থ সাধারণত দেহের জন্য ক্ষতিকর এবং দেহ থেকে নিষ্কাশনের প্রয়োজন হয়। দেহ থেকে এসব অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করার পদ্ধতিকে রেচন প্রক্রিয়া বলে। যে তন্ত্রের সাহায্যে রেচন প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাকে রেচনতন্ত্র বলে। একজোড়া বৃক্ক, একজোড়া ইউরেটার, একটি মূত্রথলি এবং একটি মূত্রনালি (ইউরেথ্রা) নিয়ে মানুষের রেচন তন্ত্র গঠিত।

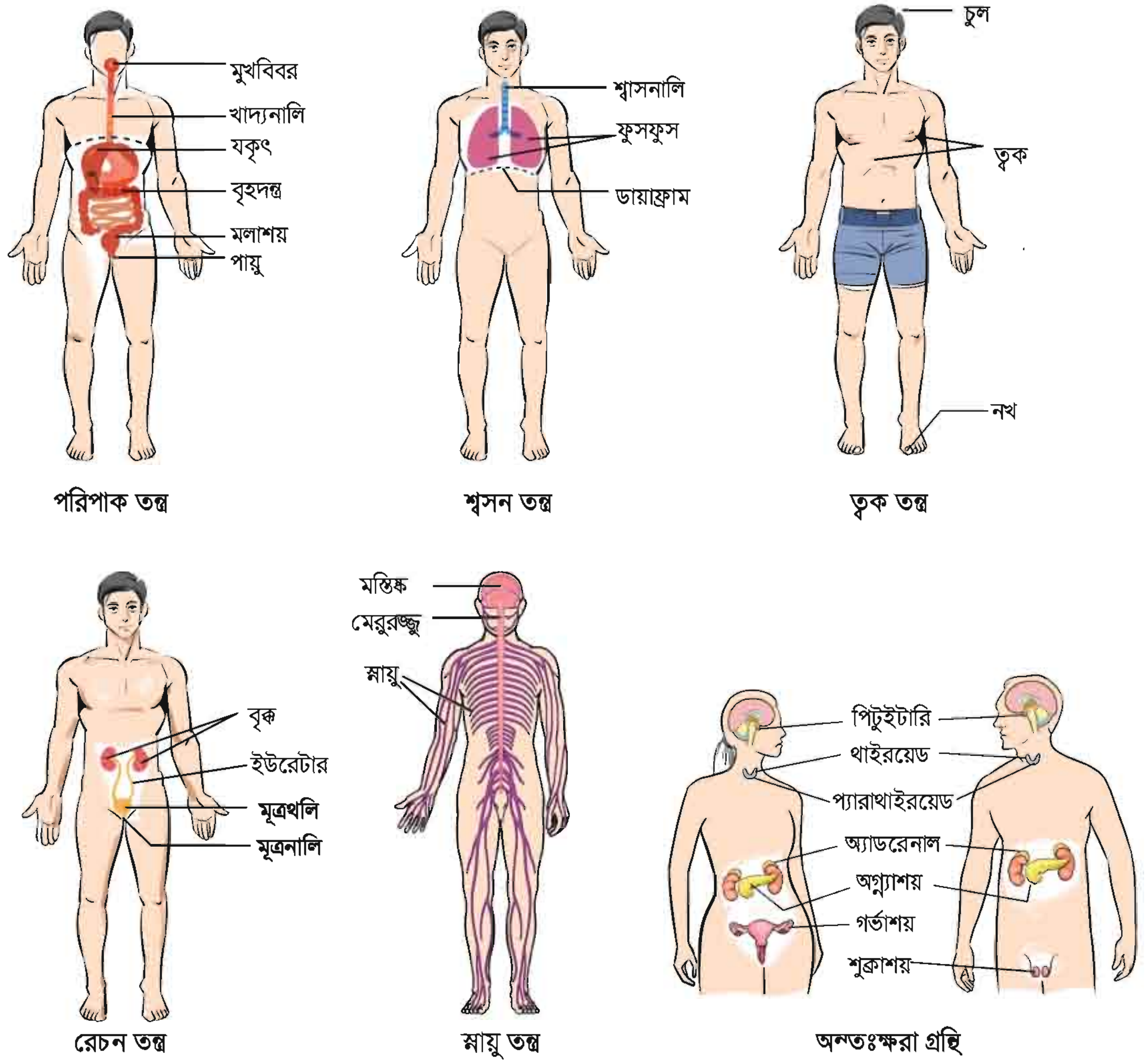
মুখবিবর
খাদ্যনালি
যকৃৎ
বৃহদন্ত্র
মলাশয়
পায়ু
শ্বাসনালি
ফুসফুস
ডায়াফ্রাম
চুল
ত্বক
নখ
বৃক্ক
ইউরেটার
মূত্রথলি
মূত্রনালি
মস্তিষ্ক
মেরুরজ্জু
স্নায়ু
পিটুইটারি
থাইরয়েড
প্যারাথাইরয়েড
অ্যাডরেনাল
অগ্ন্যাশয়
গর্ভাশয়
শুক্রাশয়

পরিপাক তন্ত্র

শ্বসন তন্ত্র

ত্বক তন্ত্র

রেচন তন্ত্র

স্নায়ু তন্ত্র

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি

চিত্র 2.25: মানবদেহের বিভিন্ন তন্ত্রের সরল চিত্র

(e) জননতন্ত্র (Reproductive system)

প্রজাতির ধারাকে বিলুপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য এই তন্ত্র নিজস্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত নতুন প্রজন্ম সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্যামেট (অর্থাৎ শুক্রাণু ও ডিম্বাণু) তৈরি করে। এটি ভ্রূণ ও শিশু ধারক অঙ্গ নিয়ে গঠিত হয়। সাধারণত পরিণত বয়সে জননতন্ত্রের মাধ্যমে প্রাণী প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে। এভাবে প্রজননের মাধ্যমে প্রজাতির ধারা অব্যাহত থাকে। মানুষ একলিঙ্গ প্রাণী। পুরুষ মানুষের দেহে পুরুষ প্রজননতন্ত্র এবং স্ত্রীলোকের দেহে স্ত্রী প্রজননতন্ত্র থাকে।

(f) ত্বকতন্ত্র (Integumentary system)

দেহের বাইরের দিকে যে আচ্ছাদনকারী আবরণ থাকে, তাকে ত্বক বা চামড়া (skin) বলে। কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থিযুক্ত এই ত্বক দেহকে আচ্ছাদন করে, বাইরের আঘাত এবং জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এছাড়া দেহের জলীয় অংশকে দেহের ভিতর সংরক্ষণ করে।

(g) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র (Endocrine system)

প্রাণিদেহে কতগুলো নালিহীন বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি আছে। এসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে হরমোন বলে। পরিবহন করার জন্য এর কোনো নির্দিষ্ট নালি থাকে না। শুধু রক্তের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে হরমোন পরিবাহিত করে। পিটুইটারি, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস, সুপ্রারেনাল ইত্যাদি গ্রন্থির সমন্বয়ে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র গঠিত।

2.5 অণুবীক্ষণ যন্ত্র

যোদ্ধার কাছে যেমন অস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে যেমন দূরবীক্ষণ যন্ত্র, ঠিক তেমনি জীববিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের কাছে অণুবীক্ষণ যন্ত্র একটি অপরিহার্য গবেষণা সহায়ক উপকরণ। এর সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র কোনো বস্তুকে বহুগুণ বড় করে দেখা যায়। তোমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র রয়েছে, তাতে আলোর সাহায্যে এসব ক্ষুদ্র বস্তু দেখার ব্যবস্থা আছে। এসব অণুবীক্ষণ যন্ত্রকে আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে। আলোর বদলে ইলেকট্রন ব্যবহার করা হয় যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে, তাকে ইলেকট্রন (ইলেকট্রনিক নয়!) অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে। আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র দুধরনের, সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

2.5.1 সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Simple microscope)

এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ফুটের উপরে একটি স্তম্ভ থাকে, যার সাথে একটি কাচের স্টেজ সংযুক্ত থাকে। এই কাচের স্টেজে দুটো ক্লিপ লাগানো থাকে। স্তম্ভের নিচের দিকে সম্মুখভাগে একটি আয়না রয়েছে। স্তম্ভের উপরে একটি টানা নল এবং এর বাহুতে লেন্স ধরে রাখার জন্য আংটা থাকে। এই আংটায়

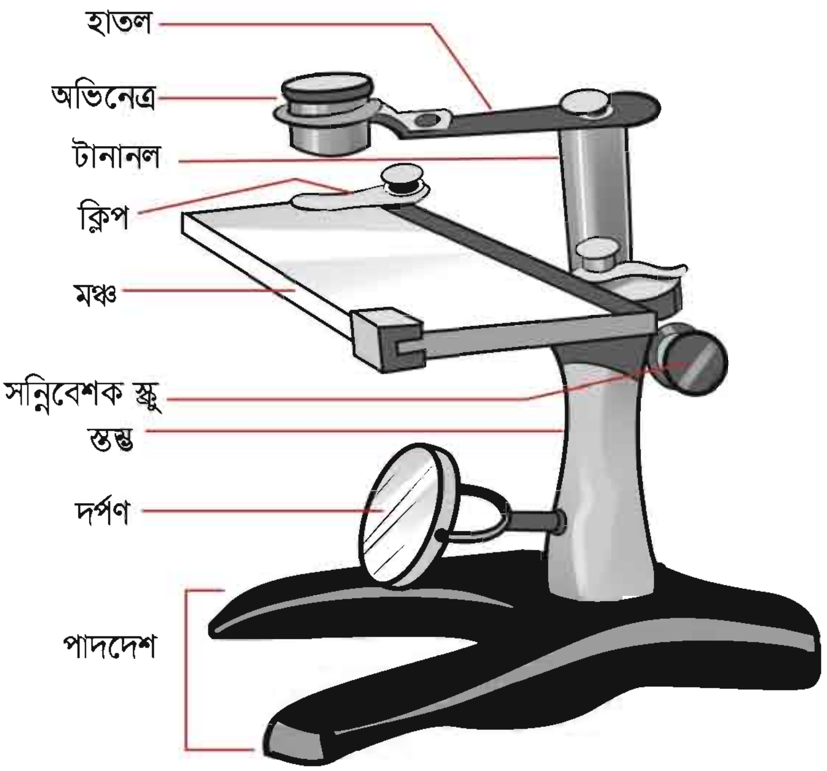

চিত্র 2.26: একটি সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

লেন্স বসিয়ে স্থূল এডজাস্টমেন্ট স্ক্রু ঘুরিয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুর উপর ফোকাস করা যায়। আয়না দিয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুতে আলো প্রতিফলিত করে পরীক্ষার কাজ শুরু করতে হবে। যে ভিত্তির উপর যন্ত্রটি দাঁড়িয়ে, সেটিকে পাদদেশ বলে।

2.5.2 যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Compound Microscope)

যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা জানার পূর্বে এর বিভিন্ন অংশগুলোর নাম জেনে নেওয়া প্রয়োজন। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের চিত্রটি লক্ষ কর।

স্ট্যান্ড: এটি বেজ-এর ওপর দণ্ডায়মান একটি উল্লম্ব পিলার।

আর্ম: স্ট্যান্ড-এর উপরের দিকে বাঁকানো অংশকে আর্ম বলে।

বেজ: স্ট্যান্ড-এর নিচের দিকে পাটাতনের মতো অংশটির নাম বেজ।

স্টেজ: আর্ম-এর নিচের অংশে স্টেজ লাগানো থাকে।

বডি টিউব: অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উপরের দিককার একটি নলাকার অংশ যার একপ্রান্তে আইপিস এবং অপর প্রান্তে অবজেকটিভ লেন্সগুলো লাগানো থাকে।

নোজপিস ও অবজেকটিভ: বডি টিউবের নিচের দিকের ঘূর্ণনশীল অংশটিকে নোজপিস বলে। এতে তিনটি অবজেকটিভ (লেন্স) লাগানো থাকে, যথা- লো পাওয়ার অবজেকটিভ (10x-12x), হাই পাওয়ার অবজেকটিভ (40x-45x), অয়েল ইমারশন অবজেকটিভ (100x)। কোনো কোনো যন্ত্রে অবশ্য আরও একটি অবজেকটিভ থাকে, যাকে বলে স্ক্রিনিং অবজেকটিভ (4x-5x)।

আইপিস: বডি টিউবের উপরের অংশে একটি (monocular) বা দুটি (binocular) আইপিস (লেন্স) লাগানো থাকে। এর বিবর্ধন ক্ষমতা সাধারণত 10x-12x হয়।

ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট নব: এটি একটি ছোট নব। এটিকে ঘুরিয়ে স্টেজকে ওঠা-নামা করানোর মাধ্যমে স্লাইডকে লেন্সের ফোকাস দূরত্বের (focal length) ভিতরে বা বাইরে নেওয়া যায়। এটিকে অনেকখানি ঘোরালে স্টেজের অল্প একটু সরণ ঘটে অর্থাৎ এটি দিয়ে ফোকাসের সূক্ষ্ম সমন্বয় করা হয়।

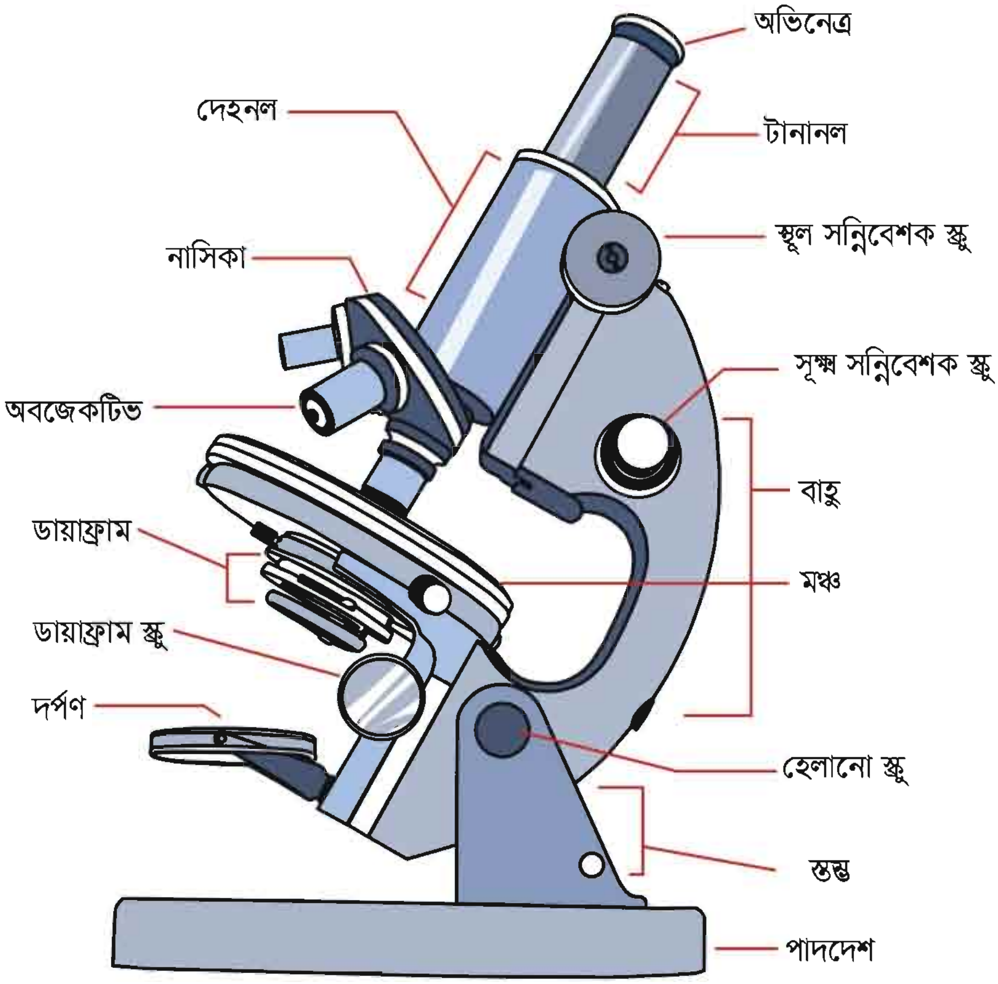
অভিনেত্র
দেহনল
টানানল
স্থূল সন্নিবেশক স্ক্রু
নাসিকা
সূক্ষ্ম সন্নিবেশক স্ক্রু
অবজেকটিভ
বাহু
ডায়াফ্রাম
মঞ্চ
ডায়াফ্রাম স্ক্রু
দর্পণ
হেলানো স্ক্রু
স্তম্ভ
পাদদেশ

চিত্র 2.27: যৌগিক আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ

কোর্স অ্যাডজাস্টমেন্ট নব: এটি একটি বড় নব। এটিকে ঘুরিয়ে স্টেজকে ওঠা-নামা করানোর মাধ্যমে স্লাইডকে লেন্সের ফোকাস দূরত্বের ভিতরে বা বাইরে নেওয়া যায়। এটিকে অল্প ঘোরালেই স্টেজের অনেকখানি সরণ ঘটে অর্থাৎ এটি দিয়ে ফোকাসের স্থূল সমন্বয় করা হয়।

সাবস্টেজ ডায়াফ্রাম ও কনডেন্সার: স্টেজের নিচে সাবস্টেজ অবস্থিত যেটা উঠা-নামা করানো যায় এবং এর সাথে একটি কনডেন্সার লাগানো থাকে। কনডেন্সারের মধ্যে একটি ডায়াফ্রাম বা পর্দা থাকে যেটা কতটুকু আলো কনডেন্সারের ভিতরে প্রবেশ করবে তা নির্ধারণ করে।

আলোর উৎস: বেস-এর কেন্দ্রে একটি আলোর উৎস থাকে, যেখান থেকে আলো কনডেন্সারের মধ্য দিয়ে লেন্সে প্রবেশ করে।

যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে প্রাকৃতিক আলো ব্যবহার করতে চাইলে গবেষণাগারের আলোকিত স্থানে এটি স্থাপন করতে হবে। প্রথমেই আয়নাটি এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি মঞ্চটির ছিদ্র বরাবর বসানো কাচের স্লাইডের নিচে প্রতিফলিত হয়। আর যদি কৃত্রিম আলোক উৎস অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অংশ হিসেবে উপস্থিত থাকে, তাহলে শুধু সেটি জ্বালালেই চলবে। যে স্লাইডটি পর্যবেক্ষণ করা হবে তা মঞ্চের ক্লিপের সাহায্যে এঁটে দিতে হবে। এরপর নোজপিস ঘুরিয়ে নিয়ে অবজেকটিভের কম পাওয়ারের লেন্স স্লাইড বরাবর স্থাপন করতে হবে। এবার প্রথমে কোর্স অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু এবং পরে ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু ঘুরিয়ে দেখার বস্তুটি ফোকাসে আনতে হবে। এবার বডি টিউবে স্থাপিত আইপিস লেন্সে চোখ রেখে দেখতে হবে। প্রয়োজনে ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু ঘুরিয়ে নেওয়া যাবে। মনোকুলার হোক বা বাইনোকুলার, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখার সময় দুটি চোখই খোলা রাখার চেষ্টা করতে হবে। প্রথমে কষ্ট হলেও ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে যাবে। এক চোখে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দেখলে চোখ সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। যদি উচ্চ পাওয়ারের দরকার হয়, তবে অবশ্যই শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে নোজপিস ঘুরিয়ে উচ্চ পাওয়ারের লেন্স স্থাপন করতে হবে।

স্টেইনিং (staining)

কোষ বা টিস্যুর পাতলা স্তরকে যখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা হয়, তখন সেটি যে জলীয় মাধ্যমে অবস্থান করে, তার থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা মুশকিল। এ সমস্যা সমাধান করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে, তার মধ্যে একটি উপায় হলো ওই কোষ বা টিস্যুকে রং করা, যাতে সেই রং দেখে পারিপার্শ্বিকতার সাপেক্ষে তার অবস্থান এবং আকৃতি আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। অনেক সময় এই রঞ্জন প্রক্রিয়া এত সূক্ষ্মতার সাথে করা সম্ভব, যাতে করে শুধু বিশেষ ধরনের কোষ কিংবা কোষের বিশেষ কোনো অংশ বা অঙ্গাণু অথবা টিস্যুর নির্দিষ্ট কোনো উপাদানই কেবল রঙিন হয়। একেই বলে স্লাইড স্টেইনিং। যেসব রঞ্জক পদার্থ দিয়ে স্টেইনিং করা হয়, সেগুলোকে একত্রে স্টেইন (stain) বলে।

চিত্র 2.28: ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র

2.5.3 ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Electron microscope)

বিবর্ধনের জন্য ব্যবহৃত তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত কম হবে, তত ছোট বস্তুকে বিবর্ধিত করা সম্ভব হবে। সাধারণত বিবর্ধনে ব্যবহৃত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের প্রায় অর্ধেকের চেয়ে ছোট বস্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখার মতো করে ফোকাস করা সম্ভব নয়। দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 400-700 ন্যানোমিটারের মধ্যে থাকে। তাই সবচেয়ে উন্নতমানের আলোক অণুবীক্ষণেও 200 ন্যানোমিটারের থেকে ছোট বস্তুকে আলোক অণুবীক্ষণে বিবর্ধিত করে দেখা যায় না, এমনকি অনেক শক্তিশালী বহুসংখ্যক লেন্সের সমন্বয় করেও সেটি করা যায় না। ফলে আলোক অণুবীক্ষণে কোষের কোষঝিল্লি, নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম ছাড়া আর কিছু খুব একটা ভালো করে বোঝা যায় না। সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত অঙ্গাণুগুলোকে আলাদা করে দেখা যায় না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য দৃশ্যমান আলোর পরিবর্তে ইলেকট্রন তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়, কেননা ইলেকট্রনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোর চেয়ে অনেক ছোট করা সম্ভব। কাচের লেন্সের পরিবর্তে সেখানে ব্যবহৃত হয় শক্তিশালী তড়িৎ চুম্বক, যা ইলেকট্রন স্রোতের গতিপথ বাঁকিয়ে দিতে পারে, ঠিক যেরকম কাচ, আলোকে বাঁকিয়ে দেয়। ফলে কোষের ভিতরকার অঙ্গাণুগুলো স্পষ্ট দেখা সম্ভব হয়। যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইলেকট্রন তরঙ্গকে ব্যবহার করে বিবর্ধন করা হয়, তাকে ইলেকট্রন (ইলেকট্রনিক নয়) মাইক্রোস্কোপ (electron microscope) বা ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে। উল্লেখ্য, ইলেকট্রন তরঙ্গ দিয়ে তৈরি করা ছবি আমরা সরাসরি চোখে দেখতে পাই না। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাথে সংযুক্ত একটি কম্পিউটার ঐ অদৃশ্য ছবিকে আমাদের দেখার উপযোগী ছবিতে পরিণত করে যা, কম্পিউটারের মনিটরে দৃশ্যমান হয়।

একক কাজ

কাজ : অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদ কোষ (পেঁয়াজ কোষ) পর্যবেক্ষণ কর।

প্রয়োজনীয় উপাদান: পেঁয়াজ, ব্লেড, স্লাইড, কভার স্লিপ, ওয়াচ গ্লাস, তুলি, গ্লিসারিন এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

পদ্ধতি: পেঁয়াজ থেকে শুকনো খোসাগুলো ছাড়িয়ে নাও। এবার যেকোনো একটি স্ফীত, রসালো শল্কপত্র

নাও। ব্লেড দিয়ে শল্কপত্রের উপরিভাগ থেকে সামান্য ত্বকস্তর তুলে নিয়ে ওয়াচ গ্লাসের পানিতে রাখ। এবারে তুলির সাহায্যে ওয়াচ গ্লাসের পানি থেকে ত্বকস্তর তুলে নিয়ে একটি পরিষ্কার স্লাইডের উপর রাখ। ত্বকস্তরের উপর এক ফোঁটা গ্লিসারিন দিয়ে তার উপর ধীরে ধীরে কভার স্লিপ রাখ।

পর্যবেক্ষণ: যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিম্নক্ষমতাসম্পন্ন অভিলক্ষ (Objective) দিয়ে দেখ। আয়তাকার, পাতলা কোষপ্রাচীরযুক্ত কোষ দেখতে পাবে। এবার উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অভিলক্ষ দিয়ে দেখ। প্রতিটি কোষে পাতলা দানাযুক্ত প্রোটোপ্লাজম, কোষগহ্বর এবং একপাশে একটি নিউক্লিয়াস দেখতে পাবে। এবার যা যা দেখলে তার চিত্র খাতায় এঁকে চিহ্নিত কর।

একক কাজ

কাজ : অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রাণিকোষ (অ্যামিবা) পর্যবেক্ষণ কর।

প্রয়োজনীয় উপাদান: অণুবীক্ষণ যন্ত্র, স্লাইড, কভার স্লিপ, ড্রপার, পেট্রিডিস, পিপেট, কাচের দণ্ড, কাচের বাটি এবং পুকুরের তলদেশ থেকে সংগৃহীত ডালপালাসহ পচা পাতা ও পানি।

পদ্ধতি : কাজের শুরুতে কোনো পচা ডোবা বা পুকুরের তলদেশ থেকে ডালপালাসহ পচা পাতা সংগ্রহ কর। এগুলো ছোট ছোট করে কেটে কাচের বাটিতে রেখে অল্প পানিসহ কাচের দণ্ড দিয়ে আস্তে আস্তে নাড়তে থাক। এভাবে কিছুক্ষণ নেড়ে বাটিটিকে একস্থানে স্থিরভাবে রেখে দাও। কাচ পাত্রে তলানি জমলে একটি পিপেট দিয়ে ঐ তলানি তুলে পেট্রিডিসে জমা কর। এবার ড্রপার দিয়ে এক ফোঁটা তলানি কাচের স্লাইডে তুলে কভার স্লিপ দিয়ে চাপা দেওয়ার পর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে বসাও।

পর্যবেক্ষণ : স্লাইড একটু এদিক সেদিক করে খোঁজাখুঁজি করলেই স্বচ্ছ জেলির মতো কতগুলো ক্ষুদ্র জীব দেখতে পাবে। এগুলোই অ্যামিবা। এত বহু ক্ষণপদ এবং গহ্বর দেখতে পাবে এবং কোষটিকে বেষ্টন করে প্লাজমালেমা নামক একটি পর্দা দেখতে পাবে। এতে উদ্ভিদকোষের মতো কোনো প্লাস্টিড থাকে না। উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা গেল কি? এবার যা যা দেখলে তার চিত্র খাতায় এঁকে চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

1. কোষ কাকে বলে?
2. প্লাস্টিডের কাজগুলো কী কী?
3. টিস্যু ও অঙ্গের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও।
4. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির গুরুত্ব কী?
5. কোষের শক্তিঘর কাকে বলে?
6. রক্তের কাজ কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

1. চিত্রসহ মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন বর্ণনা কর।
2. বিভিন্ন ধরনের সরল কলার গঠন এবং কাজের তুলনামূলক আলোচনা কর।
3. বিভিন্ন ধরনের প্রাণিকলার গঠন এবং কাজ আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. লাইসোজোমের কাজ কোনটি?

ক. খাদ্য তৈরি	খ. শক্তি উৎপাদন
গ. জীবাণু ভক্ষণ	ঘ. আমিষ সংশ্লেষণ

2. অ্যামিবা একটি প্রাণিকোষ, কারণ এর-

i. কেন্দ্রিকার গঠন সুসম্পূর্ণ
ii. বর্ণ গঠনকারী অঙ্গ আছে
iii. কোষঝিল্লি দেখা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে 3 ও 4 নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

রোহিত গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার সময় দেখল একজন লোক পাটগাছ থেকে আঁশ ছাড়াচ্ছে।

3. উদ্দীপকের সংগৃহীত অংশটিতে কোন ধরনের টিস্যু বিদ্যমান?

ক. প্যারেনকাইমা
খ. কোলেনকাইমা
গ. ক্লোরেনকাইমা
ঘ. স্ক্লেরেনকাইমা

4. উদ্দীপকের সংগৃহীত অংশের টিস্যুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

i. কোষপ্রাচীর লিগনিনযুক্ত
ii. কোষপ্রাচীরের পুরুত্ব অসমান
iii. কোষে প্রোটোপ্লাজম অনুপস্থিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

1. (ক) প্লাজমালেমা কী?
(খ) প্লাস্টিডকে বর্ণগঠনকারী অঙ্গা বলা হয় কেন?
(গ) জীবজগতের জন্য N চিহ্নিত অংশটি গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) M চিহ্নিত অংশটির অনুপস্থিতিতে জীবদেহে কী ধরনের সমস্যা দেখা দিবে তা বিশ্লেষণ কর।

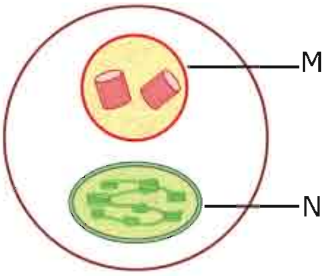

2. ক. পেশি টিস্যু কী?
খ. স্কেলিটাল টিস্যু কীভাবে মস্তিষ্ককে রক্ষা করে?
গ. চিত্রের Q চিহ্নিত অংশটির ঐরূপ অবস্থানের কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. চিত্র A ও B-এর মধ্যে একটি পরিবহন কাজ ছাড়াও অন্যান্য জৈবিক কাজে কীভাবে ভূমিকা রাখে যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

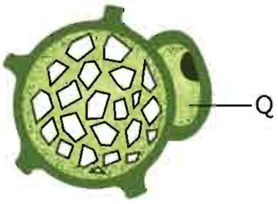

চিত্র -A

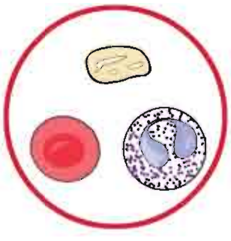

চিত্র -B

তৃতীয় অধ্যায়

কোষ বিভাজন

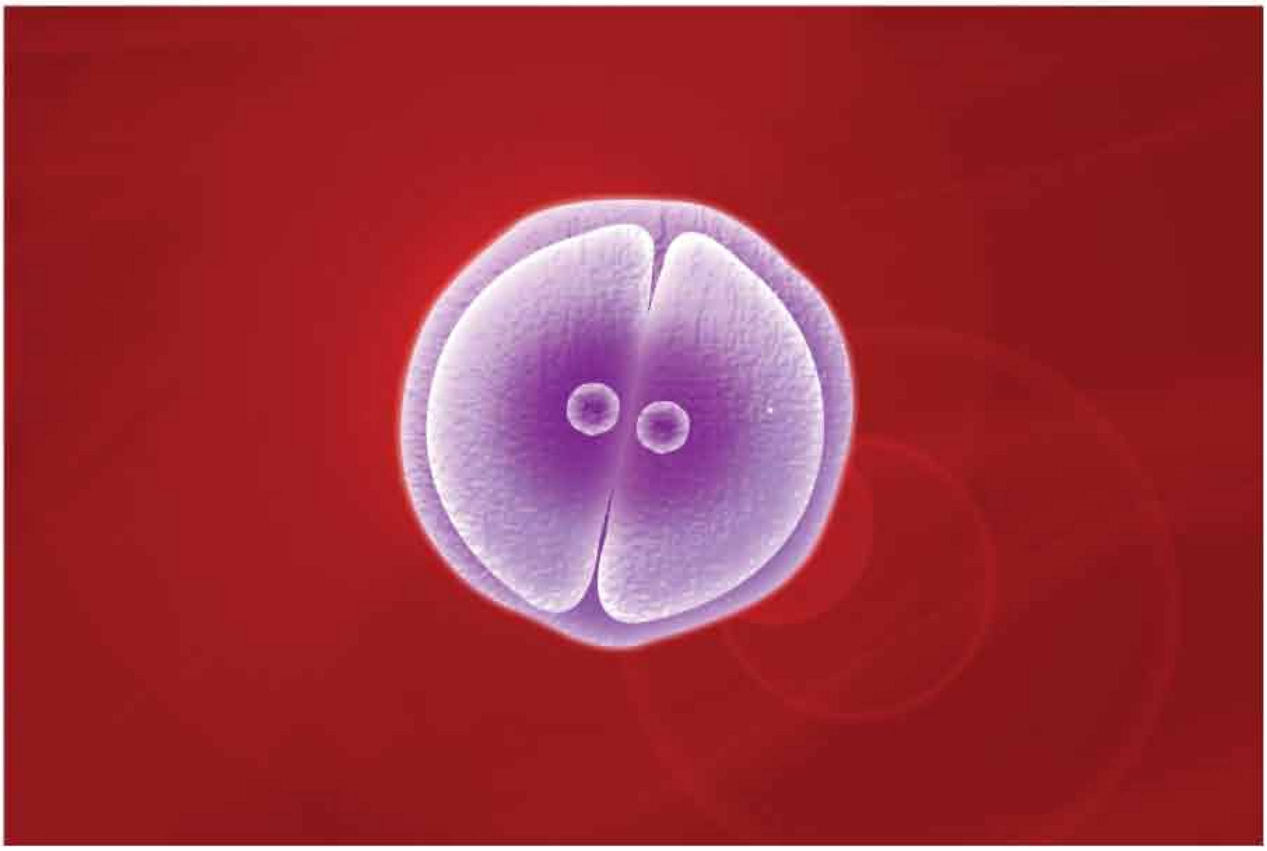

এককোষী জীব থেকে শুরু করে বহুকোষী জীব পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই নানা ধরনের কোষ বিভাজন দেখা যায়। এগুলোর কোনোটি দেহবৃদ্ধি ঘটায়, কোনোটি জননকোষ সৃষ্টি করে, আবার কোনোটি দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এই বিভিন্ন ধরনের কোষ বিভাজন কীভাবে হয়ে থাকে, এ সম্পর্কে আমরা এ অধ্যায়ে জানার চেষ্টা করব।

২০১৯

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- কোষ বিভাজনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কোষ বিভাজনের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব।
- মাইটোসিস ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাইটোসিসের পর্যায়সমূহ বর্ণনা করতে পারব।
- জীবদেহে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- মিয়োসিস ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জননকোষ উৎপাদনে মিয়োসিসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় কোষ বিভাজনের অবদান উপলব্ধি করতে পারব।

3.1 কোষ বিভাজন এবং তার প্রকারভেদ (Cell Division and its Classifications)

প্রতিটি জীবদেহ কোষ দিয়ে তৈরি। একটিমাত্র কোষ দিয়ে প্রতিটি জীবের জীবন শুরু হয়। বিভাজনের মাধ্যমে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি জীবদেহের একটি স্বাভাবিক এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কোনো কোনো জীবের দেহ একটিমাত্র কোষ দিয়ে গঠিত, এদের বলা হয় এককোষী (unicellular) জীব, যেমন ব্যাকটেরিয়া, অ্যামিবা, প্লাজমোডিয়াম ইত্যাদি। এককোষী জীব বিভাজনের মাধ্যমেই একটি থেকে অসংখ্য এককোষী জীব উৎপন্ন করে। আবার অনেক জীব একাধিক কোষ দিয়ে গঠিত। এদের বলা হয় বহুকোষী (multicellular) জীব। মানুষ, বট গাছ, তিমি মাছ ইত্যাদি জীব কোটি কোটি কোষ দিয়ে গঠিত। বিশালদেহী একটি বট গাছের সূচনাও ঘটে একটি মাত্র কোষ (জাইগোট বা নিষিক্ত ডিম্বাণু) থেকে। এককোষী নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একসময় কোটি কোটি কোষের একটি পরিণত মানুষের সৃষ্টি হয়। আবার কোষ বিভাজনের মাধ্যমেই পুং ও স্ত্রী গ্যামেট সৃষ্টি হয়ে নতুন প্রজন্মের জন্ম হয়। জীবের বৃদ্ধি ও প্রজননের উদ্দেশ্যে কোষ বিভাজনের (cell division) মাধ্যমে কোষের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে থাকে।

জীবদেহের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া হচ্ছে, মাইটোসিস (Mitosis) এবং মিয়োসিস (Meiosis)।

3.2 মাইটোসিস (Mitosis)

এই কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় প্রকৃত বা সুকেন্দ্রিক কোষ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য কোষে পরিণত হয়। মাইটোসিসে নিউক্লিয়াস একবার বিভাজিত হয়, প্রায় সমানভাবে। নিউক্লিয়াসের প্রতিটি ক্রোমোজোমও একবার করে বিভাজিত হয়। সাইটোপ্লাজমও বিভাজিত হয় একবারই। তাই মাইটোসিস বিভাজনে কোষের মাতৃকোষ এবং অপত্য কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা, তথা DNA-এর পরিমাণ সমান থাকে। শুধু যে পরিমাণে একই থাকে তা নয়, মাতৃকোষের DNA-এর প্রায় হুবহু অনুলিপি অপত্য কোষে পাওয়া যায়। একে সমীকরণিক বিভাজনও বলে। এই বিভাজন প্রকৃত নিউক্লিয়াসযুক্ত জীবের দেহকোষে (somatic cell) হয়ে থাকে এবং বিভাজনের ফলে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণী এবং উদ্ভিদ দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে বৃদ্ধি পায়। প্রাণীর দেহকোষে এবং উদ্ভিদের বর্ধনশীল অংশের ভাজক টিস্যু, যেমন: কাণ্ড, মূলের অগ্রভাগ, ভ্রূণমুকুল এবং ভ্রূণমূল, বর্ধনশীল পাতা, মুকুল ইত্যাদিতে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজন হয়। নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদ এবং প্রাণীর অযৌন জননের সময়ও এ ধরনের বিভাজন হয়।

3.2.1 মাইটোসিসের পর্যায়সমূহ

মাইটোসিস কোষ বিভাজন একটি অবিচ্ছিন্ন বা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই বিভাজনে প্রথমে ক্যারিওকাইনেসিস অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটে এবং পরবর্তীকালে সাইটোকাইনেসিস অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমের বিভাজন ঘটে। বিভাজন শুরুর আগে কোষের নিউক্লিয়াসে কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ হয়। এ অবস্থাকে ইন্টারফেজ পর্যায় বলে। বর্ণনার সুবিধার জন্য মাইটোসিসের নিউক্লিয়াসের বিভাজন প্রক্রিয়াকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়ে থাকে, পর্যায়গুলো হচ্ছে: প্রোফেজ, প্রো-মেটাফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ এবং টেলোফেজ।

(a) প্রোফেজ (Prophase)

এটি মাইটোসিসের প্রথম পর্যায়। এ পর্যায়ে কোষের নিউক্লিয়াস আকারে বড় হয় এবং ক্রোমোজোম থেকে পানি হ্রাস পেতে থাকে। এর ফলে ক্রোমোজোমগুলো আস্তে আস্তে সংকুচিত হয়ে মোটা এবং খাটো হতে শুরু করে। যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তখন এদের দেখা সম্ভব হয়। এ পর্যায়ে প্রতিটি ক্রোমোজোম সেন্ট্রোমিয়ার ব্যতীত লম্বালম্বি দুভাবে বিভক্ত হয়ে দুটি ক্রোমাটিড উৎপন্ন করে। ক্রোমোজোমগুলো কুণ্ডলিত অবস্থায় থাকায় এদের সংখ্যা গণনা করা যায় না।

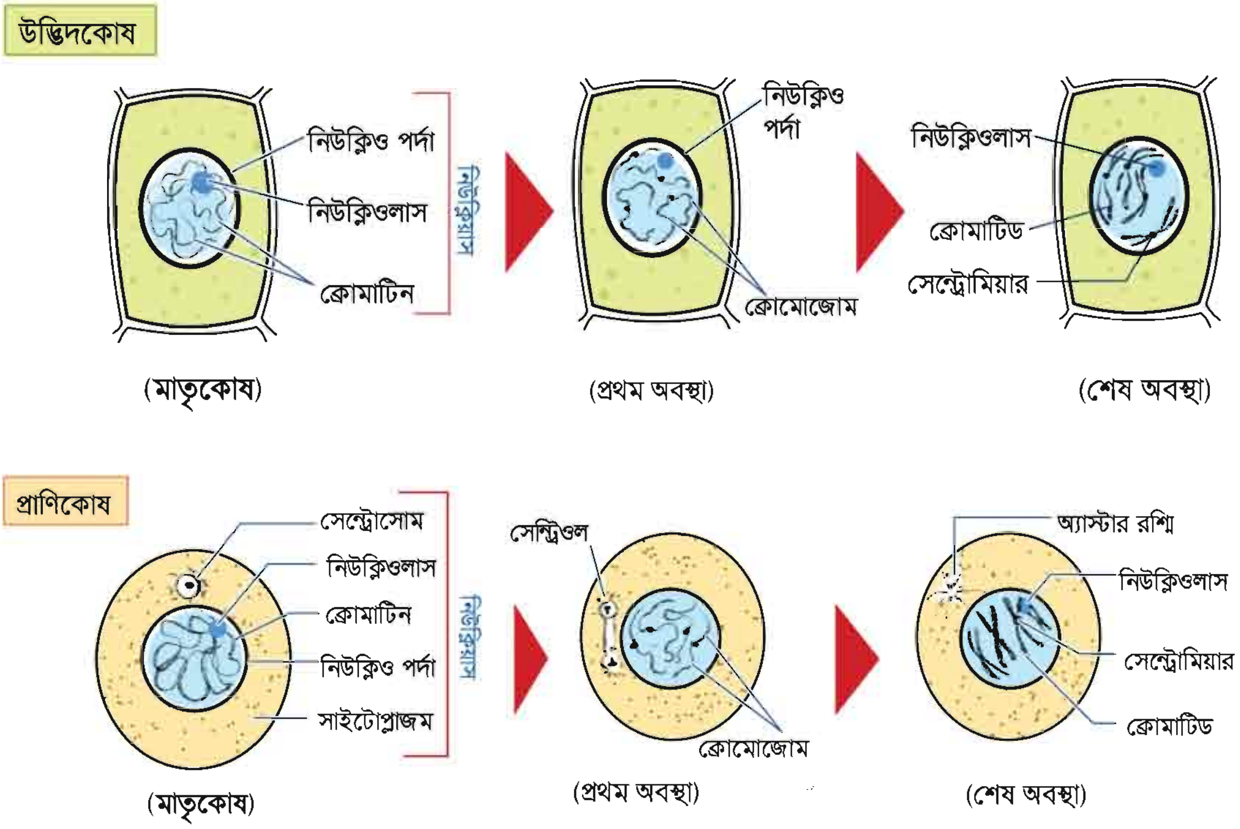
উদ্ভিদকোষ
নিউক্লিও পর্দা
নিউক্লিওলাস
ক্রোমাটিন
নিউক্লিয়াস
(মাতৃকোষ)
নিউক্লিও পর্দা
ক্রোমোজোম
(প্রথম অবস্থা)
নিউক্লিওলাস
ক্রোমাটিড
সেন্ট্রোমিয়ার
(শেষ অবস্থা)
প্রাণিকোষ
সেন্ট্রোসোম
নিউক্লিওলাস
ক্রোমাটিন
নিউক্লিও পর্দা
সাইটোপ্লাজম
নিউক্লিয়াস
(মাতৃকোষ)
সেন্ট্রিওল
ক্রোমোজোম
(প্রথম অবস্থা)
অ্যাস্টার রশ্মি
নিউক্লিওলাস
সেন্ট্রোমিয়ার
ক্রোমাটিড
(শেষ অবস্থা)

চিত্র 3.01-02: প্রোফেজ

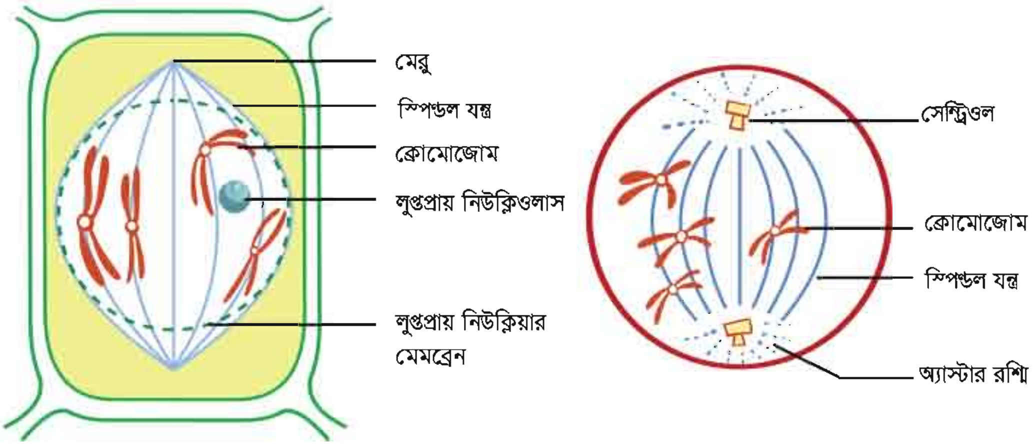
মেরু
স্পিন্ডল যন্ত্র
ক্রোমোজোম
লুপ্তপ্রায় নিউক্লিওলাস
লুপ্তপ্রায় নিউক্লিয়ার মেমব্রেন
সেন্ট্রিওল
ক্রোমোজোম
স্পিন্ডল যন্ত্র
অ্যাস্টার রশ্মি

চিত্র 3.03: প্রো-মেটাফেজ

(b) প্রো-মেটাফেজ (Pro-metaphase)

এ পর্যায়ের একেবারে প্রথম দিকে উদ্ভিদকোষে কতকগুলো তন্তুময় প্রোটিনের সমন্বয়ে দুই মেরু বিশিষ্ট স্পিন্ডল যন্ত্রের (spindle apparatus) সৃষ্টি হয়। স্পিন্ডল যন্ত্রের দুই মেরুর মধ্যবর্তী স্থানকে ইকুয়েটর বা বিষুবীয় অঞ্চল বলা হয়। কোষ কংকালের মাইক্রোটিবিউল দিয়ে তৈরি স্পিন্ডলযন্ত্রের তন্তুগুলো এক মেরু থেকে অপর মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত, এদেরকে স্পিন্ডল তন্তু (spindle fibre) বলা হয়। এ পর্যায়ে ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার স্পিন্ডলযন্ত্রের কিছু নির্দিষ্ট তন্তুর সাথে সংযুক্ত হয়। এই তন্তুগুলোকে আকর্ষণ তন্তু (traction fibre) বলা হয়। ক্রোমোজোমের সাথে এই তন্তুগুলি সংযুক্ত বলে এদের ক্রোমোসোমাল তন্তুও বলা হয়। ক্রোমোজোমগুলো এ সময়ে বিষুবীয় অঞ্চলে বিন্যস্ত হতে থাকে। কোষের নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ও নিউক্লিওলাসের বিলুপ্তি ঘটতে থাকে। প্রাণিকোষে স্পিন্ডল যন্ত্র সৃষ্টি ছাড়াও পূর্বে বিভক্ত সেন্ট্রিওল দুটি দুই মেরুতে অবস্থান করে এবং সেন্ট্রিওল দুটির চারদিক থেকে রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। একে অ্যাস্টার-রে বলে।

(c) মেটাফেজ (Metaphase)

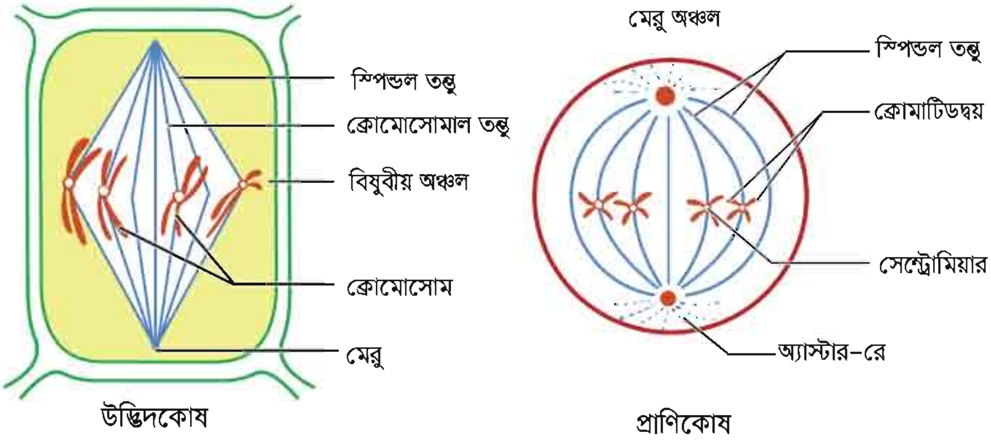
স্পিন্ডল তন্তু
ক্রোমোসোমাল তন্তু
বিষুবীয় অঞ্চল
ক্রোমোসোম
মেরু
মেরু অঞ্চল
স্পিন্ডল তন্তু
ক্রোমাটিডদ্বয়
সেন্ট্রোমিয়ার
অ্যাস্টার-রে

উদ্ভিদকোষ

প্রাণিকোষ

চিত্র 3.04: মেটাফেজ

এ পর্যায়ের প্রথমেই সব ক্রোমোজোম স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষুবীয় অঞ্চলে (দুই মেরুর মধ্যখানে) অবস্থান করে। প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার বিষুবীয় অঞ্চলে এবং বাহু দুটি মেরুমুখী হয়ে অবস্থান করে। এ পর্যায়ে ক্রোমোজোমগুলো সর্বাধিক মোটা এবং খাটো হয়। প্রতিটি ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিড দুটির আকর্ষণ কমে যায় এবং বিকর্ষণ শুরু হয়। এ পর্যায়ের শেষ দিকে সেন্ট্রোমিয়ারের বিভাজন শুরু হয়। নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এবং নিউক্লিওলাসের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে।

(d) অ্যানাফেজ (Anaphase)

প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, ফলে ক্রোমাটিড দুটি আলাদা হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় প্রতিটি ক্রোমাটিডকে অপত্য ক্রোমোজোম বলে এবং এতে একটি করে সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। অপত্য ক্রোমোজোমগুলো বিষুবীয় অঞ্চল থেকে পরস্পর বিপরীত মেরুর দিকে সরে যেতে থাকে। অর্থাৎ ক্রোমোজোমগুলোর অর্ধেক এক মেরুর দিকে এবং বাকি অর্ধেক অন্য মেরুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। অপত্য ক্রোমোজোমের মেরু অভিমুখী চলনে সেন্ট্রোমিয়ার অগ্রগামী থাকে এবং বাহুদ্বয় অনুগামী হয়। সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোমগুলো V, L, J বা I-এর মতো আকার ধারণ করে। এদেরকে যথাক্রমে মেটাসেন্ট্রিক, সাবমেটাসেন্ট্রিক, অ্যাক্রোসেন্ট্রিক বা টেলোসেন্ট্রিক বলে। অ্যানাফেজ পর্যায়ের শেষের দিকে অপত্য ক্রোমোজোমগুলো স্পিন্ডলযন্ত্রের মেরুপ্রান্তে অবস্থান নেয় এবং ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।

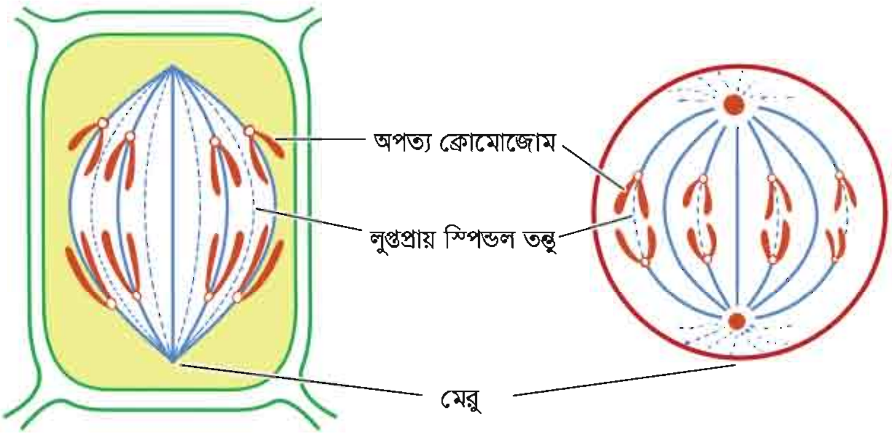

চিত্র 3.05: অ্যানাফেজ

(e) টেলোফেজ (Telophase)

এটি মাইটোসিসের শেষ পর্যায়। এখানে প্রোফেজের ঘটনাগুলো পর্যায়ক্রমে বিপরীতভাবে ঘটে। ক্রোমোজোমগুলোতে পানি যোজন ঘটতে থাকে এবং সরু ও লম্বা আকার ধারণ করে।

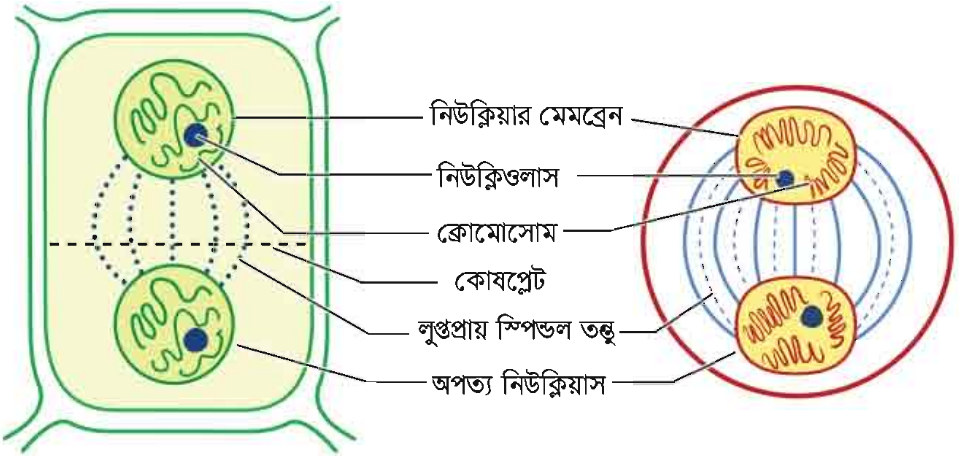

চিত্র 3.06: টেলোফেজ

অবশেষে এরা জড়িয়ে গিয়ে নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম গঠন করে। নিউক্লিওলাসের পুনরাবির্ভাব ঘটে। নিউক্লিয়ার রেটিকুলামকে ঘিরে পুনরায় নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের সৃষ্টি হয়, ফলে দুই মেরুতে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। স্পিন্ডলযন্ত্রের কাঠামো ভেঙে পড়ে এবং তন্তুগুলো ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

টেলোফেজ পর্যায়ের শেষে বিষুবীয় তলে এন্ডোপ্লাজমিক জালিকার ক্ষুদ্র অংশগুলো জমা হয় এবং পরে এরা মিলিত হয়ে কোষপ্লেট গঠন করে। সাইটোপ্লাজমিক অঙ্গাণুসমূহের সমবণ্টন ঘটে। ফলে দুটি অপত্য কোষ (daughter cell) সৃষ্টি হয়। প্রাণীর ক্ষেত্রে স্পিন্ডলযন্ত্রের বিষুবীয় অঞ্চল বরাবর কোষঝিল্লিটি গর্তের মতো ভিতরের দিকে ঢুকে যায় এবং এ গর্ত সবদিক থেকে ক্রমান্বয়ে গভীরতর হয়ে একত্রে মিলিত হয়, ফলে কোষটি দুভাগে ভাগ হয়ে পড়ে।

দলগত কাজ

কাজ : সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুসারে বিভিন্ন ধরনের ক্রোমোজোমের মডেল নির্মাণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : দড়ি বা সুতা, আর্ট পেপার, আঠা, স্কচটেপ, কাটার, সাইনপেন ইত্যাদি।

পদ্ধতি : প্রথমে আমরা তৈরি করব মেটাফেজ দশায় দৃশ্যমান ক্রোমোজোমের মডেল। একই দৈর্ঘ্যের দড়ি বা সুতার দুটি টুকরো নাও। এই টুকরা দুটো হলো একই ক্রোমোজোমের দুটি সিস্টার ক্রোমাটিডের মডেল। এমনভাবে এদেরকে গিঁট দাও যাতে গিঁটটি উভয়ের দৈর্ঘ্যের মাঝখানে পড়ে। গিঁটটি হলো সেন্ট্রোমিয়ারের মডেল। ঠিকমতো মাঝখানে গিঁটটি দিতে পারলে যা পাওয়া যাবে তা হলো একটি মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমের মডেল, যার সেন্ট্রোমিয়ার থেকে চারটি বাহু বের হয়ে আছে বলে মনে হয়। চার বাহুর দুটি হলো একটি ক্রোমাটিডের আর অপর দুটি অপর ক্রোমাটিডের। সবগুলো বাহুর দৈর্ঘ্য সমান। একইভাবে আরও দুই টুকরো সমান মাপের দড়ি বা

সুতা নিয়ে মাঝখান থেকে একটু সরিয়ে গিঁট দিয়ে সাবমেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমের মডেল তৈরি কর। প্রান্তের খুব নিকটে গিঁট দিলে তৈরি হবে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমের মডেল। একদম প্রান্তে যদি গিঁট দেওয়া হয় তাহলে সেটা হবে টেলোসেন্ট্রিক। এবার চার ধরনের ক্রোমোজোমের মডেল একটি আর্টপেপারে আঠা বা স্কচটেপ দিয়ে লাগাও। সাইনপেন দিয়ে কোনটি কী তা লেখ এবং অংশগুলো লেবেল কর। লেবেলে অবশ্যই মেটাফেজ কথাটি উল্লেখ করবে।

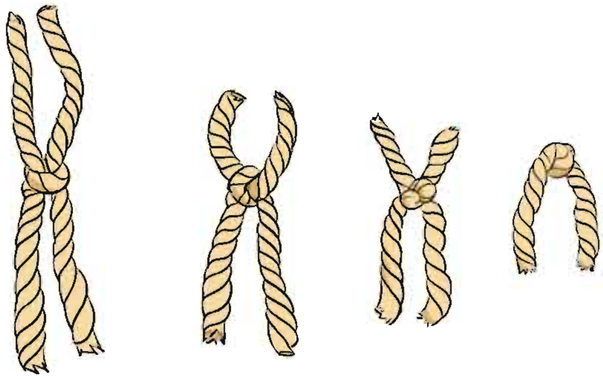

চিত্র 3.07: সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুসারে মেটাফেজ দশায় দৃশ্যমান বিভিন্ন ধরনের ক্রোমাটিডের মডেল। বাম থেকে ডানে: মেটাসেন্ট্রিক, সাবমেটাসেন্ট্রিক, অ্যাক্রোসেন্ট্রিক এবং টেলোসেন্ট্রিক।

এবার একইভাবে এনাফেজ দশায় ক্রোমোজোম, অর্থাৎ ক্রোমাটিডগুলোকে কেমন দেখা যায় তার মডেল বানাতে হবে। এজন্য প্রথমে মেটাফেজ দশার ক্রোমোজোমের মডেল বানাও। মেটাসেন্ট্রিক, সাবমেটাসেন্ট্রিক, অ্যাক্রোসেন্ট্রিক এবং টেলোসেন্ট্রিক – চারটিরই। এনাফেজ দশায় সেন্ট্রোমিয়ার বরাবর প্রতিটি ক্রোমোজোম এমনভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় যাতে একটি ভাগে কেবল একটি ক্রোমাটিড পড়ে। সাথে নিয়ে যায় সেন্ট্রোমিয়ারের সেই অর্ধেকটুকু যেটা তার অংশ। এখানেও আমরা মেটাফেজ দশার একটি ক্রোমোজোমের মডেলকে গিঁট বরাবর কেটে দুই ভাগ করব, যাতে একটি ভাগে থাকে একটিই ক্রোমাটিড। তখন দেখা যাবে, মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম থেকে প্রাপ্ত ক্রোমাটিড দুটির প্রতিটিই দেখতে ইংরেজি V বর্ণের মতো যেহেতু তার সেন্ট্রোমিয়ার থাকে ক্রোমাটিডের ঠিক মাঝখানে। মাঝখান থেকে একটু পাশের দিকে থাকা সেন্ট্রোমিয়ারবিশিষ্ট সাবমেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম থেকে অনুরূপভাবে অর্ধেক করে কেটে আলাদা করা ক্রোমাটিডের চেহারা হবে ইংরেজি L বর্ণের মতো। একইভাবে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ও টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম থেকে প্রাপ্ত ক্রোমাটিড হবে যথাক্রমে ইংরেজি J এবং I বর্ণের মতো। এবার চার ধরনের ক্রোমাটিডের মডেল একটি আর্টপেপারে আঠা বা স্কচটেপ দিয়ে লাগাও। সাইনপেন দিয়ে কোনটি কী তা লিখ এবং অংশগুলো লেবেল কর। লেবেলে অবশ্যই এনাফেজ কথাটি উল্লেখ করবে।

তারপর উভয় আর্টপেপারে দেখানো মডেল শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন কর। কোন ধরনের ক্রোমোজোম বা ক্রোমাটিড মেটাফেজ বা এনাফেজ দশায় কেমন চেহারা নেয়, তার কারণ ব্যাখ্যা কর।

মাইটোসিসের গুরুত্ব

জীবদেহে মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের কারণে প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যকার আয়তন ও পরিমাণগত ভারসাম্য রক্ষিত হয়। এর ফলে বহুকোষী জীবের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে। সব বহুকোষী জীবই জাইগোট নামক একটি কোষ থেকে জীবন শুরু করে। এই একটি কোষই বারবার মাইটোসিস বিভাজনের ফলে অসংখ্য কোষ সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ণ জীবে পরিণত হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি, চারটি থেকে আটটি, এভাবে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে একটি কোষ থেকে সম্পূর্ণ একটি জীব (যেমন: মানুষ, প্রায় 30 ট্রিলিওন কোষ) গঠিত হতে বুঝি অনেক লম্বা সময় প্রয়োজন। কিন্তু সেটি সত্যি নয়। যদি বৃদ্ধির জন্য দরকারি পুষ্টির সরবরাহ অক্ষুণ্ন থাকে, সবগুলো কোষই বিভাজনক্ষম হয় এবং প্রতিবার বিভাজনে যদি একদিন করে সময় লাগে বলে ধরে নিই, তবু মাত্র 40-50 দিনের মাথায় মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কোষ তৈরি হয়ে যাবে। মাইটোসিসে তৈরি অপত্য কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা ও গুণাগুণ একই রকম থাকায় জীবের দেহের বৃদ্ধি সুশৃঙ্খলভাবে হতে পারে। মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে, মাইটোসিসের ফলে অঙ্গজ প্রজনন সাধিত হয় এবং জননকোষের সংখ্যাবৃদ্ধিতে মাইটোসিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্ষতস্থানে নতুন কোষ সৃষ্টির মাধ্যমে জীবদেহের ক্ষতস্থান পূরণ করতে মাইটোসিস অপরিহার্য। কিছু কিছু জীবকোষ আছে যাদের আয়ুষ্কাল নির্দিষ্ট। এসব কোষ বিনষ্ট হলে মাইটোসিসের মাধ্যমে এদের পূরণ ঘটে। মাইটোসিসের ফলে একই ধরনের কোষের উৎপত্তি হওয়ায় জীবজগতের গুণগত বৈশিষ্ট্যের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। তবে অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস টিউমার এমনকি ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ হতে পারে।

টিউমার, ক্যান্সার এ শব্দগুলোর সাথে আমরা সবাই পরিচিত। এগুলো অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনের ফল। মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি এভাবে কোষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কিন্তু কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রিত থাকে। কোনো কারণে এই নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে গেলে অস্বাভাবিকভাবে কোষ বিভাজন চলতে থাকে। এর ফলে টিউমার সৃষ্টি হয় এবং প্রাণঘাতী টিউমারকে ক্যান্সার বলে।

ক্যান্সার কোষ এই নিয়ন্ত্রণহীন অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনেরই ফল। গবেষণায় দেখা গেছে, বিভিন্ন ধরনের রোগজীবাণু, কেমিক্যাল কিংবা তেজস্ক্রিয়তা ক্যান্সার কোষ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। সহস্রাধিক জিনকে ক্যান্সার কোষ তৈরিতে সহায়ক হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। উদাহরণ দেওয়ার জন্যে বলা যায়, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের E6 এবং E7 নামের দুটি জিন এমন কিছু প্রোটিন সৃষ্টি করে, যা কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রক প্রোটিন অণুসমূহকে স্থানচ্যুত করে। এর ফলে কোষ বিভাজনের নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে যায় এবং সৃষ্টি হয় জরায়ুমুখের টিউমার। অনেক সময় এ দুটি জিন পোষক কোষের জিনের সাথে একীভূত হয়ে যায় এবং কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী প্রোটিন অণুগুলোর কাজ বন্ধ করে দেয়। সৃষ্টি হয় ক্যান্সার কোষ, কিংবা ক্যান্সার।

অনেক ধরনের ক্যান্সার রয়েছে এবং সেগুলো সবই কমবেশি মারাত্মক রোগ। লিভার, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, স্তন, ত্বক, কোলন এবং জরায়ু, অর্থাৎ দেহের প্রায় সকল অঙ্গেই ক্যান্সার হতে পারে।

দলগত কাজ

কাজ: শিক্ষক কয়েকজন করে শিক্ষার্থী নিয়ে দল গঠন করে এক এক দলকে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের এক একটি পর্যায়ের চিত্র অঙ্কন করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে বলবেন।

3.3 মিয়োসিস (Meiosis)

মিয়োসিস বিভাজনের এক চক্রে নিউক্লিয়াস দুইবার বিভাজিত হয়। প্রথমবারে নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোম পরিমাণে অর্ধেক হয়ে যায়। এই বিভাজনে মাতৃকোষের যে দুটি নিউক্লিয়াস পাওয়া যায়, দ্বিতীয়বারে তার প্রতিটিই আবার দুটি কোষে বিভাজিত হয়। এবার অবশ্য ক্রোমোজোমের সংখ্যা এবং পরিমাণ সমান থাকে। তাই সব মিলিয়ে চূড়ান্ত ফল হলো, মিয়োসিস বিভাজনে একটি মাতৃকোষ থেকে চারটি অপত্য কোষ পাওয়া যায়, যেগুলোর প্রতিটিই মাতৃকোষের অর্ধেকসংখ্যক ক্রোমোজোম ধারণ করে (কাজেই DNA-এর পরিমাণও হয় প্রায় অর্ধেক)। তাই মিয়োসিসের আরেক নাম হ্রাসমূলক বিভাজন।

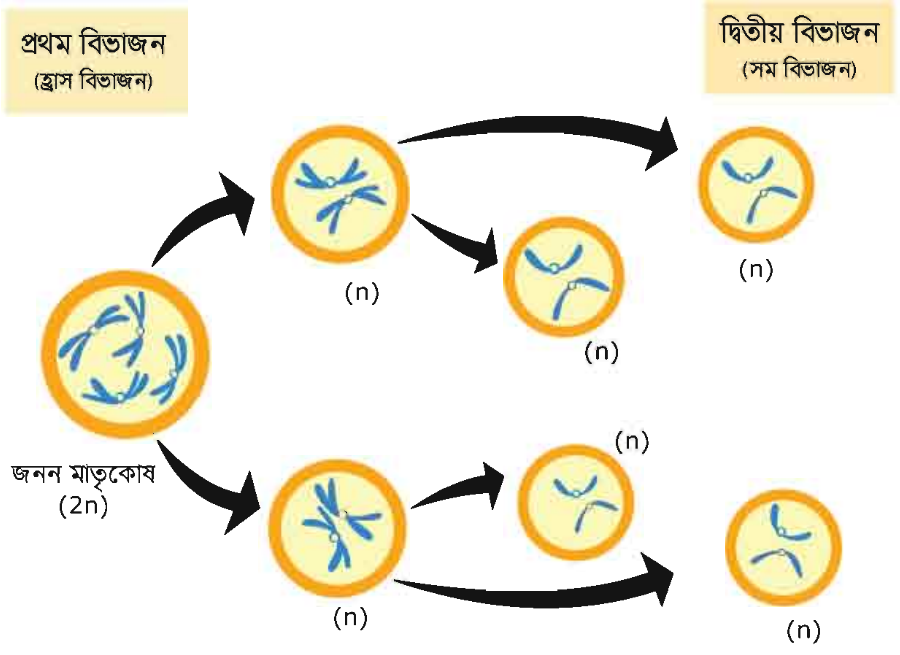

চিত্র 3.08: মিয়োসিস বিভাজন সম্বন্ধে ধারণা

প্রশ্ন হচ্ছে মিয়োসিস কেন হয়? মাইটোসিস কোষ বিভাজনে অপত্য কোষগুলোর ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের সমান থাকে। বৃদ্ধি এবং অযৌন জননের জন্য মাইটোসিস কোষ বিভাজন অপরিহার্য। যৌন জননে পুং ও স্ত্রী জনন কোষের মিলনের প্রয়োজন হয়। যদি জনন কোষগুলোর ক্রোমোজোম সংখ্যা দেহকোষের সমান থেকে যায় তা হলে জাইগোট কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা জীবটির দেহকোষের দ্বিগুণ হয়ে যাবে। মনে কর, একটা জীবের দেহকোষে এবং জনন কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা চার (4)। পুং ও স্ত্রী জনন কোষের মিলনের ফলে সৃষ্ট জাইগোটে ক্রোমোজোম সংখ্যা দাঁড়াবে আট (৪) এবং নতুন জীবটির প্রতিটি কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা হবে আট, যা মাতৃজীবের কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার দ্বিগুণ। যদি প্রতিটি জীবের জীবনচক্র এভাবে চলতে থাকে তাহলে প্রতি চক্রে যৌন জননের ফলে ক্রোমোজোম সংখ্যা বারবার দ্বিগুণ হতে থাকবে। আমরা জানি, ক্রোমোজোম জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন বহন করে। কাজেই ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণ হতে থাকলে বংশধরদের মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটে যাবে। যেহেতু পুং ও স্ত্রী জনন কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক, তাই জীবের যৌনজননে পুং ও স্ত্রী জনন কোষের মিলন হয়ে জাইগোটে পূর্ণসংখ্যক ক্রোমোজোম পাওয়া যায়। এভাবে জীবের ক্রোমোজোম সংখ্যা বংশপরম্পরায় একই থাকে। জনন কোষ সৃষ্টির সময় এবং নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদের জীবনচক্রের কোনো এক সময় যখন এ রকম ঘটে, তখন কোষের অর্ধেক ক্রোমোজোম সংখ্যার সে অবস্থাকে হ্যাপ্লয়েড (n) বলে। যখন দুটি হ্যাপ্লয়েড কোষের মিলন ঘটে, তখন সে অবস্থাকে ডিপ্লয়েড (2n) বলে। অর্থাৎ মিয়োসিস কোষ বিভাজন হয় বলেই প্রতিটি প্রজাতির বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় টিকে থাকতে পারে।

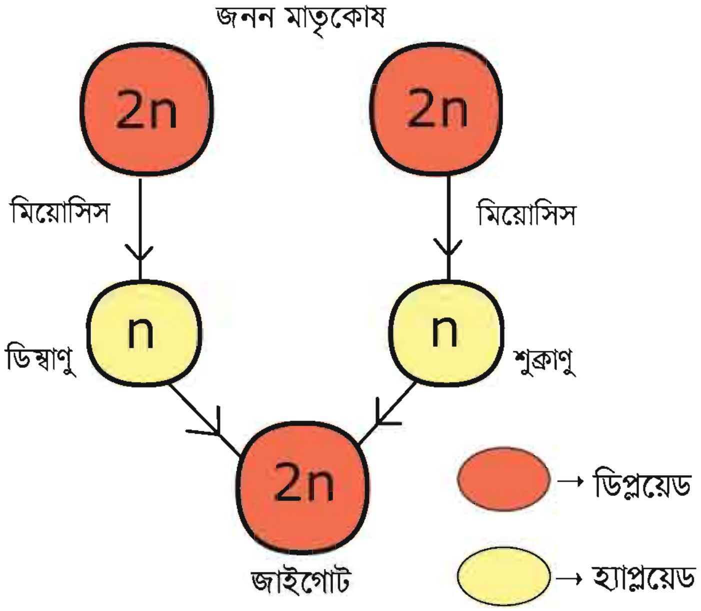

চিত্র 3.09: কোষ বিভাজনের মাধ্যমে জাইগোট সৃষ্টি

মিয়োসিস প্রধানত জীবের জনন কোষ বা গ্যামেট সৃষ্টির সময় জনন মাতৃকোষে ঘটে। সপুষ্পক উদ্ভিদের পরাগধানী এবং ডিম্বকের মধ্যে এবং উন্নত প্রাণিদেহের শুক্রাশয়ে এবং ডিম্বাশয়ের মধ্যে মিয়োসিস ঘটে। মস ও ফার্নজাতীয় উদ্ভিদের ডিপ্লয়েড মাতৃকোষ থেকে যখন হ্যাপ্লয়েড রেণু উৎপন্ন হয়, তখন জাইগোটে এ ধরনের বিভাজন ঘটে।

মিয়োসিস বিভাজনের সময় একটি কোষ পর পর দুবার বিভাজিত হয়। প্রথম বিভাজনকে প্রথম মিয়োটিক বিভাজন বা মিয়োসিস-1 এবং দ্বিতীয় বিভাজনকে দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন বা মিয়োসিস-2

বলা হয়। প্রথম বিভাজনের সময় অপত্য কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেকে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিভাজনটি মাইটোসিসের অনুরূপ, অর্থাৎ ক্রোমোজোম সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয় না।।

বাস্তবে মাঝে মাঝে হঠাৎ করে ক্রোমোজোমের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটতে পারে। যেমন: ব্যাঙের একটি প্রজাতি *Xenopus tropicalis*-এর সম্পূর্ণ ক্রোমোজোম সেট দ্বিগুণ হয়ে *Xenopus laevis* প্রজাতির উৎপত্তি ঘটেছে। প্ল্যান্টি রাজ্যের বিভিন্ন সদস্যের (যেমন: আলু) দেহকোষে (জননকোষে নয়) এই প্রক্রিয়া একটি স্বাভাবিক ঘটনা। অনেক সময় আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করার জন্য উদ্ভিদের এই জাত বেছে নিই, এমনকি সেরকম জাত পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করি, কারণ তা আকারে তুলনামূলকভাবে বড় হয়। এসব জাত খাদ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে অধিকতর সহায়ক।

চিত্র 3.10: ব্যাঙ প্রজাতি *Xenopus tropicalis* (নিচে) এবং *Xenopus laevis* (উপরে)

ক্রোমোজোম বা জেনেটিক বস্তুর সমতা রক্ষা করা ছাড়াও জীনগত বৈচিত্র্য বজায় রাখা মিয়োসিসের একইরকম গুরুত্বপূর্ণ একটি অবদান। যৌন জনন করে এমন সকল জীবে মিয়োসিসের মাধ্যমে একইভাবে জিনগত বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। কোনো প্রজাতির টিকে থাকা বা না থাকা মূলত নির্ভর করে তার সদস্য জীবদের মধ্যে কতটা বৈচিত্র্য আছে, তার উপর। পরিবেশ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। সেইসব প্রজাতি টিকে থাকে, যাদের অন্তত কিছু সদস্যের মধ্যে সেই পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মতো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যদি কোনো প্রজাতির জীবদের মধ্যে বৈচিত্র্য কম থাকে তাহলে নতুন কোনো পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর মতো বৈশিষ্ট্য কারোর মধ্যে থাকার সম্ভাবনাও হবে কম। ফলে হয়তো পুরো প্রজাতিটাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর যদি কোনো প্রজাতির জীবদের মধ্যে বৈচিত্র্য বেশি থাকে, তাহলে নতুন কোনো পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর মতো বৈশিষ্ট্য কারো না কারো মধ্যে থাকার সম্ভাবনাও হবে বেশি। তখন যদি বড় কোনো বিপদও আসে, তবু তার অন্তত কিছু সদস্য বেঁচে যাবে। তাই মিয়োসিস কোনো জীবের জিনগত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে প্রজাতির টিকে থাকার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।

জীবের টিকে থাকার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দেয় বলেই মিয়োসিস বিভাজন বিবর্তিত হয়ে জীবজগতে নিজের স্থান করে নিয়েছে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

1. কোষ বিভাজন কী?
2. সমীকরণিক কোষ বিভাজন কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

1. মাইটোসিসের বিভিন্ন পর্যায়সমূহ চিহ্নিত চিত্রসহ বর্ণনা কর।
2. মাইটোসিস প্রক্রিয়ার গুরুত্ব আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. কোন ধাপে নিউক্লিয়াসটি আকারে বড় হয়?

ক. প্রোফেজ খ. মেটাফেজ
গ. এনাফেজ ঘ. টেলোফেজ

2. মিয়োসিসের কারণে কোষে—

i. ক্রোমোজোমের সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে
ii. হ্যাপ্লয়েড সংখ্যক গ্যামেট তৈরি হয়
iii. গুণাগুণের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাশের চিত্রের আলোকে 3 ও 4 নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

3. A চিত্রের কোষ বিভাজনে—

i. মাতৃকোষ ও নতুন সৃষ্ট কোষ সমগুণ সম্পন্ন থাকে
ii. নতুন কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের অর্ধেক থাকে
iii. ক্রোমোজোম মাত্র একবার বিভাজিত হয়

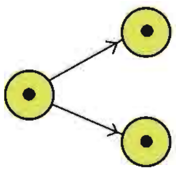
চিত্র- A

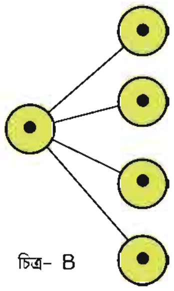
চিত্র- B

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

4. B চিত্রের বিভাজনটি A থেকে ব্যতিক্রম কারণ, এর ফলে—

ক. অপত্য জীবে ক্রোমোজোমের সংখ্যা ঠিক থাকে খ. ক্রোমোজোমের সংখ্যা বেড়ে যায়

গ. অস্বাভাবিক কোষ সৃষ্টি হয় ঘ. দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে

সৃজনশীল প্রশ্ন

1.

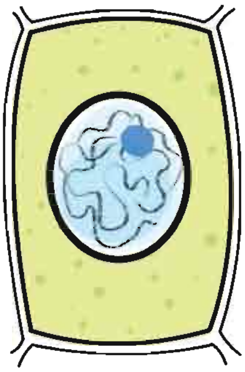

ধাপ A

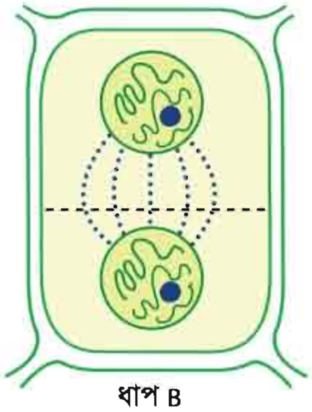

ধাপ B

ক. মাইটোসিস কোথায় ঘটে?

খ. মিয়োসিসকে হ্রাসমূলক বিভাজন বলা হয় কেন বুঝিয়ে লেখ?

গ. উদ্দীপকের B ধাপটিতে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে—ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে না ঘটলে জীবে কী সমস্যা হতে পারে বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

জীবনীশক্তি

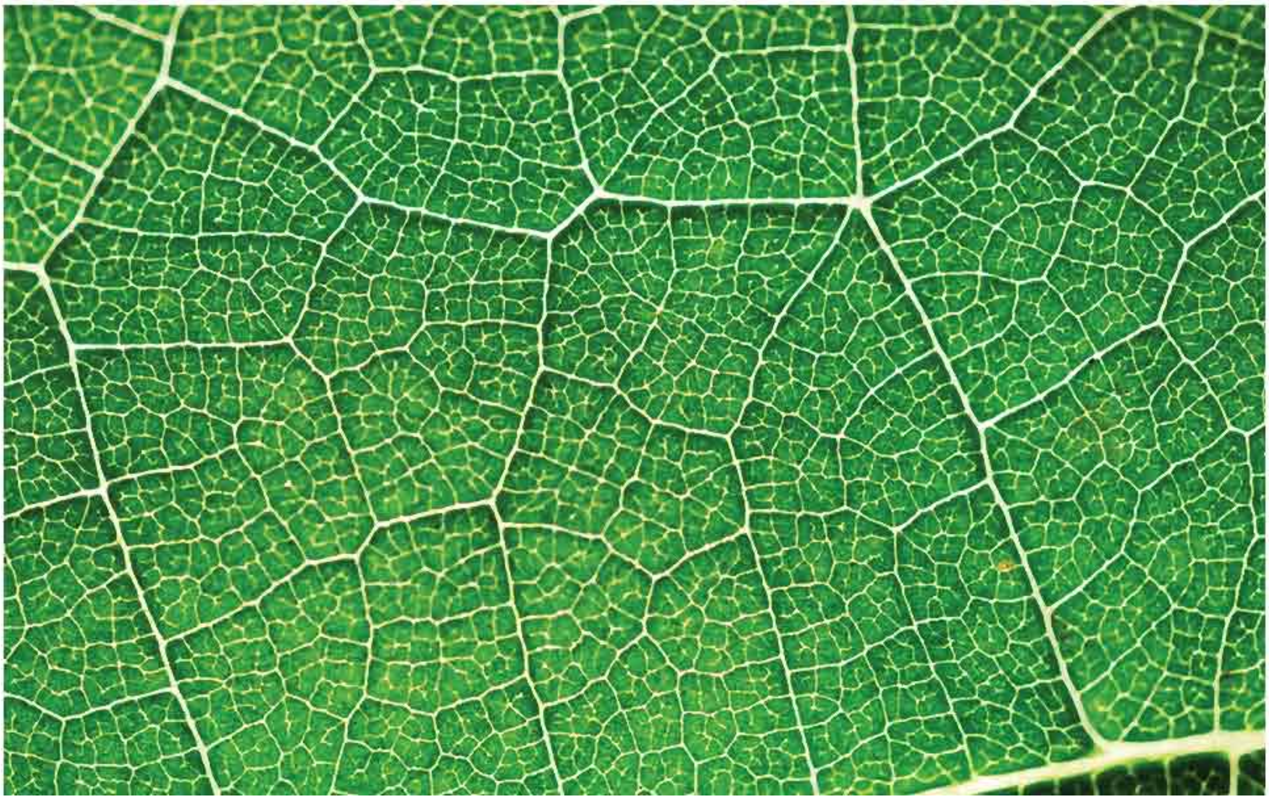

জীবন পরিচালনার জন্য জীবকোষে প্রতি মুহূর্তে হাজারো রকমের জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতে থাকে। এসব বিক্রিয়ার জন্য কমবেশি শক্তির প্রয়োজন হয়। পৃথিবীতে শক্তির মূল উৎস সূর্য। সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করে শর্করাজাতীয় খাদ্য তৈরি করে। প্রাণী কিংবা অসবুজ উদ্ভিদ সৌরশক্তিকে সরাসরি আবদ্ধ করে দৈহিক কাজে ব্যবহার করতে পারে না। জীবন পরিচালনার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, সে শক্তির জন্য তাদের কোনো না কোনোভাবে সবুজ উদ্ভিদের উপরেই নির্ভর করতে হয়। এসব বিষয় আলোচনা করাই জীবনীশক্তি বা বায়োএনার্জেটিক্স (Bioenergetics)-এর মূল উদ্দেশ্য। এই অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তাকারে জীবনীশক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- কোষে প্রধান শক্তির উৎস হিসেবে এটিপির (ATP) ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা প্রস্তুতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সালোকসংশ্লেষণে ক্লোরোফিল এবং আলোর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সালোকসংশ্লেষণের প্রভাবকের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব।
- সালোকসংশ্লেষণের উপর জীবের নির্ভরশীলতার কারণ মূল্যায়ন করতে পারব।
- শ্বসন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সবাত ও অবাত শ্বসনের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের মধ্যে তুলনা করতে পারব।
- সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিল ও আলোর অপরিহার্যতার পরীক্ষা করতে পারব।
- শ্বসন প্রক্রিয়ায় তাপ নির্গমনের পরীক্ষা করতে পারব।
- জীবের খাদ্য প্রস্তুতে উদ্ভিদের অবদান উপলব্ধি করতে পারব এবং উদ্ভিদের প্রতি সংবেদনশীল আচরণ করতে শিখব।

4.1 জীবনীশক্তি ও ATP-এর ভূমিকা

জীবনীশক্তি বা জৈবশক্তি (bioenergy) বলতে আমরা ভিন্ন বা বিশেষ কোনো শক্তিকে বুঝাই না। পদার্থবিজ্ঞানে শক্তির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা থেকে, এটি আলাদা কিছু নয়, শুধু জীবদেহ বা জৈব অণুর রাসায়নিক বন্ধন ছিন্ন করার মাধ্যমে প্রাপ্ত শক্তিকে এই নামে ডাকা হয় মাত্র। জীব প্রতিনিয়ত পরিবেশ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে, সংগৃহীত শক্তিকে একরূপ থেকে অন্যরূপে পরিবর্তিত করে, কখনো বা সঞ্চয় করে এবং শেষে সেই শক্তি আবার পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়।

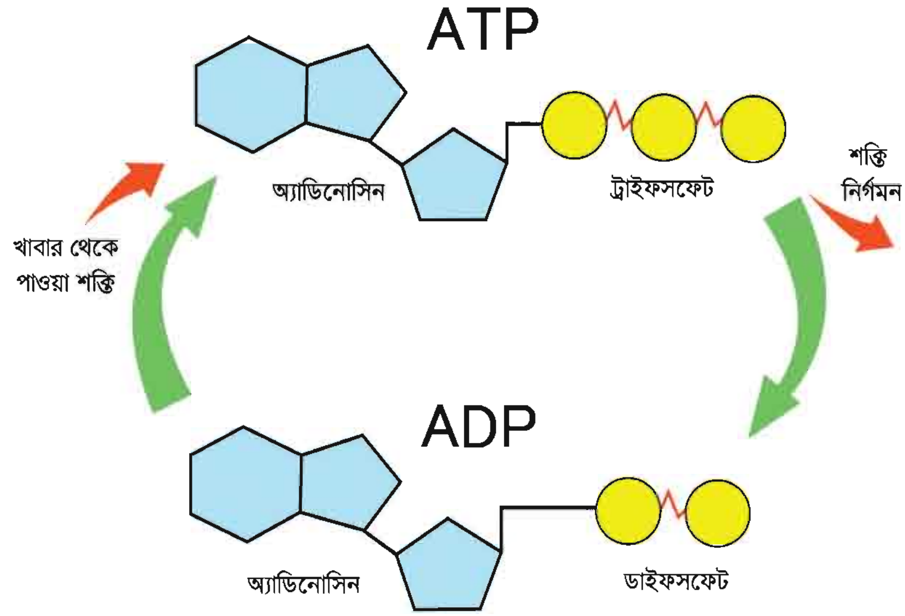

চিত্র 4.01: অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেটের (ADP) সাথে ফসফেট (P) যুক্ত হয়ে অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট (ATP) গঠিত হতে যতখানি শক্তি বাইরে থেকে সরবরাহ করা প্রয়োজন, ATP ভেঙে ADP ও ফসফেট উৎপাদন করলে প্রায় ততখানি শক্তি নির্গত হয়। জীবকোষে এই দুটি বিক্রিয়া চক্রাকারে চলতে থাকে।

DNA এবং RNA-এর গাঠনিক উপাদানগুলোর একটি হলো অ্যাডেনিন। এটি একটি নাইট্রোজেন বেস। এর সাথে পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট রাইবোজ সুগার অণু যুক্ত হয়ে তৈরি হয় অ্যাডিনোসিন। অ্যাডিনোসিন অণুর সাথে পর্যায়ক্রমে একটি, দুটি এবং তিনটি ফসফেট/ফসফোরিক এসিড গ্রুপ যুক্ত হয়ে যথাক্রমে অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট (AMP), অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট (ADP) এবং অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট (ATP) গঠন করে। এভাবে ফসফেট যুক্ত করতে বাইরে থেকে শক্তি দিতে হয়। এই বিক্রিয়ার নাম ফসফোরাইলেশন (phosphorylation)। আবার এর বিপরীত প্রক্রিয়ায়, ফসফেট গ্রুপ বিচ্ছিন্ন হলে শক্তি বের হয়ে আসে। এই বিক্রিয়ার নাম ডিফসফোরাইলেশন (dephosphorylation)। উল্লেখ্য, প্রতিমোল

ATP অণুর প্রান্তীয় ফসফেট গ্রুপে 7.3 কিলোক্যালরি (প্রায় 30.55 কিলোজুল) শক্তি জমা থাকতে পারে।

পরিবেশ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে তাকে কোষের তথা জীবদেহের ব্যবহার-উপযোগী রূপে পরিবর্তিত করার জন্য কাজ করে দুটি কোষীয় অঙ্গাণু: মাইটোকন্ড্রিয়া এবং প্লাস্টিড। উভয়েরই রয়েছে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম নামক একসেট বিশেষ জৈব অণু, যাদের কাজ হলো পুষ্টি উপাদান (যেমন: গ্লুকোজ) বা কোনো অন্তর্বর্তীকালীন অণুর শক্তিকে ATP-এর ফসফেট গ্রুপের বন্ধনশক্তি হিসেবে জমা করা। আবার, ATP-এর রাসায়নিক বন্ধন ভেঙে যে শক্তি বের হয়, সেই শক্তি দিয়ে জীবদেহের প্রতিটি জৈবনিক কাজ অর্থাৎ, মাংসপেশির সংকোচন থেকে ইন্দ্রিয়ানুভূতি, খাবার খাওয়া থেকে হজম করা, নিঃশ্বাস নেওয়া থেকে কথা বলা, চিৎকার করা থেকে হাসি-কান্না, দৈহিক বৃদ্ধি থেকে প্রজনন, দেহের তাপমাত্রা ঠিক রাখা থেকে শুরু করে দেহের প্রতিটি কোষের স্বাভাবিক আয়তন বজায় রাখা এর সবই সম্পন্ন হয়। আমরা যে খাবার খাই তা জারিত হয়, সেই জারণ থেকে নির্গত শক্তি দ্বারা ফসফোরাইলেশনের মাধ্যমে আবার সেই ভাঙা দুই টুকরা জোড়া লেগে ATP তৈরি হয়। শক্তির প্রয়োজন হলে তা আবার ভাঙে। তারপর খাদ্য থেকে শক্তি নিয়ে আবার জোড়া লাগে। এ যেন এক রিচার্জেবল ব্যাটারি। ATP শক্তি জমা করে রাখে এবং প্রয়োজন অনুসারে অন্য বিক্রিয়ায় শক্তি সরবরাহ করে। এজন্য ATP-কে অনেক সময় 'জৈবমুদ্রা' বা 'শক্তি মুদ্রা' (Biological coin or energy coin) বলা হয়।

4.2 সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis)

সবুজ উদ্ভিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো যে এরা সূর্যালোকের উপস্থিতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) এবং পানি থেকে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করাজাতীয় খাদ্য তৈরি করে। সবুজ উদ্ভিদে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য তৈরি হওয়ার এ প্রক্রিয়াকে সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় আলোকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সবুজ উদ্ভিদে প্রস্তুত খাদ্য উদ্ভিদ নিজে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় বিপাকীয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে ব্যবহার করে এবং অবশিষ্ট খাদ্য ফল, মূল, কাণ্ড অথবা পাতায় সঞ্চিত রাখে। উদ্ভিদে সঞ্চিত এই খাদ্যের উপরেই মানবজাতি ও অন্যান্য জীবজন্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে।

সালোকসংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো হলো: ক্লোরোফিল, আলো, পানি এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড। সালোকসংশ্লেষণ একটি জৈব রাসায়নিক (biochemical) বিক্রিয়া, যেটি এরকম:

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলো}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2$$

পাতার মেসোফিল টিস্যু সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার প্রধান স্থান। স্থলজ সবুজ উদ্ভিদ মাটি থেকে মূলের মাধ্যমে পানি শোষণ করে পাতার মেসোফিল টিস্যুর ক্লোরোপ্লাস্টে পৌঁছায় এবং স্টোমা বা পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বায়ু থেকে CO_2 গ্রহণ করে, যা মেসোফিল টিস্যুর ক্লোরোপ্লাস্টে পৌঁছে। জলজ উদ্ভিদ পানিতে

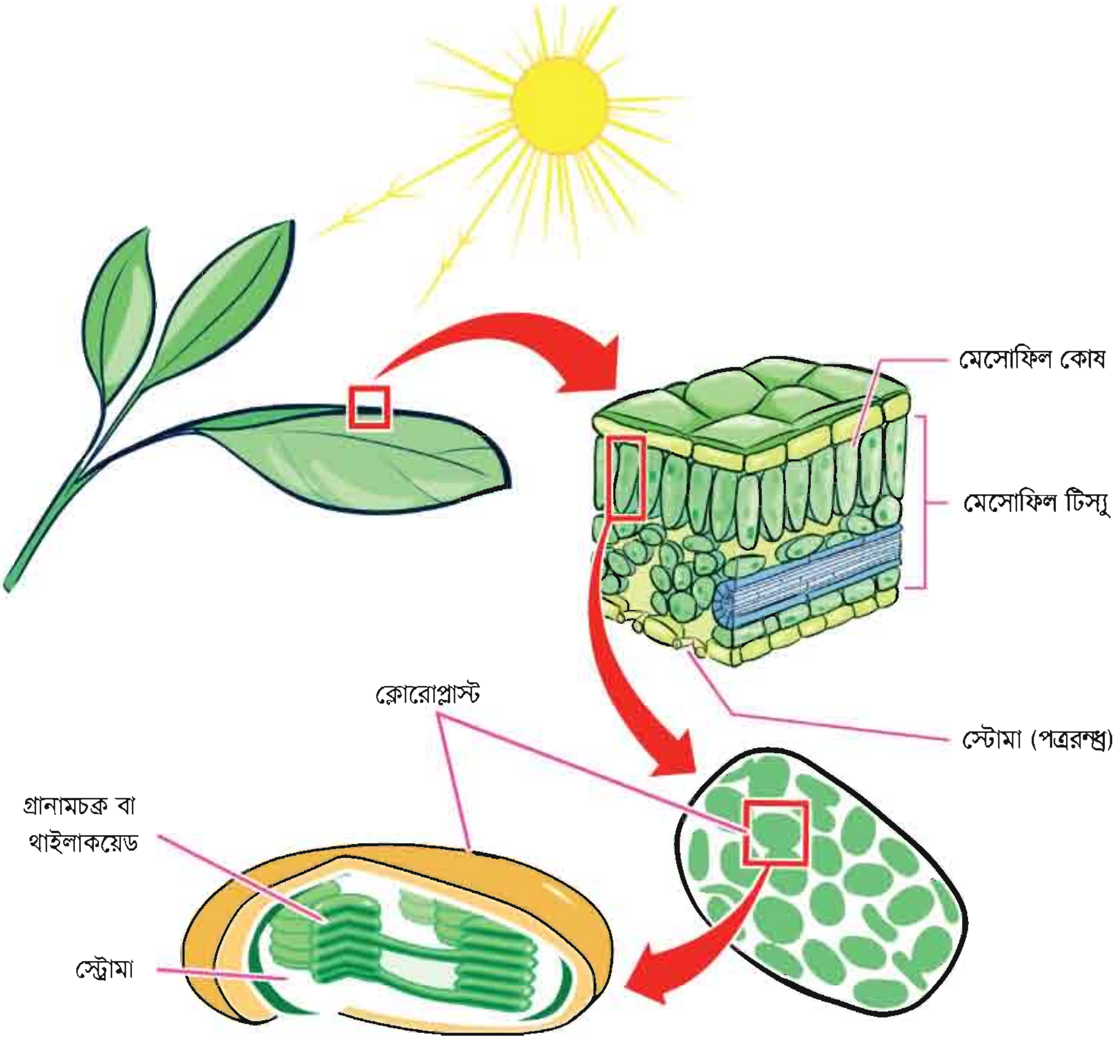
মেসোফিল কোষ
মেসোফিল টিস্যু
স্টোমা (পত্ররন্ধ্র)
ক্লোরোপ্লাস্ট
গ্রানামচক্র বা থাইলাকয়েড
স্ট্রোমা

চিত্র 4.02: সালোকসংশ্লেষণ

দ্রবীভূত CO_2 গ্রহণ করে। বায়ুমণ্ডলে 0.03% এবং পানিতে 0.3% CO_2 আছে, তাই জলজ উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষণের হার স্থলজ উদ্ভিদ থেকে বেশি।

অক্সিজেন এবং পানি সালোকসংশ্লেষণের উপজাত দ্রব্য (by-product)। এটি একটি জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া (oxidation-reduction process)। এ প্রক্রিয়ায় H_2O জারিত হয় এবং CO_2 বিজারিত হয়।

4.2.1 সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া

সালোকসংশ্লেষণ একটি জটিল এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়া। 1905 সালে ইংরেজ শারীরতত্ত্ববিদ ব্ল্যাকম্যান (Blackman) এ প্রক্রিয়াকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করেন। পর্যায় দুটি হলো, আলোকনির্ভর পর্যায় (Light dependent phase) এবং আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় (Light independent phase)।

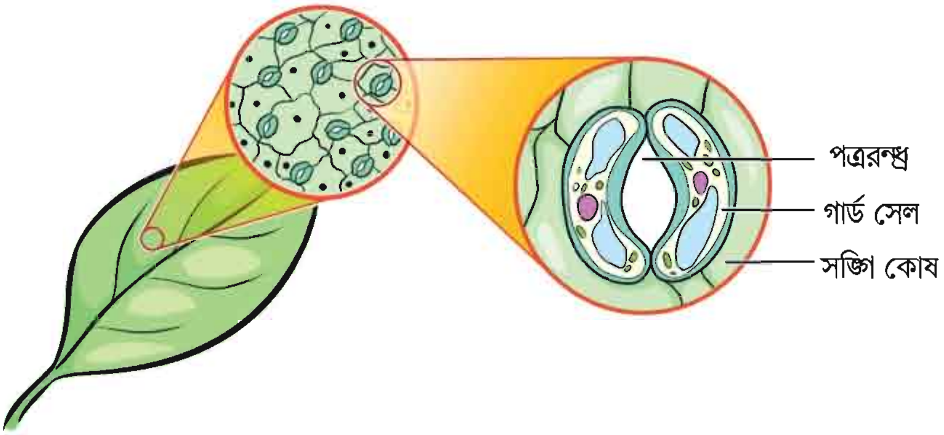

চিত্র 4.03: একটি পত্ররন্ধ্র বা স্টোমা

(a) আলোকনির্ভর পর্যায় (Light dependent phase)

আলোকনির্ভর পর্যায়ের জন্য আলো অপরিহার্য। এ পর্যায়ে সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় ATP (অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট), NADPH (বিজরিত নিকোটিনামাইড অ্যাডনিন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট) এবং H^+ (হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রোটন) উৎপন্ন হয়। এই রূপান্তরিত শক্তি ATP-এর মধ্যে সঞ্চিত হয়। এই বিক্রিয়ায় ক্লোরোফিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্লোরোফিল অণু আলোকরশ্মির ফোটন (photon) শোষণ করে এবং শোষণকৃত ফোটন থেকে শক্তি সঞ্চয় করে ADP (অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট) অজৈব ফসফেট (Pi = inorganic phosphate)-এর সাথে মিলিত হয়ে ATP তৈরি করে। ATP তৈরির এই প্রক্রিয়াকে ফটোফসফোরাইলেশন (photophosphorylation) বলে।

$$\text{ADP} + \text{Pi} \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলো}} \text{ATP}$$

সূর্যালোক এবং ক্লোরোফিলের সাহায্যে পানি বিয়োজিত হয়ে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও ইলেকট্রন উৎপন্ন হয়। এ প্রক্রিয়াকে পানির ফটোলাইসিস (photolysis) বলা হয়।

(b) আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় বা অন্ধকার পর্যায় (Light independent phase বা dark phase)

আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে আলোর প্রত্যক্ষ প্রয়োজন পড়ে না, তবে আলোর উপস্থিতিতেও এই প্রক্রিয়া চলতে পারে। বায়ুমন্ডলের CO_2 পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে কোষে প্রবেশ করে। আলোক পর্যায়ে তৈরি ATP, NADPH এবং H+ এর সাহায্যে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে CO_2 বিজরিত হয়ে কার্বোহাইড্রেটে পরিণত হয়। সবুজ উদ্ভিদে CO_2 বিজারণের তিনটি গতিপথ শনাক্ত করা হয়েছে যেগুলো হচ্ছে ক্যালভিন চক্র, হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র এবং ক্রেসুলেসিয়ান এসিড বিপাক। এদের মধ্যে প্রথম দুটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিচে দেওয়া হলো।

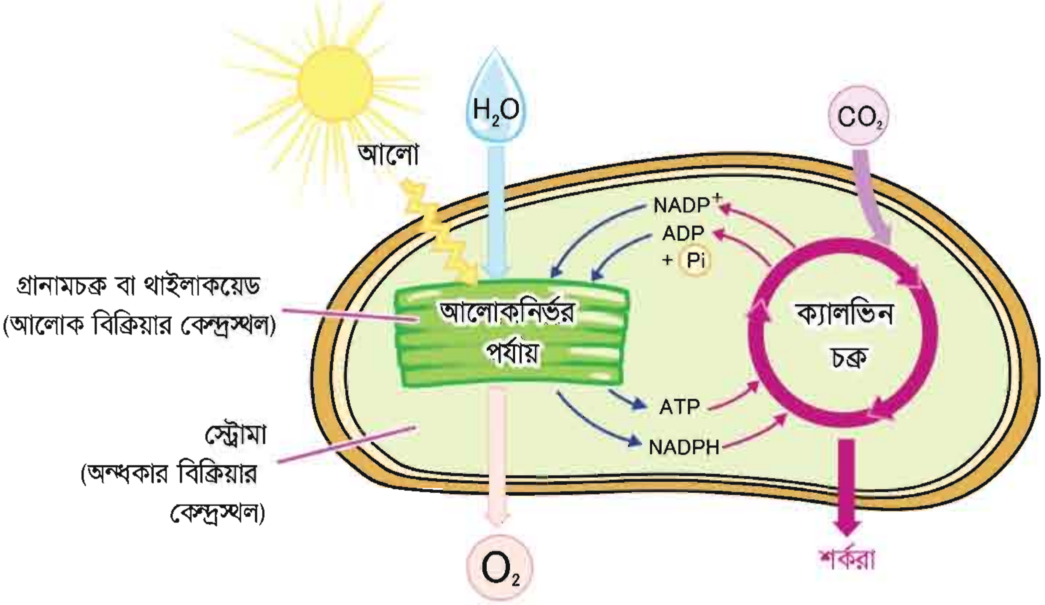
আলো
H_2O
CO_2
$NADP^+$
ADP
+ Pi
গ্রানামচক্র বা থাইলাকয়েড
(আলোক বিক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল)
আলোকনির্ভর পর্যায়
ক্যালভিন চক্র
স্ট্রোমা
(অন্ধকার বিক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল)
ATP
NADPH
O_2
শর্করা

চিত্র 4.04: C_3 উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষণের দুটি ধাপ— আলোকনির্ভর পর্যায় ও ক্যালভিন চক্র

(i) ক্যালভিন চক্র বা C_3 গতিপথ (Calvin cycle বা C_3 cycle): CO_2 আত্তীকরণের এ গতিপথকে আবিষ্কারকদের নামানুসারে ক্যালভিন—বেনসন ও ব্যাশাম চক্র বা সংক্ষেপে ক্যালভিন চক্র বলা হয়। ক্যালভিন তার এ আবিষ্কারের জন্য 1961 সালে নোবেল পুরস্কার পান। অধিকাংশ উদ্ভিদে এই প্রক্রিয়ায় শর্করা তৈরি হয় এবং প্রথম স্থায়ী পদার্থ 3-কার্বনবিশিষ্ট ফসফোগ্লিসারিক এসিড বলে এই ধরনের উদ্ভিদকে বলে C_3 উদ্ভিদ।

(ii) হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র বা C_4 গতিপথ (Hatch and Slack cycle বা C_4 cycle): অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানী M.D. Hatch ও C.R. Slack (1966 সালে) CO_2 বিজারণের আর একটি গতিপথ আবিষ্কার করেন। এই গতিপথের প্রথম স্থায়ী পদার্থ হলো 4-কার্বনবিশিষ্ট অক্সালো এসিটিক এসিড তাই, একে C_4 গতিপথ বলে।

C_4 উদ্ভিদে একই সাথে হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র এবং ক্যালভিন চক্র পরিচালিত হতে দেখা যায়। C_3 উদ্ভিদের তুলনায় C_4 উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষণের হার বেশি এবং উৎপাদন ক্ষমতাও বেশি। সাধারণত ভুট্টা, আখ, অন্যান্য ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ, মুথা ঘাস, অ্যামারন্যথাস (*Amaranthus*) ইত্যাদি উদ্ভিদে C_4 পরিচালিত হয়।

4.2.2 সালোকসংশ্লেষণে ক্লোরোফিলের ভূমিকা

পাতার ক্লোরোফিলের পরিমাণের সাথে সালোকসংশ্লেষণের হারের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে, কারণ একমাত্র ক্লোরোফিলই আলোকশক্তি গ্রহণ করতে পারে। পুরাতন ক্লোরোপ্লাস্ট নষ্ট হয়ে যায় এবং তখন নতুন ক্লোরোপ্লাস্ট সংশ্লেষিত হয়। নতুন ক্লোরোপ্লাস্ট এবং ক্লোরোপ্লস্টের উপাদান সৃষ্টির হারের উপর সালোকসংশ্লেষণের হার নির্ভরশীল। সালোকসংশ্লেষণ ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য ক্লোরোপ্লাস্টের বিভিন্ন

উপাদান দ্রুত এবং প্রচুর পরিমাণে পুনর্গঠিত হওয়া প্রয়োজন। তবে কোষে খুব বেশি পরিমাণ ক্লোরোফিল থাকলে এনজাইমের অভাব দেখা দেয় এবং সালোকসংশ্লেষণ কমে যায়।

4.2.3 সালোকসংশ্লেষণে আলোর ভূমিকা

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলোর গুরুত্ব অপরিসীম। পানি এবং CO_2 থেকে শর্করা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস আলো। সূর্যালোক ক্লোরোফিল সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে। সূর্যালোকের প্রভাবেই পত্ররন্ধ্র উন্মুক্ত হয়, CO_2 পাতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে এবং খাদ্য প্রস্তুতকরণে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু পাতায় যেটুকু আলো পড়ে, তার অতি সামান্য অংশই সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। আবার আলোকবর্ণালির লাল, নীল, কমলা এবং বেগুনি অংশটুকুতেই সালোকসংশ্লেষণ ভালো হয়। সবুজ কিংবা হলুদ আলোতে সালোকসংশ্লেষণ ভালো হয় না। একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আলোর পরিমাণ বাড়লে সালোকসংশ্লেষণের হারও বেড়ে যায়। কিন্তু আলোর পরিমাণ অত্যধিক বেড়ে গেলে পাতার ভিতরকার এনজাইম নষ্ট হয়ে যায়, ক্লোরোফিল উৎপাদন কম হয়। ফলে সালোকসংশ্লেষণের হারও কমে যায়। সাধারণত 400 nm থেকে 480 nm এবং 680 nm (ন্যানোমিটার) তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আলোতে সালোকসংশ্লেষণ সবচেয়ে ভালো হয়।

4.2.4 সালোকসংশ্লেষণের প্রভাবক

আলো এবং ক্লোরোফিল ছাড়াও সালোকসংশ্লেষণ আরও কতগুলো প্রভাবক দিয়ে প্রভাবিত হয়। প্রভাবকগুলো কিছু বাহ্যিক এবং কিছু অভ্যন্তরীণ। প্রভাবকের উপস্থিতি, অনুপস্থিতি, পরিমাণের কম-বেশি সলোকসংশ্লেষণের পরিমাণও কম-বেশি করে থাকে। প্রভাবকগুলো হচ্ছে:

(a) বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ

(i) আলো: এ সম্পর্কে ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

(ii) কার্বন ডাই-অক্সাইড: কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়া সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া চলতে পারে না। এ প্রক্রিয়ায় যে খাদ্য প্রস্তুত হয় তা কার্বন ডাই-অক্সাইড বিজারণের ফলেই হয়ে থাকে। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ 0.03 ভাগ, কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ শতকরা এক ভাগ পর্যন্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করতে পারে। তাই বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সালোকসংশ্লেষণের পরিমাণও বেড়ে যায়। তবে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ খুব বেশি মাত্রায় বেড়ে গেলে পাতার মেসোফিল টিস্যুর কোষের অম্লত্বও বেড়ে যায় এবং পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়।

(iii) তাপমাত্রা: সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা বিশেষ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। সাধারণত

অতি নিম্ন তাপমাত্রা (0^0 সেলসিয়াস, এর কাছাকাছি) এবং অতি উচ্চ তাপমাত্রায় (45^0 সেলসিয়াসের উপরে) এ প্রক্রিয়া চলতে পারে না। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য পরিমিত (optimum) তাপমাত্রা হলো 22^0 সেলসিয়াস থেকে 35^0 সেলসিয়াস পর্যন্ত। তাপমাত্রা 22^0 সেলসিয়াসের কম বা 35^0 সেলসিয়াসের বেশি হলে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়।

(iv) পানি: সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা তৈরির উদ্দেশ্যে CO_2 কে বিজারণের জন্য প্রয়োজনীয় $H+$ (হাইড্রোজেন আয়ন) পানি থেকেই আসে। পানির ঘাটতি হলে পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষেও স্ফীতি হারিয়ে রন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাতাস থেকে CO_2 অনুপ্রবেশ বাধাগ্রস্ত হয়। অতিরিক্ত পানি ঘাটতির ফলে এনজাইমের সক্রিয়তা বিনষ্ট হয়ে সালোকসংশ্লেষণ বাধাগ্রস্থ হতে পারে।

(v) অক্সিজেন: বাতাসে অক্সিজেনের ঘনত্ব বেড়ে গেলে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায় আর অক্সিজেনের ঘনত্ব কমে গেলে সালোককসংশ্লেষণের হার বেড়ে যায়। তবে অক্সিজেনবিহীন পরিবেশে সালোকসংশ্লেষণ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে।

(vi) খনিজ পদার্থ: ক্লোরোফিলের প্রধান উপকরণ হচ্ছে নাইট্রোজেন এবং ম্যাগনেসিয়াম। লোহার অনুপস্থিতিতে পাতা ক্লোরোফিল সংশ্লেষণ করতে পারে না, ফলে পাতা হলুদ হয়ে যায়। কাজেই মাটিতে এসব খনিজের অভাব হলে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়।

(vii) রাসায়নিক পদার্থ: বাতাসে ক্লোরোফর্ম, হাইড্রোজেন সালফাইড, মিথেন বা কোনো বিষাক্ত গ্যাস থাকলে সালোকসংশ্লেষণে ব্যাঘাত ঘটে বা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

(b) অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ

(i) ক্লোরোফিল: এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

(ii) পাতার বয়স ও সংখ্যা: একেবারে কচি পাতা এবং একেবারে বয়স্ক পাতায় ক্লোরোফিলের পরিমাণ কম থাকে বলে সালোকসংশ্লেষণ কম হয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ক্লোরোপ্লাস্টের সংখ্যাও বেশি হয়। মধ্যবয়সী পাতায় সবচেয়ে বেশি সালোকসংশ্লেষণ ঘটে। পাতার সংখ্যা বেশি হলে সালোকসংশ্লেষণ বেশি হয়।

(iii) শর্করার পরিমাণ: সালোকসংশ্লেষণ চলাকালীন শর্করার পরিবহন কম হলে তা সেখানে জমা হয়ে থাকে। বিকেলে পাতায় বেশি শর্করা জমা হয় বলে সালোকসংশ্লেষণের গতি মন্থর হয়।

(iv) পটাশিয়াম: পটাশিয়ামের অভাবে সালোকসংশ্লেষণের পরিমাণ বেশ কমে যেতে দেখা যায়। কারণ, সম্ভবত এ প্রক্রিয়ায় পটাশিয়াম অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

(v) এনজাইম: সালোকসংশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের এনজাইমের প্রয়োজন হয়।

4.2.5 জীবজগতে সালোকসংশ্লেষণের গুরুত্ব

সালোকসংশ্লেষণ বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া। এ বিক্রিয়ার মাধ্যমেই সূর্যালোক এবং জীবনের মধ্যে সেতুবন্ধ সৃষ্টি হয়েছে। নিচের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে সালোকসংশ্লেষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে। বিশ্বজুড়ে এ বিক্রিয়ার ব্যাপকতা লক্ষ করে কোনো কোনো বিজ্ঞানী এ প্রক্রিয়াকে জৈব রাসায়নিক কারখানা নামে অভিহিত করেছেন।

সমস্ত শক্তির উৎস হলো সূর্য। একমাত্র সবুজ উদ্ভিদই সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করে খাদ্যের মধ্যে আবদ্ধ করতে পারে। কোনো প্রাণীই তার নিজের খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। আমরা খাদ্য হিসেবে ভাত, রুটি, ফলমূল, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি যা-ই গ্রহণ করি না কেন, তার সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবুজ উদ্ভিদ থেকে পেয়ে থাকি। কাজেই খাদ্যের জন্য সমগ্র প্রাণিকুল সবুজ উদ্ভিদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল, আর সবুজ উদ্ভিদ এ খাদ্য প্রস্তুত করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায়। কাজেই বলা যায়, পৃথিবীর সকল উদ্ভিদ এবং প্রাণীর খাদ্য প্রস্তুত হয় সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়, বিশেষ করে O_2 ও CO_2-এর সঠিক অনুপাত রক্ষায় সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। বায়ুতে অক্সিজেন গ্যাসের পরিমাণ 20.95 ভাগ এবং CO_2 গ্যাসের পরিমাণ 0.033 ভাগ।

পৃথিবীতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং জীবনযাপনের জন্য বায়ুতে এ দুটি গ্যাসের পরিমাণ স্বাভাবিক পর্যায়ে থাকতে হয়। এ পরিমাণের তারতম্য ঘটলে বায়ুমণ্ডল জীবজগতের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠবে। আমরা জানি, সব জীবেই (উদ্ভিদ ও প্রাণী) সব সময়ের জন্য শ্বসনক্রিয়া চলতে থাকে। শ্বসন প্রক্রিয়ায় জীব O_2 গ্রহণ করে এবং CO_2 ত্যাগ করে। কেবল শ্বসন প্রক্রিয়া চলতে থাকলে বায়ুমণ্ডলে O_2 গ্যাসের স্বল্পতা এবং CO_2 গ্যাসের আধিক্য দেখা দিত। কিন্তু সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডল থেকে CO_2 গ্রহণ করে এবং O_2 ত্যাগ করে বলে এখনও বায়ুমণ্ডলে O_2 ও CO_2 গ্যাসের সঠিক অনুপাত রক্ষিত হচ্ছে। তবে বর্তমানে অধিক হারে বন-জঙ্গল ধ্বংস করার ফলে বায়ুমণ্ডলে এ দুটি গ্যাসের অনুপাত নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, কাজেই আমাদেরকে অবশ্যই অধিক হারে গাছ লাগাতে হবে।

মানবসভ্যতার অগ্রগতি অনেকাংশে সালোকসংশ্লেষণের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। অন্ন, বস্ত্র, শিল্পসামগ্রী (যেমন নাইলন, রেয়ন, কাগজ, সেলুলোজ, কাঠ, রাবার), ঔষধ (যেমন কুইনাইন, মরফিন), জ্বালানি কয়লা, পেট্রল, গ্যাস প্রভৃতি উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়। তাই সালোকসংশ্লেষণ না ঘটলে মানবসভ্যতা ধ্বংস হবে, বিলুপ্ত হবে জীবজগৎ। সুতরাং সালোকসংশ্লেষণ জীবজগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

শুধু তা-ই নয়, আজ থেকে প্রায় 5 বিলিয়ন বছর আগে যখন পৃথিবী সৃষ্টি হয়, তখন এখানে কোনো গ্যাসীয় অক্সিজেন ছিল না। আদি উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন তৈরি করে এই পৃথিবীকে আমাদের জন্য বাসযোগ্য করে দিয়েছিল।

একক কাজ

কাজ: সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলোর অপরিহার্যতার পরীক্ষা।

পরীক্ষার উপকরণ: টবে লাগানো সবুজ পাতাবিশিষ্ট একটি গাছ, কালো কাগজ, 95% ইথাইল অ্যালকোহল, 1% আয়োডিন দ্রবণ, ক্লিপ, পেট্রিডিস, টেস্ট টিউব, বিকার, বুনসেন বার্নার বা স্পিরিট ল্যাম্প, ড্রপার, ফোরসেপ।

পদ্ধতি: টবে লাগানো গাছটিকে 48 ঘণ্টার জন্য অন্ধকার কোনো স্থানে রেখে দিতে হবে যেন পাতাগুলো শ্বেতসারবিহীন হয়ে পড়ে। অন্ধকারে রাখা গাছটির একটি পাতার একাংশের উভয় দিক কালো কাগজ দিয়ে আবৃত করে ক্লিপ দিয়ে আটকে দিতে হবে যেন ঐ অংশে সূর্যালোক প্রবেশ করতে না পারে। এরপর গাছসহ টবটিকে সূর্যালোকে রেখে দিতে হবে। কয়েক (6-7) ঘণ্টা পর গাছ থেকে পাতাটিকে ছিঁড়ে এনে কালো কাগজ খুলে ফেলে পানিতে কয়েক মিনিট সিদ্ধ করতে হবে। এরপর পাতাটিকে ক্লোরোফিলমুক্ত করার জন্য 95% ইথাইল অ্যালকোহলে সিদ্ধ করতে হবে, যতক্ষণ না পাতাটি বিবর্ণ হয়। এবার সিদ্ধ বর্ণহীন পাতাটিকে অ্যালকোহল থেকে তুলে পানিতে ধুয়ে নিয়ে আয়োডিন দ্রবণে ডুবাতে হবে। দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য অ্যালকোহলে সিদ্ধ করার সময় সরাসরি তাপ না দিয়ে টেস্ট টিউবে অ্যালকোহল এবং পাতা নিয়ে টেস্ট টিউবকে বিকারের পানিতে রেখে তাপ দিতে হবে।

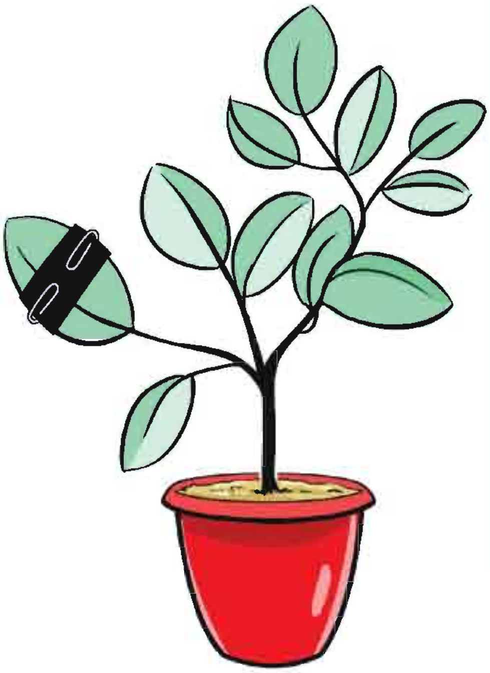
চিত্র 4.05: সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলোর অপরিহার্যতার পরীক্ষা

পর্যবেক্ষণ: আয়োডিন দ্রবণ থেকে উঠিয়ে আনলে দেখা যাবে, পাতাটির কালো কাগজ দিয়ে আবৃত অংশ ছাড়া বাকি সবটুকু অংশই নীল বা গাঢ় বেগুনি বা কালো বর্ণ ধারণ করেছে।

সিদ্ধান্ত: শ্বেতসার এবং আয়োডিন দ্রবণের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে শ্বেতসার নীল বা গাঢ় বেগুনি বা কালো বর্ণ ধারণ করবে। কালো কাগজ দিয়ে আবৃত অংশে সূর্যালোক পৌঁছাতে পারে না, ফলে পাতার ঐ অংশে সালোকসংশ্লেষণ হয় না বলে শ্বেতসারও প্রস্তুত হয় না। শ্বেতসার প্রস্তুত হয় না বলে পাতার আবৃত অংশ আয়োডিন দ্রবণে বিক্রিয়া করে নীল বা গাঢ় বেগুনি বা কালো বর্ণ ধারণ

করে না। কিন্তু পাতাটির অনাবৃত অংশে সূর্যালোক পড়েছিল বলে ঐসব সথানে শ্বেতসার উৎপন্ন হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় সালোকসংশ্লেষণ তথা শ্বেতসার প্রস্তুতের জন্য আলো অপরিহার্য।

সতর্কতা:

(a) পরীক্ষার পূর্বে টবের গাছটি যেন বেশ কিছু সময়ের জন্য অন্ধকারে রাখা হয়।
(b) কালো কাগজ এমন হতে হবে যেন তার মধ্য দিয়ে সূর্যালোক প্রবেশ করতে না পারে।
(c) পরীক্ষা চলাকালীন কমপক্ষে 6-7 ঘণ্টা পূর্বে টবটিকে সূর্যালোকে রাখতে হবে।
(d) অ্যালকোহলে পাতাটিকে সিদ্ধ করার সময় সরাসরি তাপ না দেওয়াই ভালো।

একক কাজ

কাজ: সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিলের অপরিহার্যতার পরীক্ষা।

পরীক্ষার উপকরণ: ম্যানিহট বা পাতাবাহার উদ্ভিদের নানা বর্ণের পাতা, অ্যালকোহল, আয়েডিন দ্রবণ, পানি, পেট্রিডিস, টেস্ট টিউব, বুনসেন বার্নার, ড্রপার, বিকার।

পদ্ধতি: দুপুরের দিকে উদ্ভিদের একটি বাহারি পাতা এনে এর সবুজ অংশটুকু চিহ্নিত করে পাতাটিকে কয়েক মিনিট পানিতে সিদ্ধ করতে হবে। এরপর পানি থেকে পাতাটিকে তুলে নিয়ে অ্যালকোহলে সিদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ না পাতাটি বিবর্ণ হয়। এবার পাতাটিকে তুলে পানিতে ধুয়ে নিয়ে আয়োডিন দ্রবণে ডুবাতে হবে। দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য অ্যালকোহলে সিদ্ধ করার সময় সরাসরি তাপ না দিয়ে টেস্ট টিউবে অ্যালকোহল এবং পাতা নিয়ে টেস্ট টিউবকে বিকারের পানিতে রেখে তাপ দিতে হবে।

পর্যবেক্ষণ: আয়োডিন দ্রবণে ডুবানোর পর দেখা যাবে পাতার কেবল সবুজ অংশই নীল বা গাঢ় বেগুনি বা কালো হয়েছে।

সিদ্ধান্ত: ক্লোরোফিল থাকায় কেবল সবুজ অংশই সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে শর্করা প্রস্তুত করেছে। ক্লোরোফিল না থাকায় অসবুজ (কমলা বা হলুদ) অংশে শর্করা প্রস্তুত হয়নি। সবুজ অংশে শর্করা ছিল বলেই আয়োডিন দ্রবণে ঐ অংশ নীল বা গাঢ় বেগুনি বা কালো হয়েছে।

সতর্কতা: অ্যালকোহলে পাতাটিকে সিদ্ধ করার সময় সরাসরি তাপ না দেওয়াই ভালো।

4.3 শ্বসন (Respiration)

আগের শ্রেণিতে তোমরা শ্বসন প্রক্রিয়া কাকে বলে এবং শ্বসনের ফলে যে দেহের বৃদ্ধিসাধন হয় এবং দেহ শক্তি পায়, সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে জেনেছ। এ অধ্যায়ে শ্বসন সম্পর্কে আরও একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

জীবের জীবন ধারণ অর্থাৎ চলন, ক্ষয়পুরণ, বৃদ্ধি, জনন প্রভৃতি জৈবিক কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। আমরা আগেই জেনেছি এ শক্তির প্রধান উৎস হলো সূর্যালোক। সালোকসংশ্লেষণের সময় উদ্ভিদ সৌরশক্তিকে শর্করা জাতীয় খাদ্যবস্তুর মধ্যে স্থিতি শক্তিরূপে (Potential energy) সঞ্চয় করে রাখে। খাদ্যের মধ্যে সঞ্চিত এই ধরনের শক্তি জীব তার জীবন ধারণের জন্য সরাসরি ব্যবহার করতে পারে না। শ্বসনের সময় জীবদেহে এই স্থিতি শক্তি রাসায়নিক শক্তি (ATP) হিসেবে তাপরূপে মুক্ত হয় এবং জীবের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়। শকর্রাজাতীয় খাদ্যবস্তু ছাড়াও প্রোটিন, ফ্যাট এবং বিভিন্ন জৈব এসিড শ্বসনিক বস্তুরূপে ব্যবহৃত হয়। জীবদেহে এই জটিল যৌগগুলো প্রথমে ভেঙে সরল যৌগে পরিণত হয় এবং পরে জারিত হয়ে রাসায়নিক শক্তিতে (ATP) রূপান্তরিত হয়। সাধারণ তাপমাত্রায় জীবদেহের প্রতিটি কোষে দিবারাত্রি 24 ঘণ্টাই শ্বসন চলতে থাকে। তবে উদ্ভিদের বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে (ফুল ও পাতার কুঁড়ি, অঙ্কুরিত বীজ, মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগ) শ্বসন ক্রিয়ার হার অনেক বেশি। সজীব কোষের সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকন্ড্রিয়াতে শ্বসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এ জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীবদেহ যৌগিক খাদ্যদ্রব্য জারিত করে সরল দ্রব্যে পরিণত করে এবং শক্তি উৎপন্ন করে।

4.3.1 শ্বসনের প্রকারভেদ

শ্বসনের সময় অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে শ্বসনকে দুভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলো হচ্ছে সবাত শ্বসন ও অবাত শ্বসন।

সবাত শ্বসন (Aerobic respiration): যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় এবং শ্বসনিক বস্তু (শর্করা, প্রোটিন, লিপিড, বিভিন্ন ধরনের জৈব এসিড) সম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে CO_2, H_2O এবং বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে, তাকে সবাত শ্বসন বলে। সবাত শ্বসনই হলো উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক শ্বসন প্রক্রিয়া। সবাত শ্বসনের সামগ্রিক সমীকরণটি এরকম:

$$\underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + 6O_2 \xrightarrow{\text{বিভিন্ন এনজাইম}} 6CO_2 + 6H_2O + \text{শক্তি (686 k Cal / Mole)}$$

সবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ সম্পূর্ণরূপে জারিত হয়ে সর্বমোট 6 অণু CO_2, 6 অণু পানি এবং 38টি ATP উৎপন্ন করে।

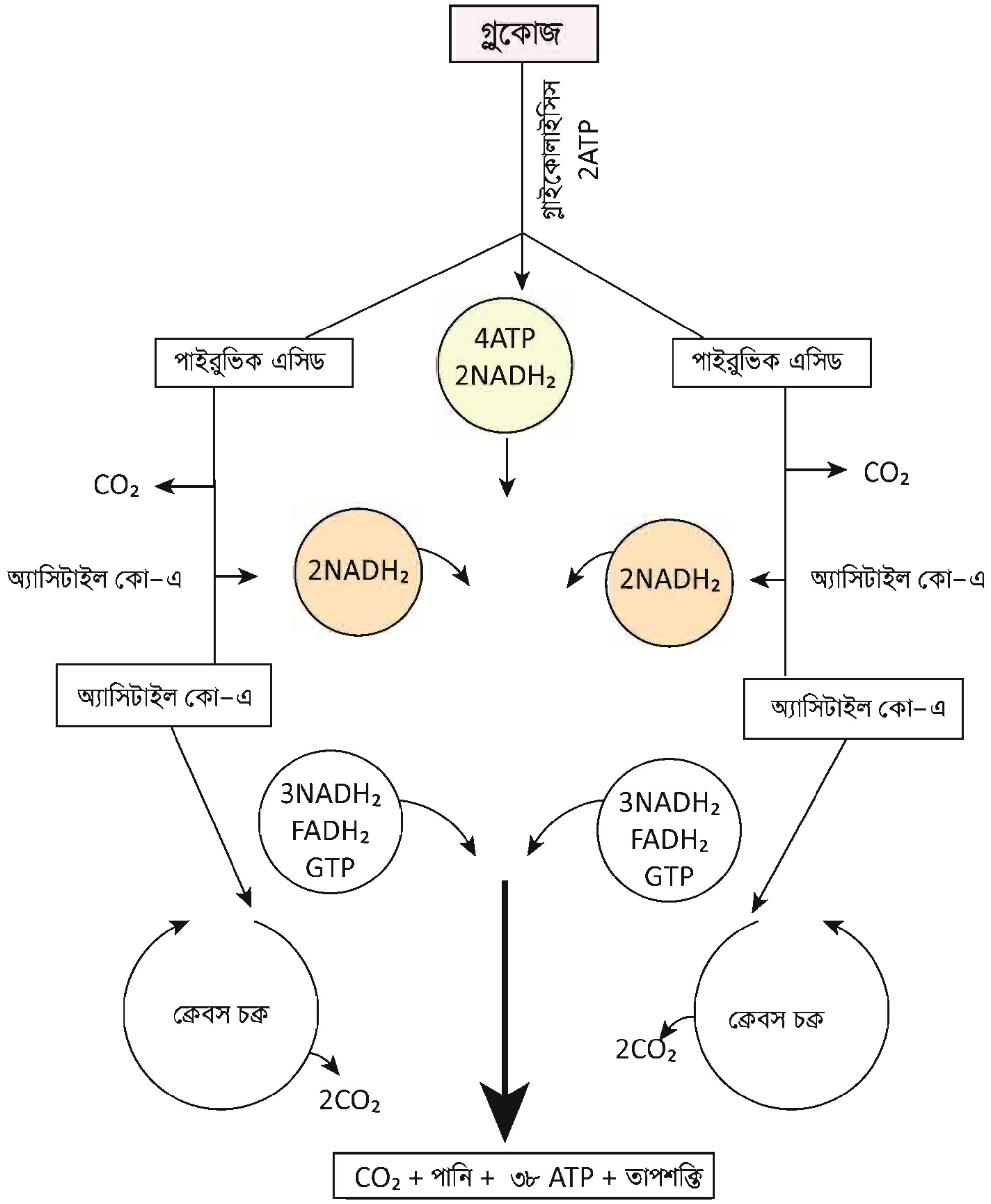
গ্লুকোজ
গ্লাইকোলাইসিস
2ATP
পাইরুভিক এসিড
4ATP
2NADH₂
পাইরুভিক এসিড
CO₂
CO₂
অ্যাসিটাইল কো–এ
2NADH₂
2NADH₂
অ্যাসিটাইল কো–এ
অ্যাসিটাইল কো–এ
অ্যাসিটাইল কো–এ
3NADH₂
FADH₂
GTP
3NADH₂
FADH₂
GTP
ক্রেবস চক্র
2CO₂
ক্রেবস চক্র
2CO₂
CO₂ + পানি + ৩৮ ATP + তাপশক্তি

চিত্র 4.06: সবাত শ্বসন প্রক্রিয়া

অবাত শ্বসন (Anaerobic respiration): যে শ্বসন প্রক্রিয়া অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে হয়, তাকে অবাত শ্বসন বলে। অর্থাৎ যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় কোনো শ্বাসনিক বস্তু অক্সিজেনের সাহায্য ছাড়াই কোষের ভিতরকার এনজাইম দিয়ে আংশিকরূপে জারিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার জৈব যৌগ (ইথাইল অ্যালকোহল, ল্যাকটিক এসিড ইত্যাদি), CO_2 এবং সামান্য পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে, তাকে অবাত শ্বসন বলে।

$$\underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} \xrightarrow{\text{এনজাইম}} \underset{\text{ইথাইল অ্যালকোহল}}{2C_2H_5OH} + 2CO_2 + \text{শক্তি } (56 \text{ k Cal / Mole})$$

কেবল মাত্র কিছু অণুজীবে যেমন ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট ইত্যাদিতে অবাত শ্বসন হয়ে থাকে।

(a) সবাত শ্বসনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

সবাত শ্বসন প্রক্রিয়া সাধারণত চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়। ধাপগুলো এরকম:

ধাপ 1: গ্লাইকোলাইসিস (Glycolysis): এই প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জারিত হয়ে দুই অণু পাইরুভিক এসিড ($C_3H_4O_3$) উৎপন্ন করে। এই ধাপে চার অণু ATP (এর মাঝে দুই অণু খরচ হয়ে যায়) এবং দুই অণু $NADH+H^+$ উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ার জন্য কোনো অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না, তাই গ্লাইকোলাইসিস সবাত ও অবাত উভয় প্রকার শ্বসনেরই প্রথম পর্যায়। গ্লাইকোলাইসিসের বিক্রিয়াগুলো কোষের সাইটোপ্লাজমে ঘটে থাকে।

ধাপ 2: অ্যাসিটাইল কো-এ সৃষ্টি: গ্লাইকোলাইসিস পর্যায়ে সৃষ্ট প্রতি অণু পাইরুভিক এসিড পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়া শেষে 2 কার্বনবিশিষ্ট এক অণু অ্যাসিটাইল কো এনজাইম-এ (Acetyl Co-A), এক অণু CO_2 এবং এক অণু $NADH+H^+$ (অথবা $NADH_2$) উৎপন্ন করে (অর্থাৎ দুই অণু পাইরুভিক এসিড থেকে দুই অণু অ্যাসিটাইল কো এনজাইম-এ, দুই অণু CO_2 এবং দুই অণু $NADH+H^+$ উৎপন্ন হয়)। এই ধাপটি সাইটোপ্লাজমে ঘটে।

ধাপ 3: ক্রেবস চক্র (Krebs cycle): ইংরেজ প্রাণরসায়নবিদ Sir Hans Krebs এ চক্রটি আবিষ্কার করেন বলে একে ক্রেবস চক্র বলা হয়। এ পর্যায়ে অ্যাসিটাইল Co-A মাইটোকন্ড্রিয়াতে প্রবেশ করে এবং ক্রেবস চক্রে অংশগ্রহণ করে। এ চক্রের সকল বিক্রিয়াই মাইটোকন্ড্রিয়াতে সংঘটিত হয়। এই চক্রে এক অণু অ্যাসিটাইল Co-A থেকে দুই অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড, তিন অণু $NADH+H^+$, এক অণু $FADH_2$ এবং এক অণু GTP (গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেট) উৎপন্ন হয়। (অর্থাৎ দুই অণু অ্যাসিটাইল Co-A থেকে চার অণু CO_2, 6 অণু $NADH+H^+$, দুই অণু $FADH_2$ এবং দুই অণু GTP উৎপন্ন হয়।)

ধাপ 4: ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত্র (Electron transport system): উপরোক্ত তিনটি ধাপে যে $NADH+H^+$ (বিজারিত NAD), $FADH_2$ (বিজারিত FAD) উৎপন্ন হয়, এই ধাপে সেগুলো জারিত হয়ে ATP, পানি, উচ্চশক্তির ইলেকট্রন এবং প্রোটন উৎপন্ন হয়। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রনগুলো ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় যে শক্তি প্রদান করে সেই শক্তি ATP তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত্র মাইটোকন্ড্রিয়ায় সংঘটিত হয় (চিত্র: 4.06)।

কাজেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে সবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ সম্পূর্ণরূপে জারিত হয়ে সর্বমোট ছয় অণু CO_2 ছয় অণু পানি এবং 38টি ATP উৎপন্ন করে। নিচের চার্টে সেটি দেখানো হলো:

শ্বসনের পর্যায়	উৎপাদিত বস্তু	ব্যয়িত বস্তু	নিট উৎপাদন
গ্লাইকোলাইসিস	2 অণু পাইরুভিক এসিড 2 অণু $NADH+H^+$ 4 অণু ATP	2 অণু ATP	6 অণু ATP 2 অণু ATP

অ্যাসিটাইল Co-A	2 অণু অ্যাসিটাইল Co-A 2 অণু CO_2 2 অণু $NADH+H^+$	2 অণু পাইরুভিক এসিড	2 অণু CO_2 6 অণু ATP
ক্রেবস চক্র	4 অণু CO_2 6 অণু $NADH+H^+$ 2 অণু $FADH_2$ 2 অণু GTP	2 অণু অ্যাসিটাইল Co-A	4 অণু CO_2 18 অণু ATP 4 অণু ATP 2 অণু ATP
		মোট	38 অণু ATP+ 6 অণু CO_2

1 অণু $NADH+H^+$ বা $NADH_2$ ⟶ 3 অণু ATP
1 অণু $FADH_2$ ⟶ 2 অণু ATP
1 অণু GTP ⟶ 1 অণু ATP

(b) অবাত শ্বসনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:
দুটি ধাপে অবাত শ্বসন হয়ে থাকে। ধাপ দুটি হলো:

ধাপ 1: গ্লুকোজের অসম্পূর্ণ জারণ: এই ধাপে এক অণু গ্লুকোজ থেকে দুই অণু পাইরুভিক এসিড, চার অণু ATP (এর মধ্যে দুই অণু ব্যবহার হয়ে যায়) এবং দুই অণু $NADH+H^+$ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে এ পর্যন্ত বিক্রিয়া সবাত শ্বসনের গ্লাইকোলাইসিসের অনুরূপ। তবে উৎপন্ন পাইরুভিক এসিড পরবর্তী ধাপে বিজারিত হয়ে যায় বলে অবাত শ্বসনে গ্লুকোজের অসম্পূর্ণ জারণ ঘটে- এমনটা বিবেচনা করা হয়।

ধাপ 2: পাইরুভিক অ্যাসিডের বিজারণ: সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত এনজাইমের কার্যকারিতায় পাইরুভিক অ্যাসিড বিজারিত হয়ে CO_2 এবং ইথাইল অ্যালকোহল অথবা শুধু ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। এক্ষেত্রে গ্লাইকোলাইসিসে উৎপন্ন বিজারিত NAD (অর্থাৎ $NADH+H^+$) জারিত হয়ে যে ইলেকট্রন, প্রোটন ও শক্তি নির্গত করে, তা ব্যবহৃত হয় পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে ল্যাকটিক অ্যাসিড বা ক্ষেত্রবিশেষে ইথানল উৎপাদনের জন্য। অন্যদিকে, অক্সিজেনের অভাবে তখন অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশনও চলে না। তাই অবাত শ্বসনের ক্ষেত্রে এক অণু গ্লুকোজের গ্লাইকোলাইসিসে নিট মাত্র 2 অণু ATP পাওয়া যায়।

4.3.2 শ্বসন প্রক্রিয়ার প্রভাবকসমূহ

শ্বসন প্রক্রিয়ার প্রভাবকগুলো বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ দুরকম হতে পারে।

(a) বাহ্যিক প্রভাবক: বাহ্যিক প্রভাবকগুলো হলো:

(i) তাপমাত্রা: 20° সেলসিয়াসের নিচে এবং 45° সেলসিয়াসের উপরের তাপমাত্রায় শ্বসন হার কমে যায়। শ্বসনের জন্য উত্তম তাপমাত্রা 20° সেলসিয়াস থেকে 45° সেলসিয়াস।

(ii) অক্সিজেন: সবাত শ্বসনে পাইরুভিক এসিড জারিত হয়ে CO_2 ও H_2O উৎপন্ন করে। কাজেই অক্সিজেনের অভাবে সবাত শ্বসন কোনোক্রমেই চলতে পারে না।

(iii) পানি: পরিমিত পানি সরবরাহ শ্বসন ক্রিয়াকে স্বাভাবিক রাখে। কিন্তু অত্যন্ত কম কিংবা অতিরিক্ত পানির উপস্থিতিতে শ্বসন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

(iv) আলো: শ্বসন কার্যে আলোর প্রয়োজন পড়ে না সত্যি কিন্তু দিনের বেলা আলোর উপস্থিতিতে পত্ররন্ধ্র খোলা থাকায় O_2 গ্রহণ ও CO_2 ত্যাগ করা সহজ হয় বলে শ্বসন হার একটু বেড়ে যায়।

(v) কার্বন ডাই-অক্সাইড: বায়ুতে CO_2-এর ঘনত্ব বেড়ে গেলে শ্বসন হার একটুখানি কমে যায়।

(b) অভ্যন্তরীণ প্রভাবক: অভ্যন্তরীণ প্রভাবকগুলো হলো:

(i) খাদ্যদ্রব্য: শ্বসন প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য (শ্বসনিক বস্তু) ভেঙে শক্তি, পানি এবং CO_2 নির্গত করে, তাই কোষে খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ ও ধরন শ্বসন হার নিয়ন্ত্রণ করে ।

(ii) উৎসেচক: শ্বসন প্রক্রিয়ায় অনেক ধরনের এনজাইম বা উৎসেচক সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। কাজেই এনজাইমের ঘাটতি শ্বসনের হার কমিয়ে দেয়।

(iii) কোষের বয়স: অল্পবয়স্ক কোষে, বিশেষ করে ভাজক কোষে প্রোটোপ্লাজম বেশি থাকে বলে সেখানে বয়স্ক কোষ থেকে শ্বসনের হার বেশি।

(iv) অজৈব লবণ: কোনো কোনো লবণ শ্বসন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করলেও কোষের সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক কাজের জন্য এবং স্বাভাবিক শ্বসন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য কোষের ভিতরে অজৈব লবণ থাকতে হয়।

(v) কোষমধ্যস্থ পানি: বিভিন্ন শ্বসনিক বস্তু দ্রবীভূত করতে এবং এনজাইমের কার্যকারিতা প্রকাশের জন্য পানির প্রয়োজন।

4.3.3 শ্বসনের গুরুত্ব

শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি দিয়ে জীবের সব ধরনের ক্রিয়া-বিক্রিয়া এবং কাজকর্ম পরিচালিত হয়। শ্বসনে নির্গত CO_2 জীবের প্রধান খাদ্য শর্করা উৎপন্নের জন্য সালোকসংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। এ প্রক্রিয়া উদ্ভিদে খনিজ লবণ পরিশোষণে সাহায্য করে, যা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং অন্যান্য জৈবিক প্রক্রিয়া চালু রাখে। কোষ বিভাজনের প্রয়োজনীয় শক্তি ও কিছু আনুষঙ্গিক পদার্থ শ্বসন প্রক্রিয়া থেকে আসে। তাই বলা যেতে পারে এ প্রক্রিয়া জীবের দৈহিক বৃদ্ধিও নিয়ন্ত্রণ করে। এ প্রক্রিয়া বিভিন্ন উপক্ষার ও জৈব এসিড সৃষ্টিতে সহায়তা করার মাধ্যমে জীবনের অন্যান্য জৈবিক কাজেও সহায়তা করে।

কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বাঁচতে পারে না। এদের শক্তি উৎপাদনের একমাত্র উপায় হলো অবাত শ্বসন। এ প্রক্রিয়ায় ইথাইল অ্যালকোহল তৈরি হয়, যা বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ল্যাকটিক এসিড ফার্মেন্টেশনের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়ায় দই, পনির ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। রুটি তৈরিতে এ প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। ইস্টের অবাত শ্বসনের ফলে অ্যালকোহল এবং CO_2 গ্যাস তৈরি হয়। এই CO_2 গ্যাসের চাপে রুটি ফুলে গিয়ে ভিতরে ফাঁপা হয়।

একক কাজ

কাজ: শ্বসন প্রক্রিয়ায় তাপ নির্গমনের পরীক্ষা।

উপকরণ: দুটি থার্মোফ্লাস্ক, দুটি থার্মোমিটার, ছিদ্রযুক্ত দুটি রাবার কর্ক, অঙ্কুরিত ছোলা এবং 10% মারকিউরিক ক্লোরাইড দ্রবণ।

পদ্ধতি: দুটি থার্মোফ্লাস্কের একটিতে 'ক' ও অন্যটিতে 'খ' লেবেল লাগাতে হবে। 'ক' চিহ্নিত থার্মোফ্লাস্কে সামান্য পানিসহ কিছু অঙ্কুরিত ছোলাবীজ নিতে হবে। ছিদ্রযুক্ত রাবার কর্কের মধ্য দিয়ে একটি থার্মোমিটার প্রবেশ করানোর পর ফ্লাস্কের মুখটি ভালো করে বন্ধ করে দিতে হবে। অবশিষ্ট অঙ্কুরিত ছোলাগুলোকে 10% ফুটন্ত মারকিউরিক ক্লোরাইড দ্রবণে 10 মিনিট ডুবিয়ে রেখে 'খ' চিহ্নিত ফ্লাস্কে নিতে হবে এবং ছিদ্রযুক্ত কর্কের মধ্য দিয়ে একটি থার্মোমিটার ঢুকিয়ে ফ্লাস্কের মুখ ভালোভাবে আটকে দিতে হবে। এবার 'ক' ও 'খ' চিহ্নিত থার্মোমিটার দুটির প্রাথমিক তাপমাত্রা লিখে রেখে ফ্লাস্ক দুটিকে রেখে দিতে হবে।

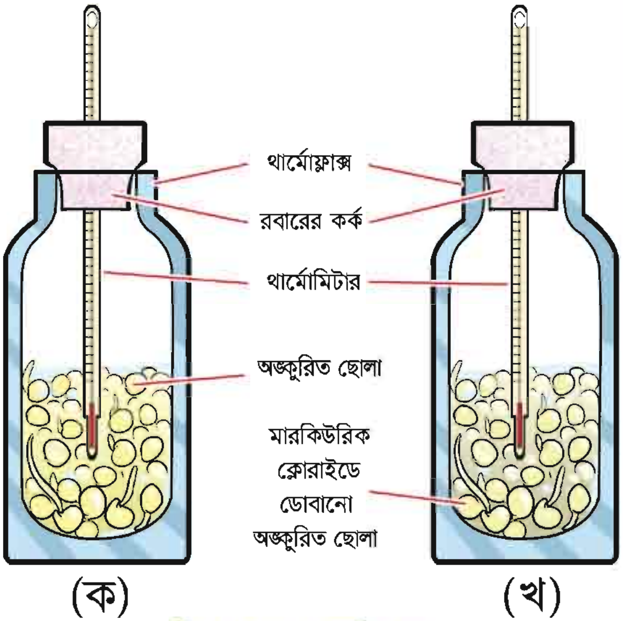

চিত্র 4.07: থার্মোফ্লাস্ক

পর্যবেক্ষণ: কয়েক ঘণ্টা পর দেখা যাবে 'ক' থার্মোমিটারের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে কিন্তু 'খ' থার্মোমিটারের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকবে।

সিদ্ধান্ত: 'ক' থার্মোফ্লাস্কের অঙ্কুরিত ছোলাগুলো সজীব থাকায় শ্বসন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে এবং তাপ নির্গমনের কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে 'খ' ফ্লাস্কের ছোলাগুলো মারকিউরিক

ক্লোরাইড দ্রবণে ডুবিয়ে নেওয়াতে বীজগুলো মরে গিয়ে নির্বীজ (Sterilized) হয়ে যায়। ফলে শ্বসন প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ায় তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকে।

সতর্কতা:

1. লক্ষ রাখতে হবে যেন বীজগুলো সতেজ এবং অঙ্কুরিত হয়।
2. থার্মোমিটারের পারদপূর্ণ অংশটি যেন বীজের মাঝখানে থাকে।

? অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

1. সালোকসংশ্লেষণ কাকে বলে? বিক্রিয়ার মাধ্যমে দেখাও।
2. সালোকসংশ্লেষণের কাঁচামাল কী কী?
3. শ্বসন কাকে বলে? বিক্রিয়ার মাধ্যমে দেখাও?
4. সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের মধ্যে সম্পর্ক কী?
5. অবাত ও সবাত শ্বসনের পার্থক্য লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

1. জীবের সালোকসংশ্লেষণের উপর নির্ভরশীলতার কারণ ব্যাখ্যা কর।
2. শ্বসনের গুরুত্ব আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উপজাত হিসেবে নির্গত হয় কোনটি?

ক. পানি খ. শর্করা
গ. অক্সিজেন ঘ. কার্বন ডাই-অক্সাইড

2. শ্বসনের গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় কত অণু ATP তৈরি হয়?

ক. 4 খ. 6
গ. 8 ঘ. 18

উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং 3 ও 4 নং প্রশ্নের উত্তর দাও

3. চিত্রে A ও B উভয়েরই কাজ হচ্ছে—

i. O_2 গ্রহণ

ii. H_2O নির্গমন

iii. CO_2 ত্যাগ

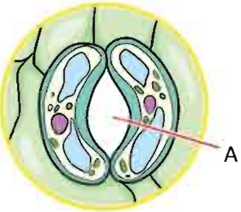

চিত্র X

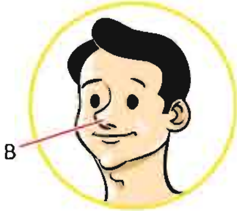

চিত্র Y

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

4. চিত্রে X-এ সংঘটিত প্রক্রিয়াটি—

i. পরিবেশকে শীতল রাখে

ii. সালোকসংশ্লেষণে সহায়তা করে

iii. শ্বসনে ব্যাঘাত ঘটায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

1.

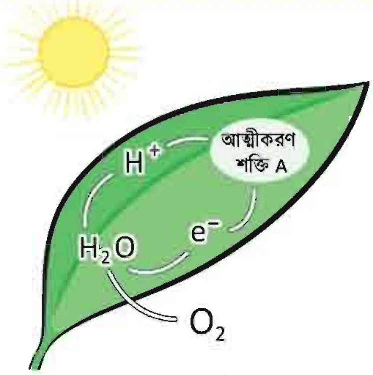

ক. পাইরুভিক এসিডের সংকেত কী?

খ. অবাত শ্বসন বলতে কী বোঝায়?

গ. চিত্রে A উপাদানটি কীভাবে তৈরি হচ্ছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্রে A উৎপাদনটি উৎপন্নে ব্যাঘাত ঘটলে উদ্ভিদের উপর কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে তা যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

2. দশম শ্রেণির ছাত্রী বিপাশা গাজর খেতে পছন্দ করে। গাজরে গ্লুকোজ থাকায় এটা তার কাজ করার শক্তি যোগায়। তার ছোট বোন তাকে প্রশ্ন করে, গাছ বড় হওয়ার জন্য শক্তি কীভাবে পায়? সে তার বোনকে জানায়, গাছও শ্বসন প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ থেকে শক্তি পায়।

ক. ফটোলাইসিস কী?

খ. C_4 উদ্ভিদ বলতে কী বোঝায়?

গ. বিপাশার গৃহীত খাদ্য উপাদানের 2 অণু থেকে ক্রেবস চক্রে কী পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয় ছকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত প্রক্রিয়াটি বাধাগ্রস্ত হলে উদ্ভিদের মধ্যে কী প্রভাব ফেলবে তা বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

খাদ্য, পুষ্টি এবং পরিপাক

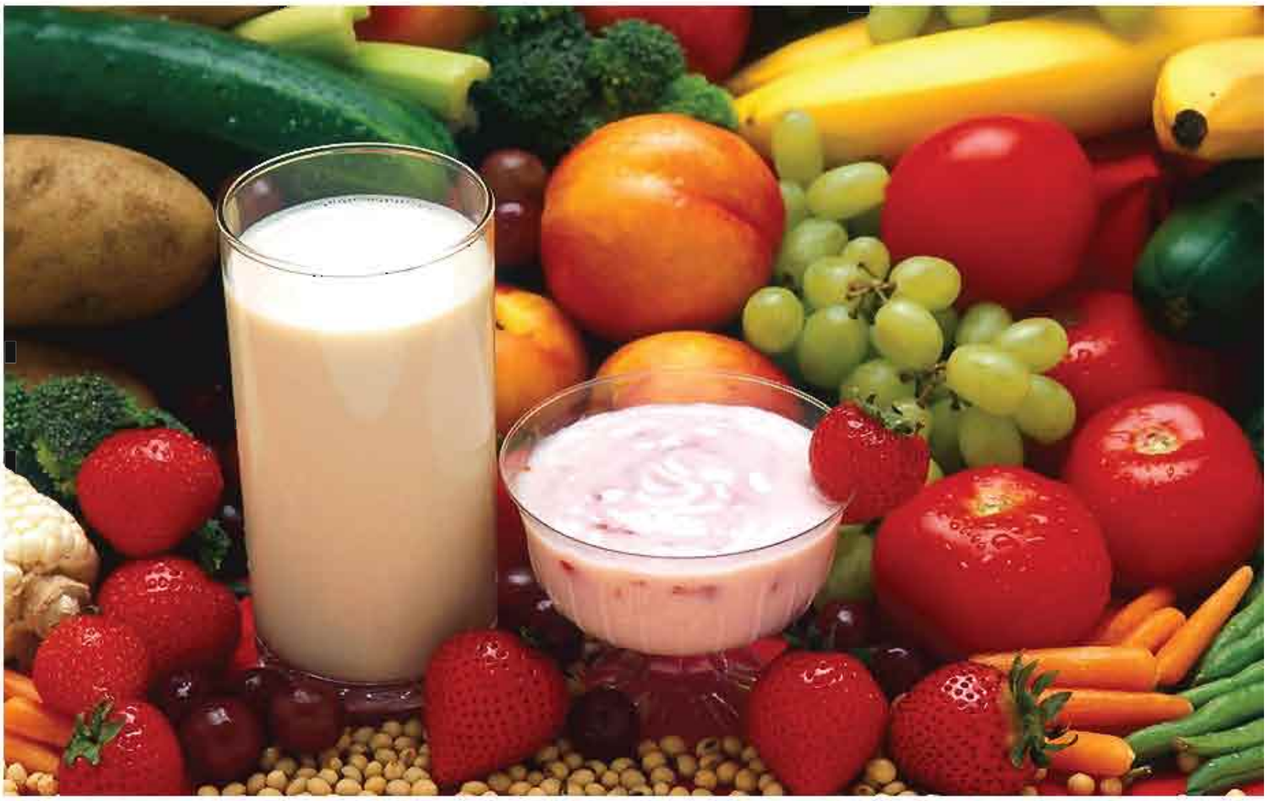

জীবমাত্রই খাদ্য গ্রহণ করে, কারণ জীবের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। তবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া ভিন্ন। জীবের পুষ্টির জন্য বিভিন্ন উপাদানের প্রয়োজন হয়। মানবদেহের জন্য খাদ্য, পুষ্টি ও পরিপাক প্রক্রিয়া এবং উদ্ভিদের পুষ্টি এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- উদ্ভিদের পুষ্টির অতি প্রয়োজনীয় উপাদান বর্ণনা করতে পারব।
- উদ্ভিদে পুষ্টির অভাবজনিত লক্ষণ বিশ্লেষণ করতে পারব।
- প্রাণীর খাদ্যের প্রধান উপাদান ও উৎস বর্ণনা করতে পারব।
- আদর্শ খাদ্য পিরামিড ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য গ্রহণের নিয়মনীতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পুষ্টির অভাবজনিত রোগের লক্ষণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার বর্ণনা করতে পারব।
- কিলোক্যালরি ও কিলোজুল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পুষ্টি উপাদানে শক্তির পরিমাণ এবং ক্যালরি ও জুলে এদের রূপান্তর ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই) ও বডি মাস রেশিওর (বিএমআর) গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিএমআই ও বিএমআরের হিসাব করতে পারব।
- বিএমআর এবং ব্যয়িত শক্তির সাথে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারব।
- বয়স ও লিঙ্গভেদে বিএমআই হিসাব করতে পারব।
- সুস্থ জীবনযাপনে শরীরচর্চা ও বিশ্রামের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য সংরক্ষণে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্যে অতিমাত্রায় রাসায়নিক পদার্থ এবং রঞ্জকের ব্যবহারের শারীরিক বিক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে পারব।
- পৌষ্টিকতন্ত্রের প্রধান অংশ ও সহায়তাকারী অঙ্গের গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- পৌষ্টিকতন্ত্রের প্রধান অংশের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করতে পারব।
- যকৃতের (Liver) কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- অগ্ন্যাশয়ের কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- খাদ্য পরিপাকে উৎসেচকের (Enzyme) ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব।
- অন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যাজনিত রোগ এবং এর প্রতিরোধ ও প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে পারব।
- পরিপাকতন্ত্রের রোগের বিষয়ে নিজে সচেতন হব এবং পরিবারের সদস্যদের সচেতন হতে উদ্বুদ্ধ করব।
- সাত দিনের গৃহীত খাদ্যের একটি তালিকা তৈরি করে এটিকে সুষম খাদ্যের সাথে তুলনা করতে পারব।
- স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে পুষ্টির অবদান বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পোস্টার অঙ্কন করতে পারব।
- স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে পুষ্টির অবদান বিষয়ে নিজে সচেতন হব অন্যদের সচেতন করব।

5.1 উদ্ভিদের খনিজ পুষ্টি (Plant Mineral Nutrition)

উদ্ভিদ তার বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য মাটি, বায়ু এবং পানি থেকে কতগুলো উপাদান গ্রহণ করে। এ উপাদানগুলোর অভাবে উদ্ভিদ সুষ্ঠুভাবে বাঁচতে পারে না। এ উপাদানগুলোকে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান বলে। এ সকল পুষ্টি উপাদানের অধিকাংশই উদ্ভিদ মাটি থেকে সংগ্রহ করে বলে এদেরকে খনিজ পুষ্টি বলা হয়। উদ্ভিদে প্রায় 60টি অজৈব উপাদান শনাক্ত করা হয়েছে, তবে এই 60টি উপাদানের মধ্যে মাত্র 16টি উপাদান উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এ 16টি পুষ্টি উপাদানকে সমষ্টিগতভাবে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান (essential elements) বলা হয়। এই উপাদানগুলো সব ধরনের উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, শারীরবৃত্তীয় কাজ এবং প্রজননের জন্য প্রয়োজন। এদের যেকোনো একটির অভাব হলে উদ্ভিদে তার অভাবজনিত লক্ষণ (deficiency symptoms) দেখা দেয় এবং পুষ্টির অভাবজনিত রোগের সৃষ্টি হয়। একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের কাজ অপরটি দিয়ে সম্পন্ন হয় না।

অত্যাবশ্যকীয় 16টি উপাদানের মধ্যে উদ্ভিদ কোনো কোনো উপাদান বেশি পরিমাণে গ্রহণ করে, আবার কোনো কোনো উপাদান সামান্য পরিমাণে গ্রহণ করে। উদ্ভিদ কর্তৃক গৃহীত অত্যাবশ্যকীয় খনিজ পুষ্টির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে এদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা ম্যাক্রো উপাদান এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা মাইক্রো উপাদান।

(a) ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা ম্যাক্রো উপাদান (macro-nutrient বা macro-element): উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য যেসব উপাদান বেশি পরিমাণে দরকার হয়, সেগুলোকে ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা ম্যাক্রো উপাদান বলা হয়। ম্যাক্রো উপাদান 10টি, যথা: নাইট্রোজেন (N), পটাশিয়াম (K), ফসফরাস (P), ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O), সালফার (S) এবং লৌহ (Fe)।

(b) মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা মাইক্রো উপাদান (micro-nutrient বা micro-element): উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য যেসব উপাদান অত্যন্ত সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হয় তাদেরকে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা মাইক্রো উপাদান বলে। মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট 6টি, যথা: দস্তা বা জিংক (Zn), ম্যাংগানিজ (Mn), মোলিবডেনাম (Mo), বোরন (B), তামা বা কপার (Cu) এবং ক্লোরিন (Cl)।

5. 1.1 পুষ্টি উপাদানের উৎস এবং ভূমিকা

পুষ্টি উপাদানের উৎস

উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানগুলোর মধ্যে কার্বন এবং অক্সিজেন বায়ুমণ্ডল থেকে গ্রহণ করে। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পানি থেকে গ্রহণ করে। অন্যসব উপাদান মাটি থেকে মূলের সাহায্যে শোষণ করে। এ উপাদানগুলো মাটিতে বিভিন্ন লবণ হিসেবে থাকে। কিন্তু উদ্ভিদ এগুলোকে লবণ হিসেবে সরাসরি শোষণ করতে পারে না, আয়ন হিসেবে শোষণ করে। যেমন: Ca^{++}, Mg^{++}, $NH4^{+}$, NO_3^{-}, K^{+} ইত্যাদি।

উদ্ভিদের পুষ্টিতে বিভিন্ন খনিজ উপাদানের ভূমিকা

উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন খনিজ পুষ্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিছু ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টের ভূমিকার কথা নিচে বর্ণনা করা হলো।

নাইট্রোজেন : নাইট্রোজেন নিউক্লিক অ্যাসিড, প্রোটিন আর ক্লোরোফিলের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। উদ্ভিদের সাধারণ দৈহিক বৃদ্ধিতে নাইট্রোজেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং কোষ কলায় পানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। নাইট্রোজেনের অভাব হলে ক্লোরোফিল সৃষ্টি ব্যাহত হয়, আর ক্লোরোফিল সৃষ্টি ব্যাহত হলে খাদ্য প্রস্তুত বাধাপ্রাপ্ত হয়। খাদ্যপ্রস্তুত বাধাপ্রাপ্ত হলে শ্বসন প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে এবং শক্তি নির্গমন হ্রাস পায়।
ম্যাগনেসিয়াম: ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরোফিল অণুর একটি গুরুত্বপুর্ণ উপাদান এবং শ্বসন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। এর অভাব হলে ক্লোরোফিল অণু সৃষ্টি এবং সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত ব্যাহত হবে।
পটাশিয়াম: উদ্ভিদের বহু জৈবিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় পটাশিয়াম সহায়ক হিসেবে কাজ করে। পত্ররন্ধ্র খোলা এবং বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে পটাশিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। পটাশিয়াম উদ্ভিদে পানি শোষণে সাহায্য করে। কোষবিভাজনের মাধ্যমে উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে পটাশিয়াম। এটি মূল, ফুল ও ফল উৎপাদন এবং বর্ধনেও সাহায্য করে।
ফসফরাস: মূল বর্ধনের জন্য ফসফরাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। ফসফরাস জীবকোষের DNA, RNA, NADP, ATP প্রভৃতির গাঠনিক উপাদান। কাজেই এটি ছাড়া উদ্ভিদের পুষ্টি একেবারেই সম্ভব নয়। উদ্ভিদের মূল বৃদ্ধির জন্য ফসফরাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান।
আয়রন: আয়রন সাইটোক্রোমের সাংগঠনিক উপাদান, কাজেই বায়বীয় শ্বসন এর উপর নির্ভরশীল। ক্লোরোফিল সৃষ্টিতেও আয়রনের ভূমিকা অপরিসীম।

পুষ্টিতে এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্যই আমরা ভালো ফলন পেতে জমিতে নাইট্রোজেন (ইউরিয়া), পটাশিয়াম (মিউরেট অফ পটাশ), ফসফরাস (ট্রিপল সুপার ফসফেট) প্রভৃতি সার ব্যবহার করে থাকি।

উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন:

ম্যাংগানিজ: ক্লোরোপ্লাস্ট গঠন ও সংরক্ষণের জন্য ম্যাংগানিজ প্রয়োজন।
কপার: টমেটো, সূর্যমুখী উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য কপার বা তামার প্রয়োজন, শ্বসন পক্রিয়ার উপরও কপারের প্রভাব উল্লেখযোগ্য।
বোরন: উদ্ভিদের সক্রিয়ভাবে বর্ধনশীল অঞ্চলের জন্য বোরন প্রয়োজন, চিনি পরিবহনে বোরন পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে।
মোলিবডেনাম: অণুজীব দিয়ে বায়বীয় নাইট্রোজেন সংবন্ধনের জন্য মোলিবডেনাম আবশ্যক।
ক্লোরিন: সুগারবিট এর মূল এবং কাণ্ডের বৃদ্ধির জন্য ক্লোরিন প্রয়োজন।

5.1.2 পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ

উদ্ভিদের কোনো পুষ্টি উপাদানের অভাব হলে বিশেষ লক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভিদ তা প্রকাশ করে। এ

লক্ষণগুলোকে বলা হয় অভাবজনিত লক্ষণ (deficiency symptoms)। এ লক্ষণ দেখে আমরা বুঝতে পারি কোন উদ্ভিদ বা ফসলে কোন পুষ্টি উপাদানের অভাব রয়েছে। নিচে কিছু উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ উল্লেখ করা হলো:

অভাবজনিত লক্ষণ	রোগাক্রান্ত উদ্ভিদ
নাইট্রোজেন (N): নাইট্রোজেনের অভাব হলে ক্লোরোফিল সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটে। ক্লোরোফিলের অভাবে পাতার সবুজ রং হালকা হতে হতে একসময় হলুদ হয়ে যায়। তার কারণ ক্লোরোফিল ছাড়া অন্যান্য বর্ণকণা বা পিগমেন্ট মিলিতভাবে হলুদ দেখায়। পাতা হলুদ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে 'ক্লোরোসিস' (chlorosis) বলে। লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ বা দস্তার অভাবেও ক্লোরোসিস হতে পারে কেননা এগুলোও ক্লোরোফিল উৎপাদনের সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত। ক্লোরোসিসে কোষের বৃদ্ধি এবং বিভাজন হ্রাস পায়, তাই উদ্ভিদের বৃদ্ধি কমে যায়। চিত্রে যথাক্রমে নাইট্রোজেনের ঘাটতিবিশিষ্ট এবং সুস্থ পাতা দেখানো হয়েছে।	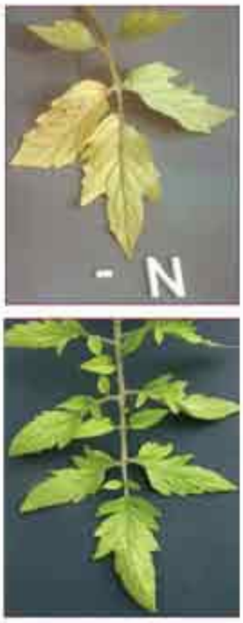
ফসফরাস (P): ফসফরাসের অভাব হলে পাতা বেগুনি হয়ে যায়। পাতায় মৃত অঞ্চল সৃষ্টি হয় এমনকি পাতা, ফুল ও ফল ঝরে যেতে পারে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং উদ্ভিদ খর্বাকার হয়। বেশিরভাগ সময় খালি চোখে দেখে ফসফরাসের ঘাটতি বোঝা যায় না। যত দিনে লক্ষণ দৃশ্যমান হয়, তত দিনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আর তেমন কিছু করার থাকে না।	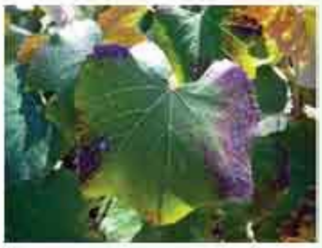
পটাশিয়াম (K): পটাশিয়ামের অভাবে পাতার শীর্ষ এবং কিনারা হলুদ হয় এবং মৃত অঞ্চল সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে পাতার শিরার মধ্যবর্তী স্থানে ক্লোরোসিস হয়ে হলুদবর্ণ ধারণ করে। পাতার কিনারায় পুড়ে যাওয়া সদৃশ বাদামি রং দেখা যায় এবং পাতা কুঁকড়ে আসে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি কম হয় এবং শীর্ষ ও পার্শ্ব মুকুল মরে যায়।	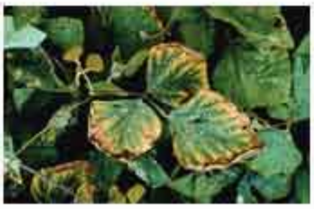

ক্যালসিয়াম (Ca): কোষের সাইটোসলে ক্যালসিয়ামের স্বাভাবিক মাত্রা, মাইটোকন্ড্রিয়া এবং এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের স্বাভাবিক কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত। মাত্রা কমে গেলে মাইটোকন্ড্রিয়ায় অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়া এবং এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের প্রোটিন ট্রাফিকিং প্রক্রিয়া বিপর্যস্ত হয়। তাই ক্যালসিয়ামের অভাবে উদ্ভিদের বর্ধনশীল শীর্ষ অঞ্চল, বিশেষ করে পাতার কিনারা বরাবর অঞ্চলগুলো মরে যায়। পাতা কুঁকড়ে যায়, ফুল ফোটার সময় উদ্ভিদের কাণ্ড শুকিয়ে যায় এবং উদ্ভিদ হঠাৎ নেতিয়ে পড়ে।	
ম্যাগনেসিয়াম (Mg): ম্যাগনেসিয়ামের অভাবে ক্লোরোফিল সংশ্লেষিত হয় না বলে সবুজ রং হালকা হয়ে যায় এবং সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়। পাতার শিরাগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অধিক হারে ক্লোরোসিস হয়।	
লৌহ (Fe): লৌহের অভাবে প্রথমে কচি পাতার রং হালকা হয়ে যায়, তবে পাতার সরু শিরার মধ্যবর্তী স্থানেই প্রথম হালকা হয় এবং ক্লোরোসিস হয়। কখনো কখনো সম্পূর্ণ পাতা বিবর্ণ হয়ে যায়। কাণ্ড দুর্বল এবং ছোট হয়।	
সালফার (S): সালফার উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রোটিন, হরমোন ও ভিটামিনের গাঠনিক উপাদানই নয়, একই সাথে এটি কোষে পানির সমতা রক্ষা করে। সালফারের অভাবে পাতা হালকা সবুজ হয় এবং পাতায় লাল এবং বেগুনি দাগ দেখা যায়। কচি পাতায় বেশি এবং বয়োবৃদ্ধ পাতায় কম ক্লোরোসিস হয়। সালফারের অভাবে মূল, কাণ্ড এবং পাতার শীর্ষ থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে টিস্যু মারা যেতে থাকে, যাকে ডাইব্যাক (dieback) বলে। কাণ্ডের মধ্যপর্ব ছোট হয় বলে গাছ খর্বাকৃতির হয়।	
বোরন (B): বোরন কোষপ্রাচীরের কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করে প্রাচীরটিকে তথা কোষটিকে দৃঢ়তা দেয়। বিপাক ক্রিয়ার বিভিন্ন বিক্রিয়ায় এর নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা রয়েছে। তাই বোরনের অভাবে পর্যাপ্ত দৃঢ়তা না পেয়ে এবং বিপাকে গোলযোগ হওয়ার কারণে উদ্ভিদের বর্ধনশীল অগ্রভাগ মরে যায়। কচি পাতার বৃদ্ধি কমে যায় এবং পাতা বিকৃত হয়, কাণ্ড খসখসে হয়ে ফেটে যায়। ফুলের কুঁড়ির জন্ম ব্যাহত হয়।	

একক কাজ

কাজ: কোন কোন খনিজ মৌলের অভাবে গাছে কী কী অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দেয়, শিক্ষক তার একটি তালিকা শিক্ষার্থীদেরকে তৈরি করতে বলবেন।

5.2 প্রাণির খাদ্য ও পুষ্টি

তোমরা ষষ্ঠ এবং অষ্টম শ্রেণিতে জেনেছ, জীবনধারণের জন্য খাদ্য যেমন অপরিহার্য, তেমনি সুস্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য প্রয়োজন। এই খাদ্যই জীবকোষে জারিত হয়ে দেহে তাপ এবং শক্তি তৈরি করে। তোমরা এর আগের অধ্যায়ে শ্বসন প্রক্রিয়ায় কীভাবে জীবদেহের ভিতরে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ এবং শক্তি উৎপন্ন হয় সেটা জেনেছ। চলাফেরা, খেলাধুলা ইত্যাদি সব কাজে শক্তির প্রয়োজন। আমরা এই শক্তি পাই খাদ্য থেকে। যেসব বস্তু খাওয়ার পর দেহে শোষিত হয়ে বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে, তাকে খাদ্য বলে। এই কাজগুলো হচ্ছে দেহের পুষ্টিসাধন, দেহের ক্ষয়পূরণ, দেহে রোগ প্রতিরোধক শক্তি উৎপাদন এবং কর্মশক্তি ও তাপ উৎপাদন।

5.2.1 খাদ্যের প্রধান উপাদান ও তার উৎস

সম্মিলিতভাবে আগে উল্লিখিত কাজগুলো আমাদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন। এ কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের দরকার হয়। খাদ্য অনেকগুলো রাসায়নিক বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। এই রাসায়নিক বস্তুগুলোকে খাদ্য উপাদান বলে। এই উপাদানগুলোর মধ্যে পুষ্টি থাকে, তাই খাদ্য উপাদানকে পুষ্টি উপাদানও বলা হয়। অধিকাংশ খাদ্যে একাধিক খাদ্য উপাদান থাকে। কোনো খাদ্যে যে উপাদানটি বেশি পরিমাণে থাকে, তাকে সেই উপাদানের খাদ্য হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। উপাদান অনুযায়ী খাদ্যবস্তুকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়:

(a) **আমিষ:** দেহের বৃদ্ধিসাধন এবং ক্ষয়পূরণ করে।

(b) **শর্করা:** দেহে শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে।

(c) **স্নেহ ও চর্বিজাতীয় খাদ্য:** দেহে তাপ এবং শক্তি উৎপাদন করে।

এছাড়া আরও তিন ধরনের উপাদানও দেহের জন্য প্রয়োজন। যেমন:

(d) **খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন:** রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ায় এবং বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উদ্দীপনা যোগায়।

(e) **খনিজ লবণ:** বিভিন্ন জৈবিক কাজে অংশ নেয়।

(f) **পানি:** দেহে পানি এবং তাপের সমতা রক্ষা করে, এছাড়া কোষের কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে এবং

কোষ ও তার অঙ্গাণুগুলোকে ধারণ করে।

উপরে উল্লেখ করা খাদ্য উপাদানের বাইরে আরও একটি উপাদান রয়েছে, যেটি কোনো পুষ্টি না জোগালেও একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান।

(g) খাদ্য আঁশ (Fibre) বা রাফেজ: রাফেজ পানি শোষণ করে এবং মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং বৃহদন্ত্র থেকে মল নিষ্কাশনে সাহায্য করে।

(a) আমিষ (Protein)

আমিষ বা প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন দিয়ে গঠিত। আমিষে শতকরা 16 ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। আমিষে সামান্য পরিমাণে সালফার, ফসফরাস এবং আয়রনও থকে। নাইট্রোজেন এবং শেষোক্ত উপাদানগুলোর উপস্থিতির কারণে আমিষের গুরুত্ব শর্করা ও স্নেহ পদার্থ থেকে আলাদা। শুধু আমিষজাতীয় খাদ্যই শরীরে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে বলে পুষ্টিবিজ্ঞানে আমিষকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আমিষের উৎস: আমরা আগেই জেনেছি মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, শিমের বীচি, শুঁটকি মাছ, চিনাবাদাম ইত্যাদি থেকে আমরা আমিষ পাই। উৎস অনুযায়ী আমিষ দুই ধরনের: প্রাণিজ আমিষ এবং উদ্ভিজ্জ আমিষ।

প্রাণিজ আমিষ: মাছ, মাংস, ডিম, পনির, ছানা, কলিজা বা যকৃৎ ইত্যাদি প্রাণিজ আমিষ। এসব খাদ্যে দেহের প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো এসিড পাওয়া যায়।

উদ্ভিজ্জ আমিষ: ডাল, চিনাবাদাম, শিমের বীচি ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ আমিষ। একসময় ধারণা করা হতো এগুলো প্রাণিজ আমিষের তুলনায় কম পুষ্টিকর, কারণ উদ্ভিজ্জ আমিষে প্রয়োজনীয় সব কয়টি অ্যামাইনো এসিড থাকে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিজ্জ আমিষ প্রাণিজ আমিষের মতোই সকল অ্যামাইনো এসিড পর্যাপ্ত পরিমাণে ধারণ করে।

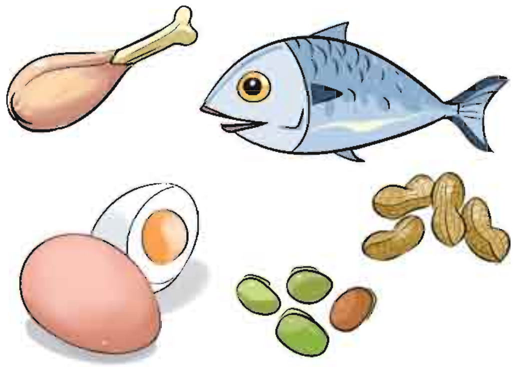
চিত্র 5.01: আমিষজাতীয় খাদ্য

অনেক সময়, দুই বা ততোধিক উদ্ভিজ্জ আমিষ একত্রে রান্না করা যায়। কিন্তু এতে অ্যামাইনো এসিডের অনুপাতের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না।

(b) শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate)

শর্করাজাতীয় খাদ্য শরীরে কাজ করার শক্তি যোগায়। শর্করার মৌলিক উপাদান কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন। উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল ও বীজে শর্করা বিভিন্নরূপে জমা থাকে। ফলের

রসে গ্লুকোজ, দুধে ল্যাকটোজ, গম, আলু, চাল ইত্যাদিতে শ্বেতসার (স্টার্চ) ইত্যাদি শর্করাজাতীয় খাদ্যের বিভিন্ন রূপ। গঠনপদ্ধতি অনুসারে শর্করাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। নিচের সারণিতে এই তিন ধরনের শর্করার গঠন এবং উৎস দেখানো হলো।

সারণি 10.2: শর্করার শ্রেণিবিভাগ

শর্করা শ্রেণি	গঠন	উদাহরণ	উৎস
এক শর্করা (Monosaccharide)	একটি মনোমার বিশিষ্ট শর্করা	গ্লুকোজ	মধু, ফলের রস
দ্বি-শর্করা (Disaccharide)	দুইটি মনোমারবিশিষ্ট (ডাইমার) শর্করা	সুক্রোজ, ল্যাকটোজ	চিনি ও দুধ
বহু শর্করা (Polysaccharide)	বহু মনোমারবিশিষ্ট (পলিমার) শর্করা	শ্বেতসার, গ্লাইকোজেন	চাল, আটা, আলু, সবুজ শাক-সবজি ইত্যাদি।

প্রধানত চাল, গম, আলু থেকে আমরা শ্বেতসার পাই। কাঁচা খাদ্যের শ্বেতসার সহজে হজম হয় না। এজন্য আমরা চাল, আটা, আলু ইত্যাদি রান্না করে খাই। খাওয়ার পর শর্করা পরিপাক হয়ে গ্লুকোজে পরিণত হয়। দ্বি-শর্করা এবং বহু শর্করা পরিপাকের মাধ্যমে সরল শর্করায় পরিণত হয়ে দেহে শোষণযোগ্য হয়। মানব পরিপুষ্টির জন্য সরল শর্করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মানবদেহ শুধু সরল শর্করা শোষণ করতে পারে।

(c) স্নেহজাতীয় খাদ্য (Fats)

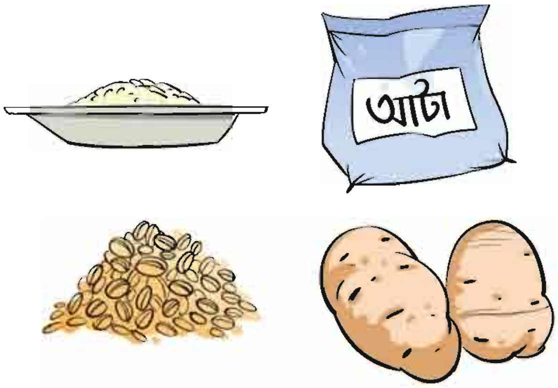

চিত্র 5.02: শর্করাজাতীয় খাদ্য

চর্বি একটি প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান। কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন দিয়ে তৈরি এই উপাদানটির মুখ্য কাজ হলো তাপ উৎপাদন করা। এই উপাদানটি পাকস্থলীতে অনেকক্ষণ থাকে, তাই তখন ক্ষুধা পায় না। দেহের ত্বকের নিচে চর্বি জমা থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন অঙ্গ যেমন: যকৃৎ, মস্তিষ্ক, মাংস পেশিতেও চর্বি জমা থাকে। দেহের এ সঞ্চিত চর্বি উপবাসের সময় কাজে লাগে। শর্করা ও আমিষের তুলনায় চর্বিতে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ ক্যালরি থাকে (ক্যালরি হলো প্রাণিদেহে শক্তি মাপার একটি একক)। খাবার তেল বা ঘি দিয়ে রান্না করা খাবার বেশ সুস্বাদু হয়, সঙ্গে এর পুষ্টিমানও বেড়ে যায়। যেমন সিদ্ধ আলুর চেয়ে ভাজা আলু, রুটির চেয়ে লুচি বা

পরোটা শুধু মুখরোচকই নয়, এতে ক্যালরিও বেশি পাওয়া যায়। কোনো কোনো চর্বিতে ভিটামিন 'এ' আছে, আবার কোনোটিতে আছে ভিটামিন 'ই'।

উৎস অনুযায়ী স্নেহপদার্থ দুই ধরনের, উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ এবং প্রাণিজ স্নেহপদার্থ।

উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ: সয়াবিন, সরিষা, তিল, বাদাম, সূর্যমুখী এবং ভুট্টার তেল ভোজ্যতেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ভোজ্যতেলের মধ্যে সয়াবিন তেল উৎকৃষ্টতম।

প্রাণিজ স্নেহপদার্থ: চর্বি, ঘি, ডালডা ইত্যাদি প্রাণিজ স্নেহপদার্থ। ডিমের কুসুমে স্নেহপদার্থ আছে, কিন্তু সাদা অংশে স্নেহপদার্থ থাকে না। স্নেহপদার্থ পানিতে অদ্রবণীয়। পানির চেয়ে হালকা বলে পানির উপর ভাসে। একজন সুস্থ সবল পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দিনে 50-60 গ্রাম চর্বির প্রয়োজন হয়।

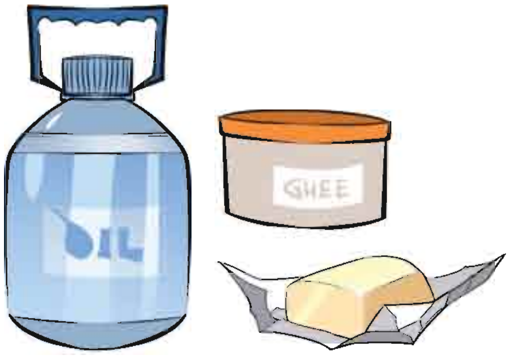

চিত্র 5.03: স্নেহজাতীয় খাদ্য

(d) খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন (Vitamins)

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিনের পরিমাণ খুব সামান্য হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। দেহের বৃদ্ধির জন্য ও সুস্থ থাকার জন্য ভিটামিন অত্যাবশ্যক। সুষম খাদ্যে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদান থাকে বলে সুষম খাদ্য থেকে প্রচুর ভিটামিন পাওয়া যায়। তবে নিয়মিত ভিটামিনবিহীন খাবার খেলে কিছুদিনের মধ্যে দেহে ভিটামিনের অভাবজনিত সমস্যা দেখা দেয়। পরবর্তীকালে তা মারাত্মক আকারে স্থায়ীভাবে দেহের ক্ষতিসাধন করে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

ভিটামিনকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন এবং পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন।

চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন

ভিটামিন A: দুধ, মাখন, চর্বি, ডিম, গাজর, আম, কাঁঠাল, রঙিন শাকসবজি, মলা মাছ ইত্যাদিতে ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়।

ভিটামিন D: দুধ, ডিম, কলিজা বা যকৃৎ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাছের তেল, ভোজ্য তেল ইত্যাদিতে ভিটামিন 'ডি' থাকে।

ভিটামিন E এবং K: উপরে উল্লিখিত সব খাবার থেকে ভিটামিন 'ই' এবং 'কে' পাওয়া যায়।

পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন

ভিটামিন B: ইস্ট, ঢেকিছাঁটা চাল, জাঁতায় ভাঙা আটা বা লাল আটা, অঙ্কুরিত ছোলা, মুগডাল, মটর,

ফুলকপি, চিনাবাদাম, শিমের বীচি, কলিজা বা যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, দুধ ডিম, মাংস, সবুজ শাকসবজি ইত্যাদিতে ভিটামিন 'বি' থাকে।

ভিটামিন C: পেয়ারা, বাতাবি লেবু, কামরাঙা, কমলা, আমড়া, বাঁধাকপি, টমেটো, আনারস, কাঁচামরিচ, তাজা শাকসবজি ইত্যাদি থেকে ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায়।

(e) খনিজ লবণ (Mineral salts)

দেহকোষ ও দেহের তরল অংশের জন্য খনিজ লবণ অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। মানুষের শরীরে ক্যালসিয়াম, লৌহ, সালফার, দস্তা, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, আয়োডিন ইত্যাদি থাকে। এ উপাদানগুলো কখনো মৌলিক উপাদানরূপে মানবদেহে অবস্থান করে না, এগুলো খাদ্য ও মানবদেহে বিভিন্ন পরিমাণে অন্য পদার্থের সাথে মিলিত হয়ে নানা জৈব এবং অজৈব যৌগের লবণ তৈরি করে। খনিজ লবণ দেহ গঠন ও দেহের অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। হাড়, দাঁত, পেশি, এনজাইম এবং হরমোন গঠনের জন্য খনিজ লবণ একটি অপরিহার্য উপাদান। স্নায়ুর উদ্দীপনা, পেশি সংকোচন, দেহকোষে পানির সাম্যতা বজায় রাখা, অম্ল ও ক্ষারের সমতাবিধান, এসব কাজে খনিজ লবণের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

দুধ, দই, ছানা, পনির, ছোট মাছ (মলা-ঢেলা), নানা রকম ডাল, সবুজ শাকসবজি, ঢেঁড়স, লাল শাক, কচু শাক ইত্যাদি ক্যালসিয়ামের প্রধান উৎস। কলিজা, সবুজ শাকসবজি, মাংস, ডিমের কুসুম, কচু শাক ইত্যাদিতে লৌহ থাকে। দুধ, মাছ, মাংস, বাদাম, ডাল থেকে ফসফরাস পাওয়া যায়। খাবার লবণ, চিপস, নোনতা খাবার, পনির, বাদাম, আচার ইত্যাদিতে সোডিয়াম থাকে। মাছ, মাংস, বাদাম, ডাল, কলা, আলু, আপেল ইত্যাদিতে পটাশিয়াম থাকে। আয়োডিনের উৎস হলো সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও মাছ, মাংস এবং শেওলা।

(f) পানি (Water)

পানির অপর নাম জীবন। জীবনরক্ষার কাজে অক্সিজেনের পরেই পানির স্থান। দেহের পুষ্টির কাজে পানি অপরিহার্য। দেহের গঠন ও অভ্যন্তরীণ কাজ পানি ছাড়া চলতে পারে না। মানবদেহে পানির কাজগুলোকে তিন ভাগ করা যায়, দেহ গঠন, দেহের অভ্যন্তরীণ কার্য নিয়ন্ত্রণ এবং দেহ থেকে দূষিত পদার্থ নির্গমন।

দেহ গঠন: দেহকোষের গঠন এবং প্রতিপালন পানি ছাড়া কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। গড়ে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈহিক ওজনের 50%-65% পানি।

দেহের অভ্যন্তরীণ কার্য নিয়ন্ত্রণ: পানি ব্যতীত দেহের অভ্যন্তরের কোনো রাসায়নিক ক্রিয়া চলতে পারে না। দেহে পানি দ্রাবকরূপে কাজ করে। পানির জন্যই দেহে রক্তসঞ্চালন সম্ভব। রক্তে পরিবাহিত খাদ্য উপাদান এবং অক্সিজেন পানির মাধ্যমে দেহকোষে পৌঁছাতে পারে। দেহের সকল ধরনের রসে খনিজ লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। পরিপাককৃত খাদ্য উপাদান পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্য দিয়ে রক্তে বিশোষিত হয়।

দূষিত পদার্থ নির্গমন: পানি দেহের দূষিত পদার্থ অপসারণে সাহায্য করে। মলমূত্র, ঘাম ইত্যাদি দূষিত পদার্থের সাথে দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি বের হয়ে যায়।

এভাবে প্রতিদিন দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি নির্গত হয়। তাছাড়া বয়স, আবহাওয়া, পরিশ্রম, খাওয়ার অভ্যাস ইত্যাদি বিষয়গুলো পানির চাহিদাকে প্রভাবিত করে। তাই একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক 2 লিটার পানি পান করা প্রয়োজন। যেমন: কোনো ব্যক্তির দৈনিক ক্যালরি চাহিদা 2000 কিলোক্যালরি হলে, তার দৈনিক 2 লিটার পানির প্রয়োজন হয়।

(g) খাদ্য আঁশ (Fibre) বা রাফেজ

শস্যদানার বহিরাবরণ, সবজি, ফলের খোসা, শাঁস, বীজ এবং উদ্ভিদের ডাঁটা, মূল ও পাতায় আঁশ থাকে। এগুলে মূলত কোষপ্রাচীরের সেলুলোজ এবং লিগনিন। হাড় যেমন মানবদেহের কাঠামো তৈরি করে, সেলুলোজ এবং রাফেজ তেমনি উদ্ভিদের কাঠামো তৈরি করে। এগুলো জটিল শর্করা। গবাদিপশু, যেমন: গরু, ছাগল,মহিষ ইত্যাদি সেলুলোজ হজম করতে পারে। কিন্তু মানুষ এগুলো হজম করতে পারে না। রাফেজ পানি শোষণ করে এবং মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ও বৃহদন্ত্র থেকে মল নিষ্কাশনে সাহায্য করে। রাফেজযুক্ত খাবার বিষাক্ত বর্জনীয় বস্তুকে খাদ্যনালি থেকে পরিশোষণ করে। ধারণা করা হয়, এরূপ খাবার খাদ্যনালির ক্যান্সারের আশঙ্কা অনেকাংশে হ্রাস করে। আঁশযুক্ত খাবার স্থূলতা হ্রাস, ক্ষুধাপ্রবণতা এবং চর্বি জমার প্রবণতা হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

5.2.2 আদর্শ খাদ্য পিরামিড

যেকোনো একটি সুষম খাদ্যতালিকায় শর্করা, ভিটামিন ও খনিজ, আমিষ ও স্নেহ বা চর্বিজাতীয় খাদ্য এবং ফাইবার অন্তর্ভুক্ত থাকে। একজন কিশোর বা কিশোরী, প্রাপ্তবয়স্ক একজন পুরুষ বা মহিলার সুষম খাদ্যতালিকা লক্ষ করলে দেখা যায়, তালিকায় শর্করার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি, শর্করাকে নিচে রেখে পরিমাণগত দিক বিবেচনা করে পর্যায়ক্রমে শাকসবজি, ফলমূল, আমিষ এবং স্নেহ ও চর্বিজাতীয় খাদ্য সাজালে যে কাল্পনিক পিরামিড তৈরি হয়, তাকে আদর্শ খাদ্য পিরামিড বলে। চিত্রে এই পিরামিডের সবচেয়ে উপরে রয়েছে স্নেহ বা চর্বিজাতীয় খাদ্য আর সবচেয়ে নিচে রয়েছে শর্করা।

আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খাবার তালিকায় যেসব খাবার থাকে তা 5.4 চিত্রে পিরামিডের আকারে দেখানো হলো। খেয়াল করে দেখ, পিরামিডের অংশগুলো তার আকার অনুযায়ী নিচের দিকে চওড়া এবং উপরের দিকে সরু। সবচেয়ে চওড়া অংশে ভাত, আলু, রুটি এসব। এগুলো বেশি করে খেতে হবে। তার পরের অংশে আছে শাকসবজি এবং ফলমূল। এসব ভাত, রুটির চেয়ে কম খেতে হবে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, পনির, ছানা, দই আরও কম পরিমাণে খেতে হবে। তেল, চর্বি ও মিষ্টিজাতীয় খাবার সবচেয়ে কম খাওয়া উচিত। আমাদের প্রতিদিনের খাবার এই খাদ্য পিরামিড অনুযায়ী বেছে নিতে হবে, তবেই আমরা সহজে সুষম খাদ্য নির্বাচন করতে পারব। কোনো কিছু খেতে ভালো লাগলে আমরা অনেক সময় বেশি খেয়ে নেই, সুস্বাস্থ্যের জন্য এ অভ্যাস ভালো নয়। তাই আমাদের সবারই পরিমিত পরিমাণ

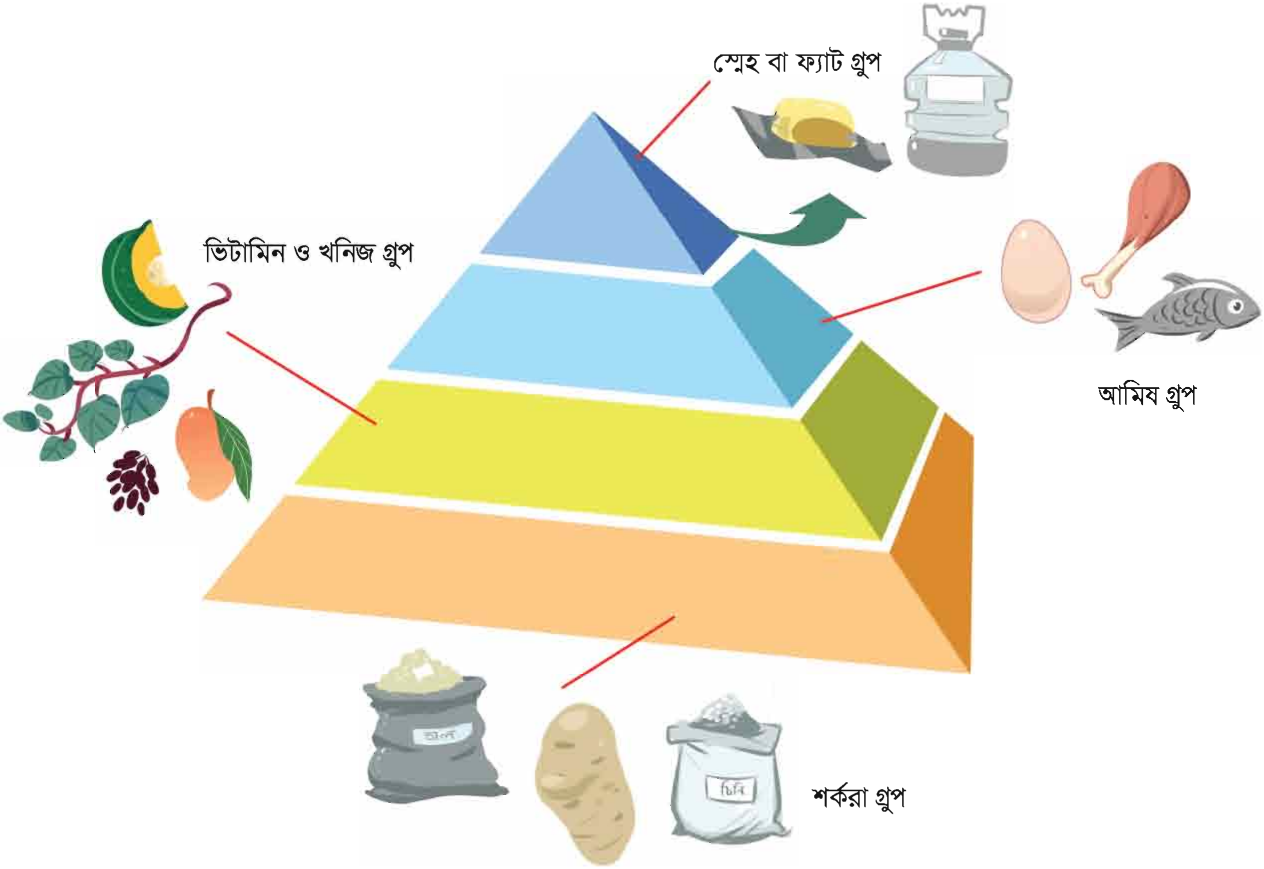

চিত্র 5.04: আদর্শ খাদ্য পিরামিড

খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে, সেই সঙ্গে খাদ্য গ্রহণের নিয়মনীতি এবং সময় মেনে চলতে হবে।

5.2.3 খাদ্য গ্রহণের নীতিমালা (Principles of food habit)

খাদ্য উপাদান বাছাই করা, সুষম খাদ্য নির্বাচন করা ও সুষম আহার করা উন্নত জীবনযাপনের একটি পূর্বশর্ত। এ জন্য খাদ্যগ্রহণ নীতিমালা বা নিয়মনীতি প্রত্যেকের জানা প্রয়োজন। নীতিমালা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকলে খাদ্য নির্বাচন, খাদ্যের পুষ্টিমান, ক্যালরি, পারিবারিক আয় ইত্যাদি সম্পর্কে নজর রেখে পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের খাদ্যের চাহিদা মেটানো সহজ হয়।

সুষম খাদ্যের বৈশিষ্ট্য

(a) একজন মানুষের বিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি উপাদানের সামর্থ্য থাকতে হবে।

(b) শর্করা, আমিষ এবং চর্বি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিমাণ মতো গ্রহণ করতে হবে।

(c) খাদ্যে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও রাফেজ বা সেলুলোজ (ফাইবার) সরবরাহের জন্য সুষম খাদ্য

তালিকায় ফল ও টাটকা শাকসবজি থাকতে হবে।

(d) খাদ্যে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি ও খনিজ লবণ থাকতে হবে।

(e) সুষম খাদ্য অবশ্যই সহজপাচ্য হতে হবে।

সুস্থ, সবল ও উন্নত জীবনযাপনের জন্য সুষম খাদ্যের কোনো বিকল্প নেই। দেহের পরিপুষ্টির জন্য ছয় উপাদানবিশিষ্ট খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করে সুষম খাদ্যের তালিকা বা মেনু পরিকল্পনা করা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেহের চাহিদা, খাদ্যের সহজলভ্যতা এবং পারিবারিক আয়, এ তিনটি বিষয় বিবেচনা করে খাদ্য উপাদান বাছাই বা মেনু পরিকল্পনা করলে তা বাস্তবমুখী হয়। কম দামি খাবার দিয়ে সমান পুষ্টিমানের মেনু পরিকল্পনা করা যায়; তাই সমমানের উপাদান-সংবলিত বেশি দামের খাদ্যের পরিবর্তে কম দামি খাদ্য নির্বাচন করে সুষম খাদ্য গ্রহণের মানসিকতা থাকা ভালো।

সুষম খাদ্যের তালিকা তৈরি

সুষম খাদ্যের তালিকা তৈরির জন্য কতগুলো বিষয়ের দিকে বিশেষ লক্ষ রাখা প্রয়োজন। যেমন:

- ব্যক্তিবিশেষের লিঙ্গ, বয়স, পেশা ও শারীরিক অবস্থা
- খাদ্যের মূল্যমান সম্পর্কে জ্ঞান
- দেহের ক্ষয়পূরণ ও গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আমিষ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ
- খাদ্যে পরিমাণমতো ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানির উপস্থিতি
- ঋতু, আবহাওয়া ও খাদ্যাভাস সম্বন্ধে জ্ঞান
- পরিবারের আর্থিক সংগতি ও সদস্যসংখ্যা

নিচের সারণিগুলো পর্যবেক্ষণ কর। এ থেকে তোমরা বিভিন্ন বয়সী মানুষের খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ ও ক্যালরি চাহিদা সম্পর্কে ধারণা পাবে।

তালিকা (a): পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও নারীর জন্য সুষম খাদ্যতালিকা

পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও নারীর দেহে প্রতিদিনের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রার ক্যালরি পেতে হলে তালিকায় উল্লিখিত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হবে। কিশোর ও যুবা বয়সী ছেলেমেয়েদের বয়স অনুযায়ী পরিমাণে একটু কম খেলেও চলবে।

	পূর্ণবয়স্ক পুরুষ			পূর্ণবয়স্ক নারী		
খাদ্যশস্যের নাম	পরিশ্রমহীন (গ্রাম)	মোটামুটি পরিশ্রমী (গ্রাম)	পরিশ্রমী (গ্রাম)	পরিশ্রমহীন (গ্রাম)	মোটামুটি পরিশ্রমী (গ্রাম)	পরিশ্রমী (গ্রাম)
শিম/বরবটি	20	25	30	20	22.5	25
ডিম মাছ/মাংস	1টি 30	1টি 30	1টি 30	1টি 30	1টি 30	1টি 30
পাতাযুক্ত শাক	40	40	40	100	100	150
অন্যান্য সবজি	60	70	80	40	40	100
আলু	50	60	80	50	50	60
দুধ	150	200	250	100	150	200
তেল/চর্বি	45	50	70	25	30	45
চিনি/গুড়	30	35	55	20	20	40

তালিকা (b): বাংলাদেশের সাধারণ খাদ্যসমূহের পুষ্টিমান

বাংলাদেশের সাধারণ খাদ্যশস্যগুলোর খাদ্যমান বা পুষ্টিমানের উপর ভিত্তি করে এ ছকটি তৈরি করা হয়েছে। এটি The Institute of Nutrition and Food Science (INFS, 1975) কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রকাশিত একটি ছক। প্রতি 100 গ্রাম গ্রহণযোগ্য খাদ্যাংশের ভিত্তিতে ক্যালরি মান নির্ধারণ করা হয়েছে। ক্যালরি মান কীভাবে বের করতে হয়, সেটি এই অধ্যায়েই বর্ণনা করা হয়েছে।

খাদ্যদ্রব্যের নাম (100 gram)	শক্তি (কিলোক্যালরি)
চাল	346
গম (আটা)	341
ছোলা	360
মসুর	343
গাজর	48
গোল আলু	97
কলমিশাক	28
পুঁইশাক	26
কুমড়া (ছোট)	60
বেগুন	24
ফুলকপি	30
বাঁধাকপি	27
বরবটি	26

খাদ্যদ্রব্যের নাম (100 gram)	শক্তি (কিলোক্যালরি)
শিম	96
ইলিশ মাছ	273
কাতলা মাছ	111
চিংড়ি	89
গো-মাংস	114
ডিম	173
মুরগির মাংস	109
খাসির মাংস	194
গরুর দুধ	67
মায়ের দুধ (মানুষ)	65
গরুর দুধের ঘি	900
রান্নার তেল	900

একক কাজ

কাজ: তালিকা থেকে শর্করা, আমিষ, চর্বিজাতীয় খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত কর।

এছাড়া অন্য যে বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে তা হলো:

- খাদ্য তৈরি, পরিবেশন ও গ্রহণের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।
- দৈনিক পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান করা। পানি অবশ্যই ফুটিয়ে পান করতে হবে।
- টাটকা সবুজ শাকসবজি, মৌসুমি ফলমূল গ্রহণ। প্রতিদিন খাদ্যতালিকায় এগুলো থাকা আবশ্যক। টিনজাত ও হিমায়িত শাকসবজি না খাওয়াই উত্তম।

একক কাজ

কাজ: শিক্ষার্থী তার 7 দিনের গৃহীত খাদ্যের একটি তালিকা তৈরি করে এটিকে সুষম খাদ্যের সাথে তুলনা করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

5.3 পুষ্টির অভাবজনিত রোগ

(a) গয়টার (Goitre):

প্রচলিত অর্থে গলগণ্ড বলতে থাইরয়েড গ্রন্থির যেকোনো ফোলাকে বোঝায়। গলগণ্ডের কিছু বিশেষ ধরনকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে গয়টার নামে ডাকা হয়, অর্থাৎ সব গলগণ্ড গয়টার নয়। টিউমার, ক্যান্সার, প্রদাহসহ নানা কারণে থাইরয়েড ফুলে যেতে পারে, সেগুলো গয়টার নয়। আবার, গয়টার থাইরয়েড গ্রন্থির কোনো নির্দিষ্ট রোগ বোঝায় না, বরং থাইরয়েডের বিভিন্ন রোগের এক সাধারণ বহিঃপ্রকাশকে বোঝায়। নানা কারণে গয়টার হতে পারে। খাবারে আয়োডিনের অভাব গয়টার তথা গলগণ্ডের অন্যতম কারণ। সমুদ্র থেকে দূরে উত্তর বঙ্গ এবং পার্বত্য এলাকার মাটিতে আয়োডিন কম থাকায় ওই সব অঞ্চলের মানুষের এই সমস্যা বেশি দেখা যায়।

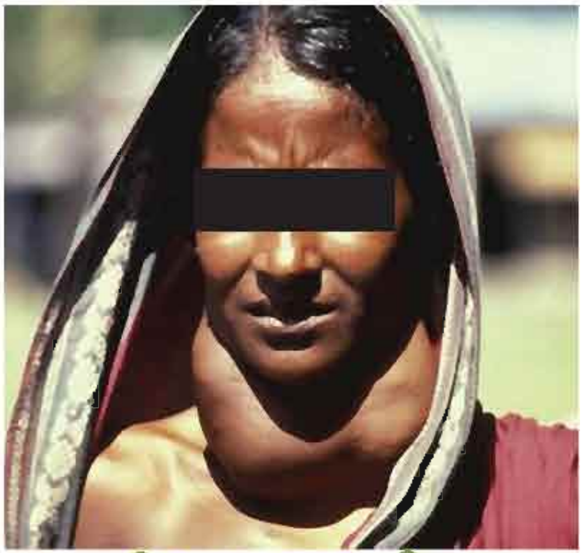
[redacted]

চিত্র 5.05: গলগণ্ড রোগী

(b) রাতকানা (Night Blindness):

ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জেরোফথ্যালমিয়া (Xerophthalmia) নামক রোগ হয়। ভিটামিন 'এ'-এর অভাব পূরণ না হলে রোগটির মাত্রা ও তীব্রতা বাড়তে থাকে। জেরোফথ্যালমিয়ার সাত থেকে আটটি মাত্রা রয়েছে, যার সর্বনিম্ন মাত্রা হচ্ছে রাতকানা। সাধারণত দুই থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের মধ্যে এ রোগ বেশি দেখা দেয়। এতে চোখের সংবেদী 'রড' কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, স্বল্প

আলোতে ভালো দেখতে পায় না। চোখে সবকিছু ঝাপসা দেখা যায়। রোগটা বেড়ে গেলে কর্নিয়া ঘোলাটে হয়ে যায়। রাতকানা দশা থেকে শুরু করে চতুর্থ বা পঞ্চম মাত্রার জেরোফথ্যালমিয়া ভিটামিন 'এ'-সহ কিছু ওষুধ প্রয়োগে ভালো হয় কিন্তু রোগ চূড়ান্ত মাত্রায় বা তার কাছাকাছি পৌঁছে গেলে কর্নিয়া প্রতিস্থাপন অস্ত্রোপচার ছাড়া আর তেমন কিছু করার থাকে না।

এই রোগ প্রতিরোধের জন্য ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাদ্য, যেমন: মাছের যকৃতের তেল, কলিজা, সবুজ শাকসবজি, রঙিন ফল (পাকা আম, কলা ইত্যাদি) ও সবজি (মিষ্টি কুমড়া, গাজর ইত্যাদি) এবং মলা-ঢেলা মাছ খাওয়া উচিত।

(c) রিকেটস (Rikets):

এটি কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ নয়, ভিটামিন 'ডি' এর অভাবে এ রোগ হয়। অন্ত্রে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষণ, দাঁত ও হাড় গঠন প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় কাজে এই ভিটামিন প্রয়োজন। দুধ, মাখন, ডিম, কডলিভার তেল ও হাঙ্গারের তেলে প্রচুর ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায়। সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে মানুষের ত্বকে জমা থাকা কোলেস্টেরল থেকেও এটি তৈরি হয়, তবে সেক্ষেত্রে ভিটামিন ডি তৈরির শেষ ধাপটি সংঘটিত হয় কিডনিতে।

দেহের হাড়গুলো দুর্বল হওয়া, গিঁট ফুলে যাওয়া, হাড়গুলো বিশেষ করে পায়ের হাড় বেঁকে যাওয়া ইত্যাদি এ রোগের লক্ষণ। এছাড়া এই রোগে অনেক সময় দেহের কাঠামো ঠিক থাকে না, হাড়গুলো ভঙ্গুর হয়ে যায় এবং বক্ষদেশ সরু হয়ে যায়।

শিশুদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন 'ডি' সমৃদ্ধ খাবার খাওয়াতে হবে। চোখ এবং জননাঙ্গ ঢেকে রেখে নবজাতককে কিছুক্ষণ রোদে রাখা ভালো। এতে সূর্যালোকের অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে শরীরে কোলেস্টেরল থেকে ভিটামিন 'ডি' তৈরি হয়। নিয়মিতভাবে সারা শরীর সারা দিন কালো বা গাঢ় রঙের কাপড়ে ঢেকে রাখলে কিংবা দীর্ঘদিন ধরে ঘরের বাইরে না বের হলে ত্বক পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় না এবং এ কারণে ভিটামিন 'ডি'-এর ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

(d) রক্তশূন্যতা (Anemia):

আমাদের দেশে শিশু ও নারীদের ক্ষেত্রে রক্তস্বল্পতা বা রক্তশূন্যতা একটি সাধারণ রোগ। রক্তশূন্যতা হচ্ছে দেহের এমন একটি অবস্থা, যখন বয়স এবং লিঙ্গভেদে রক্তে হিমোগ্লোবিনের ঘনত্ব স্বাভাবিকের তুলনায় কমে যায়। খাদ্যের মুখ্য উপাদান লৌহ, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন বি-12 ইত্যাদির অভাব ঘটলে এ রোগ দেখা যায়। রক্তস্বল্পতার শতাধিক কারণ জানা গেছে এবং পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি না হয়েও রক্তস্বল্পতা হতে পারে। তবে বাংলাদেশে সাধারণত লৌহের ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতা বেশি হয়। শিশুদের, প্রজননের উপযুক্ত বয়সী নারীদের (15-45 বছর) এবং গর্ভবতীদের এই রোগ বেশি হয়। লৌহের ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতা বা রক্তশূন্যতা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। যেমন, অত্যধিক রক্তপাত ঘটলে, কৃমির আক্রমণে, লৌহ গঠিত খাদ্য উপাদান শরীরে যথাযথভাবে শোষিত না হলে, বাড়ন্ত শিশু বা গর্ভবতী নারীদের খাদ্যে

লৌহের পরিমাণ কম থাকলে, অন্ত্রে সংক্রমণ ঘটলে, কম বয়সী শিশুদের খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ লৌহের অভাব হলে। রক্তশূন্যতা হলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা দেয়: দুর্বলতা অনুভব করা, মাথাব্যথা, মনমরা ভাব, অনিদ্রা, চোখে অন্ধকার দেখা, খাওয়ার অরুচি, বুক ধড়ফড় করা ইত্যাদি।

এ রোগ প্রতিরোধের জন্য লৌহসমৃদ্ধ খাবার, যেমন যকৃৎ, মাংস, ডিম, চিনাবাদাম, শাকসবজি, বরবটি, মসুর ডাল, খেজুরের গুড় খেতে হয়। পরীক্ষা করে অন্ত্রে কৃমির বা হুকওয়ার্ম-এর সংক্রমণ নিশ্চিত হলে কৃমিনাশক ওষুধ সেবন করা যায়। প্রয়োজন হলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী লৌহ উপাদানযুক্ত ওষুধ সেবন করে এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া রক্তস্বল্পতার চিকিৎসা করা বিপজ্জনক হতে পারে। কেননা রক্তস্বল্পতার এমন কিছু ধরন (যেমন: থ্যালাসেমিয়া) রয়েছে, যেখানে প্রচলিত মাত্রায় লৌহজাতীয় ওষুধ বা খাদ্য গ্রহণ করলে রোগী আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই রক্তস্বল্পতার চিকিৎসা শুরু করার আগে তার সঠিক কারণ নির্ণয় করা আবশ্যক।

একক কাজ

কাজ: স্বাস্থ্য সম্মত জীবনযাপনে পুষ্টির অবদান বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পোস্টার অঙ্কন কর।

5.4 পুষ্টির উপাদানে শক্তি

আমরা জানি, খাদ্য আমাদেরকে পুষ্টি ও শক্তি দেয়। কিন্তু কী পরিমাণ খাদ্য উপাদান থেকে কী পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়, আমরা কি সেটি জানি? আবার বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান থেকে নির্গত শক্তির পরিমাণও কি এক? খাদ্যের ছয়টি পুষ্টি উপাদানের মধ্যে শুধু শর্করা, প্রোটিন এবং চর্বিজাতীয় উপাদান শক্তি দিতে পারে। বাকি উপাদান তিনটি শক্তি দিতে পারে না।

আমাদের দেহের মাংসপেশি আমাদের চলনে সাহায্য করে। মাংসপেশির কারণে আমরা চলতে, ফিরতে, হাঁটতে, দৌড়াতে, বসতে ইত্যাদি কাজে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। মাংসপেশির এ ধরনের কাজে সহায়তার জন্য কী পরিমাণ শক্তি খরচ হয়? পেশির সংকোচন প্রসারণে শক্তি দরকার হয়। সুতরাং, মাংসপেশি যত বেশি সংকুচিত ও প্রসারিত হবে, শক্তিও তত বেশি খরচ হবে। তাই কাজের উপর নির্ভর করে শক্তি ব্যয়ের পরিমাণ। তবে কি হাঁটা, চলা ও নড়াচড়া না করলে শক্তি খরচ হয় না?

আমরা যদি কোনো কাজ না করি, শুধু শুয়ে বসে থাকি, তবুও আমাদের খাদ্যের দরকার হয়, ক্ষুধা লাগে, বিশ্রামরত অবস্থায় শক্তি খরচ হয় বলে মনে হয়। কিন্তু কীভাবে?

বিশ্রামাবস্থায় আমাদের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন হাত, পা কাজ করে না, কিন্তু আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ড ঠিকই চলতে থাকে। এদের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশিগুলোর সংকোচন-প্রসারণে সার্বিক কাজ সাধিত

হয়, কাজেই তখনও শক্তি ব্যয় হতে থাকে। এই শক্তিকে মৌলবিপাক শক্তি বলে। একজন লোকের দৈনিক কী পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন তা প্রধানত নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর, মৌলবিপাক, দৈহিক পরিশ্রমের ধরন ও খাদ্যের প্রভাব। এছাড়া দেহের বৃদ্ধির শারীরিক অবস্থা ও আবহাওয়ার উপরও ক্যালরির চাহিদা নির্ভর করে।

5.4.1 খাদ্য শক্তি পরিমাপের একক

তোমরা জান, শক্তির বিভিন্ন রূপ রয়েছে। পুষ্টি উপাদান থেকে নির্গত শক্তি হচ্ছে তাপশক্তি। তাপশক্তির একক হচ্ছে ক্যালরি। পদার্থবিজ্ঞানের হিসেবে এক কিলোগ্রাম (1000 গ্রাম) পানির উষ্ণতা 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি করতে 1000 ক্যালরি বা 1 কিলোক্যালরি তাপের প্রয়োজন হয়। পুষ্টিবিদেরা খাদ্যের শক্তি বোঝানোর জন্যেও "ক্যালরি" শব্দটি ব্যবহার করে থকেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খাদ্যের ক্যালরি আসলে কিলোক্যালরি। বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য এই বইয়ে খাদ্য শক্তি বোঝানোর জন্য খাদ্য ক্যালরি অথবা কিলোক্যালরি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সংস্থার মতে, খাদ্যের শক্তিমূল্য প্রকাশের ক্ষেত্রে খাদ্য ক্যালরি কিংবা কিলোক্যালরির পরিবর্তে কিলোজুল একক ব্যবহার করা উচিত।

এক্ষেত্রে 1 খাদ্য ক্যালরি = 1 কিলোক্যালরি = 4.2 কিলোজুল (প্রায়)।

5.4 .2 পুষ্টির উপাদানে তাপশক্তি নির্ণয়

প্রতিদিন আমরা নানা রকম পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে থাকি। ভাত, খিচুড়ি, পোলাও, মাংস থেকে শুরু করে ফলমূল, শাকসবজি, পানীয় ইত্যাদির কোনোটিই বাদ যায় না। তাই পুষ্টি উপাদানে শক্তি পরিমাপ করতে হলে এর প্রকৃতি জেনে নিতে হবে।

পুষ্টির প্রকৃতি, মিশ্রখাদ্য ও বিশুদ্ধ খাদ্য: খাদ্যের প্রকৃতি বলতে এটা কি মিশ্রখাদ্য, নাকি বিশুদ্ধ খাদ্য তাকে বোঝায়। মিশ্রখাদ্যে একের অধিক পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকে। যেমন: দুধ, ডিম, খিচুড়ি, পেয়ারা ইত্যাদি। অন্যদিকে বিশুদ্ধ খাদ্যে শুধু একটি উপাদান থাকে। যেমন: চিনি, গ্লুকোজ। এতে শর্করা ছাড়া অন্য কিছু থাকে না।

পুষ্টি উপাদান ও তার পরিমাণ নির্ণয়: পুষ্টি উপাদানের প্রকৃতি জানার পর ঐ খাদ্যে কী কী উপাদান কী পরিমাণে আছে তা জেনে নিতে হবে। তবে বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টি উপাদান ও তার পরিমাণ খাদ্য মূল্যতালিকা দেখে জেনে নিতে হয়।

ক্যালরি নির্ণয়: খাদ্যের পুষ্টি উপাদান ও তার পরিমাণ জানার পর শর্করা, প্রোটিন ও চর্বির ক্যালরি বের করতে হয়। এক্ষেত্রে ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানির ক্যালরি মূল্য শূন্য ধরে হিসাব করতে হবে।

খাদ্য উপাদানে খাদ্য ক্যালরির পরিমাণ

উপাদান (1 গ্রাম)	খাদ্য ক্যালরি
শর্করা	4
আমিষ	4
চর্বি	9

উদাহরণ

প্রশ্ন: 20 গ্রাম চিড়ায় 15.4 গ্রাম শর্করা (77%), 1.32 গ্রাম প্রোটিন (6.6%) এবং 0.24 গ্রাম স্নেহ (1.2%) আছে, 1 কেজি চিড়াতে খাদ্যশক্তির পরিমাণ কত?

উত্তর: খাদ্য উপাদানে খাদ্য ক্যালরির ছক ব্যবহার করে:

15.4 গ্রাম শর্করা থেকে 15.4 × 4 = 61.60 খাদ্য ক্যালরি
1.32 গ্রাম প্রোটিন থেকে 1.32 × 4 = 5.28 খাদ্য ক্যালরি
0.24 গ্রাম স্নেহ থেকে 0.24 × 9 = 2.16 খাদ্য ক্যালরি

অতএব, 20 গ্রাম চিড়ায় মোট = 69.04 খাদ্য ক্যালরি কিংবা 69.04 কিলোক্যালরি
এ হিসাবে, 1 কেজি চিড়ার খাদ্য ক্যালরি = 1000 × (69.04/20) = 3452 কিলোক্যালরি
যেহেতু 1 কিলোক্যালরি = 4.2 কিলোজুল
অতএব, 3452 কিলোক্যালরি = 14,490 কিলোজুল (প্রায়)

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দিনে 2000 থেকে 2500 খাদ্য ক্যালরির প্রয়োজন হয়। তবে লিঙ্গ, পরিশ্রমের মাত্রা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে এই সংখ্যাটি একটু বাড়তে বা কমতে পারে। প্রয়োজন থেকে বেশি কিলোক্যালরি গ্রহণ করলে সেটি মেদ হিসেবে শরীরে জমা হয়ে যায়।

একক কাজ

কাজ : তোমার দৈনিক প্রয়োজন 2000 কিলোক্যালরি ধরে নিয়ে সুষম খাদ্য বিবেচনা করে সারা দিনের জন্য তোমার পছন্দের একটি খাবারের মেনু তৈরি কর।

5.5 বিএমআর (BMR) এবং বিএমআই (BMI)

বিএমআর (Basal Metabolic Rate) পূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থায় মানবশরীরে ব্যবহৃত শক্তির পরিমাণ নির্দেশ করে।

বিএমআই (Body Mass Index) মানবদেহের গড়ন ও চর্বির একটি সূচক নির্দেশ করে।

শরীরের সুস্থতা এবং স্থূলতার মান নির্ণয়ে এই মানদণ্ড দুটি খুবই উপযোগী।

5.5.1 বিএমআর মান নির্ণয়

বিএমআর মান বের করা একটু কঠিন, এর সমীকরণ লিঙ্গ ও বয়সভেদে পার্থক্য আছে। বিএমআর সম্পর্কে ধারণা পেতে বহুল ব্যবহৃত হ্যারিস বেনেডিক্ট সূত্রটি ব্যবহার করা যায়।

মেয়েদের বিএমআর = 655 + (9.6 × ওজন কেজি) + (1.8 × উচ্চতা সে.মি.) - (4.7 × বয়স বছর)
ছেলেদের বিএমআর = 66 + (13.7 × ওজন কেজি) + (5 × উচ্চতা সে.মি.) - (6.8 × বয়স বছর)

ধরা যাক একজন নারীর বয়স 33 বছর, উচ্চতা 165 সে.মি. এবং ওজন 94 কেজি।

সুতরাং তার বিএমআর = 655 + (9.6 × 94) + (1.8 × 165) - (4.7 × 33)
= 655 + 902.4 + 297 - 155.1
= 1699.3 ক্যালরি

নিচের ছকটি ব্যবহার করে বিএমআর এর মান থেকে আমাদের দৈনিক ক্যালরির চাহিদা বের করা যায়।

শারীরিক অবস্থা	ক্যালরি মান
পরিশ্রমী না হলে	বিএমআর মান × 1.2
হালকা পরিশ্রমী, সপ্তাহে 2-3 দিন খেলাধুলা করলে	বিএমআর মান × 1.375
পরিশ্রমী, সপ্তাহে 2-3 দিন প্রচুর খেলাধুলা করলে	বিএমআর মান × 1.55
পরিশ্রমী, সপ্তাহে প্রতিদিন প্রচুর খেলাধুলা করলে	বিএমআর মান × 1.725
অত্যন্ত পরিশ্রমী, প্রচুর দৌড়ঝাঁপ, খেলাধুলা করলে	বিএমআর মান × 1.9

উদাহরণ হিসেবে উপরের নারীটি পরিশ্রমী হয়ে থাকলে, প্রতিদিন প্রচুর খেলাধুলা করলে এবং তার বিএমআর মান 1699.3 হলে তার ক্যালরি চাহিদার মান (1699.3 X 1.725) 2,931.29। অর্থাৎ প্রতিদিন 3,000 কিলোক্যালরির কাছাকাছি খাদ্য গ্রহণ করলে সেই নারীটি তার ওজন একই রাখতে পারবে।

বিএমআর ও ব্যয়িত শক্তির সম্পর্ক

বিএমআরের মান বয়স, লিঙ্গ, খাদ্যাভ্যাস ও শরীরের গঠনের উপর নির্ভর করে। আমাদের দৈনিক খাদ্য চাহিদার সাথে বিএমআরের মান নিয়ন্ত্রণ লক্ষ করা যায়। বিএমআর আমাদের শরীরের 60 থেকে 75 ভাগ শক্তির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের শরীর খাদ্যগ্রহণের মাধ্যমে মাত্র 10-20 শতাংশ এবং শারীরিক শ্রমের মাধ্যমে 20 থেকে 30 শতাংশ শক্তি পেয়ে থাকে। মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে বিএমআরের মান কমতে থাকে, আবার অনেকেই ওজন কমানোর জন্য খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে ফেলে। এতে বিএমআর মান আরও কমে যায়, ফলে আর কম খেয়ে শুকানো যায় না। যদি প্রতিদিন পরিমিত শারীরিক পরিশ্রম করা হয়, তাহলে বিএমআরের মান বেড়ে যায় এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে শরীরকে সুস্থ-সবল রাখা যায়।

5.5.2 বিএমআই মান নির্ণয়

বিএমআই = দেহের ওজন (কেজি)/ দেহের উচ্চতা (মিটার)^2

উদাহরণ হিসেবে 125 সেমি (1.25 মিটার) উচ্চতা এবং 50 কেজি ওজনের একজন ব্যক্তির বিএমআই হচ্ছে 32।

বিএমআই মান	করণীয়
18.5-এর নিচে	শরীরের ওজন কম। পরিমিত খাদ্যগ্রহণ করে ওজন বাড়াতে হবে।
18.5-24.9	সুস্বাস্থ্যের আদর্শ মান।
25-29.9	শরীরের ওজন অতিরিক্ত। ব্যায়াম করে অতিরিক্ত ওজন কমানো প্রয়োজন।
30-34.9	মোটা হওয়ার প্রথম স্তর। বেছে খাদ্যগ্রহণ ও ব্যায়াম করা প্রয়োজন।
35-39.9	মোটা হওয়ার দ্বিতীয় স্তর। পরিমিত খাদ্যগ্রহণ ও ব্যায়াম করা প্রয়োজন।
40 এর উপরে	অতিরিক্ত মোটাত্ব। মৃত্যুঝুঁকির আশঙ্কা। ডাক্তারের পরামর্শের প্রয়োজন।

বিএমআই মানদণ্ডে ব্যক্তিটির সুস্বাস্থ্যের জন্য 38 কেজি ওজন হওয়া প্রয়োজন। অতএব সঠিক পুষ্টি গ্রহণ এবং ব্যায়ামের মাধ্যমে ওজন স্বাস্থ্যসম্মত মানে নিয়ে যেতে হবে।

একক কাজ

কাজ : তোমার বিএমআর বের করে সেখান থেকে প্রতিদিন তোমার কত কিলোক্যালরি খাওয়া উচিত বের কর।

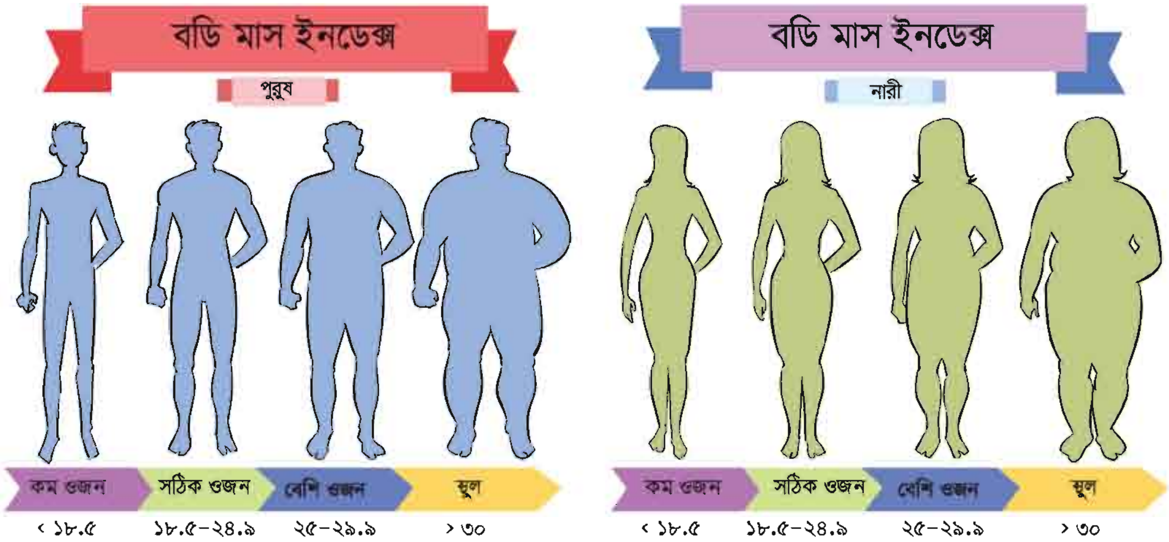
বডি মাস ইনডেক্স
পুরুষ
কম ওজন
সঠিক ওজন
বেশি ওজন
স্থূল
< ১৮.৫
১৮.৫–২৪.৯
২৫–২৯.৯
> ৩০
বডি মাস ইনডেক্স
নারী
কম ওজন
সঠিক ওজন
বেশি ওজন
স্থূল
< ১৮.৫
১৮.৫–২৪.৯
২৫–২৯.৯
> ৩০

চিত্র 5.06: বি এম আই

একক কাজ

কাজ : তোমার বিএমআই বের করে দেখ তোমার খাদ্য গ্রহণ এবং জীবনধারা সঠিক আছে কি না।

দলগত কাজ

কাজ: তোমাদের পুরো শ্রেণির গড় বিএমআর এবং বিএমআই বের করে তার উপরে একটি প্রতিবেদন লেখ।

5.6 শরীরচর্চা ও বিশ্রাম

সুস্থ জীবনের জন্য প্রতিদিন সকলেরই পরিমিত পরিশ্রম করা উচিত। বর্তমানে কাজের ধারা, অতিরিক্ত ইন্টারনেট আসক্তি, পড়াশোনার চাপ, খেলার মাঠের অপ্রতুলতা ইত্যাদি নানা কারণে আমরা খুবই কম হাঁটাচলা কিংবা দৌড়া দৌড়ি করি, ফলে আমাদের সামগ্রিক স্থূলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শরীর সুস্থ, সবল থাকছে না এবং আমরা কর্মবিমুখ হয়ে পড়ছি। পরিমিত শরীরচর্চার মাধ্যমে আমরা আমাদের শরীরের কার্যক্ষমতা অটুট রেখে সুস্থ থাকতে পারি। দেখা গেছে, যারা প্রতিদিন এক ঘণ্টা মাঝারি মানের শরীরচর্চা করে, পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করে, তারাই সুস্থ এবং হাসিখুশি জীবনযাপন করে এবং দীর্ঘজীবন লাভ করে। শরীরচর্চার মাধ্যমে দেহের অতিরিক্ত ওজন কমানো সম্ভব। শরীরচর্চার ফলে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং বেশ কয়েক ধরনের ক্যান্সার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন রকমের শরীরচর্চা আছে,

জোরে হাঁটা, জগিং, দৌড়, সাঁতারকাটা, খেলাধুলা করা, সাইকেল চালানো— এগুলো শরীরচর্চার অংশ।

আমাদের শরীরের জন্য বিশ্রাম অত্যন্ত প্রয়োজন। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের পরই বিশ্রামের প্রয়োজন। শুয়ে থাকা, ঘুমানো ইত্যাদি বিশ্রামের অংশ। বিশ্রামের ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশ পুনঃশক্তি সঞ্চয় করে। জীবজগতের প্রায় প্রতিটি প্রাণীই বিশ্রাম নেয়। এই বিশ্রাম দিন এবং রাত্রির চক্রের সাথে সম্পৃক্ত। অনেক প্রাণী আছে যারা সূর্যালোকে কর্মক্ষম থাকে। আবার অনেক প্রাণী আছে যারা দিনে বিশ্রাম নেয় কিন্তু রাতে কর্মক্ষম হয়ে খাদ্যের খোঁজে বের হয়। এদের নিশাচর বলে।

5.7 খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার

খাদ্য সংরক্ষণ এমন একটি প্রক্রিয়া, যেটি খাদ্যের পচন রোধ করে, যার ফলে খাদ্যের গুণাগুণ, গ্রহণযোগ্যতা এবং খাদ্যমান অটুট থাকে। খাদ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে সাধারণত পচনসৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের সংক্রমণ এবং খাদ্যের চর্বিজাতীয় অংশের জারণ বন্ধ করা হয়।

মাছের শুঁটকিকরণ, লোনা ইলিশ, আচার, বরফ দিয়ে শীতলকরণ, চিংড়ির নাপতে, মাছের শীদল এগুলো সবই খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন প্রচলিত উপায়। আজকাল খাদ্যদ্রব্যের ক্যানিং বা কৌটাজাত করে, ধোঁয়ার মাধ্যমে স্মোকিং প্রভৃতি প্রক্রিয়া খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহার করা হয়। খাদ্য সংরক্ষণে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসম্মত অনুমোদিত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়, যাতে খাদ্যদ্রব্যে পচন সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক সংক্রমণ করতে না পারে। সাধারণত সোডিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাবার লবণ, ক্যালসিয়াম এপারনেট, সালফার ডাই-অক্সাইড, সোডিয়াম বাইসালফেট, সোডিয়াম বেনজয়েট, সরবেট (পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম) খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে অনুমোদিতভাবে ব্যবহার করা হয়। স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণে ক্ষতিকারক ফরমালিন এবং বিভিন্ন রকমের রঞ্জক পদার্থ কখনোই খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহার করা উচিত নয়।

খাদ্যে ভেজাল ও রঞ্জকের ব্যবহার

এই সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের নির্মল পরিবেশের যেমন প্রয়োজন, তেমনি নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ অপরিহার্য। বর্তমানে বাজারে অনৈতিকভাবে খাদ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর ও অস্বাস্থ্যকর রাসায়নিক দ্রব্য ভেজাল ও রঞ্জক পদার্থ হিসেবে ব্যবহার করে সেগুলো বিক্রি করা হয়। এর ফলে জনস্বাস্থ্য এখন হুমকির সম্মুখীন। স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের এই ঝুঁকির ধারা চলতে থাকলে রোমানদের মতো আমরাও একদিন বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখোমুখি হব। (একসময় রোমবাসী যে পানীয় আধার ব্যবহার করত তা সিসার তৈরি ছিল। যার ফলে পানকারী কোনো না কোনোভাবে সিসার বিষাক্ততার শিকার হয়েছে এবং বিকলাঙ্গ প্রজন্মের জন্ম দিয়েছে।) বাংলাদেশে খাদ্যে বিভিন্ন প্রকারের ভেজাল মেশানো হয়। এর মধ্যে বাণিজ্যিক রং, এন্টিবায়োটিক, কীট ও বালাইনাশক, ফরমালিন, হেভি মেটাল উল্লেখযোগ্য। যেসব মাছ, গৃহপালিত পশু ও হাঁস-মুরগিকে অননুমোদিত দ্রব্য দিয়ে তৈরি খাদ্য খাওয়ানো হয়, সেগুলো মানবশরীরের জন্য হুমকিস্বরূপ।

স্বাস্থ্যঝুঁকির কয়েকটি ক্ষতিকারক দিক

বাণিজ্যিক রং যা কাপড় কিংবা রঙের কাজে ব্যবহার করা হয়, তা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য, যেমন আইসক্রিম, গোলা আইসক্রিম, লজেন্স, বেগুনি, বড়া ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই জাতীয় খাবার ধীরে ধীরে যকৃতের কার্যকারিতা নষ্ট করে নানাবিধ রোগের কারণ হয়।

ফরমালিনে ডুবানো মাছ, ফল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যে পচন সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া জন্ম নিতে পারে না বলে কয়েক দিন বেশ টাটকা দেখা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, এই ফরমালিন মাছের কোষের সাথে যৌগ তৈরি করে ফেলে। মাছ ধোয়া হলেও ঐ যৌগটি মাছের দেহে থেকে যায়। যা পরে রান্না করা মাছের সাথে মানবদেহে প্রবেশ করে। এই বিষাক্ত যৌগ নানা রকম জটিল রোগের উপসর্গের কারণসহ অনেক ক্ষেত্রে ক্যান্সারজাতীয় রোগের সৃষ্টি করে।

মজুত খাদ্যে এবং সবজিতে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। কীটনাশকের বিষাক্ততার সময় নষ্ট হবার আগেই দ্রব্যাদি বাজারজাত করলে বিষাক্ত খাদ্যের প্রভাবে স্বাস্থ্যঝুঁকির আশঙ্কা থাকে। এতে শিশুরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশি। তাদের শরীরের বাড়ন্ত কোষে এই বিষাক্ত কীটনাশক বিরূপ প্রভাব ফেলে। ফলে একদিকে যেমন শিশুর মনের বিকাশ ব্যাহত হয়, অন্যদিকে তারা নানা রকমের অসুস্থতায় ভুগে থাকে।

খাদ্যে যেসব রাসায়নিক দ্রব্য ও ভেজাল থাকে, তার একটি তালিকা দেওয়া হলো।

ভেজাল বা বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য	সম্ভাব্য উৎস	প্রতিকার
1. এন্টিবায়োটিক	মাছ ও পশুখাদ্যে ব্যবহারের ফলে প্রাণীর শরীরে জমা হয়।	শুধু অনুমোদিত ওষুধ রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক ব্যবহার করতে হবে।
2. হেভি মেটাল	মাছ ও পশুখাদ্যে ব্যবহৃত অখাদ্য উপাদান (যেমন ট্যানারির বর্জ্য) প্রাণীর শরীরে জমা হয়।	অখাদ্য উপাদান যেমন ট্যানারির বর্জ্য, কয়লা, মাটি, প্রাণীর বিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যবহার পরিহার করা।
3. বাণিজ্যিক রং	আইসক্রিম, গোলা-আইসক্রিম, শরবত, রঙিন পানীয়, ভাজা বড়া ও বিভিন্ন মিষ্টি তৈরিতে কারখানায় ব্যবহৃত রংয়ের অননুমোদিত ব্যবহার।	শুধু অনুমোদিত খাদ্যরং ব্যবহার করা।
4. ফরমালিন	মর্গে লাশ সংরক্ষণের প্রধান উপাদান। মাছ, দুধ, ফল ইত্যাদি সংরক্ষণে অননুমোদিত ব্যবহার।	ফরমালিন ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা।
5. কীটনাশক	শাক-সবজি উৎপাদনে বালাইনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে বিষাক্ততা অনেক ক্ষেত্রে রয়ে যায়। শুঁটকিতে ডিডিটির অননুমোদিত ব্যবহার।	কীটনাশকের বিষাক্ততা নষ্ট হবার পর শাক-সবজি বাজারজাত করা। শুঁটকিতে ডিডিটি ব্যবহার না করা।

6. রাসায়নিক পদার্থ	কাঁচা ফল ও টমেটো পাকাতে মাত্রাতিরিক্ত কারবাইড ও বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের অননুমোদিত ব্যবহার। কোমল পানীয় জলে মাত্রাতিরিক্ত সরবেটের অননুমোদিত ব্যবহার।	ফলকে পাকতে সময় দেওয়া, যেন প্রকৃতিগতভাবে ফল পাকে। কারবাইড ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা। পরিমিত মাত্রায় সরবেট ব্যবহার করা।
7. জীবাণু	খাদ্য উৎপাদন কিংবা প্রস্তুতিকালে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর জীবাণু খাদ্যে মিশে যেতে পারে।	বায়োসিকিউরিটি নিশ্চিতকরণ।

দলগত কাজ

কাজ: শিক্ষক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করবেন এবং ভেজালযুক্ত খাবার খাওয়ার ক্ষতিকর দিকগুলো লিপিবদ্ধ করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে বলবেন।

5.8 পরিপাক

মানবদেহ অসংখ্য কোষের সমন্বয়ে গঠিত। এই কোষগুলোকে সজীব এবং কার্যকর রাখতে হলে সময়মতো খাদ্য সরবরাহ প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ খাদ্য জটিল এবং জৈব যৌগ অবস্থায় গ্রহণ করা হয়। দেহের কোষগুলো তা সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। খাদ্যকে শোষণযোগ্য ও কোষ উপযোগী করতে হলে তাকে ভেঙে সহজ, সরল এবং তরল অবস্থায় রূপান্তরিত করা আবশ্যক।

দেহে দুভাবে খাদ্য শোষিত হওয়ার উপযোগী হয়, যান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

যান্ত্রিক প্রক্রিয়া: খাদ্যদ্রব্য মুখগহ্বরে দাঁতের সাহায্যে চিবানো হয়। প্রথমত চিবানোর ফলে খাদ্যবস্তু ছোট ছোট টুকরায় পরিণত হয়। পাকস্থলী এবং অন্ত্রের মধ্যে এই টুকরা খাদ্যবস্তুগুলো মণ্ডে পরিণত হয়।

রাসায়নিক বিক্রিয়া: রাসায়নিক প্রক্রিয়া পরিপাকের দ্বিতীয় ধাপ। পরিপাক রসের এনজাইম খাদ্যের রাসায়নিক ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে। এতে খাদ্যের জটিল উপাদানগুলো ভেঙে দেহের গ্রহণযোগ্য সরল উপাদানে পরিণত হয়। তাছাড়া কোষের ভিতরকার কর্মকাণ্ড এই এনজাইমের উপর নির্ভরশীল।

পরিপাকতন্ত্র বা পৌষ্টিকতন্ত্র (Digestive System): খাদ্যদ্রব্য পরিপাকের জন্য মানবদেহে পরিপাকতন্ত্র বা পৌষ্টিকতন্ত্র নামে একটি আলাদা তন্ত্র আছে। যে তন্ত্রের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য ভেঙে দেহের গ্রহণ উপযোগী উপাদানে পরিণত ও শোষিত হয়, তাকে পৌষ্টিকতন্ত্র বলে। এ তন্ত্রটি পৌষ্টিকনালি এবং কয়েকটি গ্রন্থি নিয়ে গঠিত। পৌষ্টিকনালি মুখ থেকে শুরু হয়ে পায়ুতে শেষ হয়।

5.8.1 পৌষ্টিকনালি

মুখগহ্বর থেকে পায়ুপথ পর্যন্ত বিস্তৃত এই নালিপথ কোথাও সরু আবার কোথাও প্রশস্ত। এর প্রধান অংশগুলো নিম্নরূপ:

(a) মুখ (Mouth):

মুখ থেকে পৌষ্টিকনালির শুরু হয়। এটি নাকের নিচে আড়াআড়ি একটি বড় ছিদ্র, যেটি উপরে এবং নিচে ঠোঁট দিয়ে বেষ্টিত থাকে।

(b) মুখগহ্বর (Buccal cavity):

মুখের অভ্যন্তরে দাঁত, জিহ্বা ও লালাগ্রন্থি থাকে। এগুলো প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। দাঁত খাদ্যকে চিবিয়ে ছোট ছোট অংশে পরিণত করে। জিহ্বা খাদ্যবস্তুকে নেড়েচেড়ে চিবাতে সাহায্য করে এবং তার স্বাদ গ্রহণ করে। মুখের ভিতরের লালাগন্থি থেকে এনজাইম ক্ষরণ হয়। এই গ্রন্থিগুলো কানের নিচে চোয়ালের পাশে এবং জিহ্বার নিচে অবস্থিত। লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালারসের মিউসিন খাদ্যকে পিচ্ছিল করে গলধঃকরণে সাহায্য করে। লালারসের টায়ালিন ও মলটেজ নামক এনজাইম শর্করা পরিপাকে অংশ নেয়।

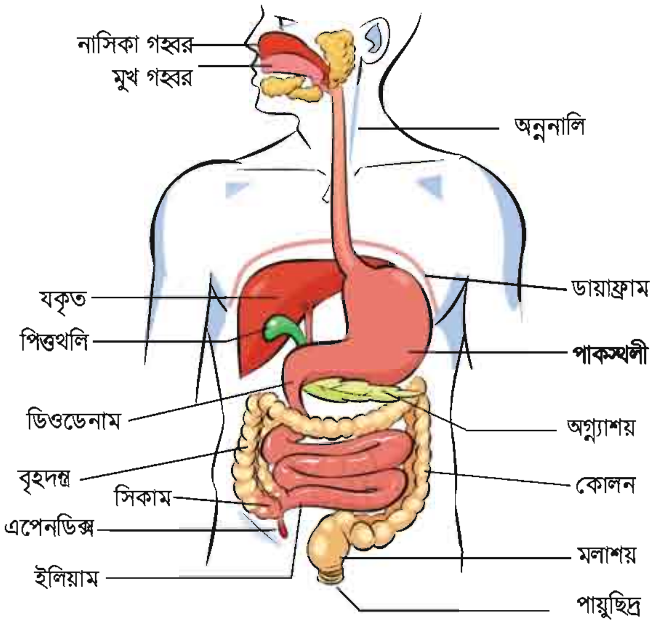

চিত্র 5.07: পরিপাকতন্ত্র

(c) দাঁত (Tooth):

মানবদেহে সবচেয়ে শক্ত অংশ দাঁত। প্রাপ্ত বয়সে মুখগহ্বরে উপরে ও নিচের চোয়ালে সাধারণত 16টি করে মোট 32টি দাঁত থাকে। মানবদেহে দাঁত দুবার গজায়। প্রথমবার শিশুকালে দুধদাঁত, দুধদাঁত পড়ে গিয়ে 18 বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার স্থায়ী দাঁত গজায়।

মানুষের স্থায়ী দাঁত চার ধরনের। সেগুলো হচ্ছে:

(i) কর্তন দাঁত (Incisor): এই দাঁত দিয়ে খাবার কেটে টুকরা করা হয়।
(ii) ছেদন দাঁত (Canine): এই দাঁত দিয়ে খাবার ছেঁড়া হয়।
(iii) অগ্রপেষণ দাঁত (Premolar): এই দাঁত দিয়ে চর্বণ, পেষণ উভয় কাজ করা হয়।
(iv) পেষণ দাঁত (Molar): এই দাঁত খাদ্যবস্তু চর্বণ ও পেষণে ব্যবহৃত হয়।

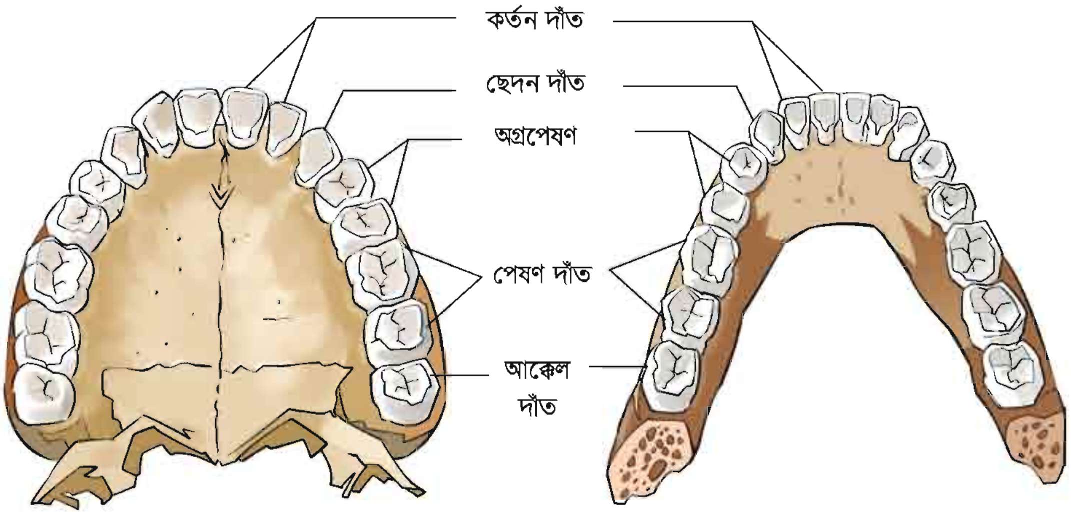
কর্তন দাঁত
ছেদন দাঁত
অগ্রপেষণ
পেষণ দাঁত
আক্কেল
দাঁত

চিত্র 5.08: বিভিন্ন ধরনের দাঁত, উপরের পাটি (বামে) এবং নিচের পাটি (ডানে)

মাড়ির সবচেয়ে পেছনের বা শেষের দাঁত দুটোকে আক্কেল দাঁত বলা হয়। প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ৪টি কর্তন দাঁত, 4টি ছেদন দাঁত, ৪টি অগ্রপেষণ দাঁত, ৪টি পেষণ দাঁত এবং 0-4টি আক্কেল দাঁত থাকে।

দাঁতের গঠন: প্রতিটি দাঁতের তিনটি অংশ থাকে:

- **(i) মুকুট:** মাড়ির উপরের অংশ;
- **(ii) মূল:** মাড়ির ভিতরের অংশ;
- **(iii) গ্রীবা:** দাঁতের মধ্যবর্তী অংশ।

প্রতিটি দাঁত যেসব উপাদান দিয়ে গঠিত তা হলো:

(i) ডেন্টিন (Dentine) : দাঁত প্রধানত ডেন্টিন নামক শক্ত উপাদান দিয়ে গঠিত।

(ii) এনামেল (Enamel) : দাঁতের মুকুট অংশে ডেন্টিনের উপরিভাগে এনামেল নামক কঠিন উপাদান থাকে। এনামেল এবং ডেন্টিন ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং ফ্লোরাইড দিয়ে তৈরি।

(iii) দন্তমজ্জা (Pulp) : ডেন্টিনের ভিতরের ফাঁপা নরম অংশকে দন্তমজ্জা বলে। এর ভিতরে ধমনি, শিরা, স্নায়ু ও নরম কোষ থাকে। দন্তমজ্জার মাধ্যমে ডেন্টিন অংশে পুষ্টি ও অক্সিজেন সরবরাহ হয়।

(iv) সিমেন্ট (Cement) : সিমেন্ট নামক

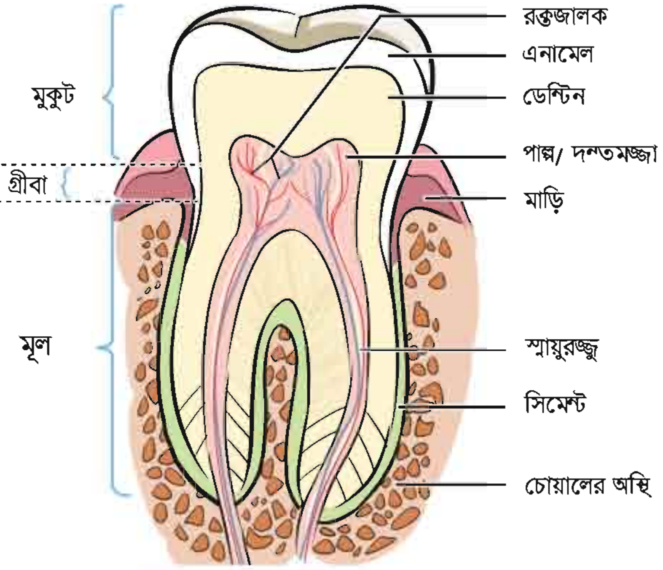
মুকুট
গ্রীবা
মূল
রক্তজালক
এনামেল
ডেন্টিন
পাল্প/ দন্তমজ্জা
মাড়ি
স্নায়ুরজ্জু
সিমেন্ট
চোয়ালের অস্থি

চিত্র 5.09: দাঁতের লম্বচ্ছেদ

পাতলা আবরণ দাঁতের মূল অংশ ডেন্টিনকে আবৃত করে রাখে। এই সিমেন্টের সাহায্যে দাঁত মাড়ির সাথে আটকানো থাকে।

4. গলবিল (Pharynx):

মুখগহ্বরের পরের অংশ গলবিল। মুখগহ্বর থেকে খাদ্যবস্তু গলবিলের মধ্য দিয়ে অন্ননালিতে পৌঁছে।

5. অন্ননালি (Oesophagus):

গলবিল থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত বিস্তৃত নালিটির নাম অন্ননালি। খাদ্যবস্তু এই নালির মধ্যে দিয়ে পাকস্থলীতে পৌঁছে।

6. পাকস্থলী (Stomach):

অন্ননালি এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের মাঝখানে একটি থলির মতো অঙ্গ। এর প্রাচীর পুরু ও পেশিবহুল। পাকস্থলীর প্রাচীরে অসংখ্য গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থাকে। পাকস্থলীর পেশি সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্যবস্তুকে পিষে মণ্ডে পরিণত করে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।

7. অন্ত্র (Intestine):

পাকস্থলীর পরের অংশ অন্ত্র। এটি একটি লম্বা প্যাঁচানো নালি। অন্ত্র দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত, ক্ষুদ্রান্ত ও বৃহদন্ত্র।

(i) ক্ষুদ্রান্ত (Small Intestine):

পাকস্থলী থেকে বৃহদন্ত্র পর্যন্ত বিস্তৃত লম্বা, প্যাঁচানো নলটিকে ক্ষুদ্রান্ত্র বলে। ক্ষুদ্রান্ত্র আবার তিনটি অংশে বিভক্ত, ডিওডেনাম, জেজুনাম ও ইলিয়াম। ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনামে পিত্তথলি থেকে পিত্তনালি এবং অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় নালি এসে মিলিত হয়। পিত্তনালির মাধ্যমে যকৃতের পিত্তরস এবং অগ্ন্যাশয়ের অগ্ন্যাশয় রস ডিওডেনামে এসে পৌঁছে। ক্ষুদ্রান্ত্রের গায়ে আন্ত্রিক গ্রন্থিও থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরে আঙুলের মতো প্রক্ষেপিত অংশ থাকে, এদের ভিলাস বলে। ভিলাস পরিপাককৃত খাদ্য উপাদান শোষণ করে।

(ii) বৃহদন্ত্র (Large Intestine):

ইলিয়াম থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত মোটা নলাকৃতির অংশ হলো বৃহদন্ত্র। বৃহদন্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত, সিকাম, কোলন ও মলাশয়। সিকামের সাথে অ্যাপেনডিক্স নামক ক্ষুদ্র নলের মতো প্রবৃদ্ধি সংযুক্ত থাকে। বৃহদন্ত্রে মূলত পানি শোষিত হয়, মল তৈরি হয় এবং মল জমা থাকে।

(h) পায়ু (Anus):

পৌষ্টিক নালির শেষ প্রান্তে অবস্থিত ছিদ্রপথই হলো পায়ু।

5.8.2 পৌষ্টিক গ্রন্থি (Digestive glands):

যেসব গ্রন্থির রস খাদ্য পরিপাকে অংশ নেয় তাদেরকে পরিপাকগ্রন্থি বা পৌষ্টিকগ্রন্থি বলে। মানবদেহে পৌষ্টিকগ্রন্থিগুলো হলো:

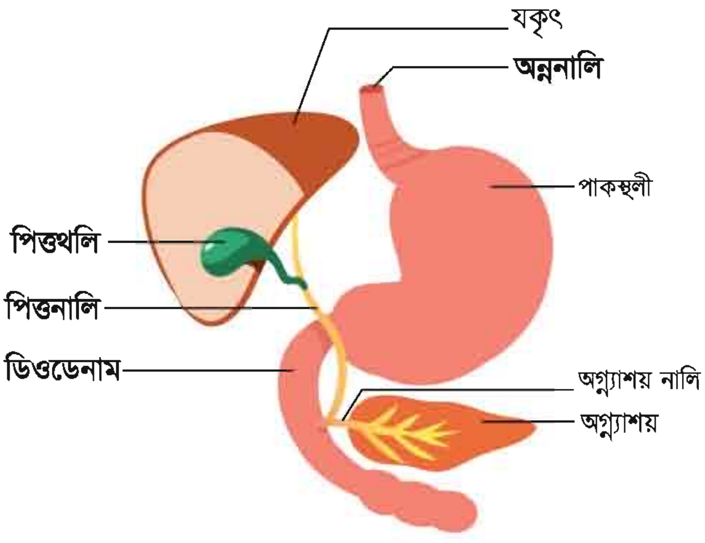

চিত্র 5.10: পৌষ্টিকগ্রন্থি

(a) লালাগ্রন্থি (Salivary glands):
মানুষের তিন জোড়া লালাগ্রন্থি আছে। দুই কানের সামনে ও নিচে এক জোড়া (প্যারোটিডগ্রন্থি), চোয়ালের নিচে একজোড়া (সাব-ম্যাক্সিলারি) এবং চিবুকের নিচে একজোড়া (সাব-লিঙ্গুয়ালগ্রন্থি)। এগুলো পৃথক পৃথক নালির মাধ্যমে মুখগহ্বরে উন্মুক্ত হয়। লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস, লালা (saliva) নামে পরিচিত। লালা রসে টায়ালিন নামক এনজাইম এবং পানি থাকে।

(b) যকৃৎ (Liver):
মধ্যচ্ছদার নিচে উদরগহ্বরের উপরে পাকস্থলীর ডান পাশে যকৃৎ অবস্থিত। এটি মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি। এর রং লালচে খয়েরি। যকৃতের ডান খণ্ডটি বাম খণ্ড থেকে আকারে কিছুটা বড়। প্রকৃতপক্ষে চারটি অসম্পূর্ণ খণ্ড নিয়ে যকৃৎ গঠিত। প্রতিটি খণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোবিউল দিয়ে তৈরি। প্রত্যেকটি লোবিউলে অসংখ্য কোষ থাকে। এ কোষ পিত্তরস (bile) তৈরি করে। পিত্তরস ক্ষারীয় গুণ সম্পন্ন। যকৃতে বিভিন্ন রকম জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, তাই একে রসায়ন গবেষণাগার বলা হয়।

যকৃতের নিচের অংশ পিত্তথলি বা পিত্তাশয় সংলগ্ন থাকে। এখানে পিত্তরস জমা হয়। পিত্তরস গাঢ় সবুজ বর্ণের এবং তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট। পিত্তথলি পিত্তনালির সাহায্যে অগ্ন্যাশয় নালির সাথে মিলিত হয়। এটি যকৃৎ-অগ্ন্যাশয় নালির মাধ্যমে ডিওডেনামে প্রবেশ করে।

একক কাজ

কাজ: পৌষ্টিকতন্ত্রের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

যকৃতের কাজ: যকৃৎ পিত্তরস তৈরি করে। পিত্তরসের মধ্যে পানি, পিত্ত-লবণ, কোলেস্টেরল ও খনিজ লবণ প্রধান। এই রস পিত্তথলিতে জমা থাকে। প্রয়োজনে ডিওডেনামে এসে পরোক্ষভাবে পরিপাকে অংশ নেয়। পিত্তরসে কোনো উৎসেচক বা এনজাইম থাকে না। যকৃৎ উদ্বৃত্ত গ্লুকোজ নিজদেহে

গ্লাইকোজেনরূপে সঞ্চয় করে রাখে। পিত্তরস খাদ্যের অম্লভাব প্রশমিত করে এবং ক্ষারীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই পরিবেশ খাদ্য পরিপাকের অনুকূল। কেননা আম্লিক পরিবেশে খাদ্য পরিপাক হয় না। পিত্তরস চর্বিজাতীয় খাদ্যকে ক্ষুদ্র দানায় পরিণত করে, যা লাইপেজ সহযোগে পরিপাকে সহায়তা করে। অতিরিক্ত অ্যামাইনো এসিড যকৃতে আসার পর বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ও অ্যামোনিয়ারূপে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ তৈরি করে এবং স্নেহজাতীয় পদার্থ শোষণে সাহায্য করে। রক্তে কখনো গ্লুকোজের মাত্রা কমে গেলে যকৃতের সঞ্চিত গ্লাইকোজেনের কিছুটা অংশ গ্লুকোজে পরিণত হয় এবং রক্তস্রোতে মিশে যায়। এভাবে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত থাকে।

(c) অগ্ন্যাশয় (Pancreas):

অগ্ন্যাশয় পাকস্থলীর পিছনে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ মিশ্রগ্রন্থি। এটি একাধারে পরিপাকে অংশগ্রহণকারী এনজাইম ও রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন নিঃসৃত করে। অর্থাৎ অগ্ন্যাশয় বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির মতো কাজ করে। অগ্ন্যাশয়রস অগ্ন্যাশয় নালির মাধ্যমে যকৃৎ-অগ্ন্যাশয়নালি দিয়ে ডিওডেনামে প্রবেশ করে।

অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয়রস নিঃসৃত হয়। অগ্ন্যাশয়রসে ট্রিপসিন, লাইপেজ ও অ্যামাইলেজ নামক উৎসেচক থাকে। এসব এনজাইম শর্করা, আমিষ এবং স্নেহজাতীয় খাদ্যের পরিপাকে সহায়তা করে। তাছাড়াও অম্ল-ক্ষারের সাম্যতা, পানির সাম্যতা, দেহতাপ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে অগ্ন্যাশয়ের একটি অংশ অতি প্রয়োজনীয় কিছু হরমোন, যেমন: গ্লুকাগন ও ইনস্যুলিন নিঃসরণ করে। গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় কাজে এ হরমোন দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(d) গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি (Gastric glands):

গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি পাকস্থলীর প্রাচীরে থাকে। এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস (ট্রিপসিন, লাইপেজ, অ্যামাইলেজ) গ্যাস্ট্রিক রস বা পাচক রস নামে পরিচিত।

(e) আন্ত্রিকগ্রন্থি (Intestinal glands):

ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরে ভিলাইয়ে আন্ত্রিকগ্রন্থি থাকে। এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসের নাম আন্ত্রিক রস।

5.8.3 খাদ্য পরিপাক ক্রিয়া (Digestion of Food):

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মানুষের পৌষ্টিক নালির অভ্যন্তরে জটিল, অদ্রবণীয়, অশোষণযোগ্য খাদ্য উপাদানগুলো নির্দিষ্ট উৎসেচক বা এনজাইম এবং প্রাণরস বা হরমোনের উপস্থিতিতে বিশ্লেষিত হয়ে শোষণযোগ্য এবং দ্রবণীয় সরল উপাদানে পরিণত হয়, তাকে পরিপাক বলে। এ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রথমত সরল দ্রবণীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে কোষ আবরণীর ভিতর দিয়ে অতি সহজে কোষের ভেতরে প্রবেশ করে। সবশেষে রক্ত এই পরিপাককৃত সরল উপাদানগুলোকে দেহের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ করে।

(a) মুখে পরিপাক:

মুখগহ্বরে দাঁত ও জিহ্বার সাহায্যে খাদ্য চিবানোর ফলে খাদ্যবস্তু ছোট ছোট টুকরোয় পরিণত হয়। এ সময় লালাগ্রন্থি থেকে লালা নিঃসৃত হয়ে খাদ্যের সাথে মিশে যায়। লালা খাদ্যবস্তুকে গলাধঃকরণে সাহায্য করে। লালায় টায়ালিন বা স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ নামক উৎসেচক বা এনজাইম থাকে। এটি শ্বেতসারকে মলটোজে পরিণত করে। মুখগহ্বরে আমিষ বা স্নেহজাতীয় খাদ্যের কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না।

মুখগহ্বর থেকে খাদ্যদ্রব্য পেরিস্টালসিস (Peristalsis) প্রক্রিয়ায় অন্ননালির মধ্য দিয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। পৌষ্টিক নালিগাত্রের পেশির পর্যায়ক্রমিক সংকোচন ও প্রসারণের ফলে খাদ্যদ্রব্য সামনের দিকে অগ্রসর হয়। অন্ননালিতে খাদ্যের কোনো পরিপাক ঘটে না।

(b) পাকস্থলীতে পরিপাক:

পাকস্থলীতে খাদ্য আসার পর অন্তঃপ্রাচীরের গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি থেকে গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরিত হয়। এই রসে প্রধান যে উপাদানগুলো থাকে তা হলো:

হাইড্রোক্লোরিক এসিড: হাইড্রোক্লোরিক এসিড খাদ্যের মধ্যে কোনো অনিষ্টকারী ব্যাকটেরিয়া থাকলে তা মেরে ফেলে, নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেনকে সক্রিয় পেপসিনে পরিণত করে এবং পাকস্থলীতে পেপসিনের সুষ্ঠু কাজের জন্য অম্লীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে।

$$\text{নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন} \xrightarrow{\text{HCL}} \text{সক্রিয় পেপসিন}$$

পেপসিন (Pepsin): এক ধরনের এনজাইম, যা আমিষকে ভেঙে দুই বা ততোধিক অ্যামাইনো এসিড দিয়ে তৈরি যৌগ গঠন করে, যা পলি পেপটাইড নামে পরিচিত।

$$\text{আমিষ} \xrightarrow{\text{পেপসিন}} \text{পলিপেপটাইড}$$

শর্করা এবং স্নেহজাতীয় খাদ্য সাধারণত পাকস্থলীতে পরিপাক হয় না। কারণ এদের পরিপাকের জন্য গ্যাস্ট্রিক রসে নির্দিষ্ট কোনো এনজাইম থাকে না।

পাকস্থলীতে খাদ্যদ্রব্য পৌঁছানো মাত্র উপরোক্ত রসগুলো নিঃসৃত হয়। পাকস্থলীর অনবরত সংকোচন ও প্রসারণ এবং এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে খাদ্য মিশ্র মণ্ডে পরিণত হয়। একে পাকমণ্ড বা কাইম (chyme) বলে। এই মণ্ড অনেকটা স্যুপের মতো এবং কপাটিকা ভেদ করে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে।

(c) ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক:

পাকস্থলী থেকে পাকমণ্ড ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনামে প্রবেশ করে। এ সময় অগ্ন্যাশয় থেকে একটি ক্ষারীয় পাচকরস ডিওডেনামে আসে। এই পাচকরস খাদ্যমণ্ডের অম্লভাব প্রশমিত করে। পাচকরসের এনজাইম

দিয়ে শর্করা এবং আমিষ পরিপাকের কাজ চলতে থাকে এবং স্নেহপদার্থের পরিপাক শুরু হয়।

যকৃৎ থেকে পিত্তরস নিঃসৃত হয়। এটি অম্লীয় অবস্থায় খাদ্যকে ক্ষারীয় করে পরিপাকের উপযোগী করে তোলে। পিত্ত-লবণ স্নেহপদার্থের ক্ষুদ্র কণাগুলোকে পানির সাথে মিশতে সাহায্যে করে। পিত্ত-লবণ পিত্তরসের অন্যতম উপাদান। লাইপেজ নামক এনজাইমের কাজ যথাযথ সম্পাদনের জন্য পিত্ত-লবণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ লবণের সংস্পর্শে স্নেহপদার্থ সাবানের ফেনার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানায় পরিণত হয়। স্নেহবিশ্লেষক লাইপেজ এই দানাগুলোকে ভেঙে ফ্যাটি এসিড এবং গ্লিসারলে পরিণত করে।

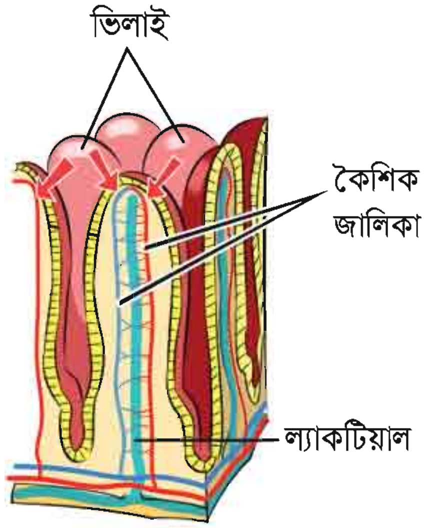

চিত্র 5.11: ইলিয়ামে দ্রবীভূত খাদ্য ও স্নেহপদার্থের শোষণ

$$\text{স্নেহপদার্থ} \xrightarrow{\text{লাইপেজ}} \text{ফ্যাটি এসিড} + \text{গ্লিসারল}$$

অগ্ন্যাশয় রসে অ্যামাইলেজ, লাইপেজ ও ট্রিপসিন নামক এনজাইম থাকে। আন্ত্রিক রসে আন্ত্রিক অ্যামাইলেজ, লাইপেজ, মলটেজ, ল্যাকটেজ ও সুক্রেজ ইত্যাদি এনজাইম থাকে। আংশিক পরিপাককৃত আমিষ ক্ষুদ্রান্ত্রে ট্রিপসিনের সাহায্যে ভেঙে অ্যামাইনো এসিড এবং সরল পেপটাইডে পরিণত হয়।

$$\text{পলিপেপটাইড} \xrightarrow{\text{ট্রিপসিন}} \text{অ্যামাইনো এসিড} + \text{সরল পেপটাইড}$$

অ্যামাইলেজ শ্বেতসারকে সরল শর্করায় পরিণত করে।

$$\text{শ্বেতসার} \xrightarrow{\text{অ্যামাইলেজ}} \text{গ্লুকোজ}$$

পরিপাককৃত খাদ্য শোষণ: ক্ষুদ্রান্ত্রে সব ধরনের খাদ্যই সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট এনজাইমের ক্রিয়ায় পরিপাক হয়ে সরল, শোষণযোগ্য খাদ্য উপাদানে পরিবর্তিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরে অবস্থিত রক্তজালকসমৃদ্ধ আঙুলের মতো প্রক্ষেপিত অংশ থাকে। একে ভিলাই বলে, আর একবচনে বলে ভিলাস। প্রতিটি ভিলাসের মাঝখানে ল্যাকটিয়াল নামক লসিকা-জালক রক্তের কৈশিক নালি দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকে। ভিলাই ভাঁজে ভাঁজে থাকায় ইলিয়ামের প্রাচীরগাত্রের আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং ব্যাপকভাবে পরিপাককার্য চলা সম্ভব হয়।

এসব রক্তনালি যুক্ত হয়ে হেপাটিক শিরা গঠন করে। এই শিরা দিয়ে শোষিত রক্ত যকৃতে আসে। স্নেহপদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা ভিলাসের ল্যাকটিয়ালে শোষিত হয়ে প্রথমে লসিকা দিয়ে বাহিত হয়ে রক্তস্রোতে মিশে। কোষে অনুপ্রবেশের পর পিত্ত-লবণ ফ্যাটি এসিড থেকে পুনরায় পৃথক হয়ে যায়।

কৈশিক নালির মধ্যে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় নালির প্রাচীর ছুঁয়ে জলীয় পদার্থ বের হয়। এই জলীয় পদার্থকে লসিকা বলে। লসিকা খাদ্য উপাদান সরবরাহ করে কোষে পৌঁছে দেয় এবং দূষিত পদার্থ সংগ্রহ করে রক্তস্রোতে ফিরে আসে। শোষণের পর পাকমণ্ডের অবশিষ্টাংশ কোলনে পৌঁছে।

(d) বৃহদন্ত্রে পরিপাক:

কোলনে পাকমণ্ডের কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া বা পরিপাক ঘটে না। তবে খাদ্যের অসার অংশের সাথে যে পানি থাকে, তা এখানে শোষিত হয়। তাছাড়া থাকে কিছু আমিষ, লিপিড, লবণ এবং উদ্বৃত্ত এনজাইম। এসব বস্তু থেকে বৃহদন্ত্র লবণ ও পানি শোষণ করে রক্তে স্থানান্তরিত করে। ফলে উচ্ছিষ্ট খাদ্য ঘনীভূত হয়ে মলে পরিণত হয়। এই মল মলাশয়ে জমা থাকে এবং প্রয়োজনমতো পায়ুপথ দিয়ে বের হয়ে আসে।

আত্তীকরণ: শোষিত খাদ্যবস্তুর প্রোটোপ্লাজমে পরিণত বা রূপান্তরিত করার পদ্ধতি হলো আত্তীকরণ। এটা একটি গঠনমূলক বা উপচিতি প্রক্রিয়া। কোষের প্রোটোপ্লাজম নিঃসৃত এনজাইমের সহযোগিতায় সরল খাদ্য জটিল উপাদানে পরিণত হয়। যেমন অ্যামাইনো এসিড, গ্লুকোজ, ফ্যাটি এসিড এবং গ্লিসারল রক্তের সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এসব স্থানে প্রোটোপ্লাজম নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে আমিষ, স্নেহ এবং শর্করা তৈরি হয়। এভাবে প্রোটোপ্লাজম কোষের ক্ষয়পূরণ ও গঠনে সহায়তা করে এবং তার ফলে দেহের বৃদ্ধি ঘটে।

5.9 আন্ত্রিক সমস্যা

আন্ত্রিক সমস্যার কারণে কখনো কখনো নিম্নলিখিত রোগ বা শারীরিক অসুবিধা দেখা দেয়। যেমন:

(a) অজীর্ণতা (Dyspepsia):

একে আমরা বদহজমও বলে থাকি। নানা কারণে বদহজম হয় বা হজমে ব্যাঘাত ঘটে। যেমন: পাকস্থলীতে সংক্রমণ, বিষণ্নতা, অগ্ন্যাশয় রোগ, থাইরয়েডের সমস্যা ইত্যাদি।

পেটের উপরের দিকে ব্যথা, পেট ফাঁপা, পেট ভরা মনে হওয়া, বুক জ্বালা করা, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, বুক ব্যথা, টক ঢেঁকুর উঠা— এগুলো অজীর্ণতার লক্ষণ। পাকস্থলী বা অন্ত্রের আলসারের কারণেও হজমে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। একে সাধারণ মানুষ গ্যাস্ট্রিক বলে থাকে, যদিও সঠিক নামটি হলো পেপটিক আলসার।

অজীর্ণতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যা করতে হবে তা হলো: অতি ভোজন না করা, আস্তে আস্তে ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়া, ধূমপান পরিহার করা, প্রয়োজনে অজীর্ণতার কারণ বের করে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ খাওয়া। মনে রাখতে হবে, বদহজম, পেপটিক আলসার প্রভৃতি সমস্যার সাথে অনেক সময় হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণের মিল থাকে। তাই চল্লিশোর্ধ বয়সে যদি একদিন হঠাৎ করে বদহজমের মতো অসুবিধা

শুধু হয় এবং প্রচলিত ওষুধে তার উপশম না হয়, তাহলে দেরি না করে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে। কারণ সেক্ষেত্রে তা বদহজম না হয়ে হার্ট অ্যাটাকও হতে পারে।

(b) আমাশয় (Dysentery):

Entamoeba histolytica নামক এক ধরনের প্রোটোজোয়া, সিগেলা (Shigella) নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি জীবাণুর সংক্রমণে আমাশয় হয়। ঘন ঘন মলত্যাগ, মলের সাথে শ্লেষ্মা বের হওয়া, পেটে ব্যথা, অনেক সময় শ্লেষ্মাযুক্ত মলের সাথে রক্ত যাওয়া এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য হজম না হওয়া আমাশয় রোগের লক্ষণ। আমাশয় হলে প্রয়োজনে পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়, কারণ সময়মতো চিকিৎসা না করা হলে মারাত্মক কিছু ঘটতে পারে।

এ রোগ প্রতিরোধে যা করতে হবে তা হলো: বিশুদ্ধ পানি পান করা, শাকসবজি ও ফলমূল উত্তমরূপে পানি দিয়ে ধৌত করা, মল ত্যাগের পর হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধোয়া, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা, খাওয়ার আগে হাত ও থালাবাসন ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া।

(c) কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation):

এটি কোনো বিশেষ ধরনের রোগ নয়। যখন কারো শক্ত পায়খানা হয় কিংবা দুই বা তারও বেশি দিন পায়খানা হয় না, এ অবস্থাকে বলা হয় কোষ্ঠকাঠিন্য। বিভিন্ন কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে, যেমন পায়খানার বেগ চেপে রাখলে, বৃহদন্ত্রে অপাচ্য খাদ্যাংশ থেকে অতিমাত্রায় পানি শোষিত হলে, পৌষ্টিক নালির মধ্য দিয়ে খাদ্যের অপাচ্য অংশ ধীরে ধীরে গমনে মল থেকে বেশি পানি শোষিত হলে। আবার পরিশ্রম না করলে, আন্ত্রিক গোলযোগে, কোলনের মাংসপেশি স্বাভাবিকের তুলনায় ধীরে ধীরে সংকুচিত হলে, রাফেজ বা আঁশযুক্ত খাবার না খেলেও কোষ্ঠকাঠিন্য হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়।

কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণে মল ত্যাগ কষ্টদায়ক হয়। ফলে পেটে অস্বস্তিকর অবস্থা, পেট ব্যথা ও নানা রকম আনুষঙ্গিক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। দীর্ঘমেয়াদি কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে হার্নিয়াসহ বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। আবার পরিপাক নালির টিউমারসহ বিভিন্ন অসুখের লক্ষণ হিসেবে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। তাই কোষ্ঠকাঠিন্য হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

এ রোগ প্রতিকারে যা করতে হবে তা হলো: আঁশযুক্ত খাবার খাওয়া, প্রচুর পানি পান করা, নিয়মিত শাকসবজি, আপেল, নারকেল, খেজুর, আম, কমলা, পেঁপে, আনারস, কলা ইত্যাদি খাওয়া। নিয়মিত মল ত্যাগের অভ্যাস করা, হাঁটাচলার অভ্যাস গড়ে তোলা।

(d) গ্যাস্ট্রিক ও পেপটিক আলসার (Gastric and Peptic ulcer):

আলসার বলতে যেকোনো এপিথেলিয়াম বা আবরণী টিস্যুর একধরনের ক্ষত বোঝায়। পেপটিক আলসার বলতে খাদ্যনালির কোনো অংশের আলসার বোঝায়। সেটি যদি পাকস্থলীতে হয় তাহলে তাকে গ্যাস্ট্রিক আলসার, ডিওডেনামে হলে ডিওডেনাল আলসার বলা হয়। দীর্ঘদিন ধরে খাদ্যগ্রহণে অনিয়ম হলে

পাকস্থলীতে অম্লের আধিক্য ঘটে এবং অনেক দিন ধরে এ অবস্থা চলতে থাকলে এই অম্ল বা এসিড দিয়ে পাকস্থলী বা অন্ত্রে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে পেপটিক আলসার হতে পারে। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানী রবিন ওয়ারেন (1951-বর্তমান) ও ব্যারি মার্শালের (1937-বর্তমান) গবেষণায় জানা গেছে, খাদ্যে অনিয়ম, ভাজাপোড়া খাবার খাওয়া, বিষণ্ণতা বা উৎকণ্ঠা ইত্যাদি পেপটিক আলসারের নিয়ামক হলেও অন্যতম প্রধান কারণ *Helicobacter pylori* (সংক্ষেপে *H. pylori*) নামের একটি ব্যাকটেরিয়া। এজন্য তাঁরা 2005 সালে যৌথভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আগে ভাবা হতো, পাকস্থলীর তীব্র হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে (pH 1.5-3.5) কোনো ব্যাকটেরিয়া টিকতে পারে না। তাঁর ধারণা প্রমাণ করার জন্য ব্যারি মার্শাল নিজে *H. pylori* ব্যাকটেরিয়া মিশ্রিত দ্রবণ পান করে পেপটিক আলসারে ভুগেছিলেন (উল্লেখ্য, এই ব্যাকটেরিয়া যে শুধু আলসারের জন্য দায়ী তাই নয়, এ থেকে পাকস্থলীর ক্যান্সারও হতে পারে। তাই মার্শাল তাঁর নিজের জীবনের উপর মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছিলেন, যা অনুসরণীয় নয়।)

পেপটিক আলসার রোগে সাধারণত পেটের ঠিক মাঝ বরাবর, নাভির একটু উপরে একঘেয়ে ব্যথা অনুভূত হয়। খালি পেটে বা অতিরিক্ত তেলজাতীয় খাদ্য খেলে ব্যথা বাড়ে। আলসার মারাত্মক হলে বমি হতে পারে। কখনো কখনো বমি এবং মলের সাথে রক্ত নির্গত হয়। এন্ডোসকপি (Endoscopy) বা বেরিয়াম এক্স-রের মাধ্যমে এ রোগ নির্ণয় করা যায়।

এ রোগ থেকে দূরে থাকতে হলে যা করতে হবে তা হলো: নিয়মিত সহজপাচ্য খাদ্য গ্রহণ করা, অধিক তেল এবং মশলাযুক্ত গুরুপাক খাদ্য পরিহার করা। ফুটানো দুধ, পনির এবং কলা খেলে ভালো উপকার পাওয়া যায়। নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ করে, কফি, সিগারেট ইত্যাদি উত্তেজক পদার্থ গ্রহণ থেকে বিরত থেকে, প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নিয়ে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। তবে মার্শাল ও ওয়ারেনের আবিষ্কার থেকে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পেয়েছি তা হলো, যদি কেউ *H. pylori* দিয়ে সংক্রমিত হয়, তার ক্ষেত্রে উপরোক্ত নিয়ম পালনে রোগ পুরোপুরি ভালো হবে না। তখন পূর্ণ আরোগ্যের জন্য নিয়ম মেনে আহার করার পাশাপাশি চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক ডোজে সঠিক অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খেতে হবে।

(e) অ্যাপেনডিসাইটিস (Appendicitis):

পেটের ডান দিকের নিচে বৃহদন্ত্রের সিকামের সাথে অ্যাপেনডিক্স যুক্ত থাকে। এটি আঙুলের আকারের একটি থলে। অ্যাপেনডিক্সের সংক্রমণের কারণে অ্যাপেনডিসাইটিস হয়। এ রোগে প্রথমে নাভির চারদিকে ব্যথা অনুভব হয় এবং ব্যথা শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তলপেটের ডান দিকে সরে যায়। ক্ষুধামন্দ্যা, বমি, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়।

এ রোগের প্রতিকারে রোগীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তার দেখাতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি এবং প্রয়োজনে শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে অ্যাপেনডিক্স অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। অ্যাপেনডিক্সের সংক্রমণ মারাত্মক হলে এটি ফেটে যেতে পারে এবং রোগীর জন্য মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

(f) কৃমিজনিত রোগ:

কৃমি পরজীবী হিসেবে পোষকদেহে বাস করে। মানবদেহ অনেক প্রজাতির কৃমির পোষক। বিশেষ করে মানুষের অন্ত্রে গোলকৃমি, সুতাকৃমি ও ফিতাকৃমি পরজীবী হিসেবে বাস করে। কৃমির কারণে পেটে ব্যথা, দুর্বলবোধ, বদহজম, পেটে অস্বস্তিবোধ, বমি বমি ভাব, অনিদ্রা, খাওয়ায় অরুচি, রোগীর চেহারা ফ্যাকাশে হওয়া, রক্তাল্পতা দেখা দেওয়া, হাত-পা ফুলে যাওয়া, পেট বড় হয়ে ফুলে উঠা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। শিশুর জ্বর হলে অনেক সময় মলের সাথে এমনকি নাক-মুখ দিয়ে কৃমি বেরিয়ে আসে।

রোগীর মল পরীক্ষা করে পেটে কৃমি আছে কি না তা জানা যায়। মল পরীক্ষায় কৃমির ডিম পাওয়া গেলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কৃমিনাশক ঔষধ খেতে হয়।

কৃমি আক্রান্ত ব্যক্তি অথবা মাছির মাধ্যমে খাদ্যবস্তু দূষিত হয়। দূষিত খাদ্য কৃমি বিস্তারে সহায়তা করে। কাঁচা ফলমূল ধুয়ে খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা, খাবার আগে হাত ভালোভাবে ধোয়া, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা, খালি পায়ে না হাঁটা এবং অল্প সিদ্ধ শাকসবজি বা মাংস না খাওয়া ইত্যাদি সাবধানতা অবলম্বন করে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

(g) ডায়রিয়া (Diarrhoea):

যদি দিনে অন্তত তিনবার পাতলা পায়খানা হয়, তবে তার ডায়রিয়া হয়েছে বলে মনে করতে হবে। সব বয়সী মানুষের ডায়রিয়া হতে পারে, তবে সাধারণত শিশুরা এতে দ্রুত কাহিল হয়ে পড়ে। ডায়রিয়া হলে রোগীর দেহ থেকে পানি এবং লবণ বেরিয়ে যায়, দেহের পানি কমে যায়, রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে দেহে পানি এবং লবণের স্বল্পতা দেখা দেয়। এ সময় যথাযথ চিকিৎসা করা না হলে রোগী মারাও যেতে পারে।

ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হওয়া, বারবার বমি হওয়া, খুব পিপাসা লাগা, মুখ ও জিহ্বা শুকিয়ে যাওয়া, দেহের চামড়া, কুঁচকে যাওয়া, চোখ বসে যাওয়া ইত্যাদি ডায়রিয়ার উপসর্গ। এ সময় রোগী খাবার বা পানীয় ঠিকমতো খেতে চায় না, শিশুর মাথার চাঁদি বা তালু বসে যায়। আস্তে আস্তে রোগী নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

দূষিত পানি পান করলে, বাসি-পচা, নোংরা খাবার খেলে, অপরিচ্ছন্ন থালা-বাসন ব্যবহার করলে, অপরিষ্কার হাতে খাবার খেলে এ রোগ বিস্তার লাভের আশঙ্কা বেশি থাকে।

ডায়রিয়া রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে খাবার স্যালাইন খাওয়ানো শুরু করতে হবে। আজকাল খাবার সালাইনের প্যাকেট বাজারে পাওয়া যায়, প্যাকেটের গায়ে স্যালাইন বানানোর নিয়ম লেখা থাকে। ঐ নিয়ম অনুযায়ী স্যালাইন বানাতে হয়। বিশেষ প্রয়োজনে বাড়িতেও স্যালাইন বানানো যায়। তোমরা ইতোপূর্বে বাড়িতে কীভাবে খাবার স্যালাইন তৈরি করা যায় তা জেনেছ।

সম্প্রতি শস্য স্যালাইন নামে আর একটি স্যালাইন উদ্ভাবিত হয়েছে। এক লিটার পানি, 50 গ্রাম চালের

গুঁড়া, এক চিমটি লবণ মিশিয়ে বাড়িতে এ স্যালাইন তৈরি করা যায়। স্যালাইন ব্যবহারের সময় যে বিষয়গুলো মনে রাখা দরকার তা হলো: পাতলা পায়খানা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত রোগীকে স্যালাইন খাওয়াতে হবে, রোগীর বমি হলেও স্যালাইন খাওয়া বন্ধ করা যাবে না, শিশু রোগীকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। রোগীকে নিয়মিত অন্যান্য খাবারও খেতে হবে। ডায়রিয়া সেরে যাওয়ার পরও অন্তত এক সপ্তাহ রোগীকে বাড়তি খাবার দিতে হবে।

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া প্রভৃতি জীবাণু দ্বারা ডায়রিয়া হতে পারে। রোটা ভাইরাস, ডায়রিয়ার জন্য দায়ী জীবাণুগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিশ্বব্যাপী রোটা ভাইরাসজনিত মোট মৃত্যুর 82 শতাংশ হয় হতদরিদ্র দেশগুলোতেই। উন্নত দেশগুলোতে এ রোগের বিস্তার আছে। তবে মৃত্যুর হার তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

দলগত কাজ

কাজ: তোমরা দলবদ্ধ হয়ে শ্রেণিকক্ষে খাবার স্যালাইন তৈরি কর। খাবার স্যালাইন খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

1. উদ্ভিদের খনিজ পুষ্টি কাকে বলে?
2. উদ্ভিদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় খনিজ পুষ্টি কয়টি?
3. আদর্শ খাদ্যপিরামিড কী?
4. রক্তশূন্যতার কারণ কী?
5. রাতকানা রোগ কেন হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

1. চিত্রসহ দাঁতের গঠন বর্ণনা কর।
2. সুষম খাদ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট হিসেবে কাজ করে?

ক. দস্তা খ. ক্লোরিন
গ. বোরন ঘ. পটাশিয়াম

2. ক্লোরোসিস হয়-

i. নাইট্রোজেনের অভাবে
ii. সালফারের ঘাটতিতে
iii. লৌহের অনুপস্থিতিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে 3 ও 4 নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

পাঁচ বৎসর বয়সী সানজানা স্কুলে তার বইয়ের সব লেখা বুঝতে পারে। তবে রাতের বেলা পড়তে বসলে সে বইয়ের লেখাগুলো ঠিকমতো দেখতে পায় না।

3. সানজানার দেহে কোন ভিটামিনের অভাব রয়েছে?

ক. ভিটামিন ‘এ’ খ. ভিটামিন ‘বি’
গ. ভিটামিন ‘সি’ ঘ. ভিটামিন ‘ডি’

4. সানজানার রোগটি প্রতিরোধে অধিক পরিমাণে খেতে হবে-

i. যকৃৎ
ii. গাজর
iii. মলা মাছ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

1. ড. রায়হান দিনের অধিকাংশ সময় গবেষণার কাজে গবেষণাগারে সময় কাটান। এতে তার ওজন বেড়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে তার ছোটভাই জহির দেশের জাতীয় যুব ফুটবল দলের একজন নিয়মিত খেলোয়াড়। সেজন্য তাকে প্রতিদিন অনেক সময় ধরে শারীরিক কসরত ও খেলাধুলা করতে হয়।

ক. কোন জাতীয় খাদ্য দেহে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে?
খ. উচ্চমানের আমিষ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
গ. জহিরের খাদ্যতালিকায় কোন ধরনের খাবার অধিক থাকা দরকার? কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. জহিরের খাদ্যতালিকার কোন ধরনের খাবার রায়হানের জন্য প্রযোজ্য নয়? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও।

2. ইফরান আলী লক্ষ করলেন তার বাগানের গাছগুলোর মধ্যে ঘাসজাতীয় গাছের পাতা হলুদ হয়ে গেছে এবং ফুল গাছের পাতা, ফুল ও কুঁড়ি ঝরে যাচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানে তিনি একজন উদ্যানতত্ত্ববিদের শরণাপন্ন হলেন। তিনি তাকে তার বাগানে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় কিছু উপাদান সরবরাহের পরামর্শ দিলেন।

ক. মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট কী?
খ. উদ্ভিদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান কী? ব্যাখ্যা কর।
গ. ইরফান আলীর বাগানের ঘাসজাতীয় উদ্ভিদের সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের উদ্যানতত্ত্ববিদের পরামর্শ মূল্যায়ন কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জীবে পরিবহন

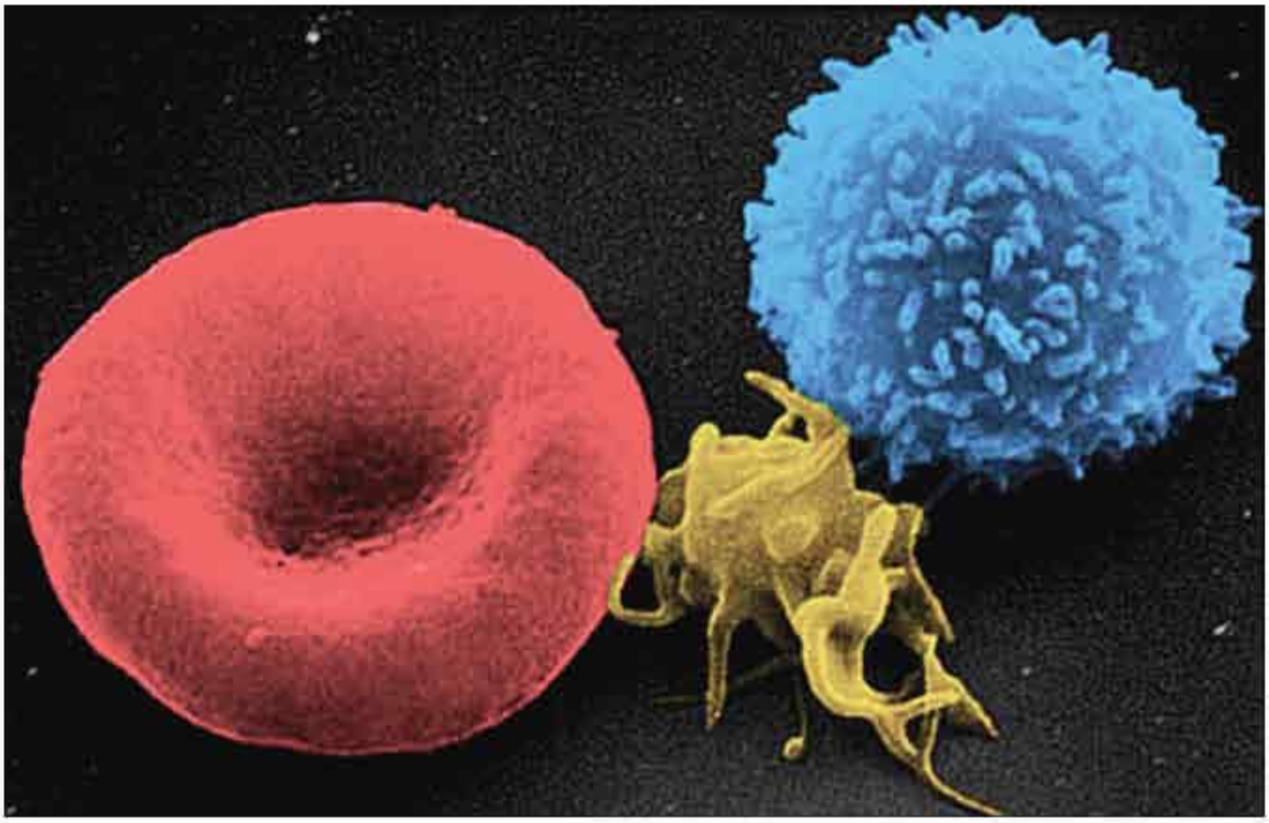

পরিবহন জীবদেহের একটি অতিপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, যা সবসময়েই ঘটে চলেছে। উদ্ভিদে পানি ও খনিজ পরিবহন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, খাদ্য চলাচলও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। মাটি থেকে গ্রহণ করা পানি আর খনিজ লবণ মূল থেকে পাতায় পৌঁছানো যেমন গুরুত্বপূর্ণ, পাতায় প্রস্তুত করা খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে পরিবহনও ঠিক তেমনি সমান প্রয়োজনীয়। মানবদেহে পরিবহন প্রক্রিয়া উদ্ভিদের মতো নয় কিন্তু উভয়েই পদার্থবিজ্ঞানের একই নিয়ম অনুসরণ করে।

উদ্ভিদ আর মানবদেহের পরিবহন পদ্ধতি এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- উদ্ভিদে পরিবহনের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ভিদে ও পানির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ভিদ পানি ও খনিজ পদার্থ শোষণ প্রক্রিয়া ও এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সালোকসংশ্লেণের ফলে উৎপাদিত পদার্থের পরিবহন বর্ণনা করতে পারব।
- উদ্ভিদে পানি ও খনিজ পদার্থ পরিবহন ও এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রস্বেদনের ধারণা ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রস্বেদনের হার নিয়ন্ত্রণে প্রভাবকের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- প্রস্বেদন একটি অতিপ্রয়োজনীয় অমঙ্গল তা মূল্যায়ন করতে পারব।
- উদ্ভিদে প্রস্বেদনের পরীক্ষা করতে পারব।
- মানবদেহে সংবহনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্ত উপাদানের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন গ্রুপের রক্তের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্ত গ্রুপ বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে রক্ত নির্বাচন করতে পারব।
- রক্তদানের নিয়মাবলি এবং এর সামাজিক দায়বদ্ধতা বর্ণনা করতে পারব।
- মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারব।
- হৃৎপিণ্ডের গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- হৃৎপিণ্ড গঠনগতভাবে যে এর কার্যক্রমের সাথে অভিযোজিত তা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- রক্ত সঞ্চালনে রক্তচাপের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- আদর্শ রক্তচাপ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কোলেস্টেরলের প্রকারভেদ, সীমা, উপকারিতা ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বর্ণনা করতে পারব।
- রক্ত সঞ্চালনে কোলেস্টেরলের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- রক্তে অস্বাভাবিকতার কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হৃৎপিণ্ড সম্পর্কিত রোগের লক্ষণ, কারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিশ্লেষণ করতে পারব।
- হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখার উপায় বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বিশ্রামরত অবস্থায় এবং শরীরচর্চার পর রক্তচাপ ও পালসরেট পরিমাপ করতে এবং দুই অবস্থানে পরিমাপকৃত রক্তচাপ ও পালসরেট বিশ্লেষণ করতে পারব।
- সঠিকভাবে রক্তচাপ ও পালসরেট পরিমাপ করতে পারব।
- হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখার জন্য নিজে সচেতন হব এবং অন্যকে সচেতন করতে পারব।

6.1 উদ্ভিদ ও পানির সম্পর্ক

পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া জীব বাঁচতে পারে না। আমরা জানি, প্রোটোপ্লাজম জীবদেহের ভৌত ভিত্তি, এই প্রোটোপ্লাজমের শতকরা 90 ভাগই পানি। এ কারণেই পানিকে ফ্লুইড অফ লাইফ বলা হয়ে থাকে। পানির পরিমাণ কমে গেলে প্রোটোপ্লাজম সংকুচিত হয়ে মরে পর্যন্ত যেতে পারে। তাছাড়া উদ্ভিদের দেহে যত বিপাকীয় বিক্রিয়া চলে, পানির অভাব হলে সেগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। উদ্ভিদদেহে পানির প্রয়োজনীয় দিকগুলোর মধ্য উল্লেখযোগ্য হলো:

(a) প্রোটোপ্লাজম সজীব রাখতে পানির বিকল্প নেই। একটি সংকুচিত প্রোটোপ্লাজমযুক্ত কোষকে বাঁচাতে চাইলে দেরি না করে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

(b) প্রস্বেদন ও সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া চালু রাখতে পরিমাণমতো পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা দরকার। এজন্যই শুষ্ক মৌসুমে বড় বড় উদ্ভিদেও পানি সেচ দিতে হয়।

(c) পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্রাবক। বিপাকীয় অনেক বিক্রিয়ায় পানির গুরুত্ব অপরিসীম।

(d) উদ্ভিদের কোষ বৃদ্ধি ও চলনে পানির ভূমিকা রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে উদ্ভিদ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় পানি কোথায় এবং কীভাবে পায়? উদ্ভিদ প্রধানত মূলের মাধ্যমে মাটি থেকে পানি শোষণ করে। উদ্ভিদে 3টি প্রক্রিয়া সম্মিলিতভাবে শোষণ কাজ সম্পাদন করে। প্রক্রিয়া তিনটি হলো ইমবাইবিশন, ব্যাপন এবং অভিস্রবণ।

(a) ইমবাইবিশন (Imbibition):

এক খণ্ড শুকনা কাঠের এক প্রান্ত পানিতে ডুবালে ঐ কাঠের খণ্ডটি কিছু পানি টেনে নেবে। আমরা জানি, কলয়েড জাতীয় শুকনা বা আধা শুকনা পদার্থ তরল পদার্থ শুষে নেয়, এ জন্যই কাঠের খণ্ডটি পানি টেনে নিয়েছে। এ প্রক্রিয়াকে ইমবাইবিশন বলে। সেলুলোজ, স্টার্চ, জিলাটিন— এগুলো হাইড্রোফিলিক (পানিপ্রিয়) পদার্থ। এরা তরল পদার্থের সংস্পর্শে এলে তা শুষে নেয়, আবার তরল পদার্থের অভাবে সংকুচিত হয়ে যায়। কোষপ্রাচীর ও প্রোটোপ্লাজম কলয়েডধর্মী হওয়ায় ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে স্ফীত হয়ে ওঠে। পানি শোষণের এটি একটি অন্যতম প্রক্রিয়া।

(b) ব্যাপন (Diffusion):

ঘরের এক কোণে কিছু সুগন্ধি ঢেলে দিলে তার সুগন্ধ সারা ঘরে ছড়িয়ে যায়। কারণ এর ক্ষুদ্র কণা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এক গ্লাস পানিতে কিছু চিনি ছেড়ে দিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্লাসের পানি মিষ্টি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে চিনির অণু পানিতে ছড়িয়ে পুরো পানিকে মিষ্টি স্বাদযুক্ত করে তোলে। এই প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে। এটি একটি ভৌত প্রক্রিয়া (Physical process)। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের

অণু বেশি ঘনত্বের এলাকা থেকে কম ঘনত্বের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তাকে ব্যাপন প্রক্রিয়া বলে। একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো পদার্থের বেশি ঘনত্ববিশিষ্ট দ্রবণ থেকে কম ঘনত্বের দ্রবণের দিকে দ্রাবকের ব্যাপিত হওয়ার প্রচ্ছন্ন ক্ষমতাকে ব্যাপন চাপ বলে। একই বায়ু চাপে কোনো একটি দ্রবণ ও দ্রাবকের ব্যাপন চাপের পার্থক্যকে ব্যাপন চাপ ঘাটতি (Diffusion pressure deficit) বলে। পাতার মেসোফিল টিস্যুতে এই ব্যাপন চাপ ঘাটতির ফলে পানির ঘাটতি আছে, এমন কোষ পাশের কোষ থেকে পানি টেনে নেয়। এক কথায় উদ্ভিদের পানি শোষণে ব্যাপনের গুরুত্ব অপরিসীম।

একক কাজ

কাজ : ব্যাপন প্রক্রিয়ার পরীক্ষণ।

উপকরণ : একটি ছোট বাটি এবং আতর বা যেকোনো সুগন্ধি।

পদ্ধতি : ব্যাপন প্রক্রিয়াটি প্রমাণ করতে আতর বা সুগন্ধি বাটিতে ঢেলে পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা কর।

(c) অভিস্রবণ (Osmosis):

অভিস্রবণ কী, সেটা কি তোমরা জান? তোমরা কি খেয়াল করেছ যে তোমার মা যখন পানিতে কিশমিশ ভিজিয়ে রাখেন, তার কিছুক্ষণ পর চুপসে থাকা কিশমিশগুলো ফুলে টসটসে হয়ে ওঠে। ঐ টসটসে কিশমিশ যদি আবার ঘন চিনির দ্রবণে ভিজিয়ে রাখ, তাহলে দেখবে সেগুলো আবার চুপসে গেছে। কেন এমন হলো তা কি তোমরা ধারণা করতে পার? এটি একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি গ্রহণ করে। এ প্রক্রিয়াটি জীবন্ত কোষ ছাড়াও কৃত্রিমভাবে ল্যাবরেটরিতেও ঘটানো যায়। যদি দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ যাদের দ্রব এবং দ্রাবক একই, একটি বৈষম্যভেদ্য পর্দা (Selectively permeable membrane) দিয়ে আলাদা করা হয়, তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটি দ্রবণের ঘনত্ব সমান হয়ে যাবে। একই দ্রব এবং দ্রাবকযুক্ত দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ একটি বৈষম্যভেদ্য পর্দা দিয়ে আলাদা করা হলে, দ্রাবক তার নিম্ন ঘনত্বের দ্রবণ থেকে উচ্চ ঘনত্বের দ্রবণের দিকে প্রবাহিত হয়। দ্রাবকের বৈষম্যভেদ্য পর্দা ভেদ করে তার নিম্ন ঘনত্বের দ্রবণ থেকে উচ্চ ঘনত্বের দ্রবণের দিকে প্রবাহিত হওয়াকে অভিস্রবণ প্রক্রিয়া বলা হয়।

একক কাজ

কাজ : কোষ থেকে কোষে অভিস্রবণের পরীক্ষণ।

উপকরণ : একখণ্ড আলু, ব্লেড, পেট্রিডিস, পানি, চিনি।

পদ্ধতি : আলু দিয়ে অসমোস্কোপ বানাও। চিনির শরবৎ ঢেলে অভিস্রবণের প্রমাণ দাও।

6.2 পানি ও খনিজ লবণ শোষণ

উদ্ভিদে পানি শোষণ ও খনিজ লবণ শোষণ ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় হয়। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা পানি শোষণ বিষয়টি সম্পর্কে আগে জানব।

(a) পানি শোষণ:

সাধারণভাবে উদ্ভিদ তার মূলরোমের মাধ্যমে মাটির কৈশিক পানি (capillary water) শোষণ করে। প্রস্বেদনের ফলে পাতার কোষে ব্যাপন চাপ ঘাটতির সৃষ্টি হয়, এর ফলে পাশের কোষ থেকে পানি এই কোষের দিকে ধাবিত হয়। একইভাবে ঐ দ্বিতীয় কোষটিতে আবার ব্যাপন চাপ ঘাটতি সৃষ্টি হয় এবং তার পাশের বা নিচের কোষ থেকে পানি টেনে নেয়। এভাবে ব্যাপন চাপ ঘাটতি ক্রমশ মূলরোম পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং একটি চোষক শক্তির সৃষ্টি হয়। এ চোষক শক্তির টানে মাটির কৈশিক পানি মূলরোমে ঢুকে পড়ে। মাটি থেকে মূলরোমে অভিস্রবণ ও ব্যাপন প্রক্রিয়ায় এ পানি প্রবেশ করে। এভাবে মূলরোম থেকে পানি মূলের কর্টেক্সে (Cortex) প্রবেশ করে। এ কাজটিকে কোষ থেকে কোষান্তরে অভিস্রবণ (cell to cell osmosis) পদ্ধতি বলে। একইভাবে পানি অন্তঃত্বক ও পরিচক্র হয়ে পরিবহন কলা গুচ্ছে (Vascular bundles) পৌঁছে যায়। পানি একবার পরিবহন কলায় পৌঁছে গেলে তা জাইলেম কলার মাধ্যমে উপরের দিকে এবং পাশের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। এভাবে পানি বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা হয়ে

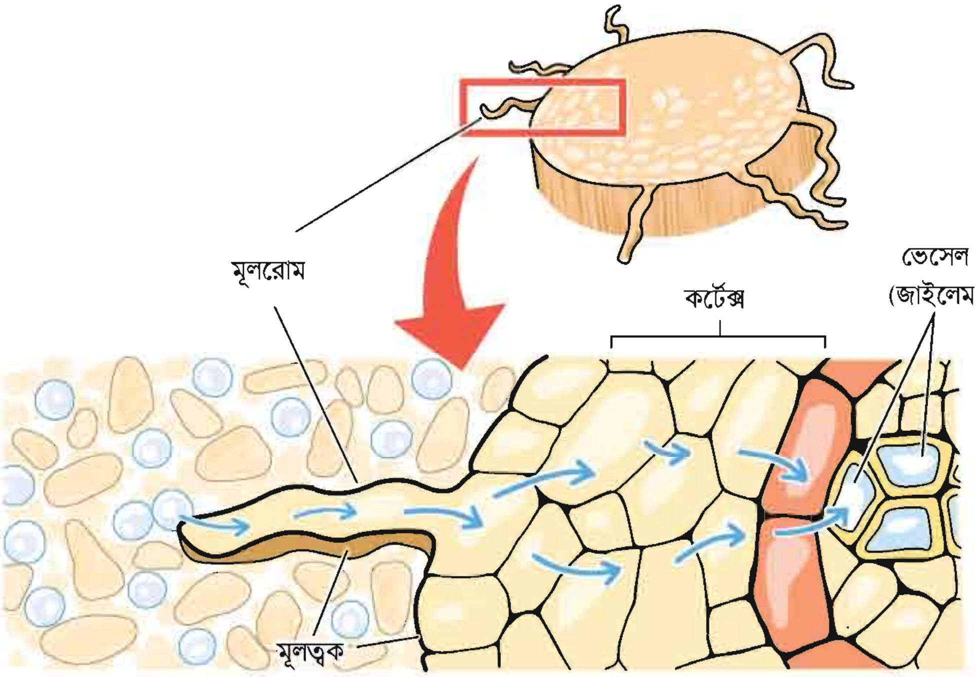

চিত্র 6.01: পানি শোষণ ও পরিবহন

উদ্ভিদের পাতায় পৌঁছে যায়। এ কাজে যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া কাজ করে সেগুলো হলো, অভিস্রবণ ও প্রস্বেদন।

(b) খনিজ লবণ শোষণ:
অধিকাংশ উদ্ভিদ পানির সাথে কিছু পরিমাণ খনিজ লবণ শোষণ করে, কিছু লবণ মূলরোম দিয়ে শোষিত হলেও মূলত মূলের অগ্রভাগের কোষ বিভাজন অঞ্চলই শোষণ অঞ্চল হিসেবে কাজ করে। খনিজ লবণ শোষিত হয় আয়ন হিসেবে। শোষণ প্রধানত দুটি উপায়ে হয়ে থাকে, নিষ্ক্রিয় শোষণ ও সক্রিয় শোষণ।

নিষ্ক্রিয় শোষণ (Passive absorption): উদ্ভিদের এ প্রক্রিয়ায় মূলরোম ইমবাইবিশন ও অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় লবণ শোষণ করে, কোনো বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয় না।

সক্রিয় শোষণ (Active absorption): সক্রিয় শোষণে খনিজ লবণ পরিবহনের জন্য কোষে উৎপন্ন বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয়।

6.2.1 উদ্ভিদে পরিবহন:

উদ্ভিদে পরিবহন বলতে মাটি থেকে শোষিত পানি ও খনিজ লবণ এবং পাতায় প্রস্তুতকৃত খাদ্যের চলাচলকে বুঝায়। আমরা জানি, জাইলেম ভেসেলের মাধ্যমে পানি এবং খনিজ লবণ উদ্ভিদের পাতায় পৌঁছায়। প্রস্বেদন টান, কৈশিক শক্তি এবং মূলজ চাপের ফলে কোষরস উদ্ভিদের পাতায় পৌঁছে যায় বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন। এভাবে পাতায় পানি পৌঁছালে সেখানে খাদ্য প্রস্তুত হয়। প্রস্তুত খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন এলাকায় পরিবহনের দায়িত্ব গ্রহণ করে ফ্লোয়েম টিস্যু। এ খাদ্য ফ্লোয়েমের সিভনলের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। উদ্ভিদের বিভিন্ন জৈব যৌগ ফ্লোয়েম টিস্যুর মাধ্যমে বিপরীত দিকে একই সাথে চলাচল করে। উদ্ভিদের নিচের দিকের যৌগগুলো নিচের দিকে, উপরে সংশ্লেষিত যৌগগুলো উপরের দিকে এবং উদ্ভিদের মাঝামাঝি এলাকায় সংশ্লেষিত পদার্থগুলো উপরে বা নিচে যেকোনো দিকে প্রবাহিত হয়।

উদ্ভিদে পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা:
পরিবহন অর্থ একস্থান থেকে অন্য স্থানে কোনো পদার্থের স্থানান্তর। পানি ও খনিজ লবণের চলাচলকে উদ্ভিদে পরিবহন বলা হয়। উদ্ভিদে পানি ও খনিজ দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তার কথা সব বিজ্ঞানীই স্বীকার করেছেন। এই পানি এবং খনিজ পদার্থ উদ্ভিদের কাজে আসতে হলে সেগুলোকে অবশ্যই বিক্রিয়াস্থলে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য পানি এবং খনিজ লবণ পরিবহন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলরোম দিয়ে পানি ও খনিজ লবণ শোষিত হয়ে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় কর্টেক্সের মধ্য দিয়ে জাইলেম ভেসেলে পৌঁছায় এবং প্রস্বেদন স্রোতের সাথে ধীরে ধীরে পাতায় গিয়ে পৌঁছে। সেখানে খাদ্য তৈরি হয়। পাতা থেকে তৈরি খাদ্য ফ্লোয়েমের সিভনল দিয়ে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে যায়। কখনো জাইলেম ভেসেল বা ফ্লোয়েমের সিভনল কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেলে উদ্ভিদের মৃত্যু অবধারিত। এজন্য বলা যায় পরিবহন উদ্ভিদ জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

পানি ও খনিজ পদার্থের পরিবহন (Translocation of water and minarals):

আমরা ইতোপূর্বে অভিস্রবণ ও ব্যাপন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেয়েছি। অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ মাটি থেকে মূল দিয়ে পানি শোষণ করে। মূলরোমের সাহায্যে প্রধানত এ কাজটি হয়। পাশাপাশি উদ্ভিদ মাটি থেকে প্রয়োজনীয় খনিজ পুষ্টিও শোষণ করে। অবশ্য খনিজ পুষ্টি শোষণের পদ্ধতি পানি শোষণ পদ্ধতি থেকে আলাদা। এ বিষয়ে উচ্চতর শ্রেণিতে তোমরা বিস্তারিত জানতে পারবে। কোষের ভিতরকার পানি এবং পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণকে একত্রে কোষরস (cell sap) বলে। এবার আমরা মূল থেকে উদ্ভিদের সর্বোচ্চ শাখায় এবং পাতায় কীভাবে কোষরস পৌঁছায় তা জানব।

কোষরসের আরোহণ (Ascent of sap):

মূল পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে। এ কোষরস বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রভাবে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠতে থাকে। একই সাথে কোষরসের পার্শ্ব পরিবহনও চলতে থাকে। কোষরস পরিবহনকে দুভাগে ভাগ করা যায়, মাটিতে থাকা পানি ও খনিজ লবণগুলো মূলরোম থেকে মূলের পরিবহন কলায় পৌঁছানো এবং মূলের পরিবহন কলা থেকে পাতায় পৌঁছানো। প্রথম ধাপে অভিস্রবণ, ব্যাপন ও প্রস্বেদন টান ইত্যাদি পানি এবং খনিজ লবণ শোষণ ও পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মূলরোম দিয়ে শোষিত পানি এবং খনিজ পদার্থ অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় মূলরোম থেকে পাশের কোষে যায়। ঐ কোষ থেকে তা পুনরায় তার পাশের কোষে যায়। এভাবে কোষ থেকে কোষে পানি এবং খনিজ পদার্থ চলতে চলতে একসময় মূলের পরিবহন টিস্যু হয়ে এবং কাণ্ডের পরিবহন কলা বেয়ে পাতার মেসোফিল কলায় পৌঁছায়।

একক কাজ

কাজ: উদ্ভিদের রস উত্তোলন পরীক্ষণ।

উপকরণ: *Peperomia* উদ্ভিদ, একটি বোতল, পানি ও স্যাফ্রানিন বা লাল কালি।

পদ্ধতি: একটি বোতলে কিছু পানি নিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা স্যাফ্রানিন বা লাল কালি নাও। মূলসহ একটি তাজা *Peperomia* উদ্ভিদ এমনভাবে স্থাপন কর যেন মূলগুলো পানিতে ডুবে থাকে। এ অবস্থায় বোতলটিকে কয়েক ঘণ্টার জন্য রেখে দাও এবং পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল খাতায় লেখ।

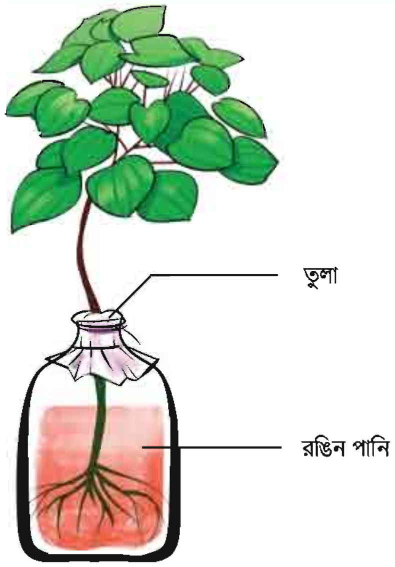

চিত্র 6.02: উদ্ভিদে রস উত্তোলন পরীক্ষা

6.2.3 সালোকসংশ্লেষণে উৎপাদিত পদার্থের পরিবহন

তোমরা আগেই জেনেছ যে উদ্ভিদ অভিস্রবণ পদ্ধতিতে পানি গ্রহণ করে। এ পানি জাইলেম ভেসেলের মাধ্যমে সুউচ্চ বৃক্ষের সর্বোচ্চ স্থানের পাতায়ও পৌঁছে যায়। পাতা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এ পানি ব্যবহার করে। আলোর উপস্থিতিতে ক্লোরোপ্লাস্টে বায়ু থেকে গৃহীত CO_2 এবং মাটি থেকে গৃহীত পানির সংমিশ্রণে শর্করাজাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হয়। এ উৎপন্ন খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে চলে যায়। উদ্ভিদের প্রতিটি কোষই এ খাদ্য ব্যবহার করে শ্বসন প্রক্রিয়ায় তার বিপাকীয় কাজ চালানোর প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেয়। এ কাজের পর যতটুকু খাদ্য অবশিষ্ট থাকে, সেগুলো উদ্ভিদের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সঞ্চিত থাকে। বিভিন্ন ফল এবং বীজ ছাড়াও কান্ড (যেমন-গোল আলু), মূল (যেমন-মিষ্টি আলু) কিংবা পাতাতেও (যেমন-ঘৃতকুমারী) এই খাদ্য জমা থাকে। আমরা এবার দেখব সালোকসংশ্লেষণে উৎপন্ন খাদ্য কীভাবে উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়।

ফ্লোয়েমের মাধ্যমে পরিবহন (Phloem translocation):
উদ্ভিদের মূল এবং পাতা পরস্পর থেকে দূরে অবস্থান করায় খাদ্য চলাচলে একটি দ্রুত ও কার্যকর পরিবহনব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। এ কাজটি ফ্লোয়েমের সিভনল করে থাকে। ফ্লোয়েম পরিবহন কলাগুচ্ছের অন্যতম গুচ্ছ। আমরা জেনেছি যে পরিবহন কলাগুচ্ছে জাইলেমগুচ্ছ এবং ফ্লোয়েমগুচ্ছ থাকে। ফ্লোয়েমগুচ্ছে সিভনল, সঙ্গীকোষ, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা ও বাস্টফাইবার থাকে। সিভনল এক ধরনের কেন্দ্রিকাবিহীন ও পাতলা প্রাচীরযুক্ত সজীব কোষ। লম্বালম্বিভাবে এরা একটির সাথে অন্যটি যুক্ত হয়ে উদ্ভিদদেহে জালের মতো গঠন সৃষ্টি করে। দুটো কোষের মধ্যবর্তী অনুপ্রস্থ প্রাচীরটি স্থানে স্থানে বিলুপ্ত হয়ে চালুনির মতো আকার ধারণ করে। এর ফলে খাদ্যদ্রব্য সহজেই এক কোষ থেকে অন্য কোষে চলাচল করতে পারে। শীতকালে এ রন্ধ্রগুলোতে ক্যালোজ নামক রাসায়নিক পদার্থ জমা হয়ে রন্ধ্র ছোট হয়, তাই খাদ্য চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। গ্রীষ্মের আগমনে ক্যালোজ গলে যায়, তাই খাদ্য চলাচল বেড়ে যায়।

6.2.4 প্রস্বেদন (Transpiration):

পানি ছাড়া জীবন কল্পনা করা যায় না। উদ্ভিদ প্রধানত মূল দিয়ে তার প্রয়োজনীয় পানি শোষণ করে। শোষিত পানির অতি সামান্য অংশ উদ্ভিদের বিভিন্ন জৈবিক কার্যাবলির জন্য ব্যয় হয়। অবশিষ্ট পানি উদ্ভিদের বায়বীয় অংশ দিয়ে বাষ্পাকারে বাইরে বের হয়ে যায়। সাধারণত স্থলজ উদ্ভিদ যে শারীরতত্ত্বীয় প্রক্রিয়ায় তার বায়বীয় অঙ্গের মাধ্যমে বাষ্পাকারে পানি বের করে দেয়, সেটাই প্রস্বেদন বা বাষ্পমোচন প্রক্রিয়া। এ কাজটি তার বায়বীয় অঙ্গের কোন অংশের মাধ্যমে ঘটে, তার ভিত্তিতে এদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা: পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন, কিউটিকুলার প্রস্বেদন ও লেন্টিকুলার প্রস্বেদন।

(a) পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন (Stromatal transpiration):

পাতায়, কচিকাণ্ডে, ফুলের বৃতি ও পাপড়িতে দুটি রক্ষীকোষ (Guard cell) বেষ্টিত এক ধরনের রন্ধ্র থাকে। এদেরকে পত্ররন্ধ্র (একবচন stoma, বহুবচন stomata) বলে। কোনো উদ্ভিদের মোট প্রস্বেদনের 90-95% হয় পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে।

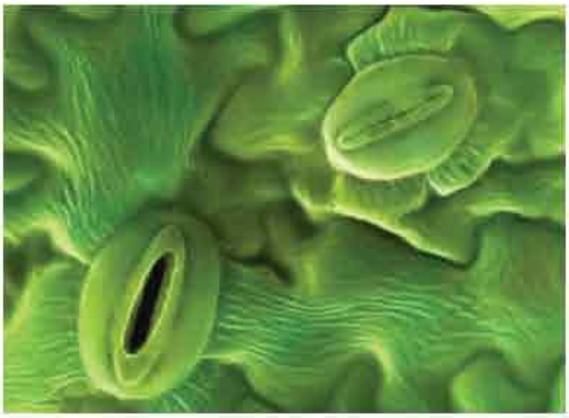

চিত্র 6.03: একটি খোলা এবং একটি বন্ধ পত্ররন্ধ্র

(b) কিউটিকুলার প্রস্বেদন (Cuticular transpiration):

উদ্ভিদের বহিঃত্বকে বিশেষ করে পাতার উপরে এবং নিচে কিউটিনের আবরণ থাকে। এ আবরণকে কিউটিকল বলে। কিউটিকল ভেদ করে কিছু পানি বাষ্পাকারে বাইরে বের হয়। এ প্রক্রিয়াকে কিউটিকুলার প্রস্বেদন বলে।

(c) লেন্টিকুলার প্রস্বেদন (Lenticular transpiration):

উদ্ভিদে গৌণ বৃদ্ধি হলে কাণ্ডের বাকল ফেটে লেন্টিসেল নামক ছিদ্র সৃষ্টি হয়। লেন্টিসেলের ভিতরের কোষগুলো আলাদাভাবে সজ্জিত থাকে এবং এর মাধ্যমে কিছু পানি বাইরে বেরিয়ে যায়। একে লেন্টিকুলার প্রস্বেদন বলে।

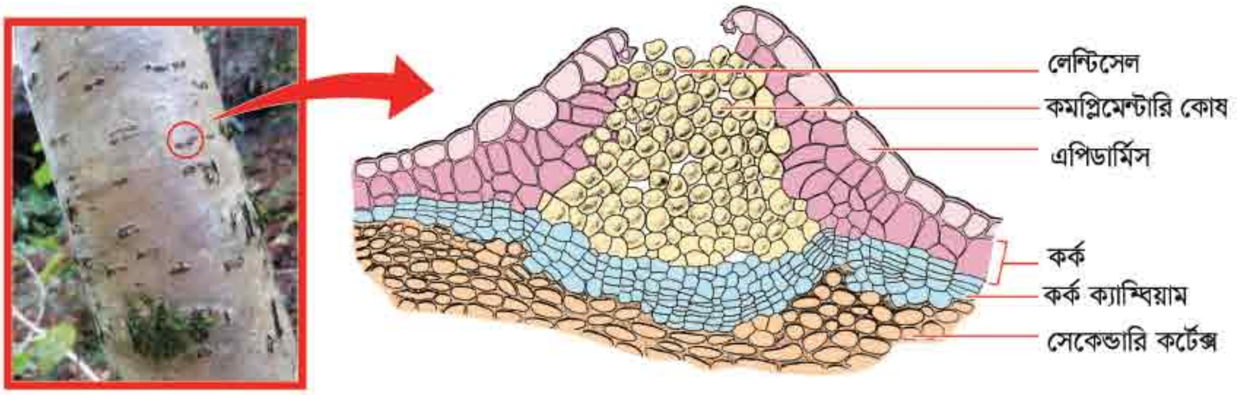

চিত্র 6.04: একটি লেন্টিসেল

প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদটি বাষ্পাকারে অতিরিক্ত পানি মুক্ত করে আর এর ফলে সৃষ্ট টানে পানি শোষিত হয়। এ প্রক্রিয়াটি অনেকগুলো প্রভাবকের উপর নির্ভরশীল। এদের মোটামুটিভাবে দুভাগে ভাগ করা যায়, বাহ্যিক প্রভাবক ও অভ্যন্তরীণ প্রভাবক।

(a) বাহ্যিক প্রভাবক

(i) তাপমাত্রা (Temperature): তাপমাত্রার তারতম্যের সঙ্গে প্রস্বেদনের হারও ওঠা-নামা করে। অধিক তাপে পানি সহজেই বাষ্পে পরিণত হতে পারে বলে প্রস্বেদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বায়ুমন্ডলের জলীয়বাষ্প ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রস্বেদনের হারও দ্রুততর হয়। তাপমাত্রা কমে গেলে তাই স্বাভাবিক নিয়মেই প্রস্বেদনের হারও কমে যায়।

(ii) আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative humidity): বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ ও বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণক্ষমতার আনুপাতিক হারকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে। কোনো একটি এলাকার বায়ুমণ্ডলে অধিক জলীয়বাষ্প থাকা সত্ত্বেও অধিক ধারণক্ষমতার জন্য তা শুষ্ক হতে পারে। আবার কম জলীয়বাষ্প থাকা সত্ত্বেও বায়ুমন্ডলের কম ধারণক্ষমতার জন্য এটি সিক্ত হতে পারে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হলে বায়ু অসম্পৃক্ত থাকে ও জলীয়বাষ্প গ্রহণ করতে পারে কিন্তু অধিক হলে বায়ু সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে জলীয়বাষ্প ধারণক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম থাকলে প্রস্বেদনের হার বেড়ে যায় এবং বেশি থাকলে হার কমে যায়।

(iii) আলো (Light): আলোর উপস্থিতিতে পত্ররন্ধ্র খুলে যায়, ফলে প্রস্বেদনের হার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অন্ধকারে পত্ররন্ধ্র বন্ধ থাকায় এই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। আলোর তারতম্যের জন্য পত্ররন্ধ্রের আকারেও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ফলে প্রস্বেদনের হারও ওঠা-নামা করে। আলো উদ্ভিদদেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমেও প্রস্বেদন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

(iv) বায়ুপ্রবাহ (Wind): প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদের চারদিকের বায়ু সিক্ত হয়ে ওঠে, ফলে এই প্রক্রিয়ার হার কমতে থাকে। যখন বায়ুপ্রবাহ সম্পৃক্ত বায়ু দূরে সরিয়ে দেয় তখন এই হার আবার বৃদ্ধি পায়। বায়ুপ্রবাহের ফলে পত্রগুলো আন্দোলিত হয় এবং পত্ররন্ধ্রের চাপ পড়ে। ফলে অধিক হারে জলীয়বাষ্প রন্ধ্রপথে বের হয়। এসব কারণে বায়ুপ্রবাহের তারতম্যে প্রস্বেদন হারেরও তারতম্য ঘটে। বায়ুচাপ বৃদ্ধিতে বাষ্পীয়ভবন ক্রিয়া হ্রাস পায়, ফলে প্রস্বেদন কমে যায়। আবার বায়ুচাপ কমে গেলে বাষ্পীয়ভবন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পায় এবং প্রস্বেদনের হারও বেড়ে যায়।

(b) অভ্যন্তরীণ প্রভাবক

(i) পত্ররন্ধ্র: পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা, আয়তন, গঠন এবং অবস্থানের উপর প্রস্বেদন হারের তারতম্য ঘটে।

(ii) পত্রের সংখ্যা: পাতার সংখ্যা, আয়তন, গঠন এবং অবস্থানের উপর প্রস্বেদন হারের তারতম্য লক্ষ করা যায়।

(iii) পত্রফলকের আয়তন: পত্রফলকের আয়তন বড় হলে প্রস্বেদনের হার বেড়ে যায়। একইভাবে এ আয়তন কম হলে প্রস্বেদনের হারও কমে যায়।

(iv) উদ্ভিদের বায়ব অঙ্গের আয়তন: পাতা ও কাণ্ডসহ উদ্ভিদের বায়ব অঙ্গের কলেবর বৃদ্ধি পেলে প্রস্বেদনের হারও বেড়ে যায়।

এছাড়া কিউটিকলের উপস্থিতি, স্পনজি প্যারেনকাইমার পরিমাণ এগুলোও প্রস্বেদন হারের তারতম্য ঘটায়।

একক কাজ

কাজ: প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ যে পানি বাষ্পাকারে বের করে দেয় তার পরীক্ষা।

উপকরণ: টবসহ একটি সতেজ উদ্ভিদ, একটি কাচের বেলজার বা সেলোফেন ব্যাগ, সুতা বা ক্লিপ এবং পরিমাণমতো কিছু পানি।

পদ্ধতি: প্রথমেই টবসহ গাছটিকে টেবিলের উপর বসিয়ে দিতে হবে এবং টবে পরিমাণমতো পানি ঢেলে দিতে হবে। এবার কিছু পাতাসহ একটি শাখাকে সেলোফেন ব্যাগ দিয়ে মুড়ে সুতো দিয়ে বেঁধে বা ক্লিপ দিয়ে আটকে অথবা বেলজার দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন ভিতরের বাষ্প বের হতে বা বাইরের বাতাস ঢুকতে না পারে। এ অবস্থায় টবটি এক ঘণ্টা রেখে দিতে হবে।

পর্যবেক্ষণ: এক ঘণ্টা পর দেখা যাবে, সেলোফেন ব্যাগের ভিতরের গায়ে পানির ফোঁটা জমে আছে এবং পুরো ব্যাগটি অস্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। কেন এমন হলো তা কি তোমরা বুঝতে পারছ?

সিদ্ধান্ত: যেহেতু সেলোফেন ব্যাগে অন্য কোনো পানি ঢোকার সুযোগ ছিল না, তাই ঐ পানির কণাগুলো যে পাতা থেকেই বেরিয়েছে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এতে প্রমাণিত হলো যে উদ্ভিদ তার বায়বীয় অঙ্গ দিয়ে পানি বাষ্পাকারে দেহের বাইরে বের করে দেয়।

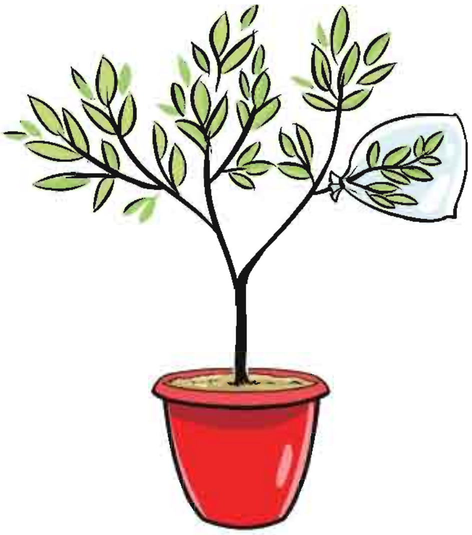

চিত্র 6.05: প্রস্বেদনের পরীক্ষা

সতর্কতা:

(a) টবের উদ্ভিদটি অবশ্যই সতেজ হতে হবে।

(b) সেলোফেন ব্যাগের মুখ ভালোভাবে বেঁধে বায়ুরোধী করতে হবে।

প্রস্বেদন একটি অতি প্রয়োজনীয় অমঙ্গল (Transpiration is a necessary evil):

প্রস্বেদনের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্তমানে সকল বিজ্ঞানীই ঐকমত্যে পৌঁছেছেন বলে মনে করা হয়। এ প্রক্রিয়ার উপরে সজীব উদ্ভিদ কোষের বিপাকীয় কার্যক্রম অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রস্বেদনের ফলে

জাইলেমবাহিকায় টান পড়ে। এই টানের ফলে উদ্ভিদের মূলরোম কর্তৃক শোষিত পানি এবং খনিজ লবণ পাতায় পরিবাহিত হয়। এ টানের ঘাটতি হলে পানি শোষণ কমে যাবে এবং খাদ্য প্রস্তুতসহ অনেক বিপাকীয় কার্যক্রম শ্লথ হয়ে যাবে। প্রস্বেদনের ফলে পাতার মেসোফিলে ব্যাপন চাপ ঘাটতি সৃষ্টি হয়, যা পানি শোষণে সাহায্য করে। উদ্ভিদ প্রস্বেদনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত পত্রফলক দিয়ে শোষিত তাপশক্তি হ্রাস করে পাতার কোষগুলোর তাপমাত্রা সহনশীল পর্যায়ে রাখে।

অন্যদিকে, গুরুত্বপূর্ণ এই প্রক্রিয়াটি উদ্ভিদের বহু ধরনের উপকার করলেও এর কিছু অপকারী ভূমিকাও রয়েছে। যেমন: পানি শোষণের চেয়ে প্রস্বেদনে পানি হারানোর হার বেশি হলে উদ্ভিদের জন্য পানি এবং খনিজের ঘাটতি দেখা দিবে। এর ফলে উদ্ভিদটির মৃত্যু হতে পারে। মাটিতে পানির ঘাটতি থাকলে শোষণ কম হবে কিন্তু প্রস্বেদন পূর্বের মতো চলতে থাকবে। এ অবস্থাকে ঠেকাতে প্রকৃতি শীত মৌসুমে বহু উদ্ভিদের পাতা ঝরিয়ে দেয়। প্রস্বেদনের অভাবে প্রয়োজনীয় ব্যাপন চাপ ঘাটতি হবে না, ফলে অভিস্রবণ কম হবে।

এমতাবস্থায় বলা যায়, প্রস্বেদন কিছু ক্ষতিসাধন করলেও এই প্রক্রিয়া উদ্ভিদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় একটি কার্যক্রম। বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্যের জন্য বিজ্ঞানী কার্টিস প্রস্বেদনকে 'প্রয়োজনীয় ক্ষতি' (Necessary Evil) নামে অভিহিত করেছেন। তবে সার্বিক বিচারে এটি উদ্ভিদকে টিকে থাকার ক্ষেত্রে সুবিধা দেয় বলে এর অপকারী দিক থাকা সত্ত্বেও প্রস্বেদন প্রক্রিয়া বিবর্তিত হয়েছে।

6.3 মানবদেহে রক্ত সংবহন (Blood Circulation in human body)

রক্ত জীবনীশক্তির মূল। রক্তনালির মধ্য দিয়ে রক্ত দেহের সর্বত্র প্রবাহিত হয় এবং কোষে অক্সিজেন এবং খাদ্য উপাদান সরবরাহ করে। ফলে দেহের সব কোষ সজীব এবং সক্রিয় থাকে। যে তন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত প্রতিনিয়ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও অংশে চলাচল করে, তাকে রক্ত সংবহনতন্ত্র বলে। এ তন্ত্রে প্রবাহিত রক্তের মাধ্যমেই খাদ্য, অক্সিজেন এবং রক্তের বর্জ্য পদার্থ দেহের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবাহিত হয়।

মানবদেহে রক্তপ্রবাহ কেবল হৃৎপিণ্ড এবং রক্তনালিগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, কখনো এর বাইরে আসে না। এ ধরনের সংবহনতন্ত্রকে বন্ধ সংবহনতন্ত্র (Close circulatory system) বলা হয়। সারা দেহে রক্ত একবার সম্পূর্ণ পরিভ্রমণের জন্য মাত্র এক মিনিট বা তার চেয়েও কম সময় লাগে। বন্ধ সংবহনতন্ত্রের বড় সুবিধা হলো এ ব্যবস্থায়,

(a) রক্ত সরাসরি দেহের বিভিন্ন অঙ্গে গিয়ে পৌঁছে।

(b) রক্তবাহী নালির ব্যাসের পরিবর্তনের মাধ্যমে দেহ কোনো বিশেষ অঙ্গে রক্তপ্রবাহের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

(c) রক্ত বিভিন্ন অঙ্গে পরিভ্রমণ করে দ্রুত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। অন্যান্য তন্ত্রের তুলনায় রক্ত সংবহনতন্ত্র বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হলেও এর গঠনশৈলী মোটামুটি সাধারণ।

পরিবহনতন্ত্রকে সাধারণত দুটি অংশে ভাগ করা হয়, রক্ত সংবহনতন্ত্র (Blood circulatory system): হৃৎপিণ্ড, ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালি নিয়ে গঠিত এবং লসিকাতন্ত্র (Lymphatic system): লসিকা, লসিকানালি ও ল্যাকটিয়েলনালি নিয়ে গঠিত।

6.3.1 রক্ত (Blood)

রক্ত একটি অস্বচ্ছ, মৃদু ক্ষারীয় এবং লবণাক্ত তরল পদার্থ। রক্ত হৃৎপিণ্ড, শিরা, উপশিরা, ধমনি, শাখা ধমনি এবং কৈশিকনালি পথে আবর্তিত হয়। লোহিত রক্তকণিকায় হিমোগ্লোবিন নামক রঞ্জক পদার্থ থাকার কারণে রক্তের রং লাল দেখায়। হাড়ের লাল অস্থিমজ্জাতে রক্তকণিকার জন্ম হয়।

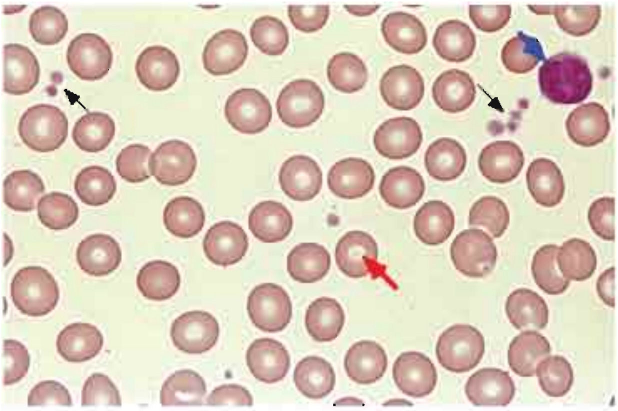

চিত্র 6.06: অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা রক্তের উপাদান। লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা ও অণুচক্রিকা যথাক্রমে লাল, নীল ও কালো রঙের তীর দিয়ে নির্দেশিত

রক্তের উপাদান

রক্ত এক ধরনের তরল যোজক কলা। রক্তরস এবং কয়েক ধরনের রক্তকণিকার সমন্বয়ে রক্ত গঠিত।

(a) রক্তরস (Plasma):

রক্তের বর্ণহীন তরল অংশকে রক্তরস বলে। সাধারণত রক্তের শতকরা প্রায় 55 ভাগ রক্তরস। রক্তরসের প্রধান উপাদান পানি। এছাড়া বাকি অংশে কিছু প্রোটিন, জৈবযৌগ ও সামান্য অজৈব লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এর মধ্যে যে পদার্থগুলো থাকে তা হলো:

(i) প্রোটিন, যথা অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন ও ফাইব্রিনোজেন
(ii) গ্লুকোজ
(iii) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্বিকণা
(iv) খনিজ লবণ
(v) ভিটামিন
(vi) হরমোন
(vii) এন্টিবডি
(viii) বর্জ্য পদার্থ যেমন: কার্বন ডাই-অক্সাইড, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ইত্যাদি।

এছাড়া সামান্য পরিমাণে সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম বাইকার্বোনেট ও অ্যামাইনো এসিড থাকে। আমরা খাদ্য হিসেবে যা গ্রহণ করি তা পরিপাক হয়ে অন্ত্রের গাত্রে শোষিত হয় এবং রক্তরসে মিশে

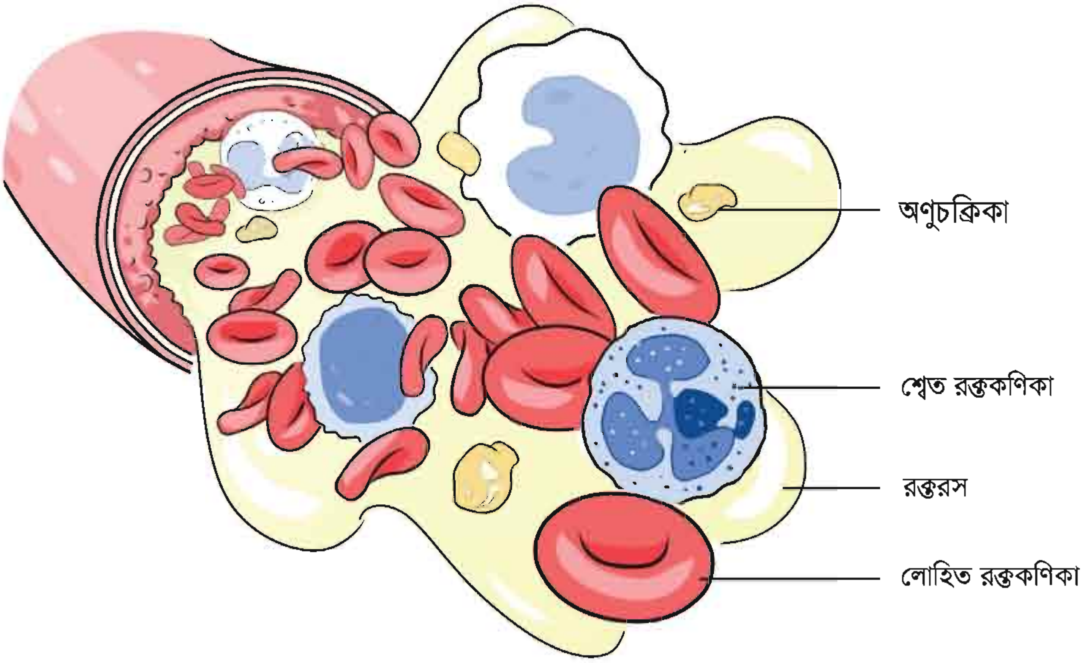

চিত্র 6.07: বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা

দেহের সর্বত্র সঞ্চালিত হয়। এভাবে দেহকোষগুলো পুষ্টিকর দ্রব্যাদি গ্রহণ করে দেহের পুষ্টির সাধন এবং ক্ষয়পূরণ করে।

(b) রক্তকণিকা (Blood corpuscles)

মানবদেহে তিন ধরনের রক্তকণিকা দেখা যায়, লোহিত রক্তকণিকা (Red Blood Corpuscles), শ্বেত রক্তকণিকা (White Blood Corpuscles) এবং অণুচক্রিকা (Blood Platelets)। যদিও এগুলো সব কোষ, তবে রক্তের প্লাজমার মধ্যে ভাসমান কণার সাথে তুলনা করে এদেরকে অনেক দিন আগে রক্তকণিকা নাম দেওয়া হয়েছিল, তখন অণুবীক্ষণ যন্ত্র এখনকার মতো উন্নত ছিল না। সেই নাম এখনও প্রচলিত।

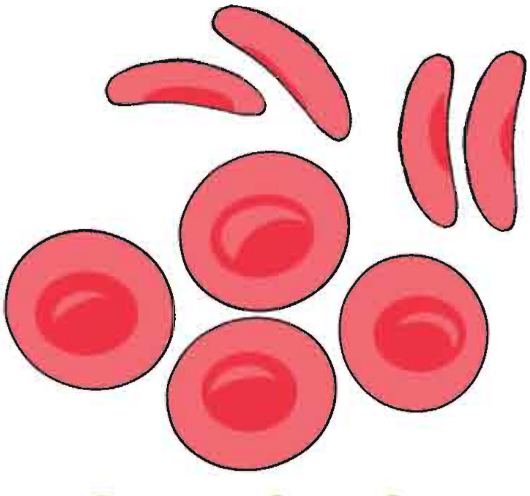

চিত্র 6.08: লোহিত রক্তকণিকা

(i) লোহিত রক্তকণিকা: মানবদেহে তিন ধরনের রক্তকণিকার মধ্যে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এটি শ্বাসকার্যে অক্সিজেন পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লাল অস্থিমজ্জায় লোহিত রক্তকণিকা তৈরি হয়। এর গড় আয়ু 120 দিন। মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না এবং দেখতে অনেকটা দ্বি-অবতল বৃত্তের মতো। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির রক্তে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে প্রায় 50 লক্ষ।

এটি শ্বেত রক্তকণিকার চেয়ে প্রায় 500 গুণ বেশি। পুরুষের তুলনায় নারীদের রক্তে লোহিত রক্তকণিকা কম থাকে। তুলনামূলকভাবে শিশুদের দেহে লোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ বেশি থাকে। আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তে লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংস হয়, আবার সমপরিমাণে তৈরিও হয়। লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন অক্সিহিমোগ্লোবিন হিসেবে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহন করে।

হিমোগ্লোবিন: হিমোগ্লোবিন এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ। লোহিত রক্তকণিকায় এর উপস্থিতির কারণে রক্ত লাল দেখায়। রক্তে প্রয়োজনীয় পরিমাণ হিমোগ্লোবিন না থাকলে রক্তস্বল্পতা বা রক্তশূন্যতা (anemia) দেখা দেয়। বাংলাদেশের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী এ রোগে আক্রান্ত।

(ii) শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট

শ্বেতকণিকার নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই। এগুলো হিমোগ্লোবিনবিহীন এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত বড় আকারের কোষ। শ্বেত কণিকার গড় আয়ু ১-১৫ দিন। হিমোগ্লোবিন না থাকার কারণে এদের শ্বেত রক্তকণিকা, ইংরেজিতে White Blood Cell বা WBC বলে। শ্বেত কণিকার সংখ্যা RBC-এর তুলনায় অনেক কম। এরা অ্যামিবার মতো দেহের আকারের পরিবর্তন করে। ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় এটি জীবাণুকে ধ্বংস করে।

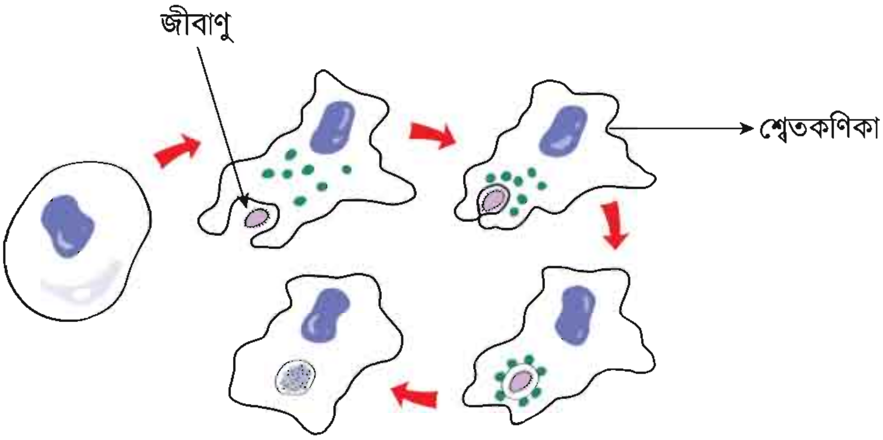

চিত্র 6.09: শ্বেত কণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণুকে ধ্বংস করে থাকে

শ্বেত কণিকাগুলো রক্তরসের মধ্য দিয়ে নিজেরাই চলতে পারে। রক্ত জালিকার প্রাচীর ভেদ করে টিস্যুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। দেহ বাইরের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে, দ্রুত শ্বেত কণিকার সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। মানবদেহে প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে 4-10 হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। অসুস্থ মানবদেহে এর সংখ্যা বেড়ে যায়। স্তন্যপায়ীদের রক্তকোষগুলোর মধ্যে শুধু শ্বেত রক্ত কণিকায় DNA থাকে।

প্রকারভেদ: গঠনগতভাবে এবং সাইটোপ্লাজমে দানার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি অনুসারে শ্বেত কণিকাকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা (ক) অ্যাগ্রানুলোসাইট বা দানাবিহীন এবং (খ) গ্রানুলোসাইট বা দানাযুক্ত।

(ক) অ্যাগ্রানুলোসাইট : এ ধরনের শ্বেত কণিকার সাইটোপ্লাজম দানাহীন ও স্বচ্ছ। অ্যাগ্রানুলোসাইট শ্বেত কণিকা দুই রকমের; যথা-লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট। দেহের লিম্ফনোড, টনসিল, প্লিহা ইত্যাদি অংশে এরা তৈরি হয়। লিম্ফোসাইটগুলো বড় নিউক্লিয়াসযুক্ত ছোট কণিকা। মনোসাইট ছোট, ডিম্বাকার ও বৃক্কাকার নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট বড় কণিকা। লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি গঠন করে এবং এই অ্যান্টিবডির দ্বারা দেহে প্রবেশ করা রোগজীবাণু ধ্বংস করে। এভাবে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। মনোসাইট ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় রোগজীবাণুকে ধ্বংস করে।

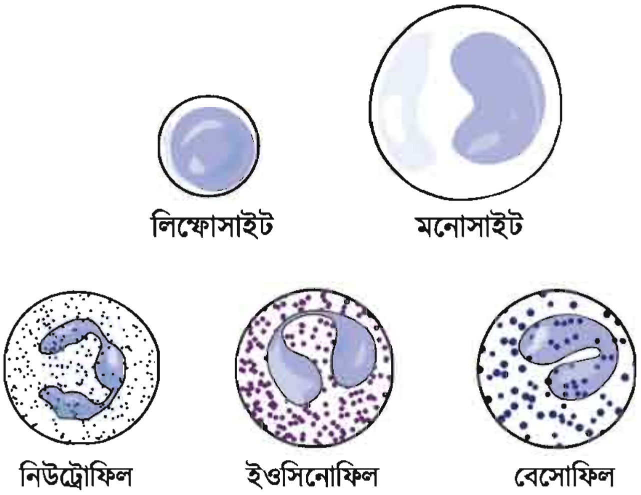

চিত্র 6.10: বিভিন্ন প্রকার শ্বেত কণিকা

(খ) গ্রানুলোসাইট : এদের সাইটোপ্লাজম সূক্ষ্ম দানাযুক্ত। গ্রানুলোসাইট শ্বেত কণিকাগুলো নিউক্লিয়াসের আকৃতির ভিত্তিতে তিন প্রকার যথা: নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল এবং বেসোফিল।

নিউট্রোফিল ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ভক্ষণ করে। ইওসিনোফিল ও বেসোফিল হিস্টামিন নামক রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত করে দেহে এলার্জি প্রতিরোধ করে। বেসোফিল হেপারিন নিঃসৃত করে রক্তকে রক্তবাহিকার ভিতরে জমাট বাঁধতে বাধা দেয়।

(iii) অণুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট

ইংরেজিতে এদেরকে প্লেইটলেট (Platelet) বলে। এগুলো গোলাকার, ডিম্বাকার অথবা রড আকারের হতে পারে। এদের সাইটোপ্লাজম দানাদার এবং সাইটোপ্লাজমে কোষ অঙ্গাণু- মাইটোকন্ড্রিয়া, গল্গি বস্তু থাকে; কিন্তু নিউক্লিয়াস থাকে না। অনেকের মতে, অণুচক্রিকাগুলো সম্পূর্ণ কোষ নয়; এগুলো অস্থি মজ্জার বৃহদাকার কোষের ছিন্ন অংশ। অণুচক্রিকাগুলোর গড় আয়ু ৫-১০ দিন। পরিণত মানবদেহে প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে অণুচক্রিকার সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ। অসুস্থ দেহে এদের সংখ্যা আরও বেশি হয়।

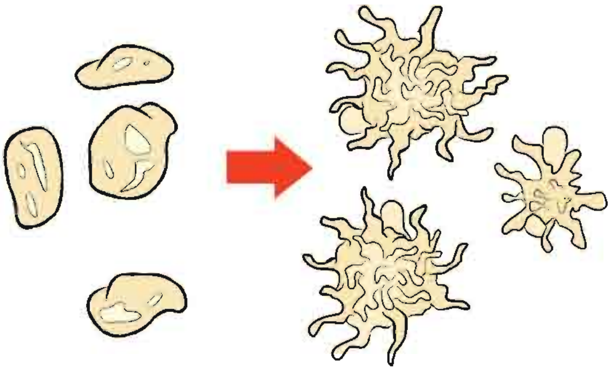

চিত্র 6.11: অণুচক্রিকা এবং তার আকার পরিবর্তন।

অণুচক্রিকার প্রধান কাজ হলো রক্ত তঞ্চন করা বা জমাট বাঁধানোতে (blood clotting) সাহায্য করা। যখন কোনো রক্তবাহিকা বা কোনো টিস্যু

আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কেটে যায়, তখন সেখানকার অণুচক্রিকাগুলো সক্রিয় হয়ে উঠে অনিয়মিত আকার ধারণ করে এবং থ্রম্বোপ্লাসটিন (Thromboplastin) নামক পদার্থ তৈরি করে। এ পদার্থগুলো রক্তের প্রোটিন প্রোথ্রমবিনকে থ্রমবিনে পরিণত করে। থ্রমবিন পরবর্তী সময়ে রক্তরসের প্রোটিন- ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিন জালকে পরিণত করে রক্তকে জমাট বাধায় কিংবা রক্তের তঞ্চন ঘটায়। ফাইব্রিন একধরনের অদ্রবণীয় প্রোটিন, যা দ্রুত সুতার মতো জালিকা প্রস্তুত করে। এটি ক্ষত স্থানে জমাট বাঁধে এবং রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। তবে রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়াটি আরও জটিল, এ প্রক্রিয়ায় জন্য আরও বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ এবং ভিটামিন K ও ক্যালসিয়াম আয়ন জড়িত থাকে।

রক্তে উপযুক্ত পরিমাণ অণুচক্রিকা না থাকলে রক্তপাত সহজে বন্ধ হয় না। ফলে অনেক সময় রোগীর প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকে।

একক কাজ

কাজ: নিচের ছকটি খাতায় আঁক ও পূরণ কর।

লোহিত ও শ্বেত রক্তকণিকার মধ্যে পার্থক্য :

বৈশিষ্ট্য	লোহিত রক্তকণিকা	শ্বেত রক্তকণিকা
(a) নিউক্লিয়াস		
(b) আকার		
(c) হিমোগ্লোবিন		
(d) সংখ্যা		
(e) কাজ		

রক্তের কাজ

রক্ত দেহের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি দেহের নানাবিধ কাজ করে, যেমন:

(a) অক্সিজেন পরিবহন: লোহিত রক্তকণিকা অক্সিহিমোগ্লোবিনরূপে কোষে অক্সিজেন পরিবহন করে।

(b) কার্বন ডাই-অক্সাইড অপসারণ: রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কোষগুলোতে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়, রক্তরস সোডিয়াম বাই কার্বনেটরূপে তা সংগ্রহ করে নিয়ে আসে এবং নিঃশ্বাস বায়ুর সাথে ফুসফুসের সাহায্যে দেহের বাইরে বের করে দেয়।

(c) খাদ্যসার পরিবহন: রক্তরস গ্লুকোজ, অ্যামাইনো এসিড, চর্বিকণা ইত্যাদি কোষে সরবরাহ করে।

(d) তাপের সমতা রক্ষা: দেহের মধ্যে অনবরত দহনক্রিয়া সম্পাদিত হচ্ছে। এতে করে বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন মাত্রার তাপ সৃষ্টি হয় এবং তা রক্তের মাধ্যমে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে দেহের সর্বত্র তাপের সমতা রক্ষা হয়।

(e) বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন: রক্ত দেহের জন্য ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ বহন করে এবং বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে সেসব ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ও কার্বন ডাই-অক্সাইড হিসেবে নিষ্কাশন করে।

(f) হরমোন পরিবহন: হরমোন নালিবিহীন গ্রন্থিতে তৈরি এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ বা রস। এই রস সরাসরি রক্তে মিশে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন অঙ্গে সঞ্চালিত হয় এবং বিভিন্ন জৈবিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(g) রোগ প্রতিরোধ: কয়েক প্রকারের শ্বেত রক্তকণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় দেহকে জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। অ্যান্টিবডি ও অ্যান্টিজেন উৎপাদনের মাধ্যমে রক্ত দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

(h) রক্ত জমাট বাঁধা: দেহের কোনো অংশ কেটে গেলে অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে এবং দেহের রক্তক্ষরণ বন্ধ করে।

6.3.2 ব্লাড গ্রুপ বা রক্তের গ্রুপ

একজন আশঙ্কাজনক বা মুমূর্ষু রোগীর জন্য রক্তের প্রয়োজন, তার রক্তের গ্রুপ 'বি' পজিটিভ। তোমরা এ রকম বিজ্ঞাপন প্রায়শই টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাও। রক্তের গ্রুপ বা ব্লাড গ্রুপ কী? কেনইবা ব্লাড গ্রুপ জানা প্রয়োজন? অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে যে বিভিন্ন ব্যক্তির লোহিত রক্ত কণিকায় A এবং B নামক দুই ধরনের অ্যান্টিজেন (antigens) থাকে এবং রক্তরসে a ও b দুই ধরনের অ্যান্টিবডি (antibody) থাকে। এই অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডির উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে মানুষের রক্তকে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করা যায়। একে ব্লাড গ্রুপ বলে। বিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার 1901 সালে মানুষের রক্তের শ্রেণিবিন্যাস করে তা A, B, AB এবং O— এ চারটি গ্রুপের নামকরণ করেন। সাধারণত একজন মানুষের রক্তের গ্রুপ আজীবন একই রকম থাকে।

নিচের সারণিতে রক্তের গ্রুপের অ্যান্টিবডি এবং অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি দেখানো হলো:

রক্তের গ্রুপ	অ্যান্টিজেন (লোহিত রক্তকণিকায়)	অ্যান্টিবডি (রক্তরসে)
A	A	b
B	B	a
AB	A, B	নেই
O	নেই	a, b

আমরা উপরের সারণিতে রক্তে বিভিন্ন অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডির উপস্থিতি দেখেছি। এর ভিত্তিতে আমরা ব্লাড গ্রুপকে এভাবে বর্ণনা করতে পারি। যেমন:

গ্রুপ A: এ শ্রেণির রক্তে A এন্টিজেন ও b এন্টিবডি থাকে।
গ্রুপ B: এ শ্রেণির রক্তে B এন্টিজেন ও a এন্টিবডি থাকে।
গ্রুপ AB: এই শ্রেণির রক্তে A ও B এন্টিজেন থাকে এবং কোনো এন্টিবডি থাকে না।
গ্রুপ O: এ শ্রেণির রক্তে কোনো এন্টিজেন থাকে না কিন্তু a ও b এন্টিবডি থাকে।

দাতার লোহিত কণিকা বা কোষের কোষঝিল্লিতে উপস্থিত অ্যান্টিজেন যদি গ্রহীতার রক্তরসে উপস্থিত এমন অ্যান্টিবডির সংস্পর্শে আসে, যা উক্ত অ্যান্টিজেনের সাথে বিক্রিয়া করতে সক্ষম তাহলে, অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়া হয়ে গ্রহীতা বা রোগীর জীবন বিপন্ন হতে পারে। এজন্য সব গ্রুপের রক্ত সবাইকে দেওয়া যায় না। যেমন: তোমার রক্তের গ্রুপ যদি হয় A (অর্থাৎ লোহিত কণিকার ঝিল্লিতে A অ্যান্টিজেন আছে) এবং তোমার বন্ধুর রক্তের গ্রুপ যদি B হয় (অর্থাৎ রক্তরসে a অ্যান্টিবডি আছে) তাহলে তুমি তোমার বন্ধুকে রক্ত দিতে পারবে না। যদি দাও তাহলে তোমার A অ্যান্টিজেন তোমার বন্ধুর a অ্যান্টিবডির সাথে বিক্রিয়া করে বন্ধুকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে। তাই দাতার রক্তে যে অ্যান্টিজেন থাকে তার সাথে মিলিয়ে এমনভাবে গ্রহীতা নির্বাচন করতে হয় যেন তার রক্তে দাতার অ্যান্টিজেনের সাথে সম্পর্কিত অ্যান্টিবডিটি না থাকে। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে কোন গ্রুপ কাকে রক্ত দিতে পারবে বা পারবে না, তার একটা ছক বানানো যায়।

দাতা

গ্রহীতা

গ্রুপ	O-	O+	B-	B+	A-	A+	AB-	AB+
AB+	🩸	🩸	🩸	🩸	🩸	🩸	🩸	🩸
AB-	🩸		🩸		🩸		🩸	
A+	🩸	🩸			🩸	🩸		
A-	🩸				🩸			
B+	🩸	🩸	🩸	🩸				
B-	🩸		🩸					
O+	🩸	🩸						
O-	🩸							

চিত্র 6.12: কোন গ্রুপের রক্ত কাকে দেওয়া যাবে তার ছক

সারণি: ABO পদ্ধতিতে মানুষের রক্তের গ্রুপ অনুযায়ী দাতা ও গ্রহীতার তালিকা

রক্তের গ্রুপ	যে গ্রুপকে রক্ত দান করতে পারে	যে গ্রুপ থেকে রক্ত গ্রহণ করতে পারে
A	A, AB	A, O
B	B,AB	B, O
AB	AB	A, B, AB, O
O	A,B,AB,O	O

উপরের সারণিটি লক্ষ করলে দেখতে পারবে O গ্রুপের রক্তবিশিষ্ট ব্যক্তি সব গ্রুপের রক্তের ব্যক্তিকে রক্ত দিতে পারে। এদের বলা হয় সর্বজনীন রক্তদাতা (universal donor)। AB রক্তধারী ব্যক্তি যেকোনো ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করতে পারে। তাই তাকে সর্বজনীন রক্তগ্রহীতা (universal recipient) বলা হয়।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে সর্বজনীন রক্তদাতা কিংবা সর্বজনীন রক্তগ্রহীতার ধারণা খুব একটা প্রযোজ্য নয়। কেননা, রক্তকে অ্যান্টিজেনের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করার ক্ষেত্রে ABO পদ্ধতি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলেও রক্তে আরও অসংখ্য অ্যান্টিজেন থাকে, যেগুলো ক্ষেত্রবিশেষে অসুবিধার কারণ হতে পারে। যেমন: রেসাস (Rh) ফ্যাক্টর, যা এক ধরনের অ্যান্টিজেন। কারো রক্তে এই ফ্যাক্টর উপস্থিত থাকলে তাকে বলে পজিটিভ আর না থাকলে বলে নেগেটিভ। এটি যদি না মেলে তাহলেও গ্রহীতা বা রোগী আরও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। তাই ABO গ্রুপের পাশাপাশি রেসাস ফ্যাক্টরও পরীক্ষা করে মিলিয়ে দেখা চাই। অর্থাৎ রেসাস ফ্যাক্টরকে বিবেচনায় নেওয়া হলে রক্তের গ্রুপগুলো হবে A+, A-, B+ B-, AB+, AB-, O+ এবং O-। নেগেটিভ গ্রুপের রক্তে যেহেতু রেসাস ফ্যাক্টর অ্যান্টিজেন নেই, তাই এটি পজিটিভ গ্রুপকে দেওয়া যাবে কিন্তু পজিটিভ গ্রুপের রক্ত নেগেটিভ গ্রুপকে দেওয়া যাবে না।

রক্তদান ও সামাজিক দায়বদ্ধতা:

আঘাত, দুর্ঘটনা, শল্যচিকিৎসা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো কারণে অত্যধিক রক্তক্ষরণ হলে দেহে রক্তের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায়। রক্তশূন্যতা দূর করার জন্য ঐ ব্যক্তির দেহে রক্ত পরিসঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। জরুরি ভিত্তিতে এই রক্তশূন্যতা দূর করার জন্য রোগীর দেহে অন্য মানুষের রক্ত দিতে হয়। অন্যকে রক্তদান করা বর্তমানে একটি সাধারণ ঘটনা। জরুরি অবস্থায় অন্য ব্যক্তির রক্ত সরাসরি বা ব্লাড ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ করা রক্ত রোগীর দেহে প্রবেশ করানো হয়। কোনো ব্যক্তির শিরার মধ্য দিয়ে বাইরে থেকে অন্যের রক্ত প্রবেশ করানোর প্রক্রিয়াকে রক্ত সঞ্চালন (Blood transfusion) বলে। এটি একটি চমৎকার ফলপ্রদ ব্যবস্থা, যার ফলে রোগীর প্রাণ রক্ষা হয়। তবে কোনো অবস্থাতেই রোগীর রক্তের গ্রুপ ও প্রকৃতি পরীক্ষা না করে এক রোগীর দেহে অন্য কোনো ব্যক্তির বা ব্লাড ব্যাংকে রক্ষিত রক্ত প্রবেশ করানো উচিত নয়। ব্যতিক্রম হলে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়ে রোগীর জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা অনেকাংশে বেড়ে যায়। যেমন: রক্তকণিকাগুলোর জমাট বাঁধা, বিশ্লিষ্ট হওয়া, জন্ডিসের প্রাদুর্ভাব এবং প্রস্রাবের সাথে হিমোগ্লোবিন নির্গত হওয়া ইত্যাদি।

আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনায় আহতদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে রক্তের প্রয়োজন হয়। মনে রাখতে হবে, এটি আমাদের সবার জন্য একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা। যেহেতু রক্তের কোনো বিকল্প নেই, তাই এরূপ অবস্থায় অনেক সময় প্রচুর রক্তের প্রয়োজন হয় এবং অন্যের কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে ঐ জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করতে হয়। এরূপ জরুরি পরিস্থিতিতে জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়।

অন্যকে রক্তদান করা একটি মহৎ কাজ। এতে রক্তদাতার নিজের কোনো ক্ষতি হয় না। একজন সুস্থ মানুষের দেহ থেকে 450 মিলি রক্ত বের করে দিলে তেমন কোনো অসুবিধা হয় না। তার দেহ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় 20 লক্ষ লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি করতে পারে। দেখা গেছে, কোনো সুস্থ ব্যক্তি চার মাস পর পর রক্তদান করলে দাতার দেহে সামান্যতম কোনো অসুবিধা হয় না।

বর্তমানে রক্তদানে উদ্বুদ্ধকরণে নানা রকম কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। যেমন: কোনো বিশেষ দিবসে বা বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন। এতে জনসাধারণের মাঝে রক্তদান সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও ভীতি অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে। অতীতের তুলনায় মানুষ এখন রক্তদান এবং গ্রহণ সম্পর্কে অধিক আগ্রহী ও সচেতন।

6.4 হৃৎপিণ্ডের গঠন ও কাজ

6.4.1 হৃৎপিণ্ডের গঠন

হৃৎপিণ্ড বক্ষ গহ্বরের বাম দিকে দুই ফুসফুসের মাঝখানে অবস্থিত একটি ত্রিকোণাকার ফাঁপা অঙ্গ। এটি হৃৎপেশি নামক এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে গঠিত। হৃৎপিণ্ড পেরিকার্ডিয়াম নামক পাতলা পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে। হৃৎপিণ্ড-প্রাচীরে থাকে তিনটি স্তর, বহিঃস্তর বা এপিকার্ডিয়াম, মধ্যস্তর বা মায়োকার্ডিয়াম এবং অন্তঃস্তর বা এন্ডোকার্ডিয়াম।

বহিঃস্তর (Epicardium): এটি মূলত যোজক কলা নিয়ে গঠিত। এই স্তরটিতে বিক্ষিপ্তভাবে চর্বি থাকে এবং এটি আবরণী কলা দিয়ে আবৃত।

মধ্যস্তর (Myocardium): এটি বহিঃস্তর এবং অন্তঃস্তরের মাঝখানে অবস্থান করে। দৃঢ় অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে এ স্তর গঠিত।

অন্তঃস্তর (Endocardium): এটি সবচেয়ে ভিতরের স্তর। হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলো অন্তঃস্তর দিয়ে আবৃত। এই স্তরটি হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাগুলোকেও আবৃত করে রাখে। হৃৎপিণ্ডের ভিতরের স্তর ফাঁপা এবং চারটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। উপরের প্রকোষ্ঠ দুটি নিচের দুটির চেয়ে আকারে ছোট। উপরের প্রকোষ্ঠ দুটিকে ডান এবং বাম অলিন্দ (right & left atrium) বলে এবং নিচের প্রকোষ্ঠ দুটিকে ডান এবং বাম নিলয় (right & left ventricle) বলে। অলিন্দ দুটির প্রাচীর তুলনামূলকভাবে পাতলা, আর নিলয়ের প্রাচীর পুরু। অলিন্দ এবং নিলয় যথাক্রমে আন্তঃঅলিন্দ পর্দা এবং আন্তঃনিলয় পর্দা দিয়ে পরস্পর পৃথক থাকে।

হৃৎপিণ্ডের উভয় অলিন্দ এবং নিলয়ের মাঝে যে ছিদ্রপথ আছে, তা খোলা বা বন্ধ করার জন্য ভালভ (valve) বা কপাটিকা থাকে। ডান অলিন্দ এবং ডান নিলয়ের মধ্যবর্তী ছিদ্রপথ তিন পাল্লাবিশিষ্ট ট্রাইকাসপিড ভালভ দিয়ে সুরক্ষিত। একইভাবে বাম অলিন্দ এবং বাম নিলয় দুই পাল্লাবিশিষ্ট বাইকাসপিড ভালভ (মাইট্রাল ভালভ নামেও পরিচিত) দিয়ে সুরক্ষিত থাকে। মহাধমনি ও ফুসফুসীয় ধমনির মুখে অর্ধচন্দ্রাকার কপাটিকা থাকে। এদের অবস্থানের ফলে পাম্প করা রক্ত একই দিকে চলে এবং এক ফোঁটা রক্তও উল্টো দিকে ফিরে আসতে পারে না।

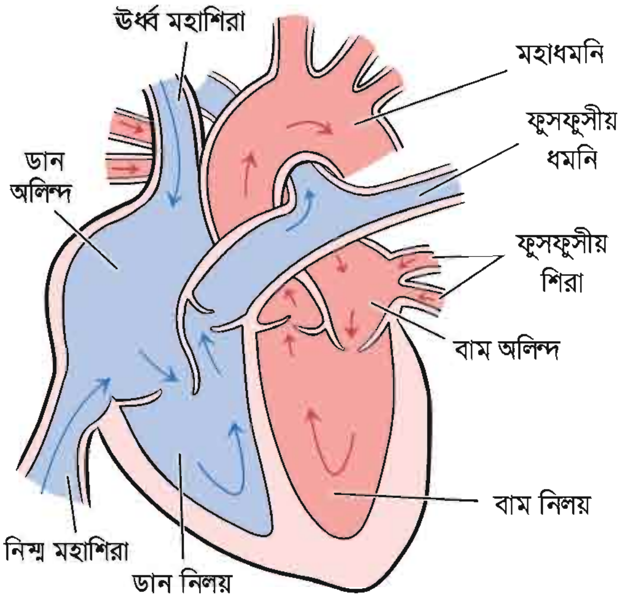

চিত্র 6.13: মানব হৃৎপিণ্ড

6.4.2 হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি

আমরা আগেই জেনেছি যে হৃৎপিণ্ড একটি পাম্পের মতো কাজ করে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন এবং প্রসারণ দিয়ে এ কাজ সম্পন্ন হয়। হৃৎপিণ্ডের অবিরাম সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে সারা দেহে রক্ত সংবহন পদ্ধতি অব্যাহত থাকে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে বলা হয় সিস্টোল এবং প্রসারণকে বলা হয় ডায়াস্টোল। হৃৎপিণ্ডের একবার সিস্টোল-ডায়াস্টোলকে একত্রে হৃৎস্পন্দন (heart beat) বলে।

অলিন্দ দুটি প্রসারিত হলে শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে। ঊর্ধ্ব মহাশিরার ভিতর দিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড যুক্ত রক্ত ডান অলিন্দে প্রবেশ করে। ফুসফুসীয় বা পালমোনারি শিরার ভিতর দিয়ে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত বাম অলিন্দে প্রবেশ করে।

অলিন্দ দুটির সংকোচন হলে নিলয় দুটির পেশি প্রসারিত হয। তখন ডান অলিন্দ-নিলয়ের ছিদ্রপথের ট্রাইকাসপিড ভালভ খুলে যায় এবং ডান অলিন্দ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড যুক্ত রক্ত ডান নিলয়ে প্রবেশ করে। ঠিক এই সময়ে বাম অলিন্দ এবং বাম নিলয়ের বাইকাসপিড ভালভ খুলে যায় তখন বাম অলিন্দ থেকে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। এর পরপরই ছিদ্রগুলো কপাটিকা দিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে নিলয় থেকে রক্ত আর অলিন্দে প্রবেশ করতে পারে না।

যখন নিলয় দুটি সংকুচিত হয়, তখন ডান নিলয় থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডযুক্ত রক্ত ফুসফুসীয় ধমনির মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করে। এখানে রক্ত পরিশোধিত হয়। ঠিক একই সময়ে বাম নিলয় থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত মহাধমনির মাধমে সারা দেহে পরিবাহিত হয় এবং উভয় ধমনির অর্ধচন্দ্রাকৃতির কপটিকাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। ফলে রক্ত পুনরায় নিলয়ে ফিরে আসতে পারে না। এভাবে হৃৎপিণ্ডে

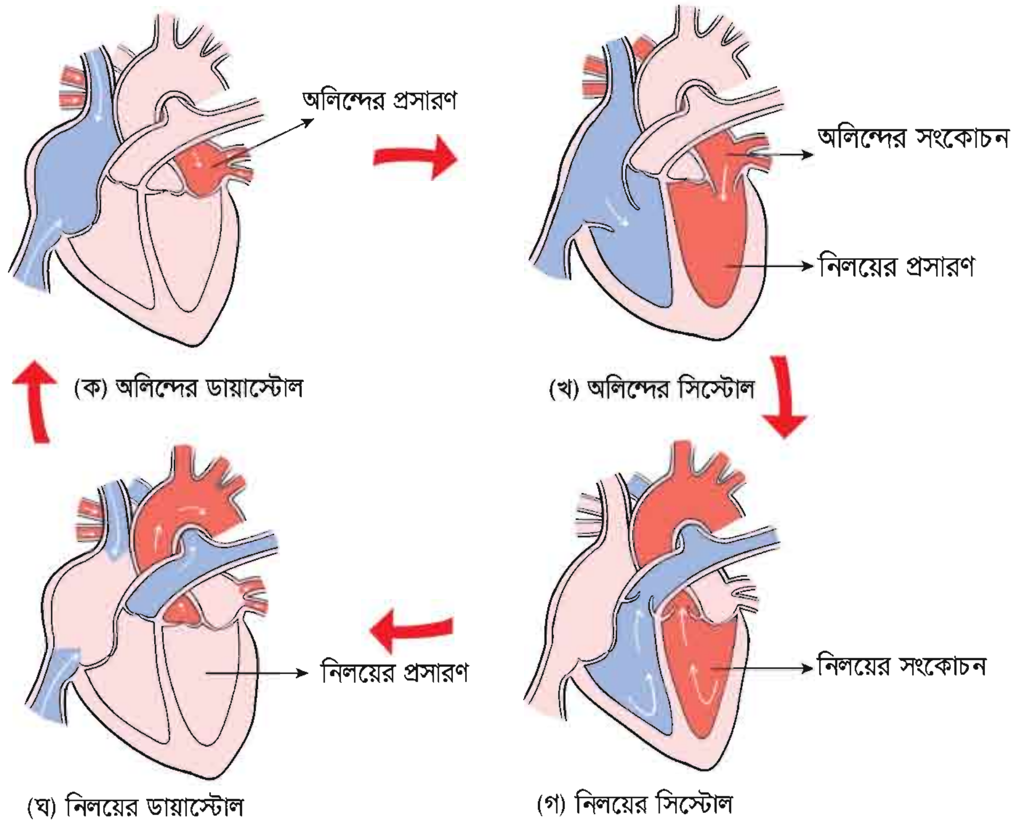

(ক) অলিন্দের ডায়াস্টোল

(খ) অলিন্দের সিস্টোল

(ঘ) নিলয়ের ডায়াস্টোল

(গ) নিলয়ের সিস্টোল

চিত্র 6.14 : হৃৎপিণ্ডের অন্তর্গঠন ও রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি

পর্যায়ক্রমিক সংকোচন এবং প্রসারণের ফলে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

হৃৎপিণ্ডের কাজ: রক্ত সংবহন তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হৃৎপিণ্ড। এর সাহায্যেই সংবহনতন্ত্রের রক্তপ্রবাহ সচল থাকে। হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলো সম্পূর্ণ বিভক্ত থাকায় এখানে অক্সিজেনযুক্ত ও অক্সিজেনবিহীন রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে না।

6.4.3 রক্তবাহিকা (Blood Vessel)

যেসব নালির ভিতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত বা সঞ্চালিত হয়, তাকে রক্তনালি বা রক্তবাহিকা বলে। এসব নালিপথে হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত বাহিত হয় এবং দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। গঠন, আকৃতি এবং কাজের ভিত্তিতে রক্তবাহিকা বা রক্তনালি তিন ধরনের— ধমনি, শিরা এবং কৈশিক জালিকা।

(a) ধমনি (Artery)

যেসব রক্তনালির মাধ্যমে সাধারণত অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে সারাদেহে বাহিত হয় তাকে ধমনি বলে। ফুসফুসীয় ধমনি এর ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমধর্মী ধমনি হৃৎপিণ্ড থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডযুক্ত রক্ত ফুসফুসে পৌঁছে দেয়।

ধমনির প্রাচীর তিন স্তরবিশিষ্ট:

(i) টিউনিকা এক্সটার্না (Tunica externa): এটি তন্তুময় যোজক কলা দিয়ে তৈরি বাইরের স্তর।

(ii) টিউনিকা মিডিয়া (Tunica media): এটি বৃত্তাকার অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে তৈরি মাঝের স্তর।

(iii) টিউনিকা ইন্টারনা (Tunica interna): এটি সরল আবরণী কলা দিয়ে তৈরি ভিতরের স্তর।

ধমনির প্রাচীর পুরু ও স্থিতিস্থাপক। ধমনিতে কপাটিকা থাকে না, এর নালিপথ সরু। হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক সংকোচনের ফলে দেহে ছোট-বড় সব ধমনিতে রক্ত তরঙ্গের মতো প্রবাহিত হয়। এতে ধমনিগাত্র সংকুচিত বা প্রসারিত হয়। ধমনির এই স্ফীতি এবং সংকোচনকে নাড়িস্পন্দন বলে। ধমনির ভিতর রক্তপ্রবাহ, ধমনিগাত্রের সংকোচন, প্রসারণ এবং স্থিতিস্থাপকতা নাড়িস্পন্দনের প্রধান কারণ। হাতের কব্জির ধমনির উপর হাত রেখে নাড়িস্পন্দন অনুভব করা যায়।

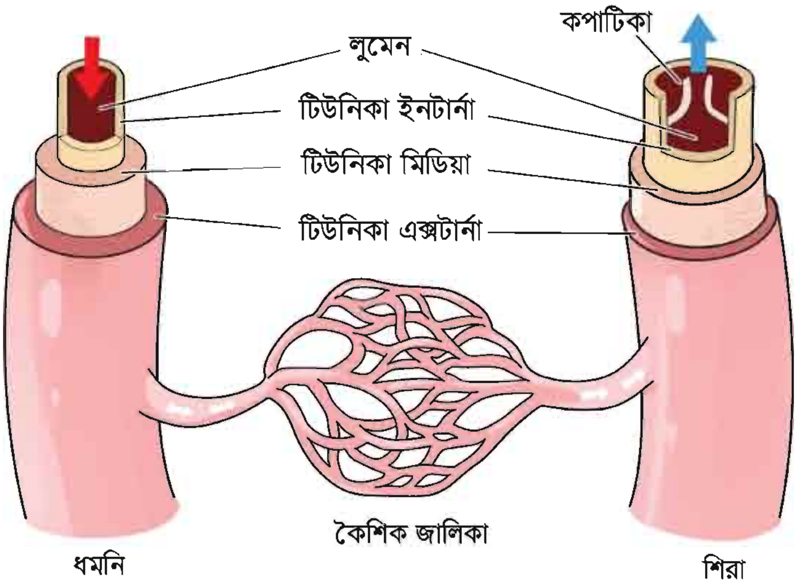

চিত্র 6.15: বিভিন্ন ধরনের রক্ত বাহিকা

(b) শিরা (Vein)

যেসব নালি দিয়ে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাদের শিরা বলে। এরা ধমনির মতোই সারা দেহে ছড়িয়ে থাকে। শিরাগুলো সাধারণত দেহের বিভিন্ন স্থানের কৈশিকনালি থেকে আরম্ভ হয় এবং এ রকম অসংখ্য নালি একত্রে সূক্ষ্ম শিরা, উপশিরা, অতঃপর শিরা এবং মহাশিরায় পরিণত হয়ে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। শিরার প্রাচীর ধমনির মতো তিন স্তরবিশিষ্ট। শিরার প্রাচীর কম পুরু, কম স্থিতিস্থাপক ও কম পেশিময়। এদের নালিপথ একটু চওড়া এবং কপাটিকা থাকে। ফুসফুস থেকে হৃৎপিণ্ডে আসা শিরাটি ছাড়া অন্য সব শিরা কার্বন ডাই-অক্সাইডসমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে হৃৎপিণ্ডে নিয়ে আসে। ফুসফুসীয় শিরা অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুস থেকে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছে দেয়।

(c) কৈশিক জালিকা (Capillaries)

পেশিতন্তুতে চুলের মতো অতি সূক্ষ্ম রক্তনালি দেখা যায়। একে কৈশিক জালিকা বা কৈশিক নালি বলে। এগুলো একদিকে ক্ষুদ্রতম ধমনি এবং অন্যদিকে ক্ষুদ্রতম শিরার মধ্যে সংযোগ সাধন করে। ফলে ধমনি শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর কৈশিক নালিতে পরিণত হয় এবং প্রত্যেকটি কোষকে পরিবেষ্টন করে রাখে। এদের প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা। এই পাতলা প্রাচীর ভেদ করে রক্তে দ্রবীভূত সব বস্তু ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোষে প্রবেশ করে।

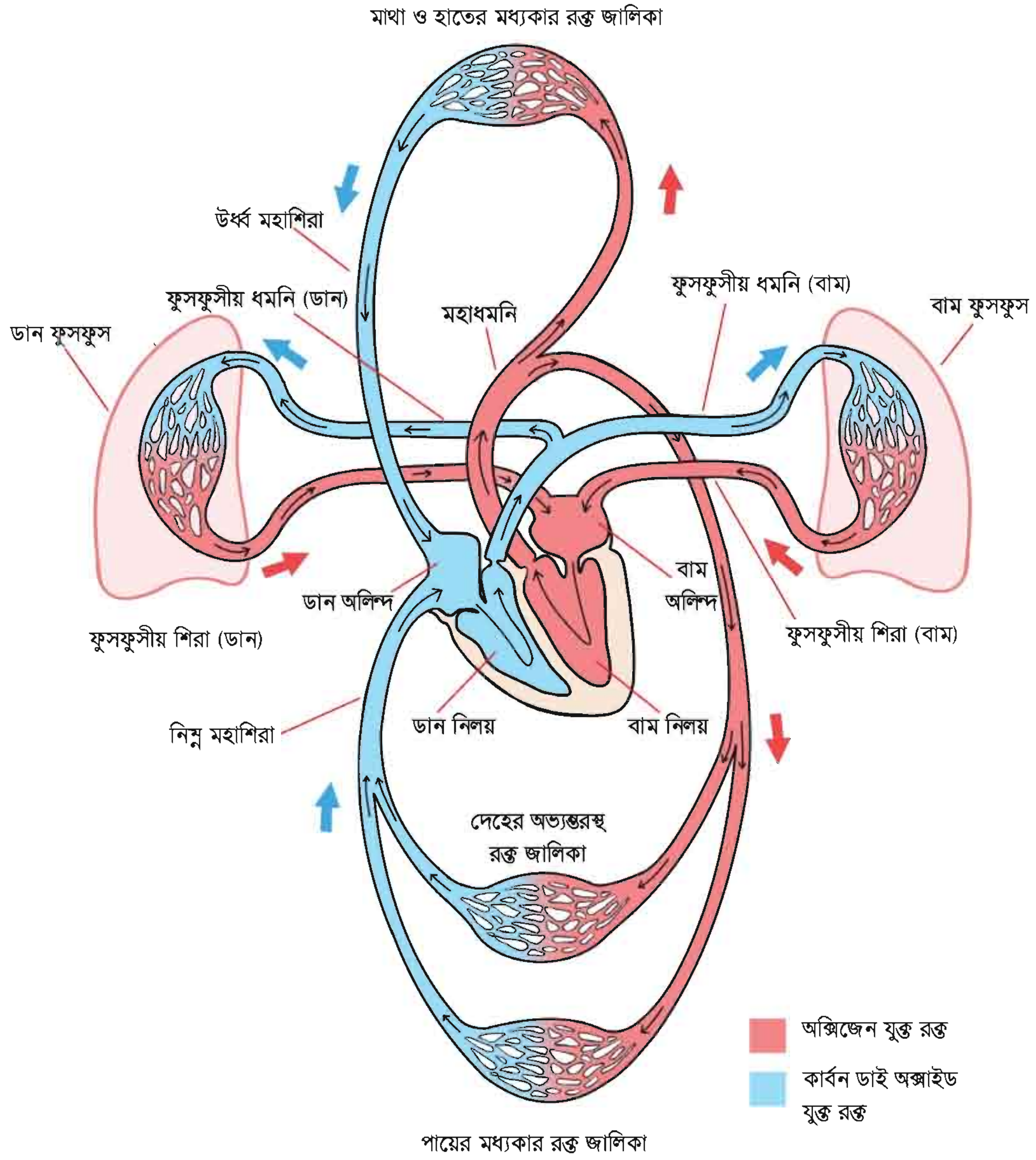
মাথা ও হাতের মধ্যকার রক্ত জালিকা
উর্ধ্ব মহাশিরা
ফুসফুসীয় ধমনি (ডান)
ডান ফুসফুস
মহাধমনি
ফুসফুসীয় ধমনি (বাম)
বাম ফুসফুস
বাম অলিন্দ
ডান অলিন্দ
ফুসফুসীয় শিরা (ডান)
ফুসফুসীয় শিরা (বাম)
নিম্ন মহাশিরা
ডান নিলয়
বাম নিলয়
দেহের অভ্যন্তরস্থ রক্ত জালিকা
🟥 অক্সিজেন যুক্ত রক্ত
🟦 কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত
পায়ের মধ্যকার রক্ত জালিকা

চিত্র 6.16: মানবদেহে রক্ত সংবহন

একক কাজ

কাজ: ধমনি ও শিরার মধ্যে পার্থক্য কর

বৈশিষ্ট্য	ধমনি	শিরা
(a) উৎপত্তি ও সমাপ্তি		
(b) রক্তপ্রবাহের দিক		
(c) রক্তের প্রকৃতি		
(d) প্রাচীর		
(e) ভিতরের নালিপথ		
(f) কপাটিকা		
(g) অবস্থান		

6.4.4 রক্তচাপ (Blood Pressure)

রক্তপ্রবাহের সময় ধমনির গায়ে যে চাপ সৃষ্টি হয়, তাকে রক্তচাপ বলে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন বা সিস্টোল অবস্থায় ধমনির গায়ে রক্তচাপের মাত্রা সর্বাধিক থাকে। একে সিস্টোলিক চাপ (Systolic Pressure) বলে। হৃৎপিণ্ডের (প্রকৃতপক্ষে নিলয়ের) প্রসারণ বা ডায়াস্টোল অবস্থায় রক্তচাপ সবচেয়ে কম থাকে। একে ডায়াস্টোলিক চাপ (Diastolic Pressure) বলে।

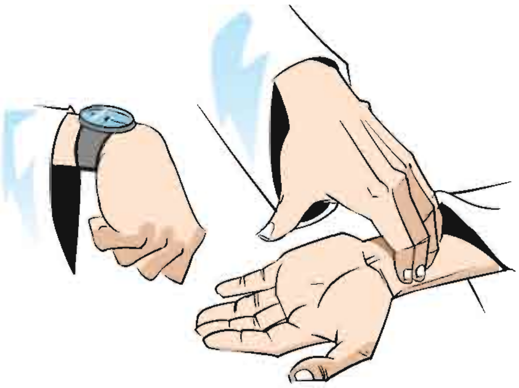

চিত্র 6.17: নাড়ি বা পালস দেখা

আদর্শ রক্তচাপ: চিকিৎসকদের মতে, পরিণত বয়সে একজন মানুষের আদর্শ রক্তচাপ (Blood pressure) সাধারণত 120/80 মিলিমিটার মানের কাছাকাছি। রক্তচাপকে দুটি সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়। প্রথমটি উচ্চমান এবং দ্বিতীয়টি নিম্নমান। রক্তের উচ্চ চাপকে সিস্টোলিক (Systolic) চাপ বলে যার আদর্শ মান 120 মিলিমিটারের নিচে। নিম্নচাপকে ডায়াস্টোলিক (Diastolic) চাপ বলে। এই চাপটির আদর্শ মান 80 মিলিমিটারের নিচে। এই চাপটি হৃৎপিণ্ডের দুটি বিটের মাঝামাঝি সময় রক্তনালিতে সৃষ্টি হয়। দুধরনের রক্তচাপের পার্থক্যকে ধমনিঘাত বা নাড়িঘাত চাপ (Pulse pressure) বলা হয়। সাধারণত সুস্থ

অবস্থায় হাতের কব্জিতে রেট তথা হৎস্পন্দনের মান প্রতি মিনিটে 60-100। হাতের কব্জিতে হালকা করে চাপ দিয়ে ধরে পালস রেট বের করা যায়। স্ফিগমোম্যানোমিটার (Sphygmomanometer) বা সংক্ষেপে বিপি যন্ত্রের সাহায্যে রক্তচাপ মাপা যায়। এই যন্ত্র দিয়ে ডায়াস্টোলিক ও সিস্টোলিক চাপ দেখে রক্তচাপ নির্ণয় করা যায়।

একক কাজ

কাজ: তুমি তোমার বন্ধু, ভাই, বোনের প্রতি মিনিটের নাড়িস্পন্দন গণনা কর। দৌড়ে আসার পর পুনরায় তাদের নাড়িস্পন্দন গণনা কর। কোনো পরিবর্তন লক্ষ করছ কি? কেন এমন হলো তা ব্যাখ্যা কর।

উচ্চ রক্তচাপ (High blood pressure or hypertension)

উচ্চ রক্তচাপকে নীরব ঘাতক হিসেবে গণ্য করা হয়। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে 2020 সালের মধ্যে স্ট্রোক ও করোনারি ধমনির রোগ হবে বিশ্বের এক নম্বর মরণব্যাধি এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে এর প্রকোপ ছড়িয়ে পড়বে মহামারী আকারে। হৃদ্‌রোগ এবং স্ট্রোকের অন্যতম প্রধান কারণ হলো উচ্চ রক্তচাপ।

উচ্চ রক্তচাপ কী? রক্ত চলাচলের সময় রক্তনালিগাত্রে যে চাপ সৃষ্টি হয়, তাকে রক্তচাপ বলে। আর স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি রক্তচাপকে উচ্চ রক্তচাপ বলা হয়। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণত সিস্টোলিক চাপ 120 মিলিমিটার পারদের নিচে এবং ডায়াস্টোলিক চাপ 80 মিলিমিটার পারদের নিচের মাত্রাকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রা হিসেবে ধরা হয়। আর এই রক্তচাপ যখন মাত্রাতিরিক্ত হয় তখনই আমরা তাকে উচ্চ রক্তচাপ বলে থাকি।

উচ্চ রক্তচাপ ঝুঁকির কারণ: বাবা বা মায়ের উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তার সন্তানদের উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এছাড়াও যারা স্নায়বিক চাপে (Tension) বেশি ভোগেন অথবা ধূমপানের অভ্যাস আছে, তাদের উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। দেহের ওজন বেশি বেড়ে গেলে কিংবা লবণ এবং চর্বিযুক্ত খাদ্য বেশি খেলে এমনকি পরিবারের সদস্যদের ডায়াবেটিস বা কোলেস্টেরলের পূর্ব ইতিহাস থাকলে উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেয়। সন্তান প্রসবের সময় খিঁচুনি রোগের (Eclampsia) কারণে মায়ের রক্তচাপ বৃদ্ধি পেতে পারে।

উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ: মাথাব্যথা, বিশেষ করে মাথার পেছন দিকে ব্যথা করা উচ্চ রক্তচাপের প্রাথমিক লক্ষণ। এছাড়া রোগীর মাথা ঘোরা, ঘাড় ব্যথা করা, বুক ধড়ফড় করা ও দুর্বল বোধ করাও উচ্চরক্তচাপের লক্ষণ। অনেক সময় রোগীর নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীর ভালো ঘুম হয় না এবং অল্প

পরিশ্রমে তারা হাঁপিয়ে ওঠে। ভয়ের ব্যাপার হলো, প্রায় 50% ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ হলে কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না। তখন স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায় কিছু বুঝে ওঠার আগেই।

রক্তচাপ নির্ণয় করা: রক্তচাপ মাপক যন্ত্র বা বিপি যন্ত্র দিয়ে রক্তচাপ মাপা হয়। রক্তচাপ মাপার শুরুতে রোগীকে কয়েক মিনিট নিরিবিলি পরিবেশে শান্তভাবে সোজা হয়ে শুয়ে থাকতে হবে। কমপক্ষে 15 থেকে 20 মিনিটের ব্যবধান রেখে রক্তচাপ নির্ণয় করা ভালো।

একক কাজ

কাজ: রক্তচাপ মাপার কৌশল আয়ত্ত করে তোমার বন্ধুদের রক্তচাপ নিচের ছকে উপস্থাপন কর।

শিক্ষার্থীর নাম	রক্তচাপ (সিস্টোল/ডায়াস্টোল)	মন্তব্য

উচ্চ রক্তচাপের প্রতিকার: উচ্চ রক্তচাপের প্রতিকারে টাটকা ফল এবং শাক-সবজি খাওয়ার অভ্যাস করা উচিত। দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণে রেখে শারীরিক পরিশ্রম করা বা ব্যায়াম করা প্রয়োজন। চর্বিজাতীয় খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা ছাড়াও খাবারের সময় অতিরিক্ত লবণ (কাঁচা লবণ) খাওয়া উচিত নয়। ধূমপান ত্যাগ করা জরুরি। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে না থাকলে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ঘটতে পারে, যা স্ট্রোক নামে পরিচিত।

কর্মতৎপরতা, স্বাস্থ্য, বয়স এবং রোগের কারণে মানুষের রক্তচাপের মাত্রা কমবেশি হতে পারে। মোটা লোকদের ওজন কমানো, চর্বিজাতীয় খাদ্য কম খাওয়া, খাবারে কম লবণ দেওয়া ইত্যাদি নিয়ম মেনে চললে উচ্চ রক্তচাপ এড়ানো যায়। রক্তচাপ খুব বেশি হলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়িমিত ঔষধ সেবন করা উচিত।

6.4.5 কোলেস্টেরল (Cholesterol)

কোলেস্টেরল হাইড্রোকার্বন কোলেস্টেইন (Cholestane) থেকে উৎপন্ন একটি যৌগ। উচ্চশ্রেণির প্রাণিজ কোষের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কোলেস্টেরল লিপোপ্রোটিন নামক যৌগ সৃষ্টির মাধ্যমে রক্তে প্রবাহিত হয়। রক্তে তিন ধরনের লিপোপ্রোটিন দেখা যায়।

(a) LDL (Low Density Lipoprotein): একে খারাপ কোলেস্টেরল বলা হয়, কারণ এটি হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। সাধারণত আমাদের রক্তে 70% LDL থাকে। ব্যক্তিবিশেষে এই পরিমাপের পার্থক্য দেখা যায়।

(b) HDL (High Density Lipoprotein): একে সাধারণত ভালো কোলেস্টেরল বলা হয়। এটি হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমায়।

(c) ট্রাই-গ্লিসারাইড (Tryglyceride): এই কোলেস্টেরল চর্বি হিসেবে রক্তের প্লাজমায় অবস্থান করে। ট্রাই-গ্লিসারাইড আমাদের খাদ্যের প্রাণিজ চর্বি অথবা কার্বোহাইড্রেট থেকে তৈরি হয়ে থাকে।

নিচের সারণিতে রক্তে কোলেস্টেরলের আদর্শ মান দেখানো হলো।

কোলেস্টেরলে প্রকার	মিলিমোল/লিটার
LDL	< 1.8
HDL	> 1.5
ট্রাই-গ্লিসারাইড	< 1.7

অধিক মাত্রার কোলেস্টেরল উপস্থিত এমন খাদ্যের মধ্যে মাখন, চিংড়ি, ঝিনুক, গবাদিপশুর যকৃৎ, ডিম, বিশেষ করে ডিমের কুসুম উল্লেখযোগ্য।

রক্তে উচ্চ কোলেস্টেরলের সমস্যা: দেহের অন্যান্য অঙ্গের মতো হৃৎপিণ্ডে অক্সিজেন এবং খাদ্যসার সরবরাহের প্রয়োজন হয়। হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনিগাত্রে চর্বি জমা হলে ধমনিতে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহে বিঘ্ন ঘটে, ফলে হৃৎপিণ্ড পর্যাপ্ত অক্সিজেন এবং খাদ্যসার না পাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রক্ত চলাচল কমে যাওয়ার কারণে বুকে ব্যথা অনুভূত হয়। এ অবস্থাকে অ্যানজিনা (Angina) বলা হয়। এছাড়া ধমনির গায়ে বেশি চর্বি জমা হলে রক্তপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় ফলে করোনারি হৃদ্‌রোগের আশঙ্কা অনেকগুণ বেড়ে যায়।

কোলেস্টেরলের কাজ: উপকারিতা ও স্বাস্থ্যঝুঁকি

কোলেস্টেরল কোষপ্রাচীর তৈরি এবং রক্ষার কাজ করে। প্রতিটি কোষের ভেদ্যতা (Permeability) নির্ণয় করে বিভিন্ন দ্রব্যাদি কোষে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। মানবদেহের জনন হরমোন এনড্রোজেন ও ইস্ট্রোজেন তৈরিতে সাহায্য করে। অ্যাডরেনাল গ্রন্থির হরমোন ও পিত্তরস তৈরিতে কোলেস্টেরলের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কোলেস্টেরল পিত্ত তৈরি করে। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে চামড়ার কোলেস্টেরল থেকে ভিটামিন 'ডি' তৈরি হয়, যা রক্তের মাধ্যমে কিডনিতে গিয়ে ভিটামিন 'ডি'র কার্যকর রূপে পরিণত হয় এবং আবার রক্তে ফিরে আসে। কোলেস্টেরল মাত্রা দেহের চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনকে (এ, ডি, ই এবং কে) বিপাকে সহায়তা করে। স্নায়ুকোষের কার্যকারিতার জন্য কোলেস্টেরল প্রয়োজন। দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সাথে কোলেস্টেরল ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

গবেষণায় প্রমাণিত যে রক্তে উচ্চমাত্রায় কোলেস্টেরল হৃৎপিণ্ড এবং রক্ত সংবহনের বিশৃঙ্খলার সাথে জড়িত। কোলেস্টেরল পিত্তরসের অন্যতম উপাদান হলেও একটি একটি বর্জ্য পদার্থ এবং যকৃতের মাধ্যমে দেহ থেকে অপসারিত হয়। পিত্তরসে কোলেস্টেরোলের মাত্রা বেড়ে গেলে তা তলানির মতো পিত্তথলিতে জমা হয়। কোলেস্টেরলের এ তলানিই শক্ত হয়ে পিত্তথলির পাথর (Gallbladder stone) নামে পরিচিত হয়। উল্লেখ্য, কোলেস্টেরল ছাড়াও পিত্ত, ফসফেট, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি জমেও পিত্তথলির পাথর হতে পারে।

6.4.6 অস্থিমজ্জা ও রক্তের অস্বাভাবিক অবস্থা: লিউকেমিয়া (Leukemia)

ভ্রূণ অবস্থায় যকৃৎ এবং প্লীহায় লোহিত রক্ত কণিকা উৎপন্ন হয়। শিশুদের জন্মের পর থেকে লাল অস্থিমজ্জা হতে লোহিত কণিকা উৎপন্ন শুরু হয়। এগুলো প্রধানত দেহে O_2 সরবরাহের কাজ করে। যদি কোনো কারণে অস্বাভাবিক শ্বেত কণিকার বৃদ্ধি ঘটে তাহলে রোগের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। তখন অস্থিমজ্জা অত্যধিক হারে শ্বেত রক্তকোষ উৎপাদন করার কারণে পরোক্ষভাবে লোহিত রক্তকোষ এবং অণুচক্রিকার উৎপাদন কমে যেতে পারে। লিউকেমিয়াকে রক্তের ক্যান্সার বলা হলেও এটি আসলে রক্ত উৎপাদন-ব্যবস্থার অস্বাভাবিকতাজনিত একটি রোগ এবং এতে প্রধানত যে অঙ্গটি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় তা হলো অস্থিমজ্জা। লোহিত রক্তকোষের অভাবে অক্সিজেনের ঘাটতি হয়, যার ফলে রোগী দুর্বল বোধ করে, ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং শ্বাসকষ্ট হয়। অণুচক্রিকার অভাবে রক্ত জমাট বাঁধতে না পারার কারণে দাঁতের গোড়া ও নাকসহ শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক সময় কোনো আঘাত ছাড়াই অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ হয়। একই কারণে দেহত্বকে ছোট ছোট লাল বর্ণের দাগ দেখা দিতে পারে এবং পায়ের গিঁটে ব্যথা হয়ে ফুলে উঠতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার শ্রেণিবিভাগ অনুসারে অর্ধশতাধিক প্রকারের লিউকেমিয়া আছে, যার বেশির ভাগেই শ্বেত রক্তকোষের আধিক্য দেখা যায়। কিন্তু অধিক হারে শ্বেত রক্তকোষ উৎপন্ন হলেও সেগুলো আসলে ক্যান্সার কোষ এবং শ্বেতকোষের স্বাভাবিক কাজ, রোগ প্রতিরোধে অক্ষম। তাই লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি সহজেই বিভিন্ন রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হন। রোগ প্রতিরোধ-ব্যবস্থার অস্বাভাবিকতার কারণে দীর্ঘমেয়াদি জ্বর হতে পারে এবং লসিকা গ্রন্থি ফুলে যেতে পারে। এভাবে রক্তের তিন ধরনের কোষের প্রায় প্রতিটিরই স্বাভাবিক কাজ ঠিকমতো না করতে পারা এ রোগের লক্ষণ। তবে লিউকেমিয়ার প্রকারভেদ অনুসারে লক্ষণের তারতম্য হতে পারে।

চিকিৎসা : বর্তমানে প্রাথমিক অবস্থায় এ রোগ নির্ণয় করা গেলে এবং রোগীর সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে পারলে এ রোগ নিরাময় করা সম্ভব। সাধারণত ক্যান্সার কেমোথেরাপি এবং অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এ রোগের চিকিৎসা করা হয়, অবশ্য প্রকারভেদ অনুসারে চিকিৎসার ভিন্নতা রয়েছে। একসময় লিউকেমিয়ার উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তবে বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব এবং দেশের বহু সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে ক্যান্সার কেমোথেরাপির ব্যবস্থা আছে।

6.5 রক্ত সংবহনতন্ত্রের কয়েকটি রোগ ও প্রতিকার

(a) হার্ট অ্যাটাক

যখন কারও হৃদ্‌যন্ত্রের কোনো অংশে রক্ত জমাট বাঁধার কারণে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় কিংবা বাধাগ্রস্ত হয়, তখন হৃৎপিণ্ডের কোষ কিংবা হৃৎপেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে মায়োকারডিয়াল ইনফ্রাকশন, করোনারি থ্রোমবসিস ইত্যাদি সমস্যা সৃষ্টি হয়, যেগুলোকে একনামে হার্ট অ্যাটাক নামে ডাকা হয়। বাংলাদেশে হৃদ্‌রোগ, বিশেষ করে করোনরি (coronary) হৃদ্‌রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। হৃৎপিণ্ড রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন এবং খাবারের সারবস্তু অর্থাৎ পুষ্টিকর পদার্থ রক্তনালির মধ্য দিয়ে দেহের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দেয়। নিজের কাজ সঠিকভাবে করার জন্য অর্থাৎ তার হৃৎপেশির অক্সিজেন এবং পুষ্টি অর্জনের জন্য হৃৎপিণ্ডের তিনটি প্রধান রক্তনালি আছে। এগুলোর মধ্যে অনেক সময় চর্বি জমে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ফলে প্রাণঘাতী রোগ হার্ট অ্যাটাক হয়। বর্তমান সময়ে হার্ট অ্যাটাকে শুধু 40-60 বছর বয়সী লোকেরাই আক্রান্ত হচ্ছে না, অনেক সময়ে তরুণরাও এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

এ রোগের সাথে দেহের ওজন বেড়ে যাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অনিয়ন্ত্রিত থাকলে, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস যেমন অধিক তেলযুক্ত খাবার (বিরিয়ানি, তেহারি ইত্যাদি), ফাস্টফুড (বার্গার, বিফ বা চিকেন প্যাটিস ইত্যাদি) খাওয়া, অলস জীবনযাপন এবং শারীরিক পরিশ্রম না করার ফলে এই রোগ দেখা যায়। এ ছাড়াও সব সময় হতাশা, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিমর্ষ থাকায় যেকোনো বয়সে এই রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

রোগের লক্ষণসমূহ: হার্ট অ্যাটাক হলে বুকে অসহনীয় ব্যথা অনুভূত হয়। বিশেষ করে বুকের মাঝখানে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব হয় যা, প্রাথমিকভাবে এন্টাসিড ঔষধ খেলেও কমবে না। ব্যথা বাম দিকে বা সারা বুকে ছড়িয়ে যেতে পারে। ব্যথা অনেক সময় গলা এবং বাম হাতে ছড়িয়ে যায়। রোগী প্রচণ্ডভাবে ঘামতে থাকে এবং বুকে ভারি চাপ অনুভব করছে বলে মত প্রকাশ করে। রোগীর যদি আগে থেকে ডায়াবেটিস থাকে, তাহলে তার বুকে কোনো ব্যথা ছাড়াই হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। তাই রোগী কিছু বুঝে ওঠার আগেই সর্বনাশ হয়ে যায়। এজন্য ডায়াবেটিস রোগী কোনো অসুবিধা বোধ না করলেও নিয়মিত চিকিৎসকের কাছে গিয়ে চেক-আপ করাতে হবে।

প্রতিকার: এমন অবস্থা দেখা দিলে অবহেলা না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইসিজি করিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার। করোনারি হৃদ্‌রোগ এক মারাত্মক হৃদ্‌রোগ। এ রোগ থেকে বাঁচতে হলে কিছু নিয়ম মেনে চলা দরকার, যাতে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। যেমন: ধূমপান না করা এবং নিয়মিত ব্যায়াম করা বা হাঁটা, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা, কাঁচা ফল ও শাকসবজি বেশি বেশি খাওয়া। চর্বিযুক্ত খাবার না খাওয়া, ভাজা খাবার, মশলাযুক্ত খাবার, ফাস্টফুড না খাওয়া ইত্যাদি।

(b) বাতজ্বর (Rheumatic Fever)

স্ট্রেপটোকক্কাস (*Streptococcus*) অণুজীবের সংক্রমণে সৃষ্ট শ্বাসনালির প্রদাহ, ফুসকুড়িযুক্ত সংক্রামক জ্বর, টনসিলের প্রদাহ অথবা মধ্যকর্ণের সংক্রামক রোগ বাতজ্বরের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। সাধারণত শিশুকালেই এ রোগের আক্রমণ শুরু হয় এবং দেহের অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বিশেষ করে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয়। হৃৎপিণ্ড যদি এ রোগে পূর্ণভাবে আক্রান্ত নাও হয়, হৃৎপেশি এবং হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা বা ভালভ অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে হৃৎপিণ্ড যথাযথভাবে রক্ত পাম্প করতে সক্ষম হয় না এবং দেহে রক্ত প্রবাহের পরিমাণ কমে যায়।

শুরুতেই রোগটি নির্ণীত না হলে বা সঠিক চিকিৎসা না হলে পরে রোগের প্রকোপ বেড়ে গেলে ওজন হ্রাস, রক্তস্বল্পতা, ক্লান্তি, ক্ষুধামান্দ্য, চেহারায় ফ্যাকাশে ভাব ইত্যাদি দেখা দেয় এবং রোগের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করার আর উপায় থাকে না। পরবর্তী সময়ে অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, ফুলে যাওয়া এবং ত্বকে লালচে রঙ দেখা দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এ রোগ শনাক্ত করা গেলে পেনিসিলিন জাতীয় ঔষধ যথাযথভাবে প্রয়োগে এ রোগের সংক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। অনেক চিকিৎসক আক্রান্ত ছেলেমেয়েদের প্রাপ্ত বয়সে না পৌঁছানো পর্যন্ত নিয়মিতভাবে পেনিসিলিন খাবার পরামর্শ দেন।

হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখার উপায়:

মানুষ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে থেকেই তার হৃৎপিণ্ড কাজ করা শুরু করে এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নির্দিষ্ট গতিতে চলতে থাকে। মানুষের বাঁচা-মরায় হৃদ্‌যন্ত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হৃদ্‌যন্ত্র সুস্থ রাখার জন্য সঠিক জীবনধারা (lifestyle) এবং খাদ্য নির্বাচনের প্রয়োজন রয়েছে। নানা ধরনের তেল বা চর্বিজাতীয় খাদ্য হৃদ্‌যন্ত্রের কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। রক্তের কোলেস্টেরল হৃৎপিণ্ডের রক্তনালিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্ষতি করে থাকে।

মাদক সেবন ও নেশা করলে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়াও হৃৎস্পন্দন সাধারণ মান থেকে বৃদ্ধি পায়। ফলে মাদকসেবী কিছুটা মানসিক আনন্দ এবং প্রশান্তি পেলেও তার হৃদ্‌যন্ত্রের অনেক ক্ষতি হয়। সিগারেটের তামাক অথবা জর্দার নিকোটিনের বিষক্রিয়া শরীরের অন্য অংশের মতো হৃৎপেশির ক্ষতি করে। সঠিক খাদ্য নির্বাচনের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখা যায়। মেদ সৃষ্টিকারী খাদ্য যেমন তেল, চর্বি, অতিরিক্ত শর্করা পরিহার এবং সুষম খাদ্য গ্রহণ, প্রতিদিন পরিমিত ব্যায়াম এবং হাঁটা-চলার মাধ্যমে সুস্থ জীবন লাভ করা যায়।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

1. প্রস্বেদন কী?
2. ব্যাপন কাকে বলে?
3. রক্তকণিকা কত প্রকার ও কী কী?
4. ধমনির কাজ কী?
5. রক্তচাপ বলতে কী বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

1. হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখার উপায় বর্ণনা কর।
2. চিত্রসহ পানি শোষণ প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. হৃৎপিণ্ডকে আবৃতকারী পর্দার নাম কী?

ক. এপিকার্ডিয়াম খ. মায়োকার্ডিয়াম
গ. পেরিকার্ডিয়াম ঘ. এন্ডোকার্ডিয়াম

2. আরাফাত পায়েস খাওয়ার সময় টসটসে কিশমিশ দেখতে পেল। এক্ষেত্রে কিশমিশ টসটসে হওয়ার কারণ কী?

ক. ব্যাপন খ. শোষণ
গ. অভিস্রবণ ঘ. ইমবাইবিশন

নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং 3 ও 4 নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

নাম	রক্তের গ্রুপ
রাফিন	A
তামিম	B
তাসমিয়া	AB
রাতুল	O

3. সর্বজনীন রক্তদাতা বা গ্রহীতার ধারণা যদিও বর্তমানে খুব একটা প্রযোজ্য নয়, তবু উক্ত ধারণা অনুসারে তাত্ত্বিক বিবেচনায় রাফিনের রক্তের প্রয়োজন হলে কার নিকট থেকে রক্ত নিতে পারবে?

ক. তামিম খ. তাসমিয়া
গ. রাতুল ঘ. তামিম ও রাতুল

4. তাসমিয়া —

(i) রক্তে A, B অ্যান্টিজেন বহন করে
(ii) রাফিনকে রক্ত দান করতে পারবে
(iii) তামিমের রক্ত গ্রহণ করতে পারবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও ii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

1.

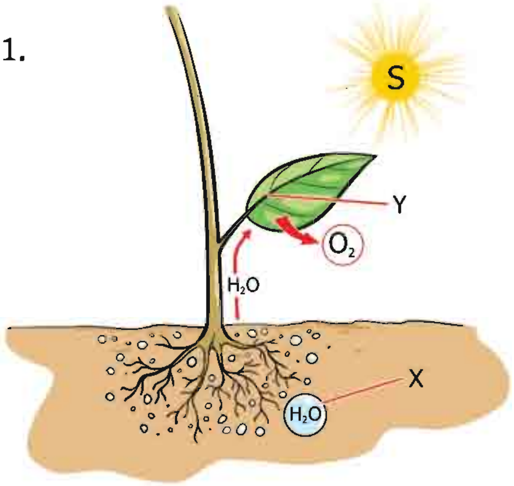

ক. বৈষম্যভেদ্য পর্দা কী?
খ. ইমবাইবিশন বলতে কী বুঝ?
গ. চিত্রে S উপাদানটির অনুপস্থিতি প্রক্রিয়াটিতে কীরূপ প্রভাব পড়বে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. চিত্রে X উপাদানটি যদি Y অঞ্চলে না পৌঁছায়, তাহলে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কী সমস্যা দেখা দিবে বিশ্লেষণ কর।

2. হাসান সাহেবের বয়স 50। তিনি একটি আর্থিক ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি মাথাব্যথা, বুক ধড়ফড় এবং অস্থিরতা ভাব অনুভব করছেন। অন্যদিকে তার 7 বছর বয়সী মেয়ে মুনের গিঁটে ব্যথা, ফুলে যাওয়া, ত্বকে লালচে ভাব দেখা যাচ্ছে। তারা দুজন ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

ক. রক্ত কী?

খ. শ্বেতকণিকা কীভাবে দেহকে রক্ষা করে? বুঝিয়ে লেখ।

গ. হাসান সাহেবের সমস্যাগুলোর কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা দুটির মধ্যে কোনটি অনিরাময়যোগ্য যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

সপ্তম অধ্যায়

গ্যাসীয় বিনিময়

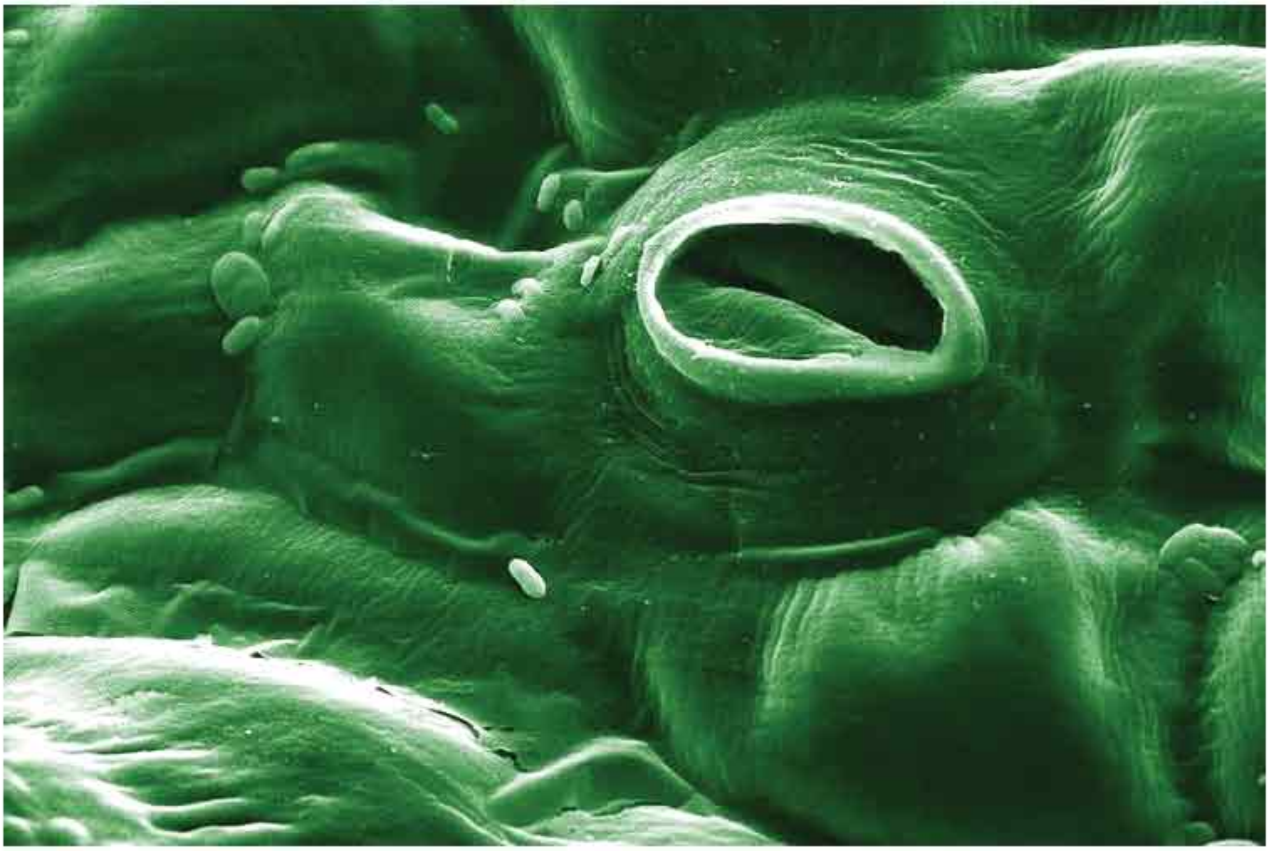

এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সব জীবদেহেই গ্যাসীয় আদান-প্রদান ঘটে। গ্যাসীয় বিনিময় জীবের একটি শারীরবৃত্তীয় কাজ। তবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর গ্যাসীয় বিনিময় প্রক্রিয়া ভিন্নতর। উদ্ভিদ ও মানবদেহের গ্যাসীয় বিনিময় প্রক্রিয়া এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- উদ্ভিদে গ্যাসীয় বিনিময়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানুষের শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অংশসমূহের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ফুসফুসের গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া ও গ্যাসীয় বিনিময় বর্ণনা করতে পারব।
- শ্বসনতন্ত্রের রোগ লক্ষণ, কারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নিঃশ্বাসের সাথে নির্গত গ্যাসটির প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারব।
- ফুসফুসের চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত করতে পারব।
- শ্বসনতন্ত্রের রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব।

7.1 উদ্ভিদে গ্যাসীয় বিনিময়

আমরা জানি যে উদ্ভিদের জীবনে সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) এবং শ্বসন (Respiration) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রক্রিয়া। মূলত এই দুটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদের গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে থাকে। এই প্রক্রিয়া দুটি ঘটে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে। উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য বায়ু থেকে CO_2 গ্রহণ করে এবং O_2 ত্যাগ করে। অন্যদিকে শ্বসন প্রক্রিয়ায় জন্য O_2 গ্রহণ করে এবং CO_2 ত্যাগ করে। উদ্ভিদে প্রাণীর মতো শ্বাস নেওয়ার জন্য কোনো বিশেষ অঙ্গ নেই, তবে পাতার স্টোমাটা ও পরিণত কাণ্ডের বাকলে লেন্টিসেলের (Lenticel) মাধ্যমে অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাসের বিনিময় ঘটে। তোমরা জান, দিনের বেলা বা পর্যাপ্ত আলোর উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষণের হার অধিক হয়। সালোকসংশ্লেষণে উৎপাদিত অক্সিজেন গ্যাসের কিছু অংশ শ্বসন প্রক্রিয়ায় ব্যয় হয়। আবার শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের কিছু অংশ সালোকসংশ্লেষণে ব্যবহার হয়, তাই আদান-প্রদানকৃত অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ প্রায় সমান।

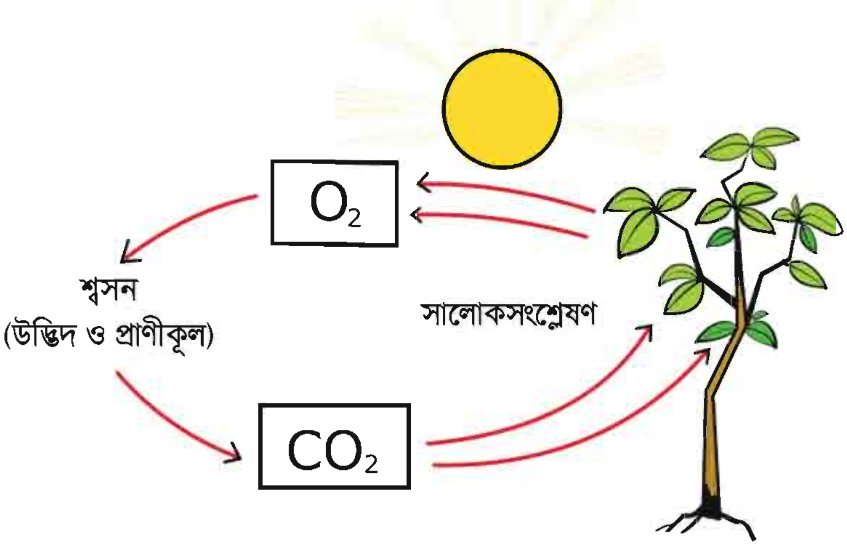

চিত্র 7.01: উদ্ভিদের গ্যাসীয় বিনিময়

রাতের বেলা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার আলোক পর্যায় বন্ধ থাকে, তাই অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় না। অন্যদিকে দিবারাত্রি 24 ঘণ্টা শ্বসন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়, ফলে শ্বসন প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের উৎপাদন চলতে থাকে। এ জন্য বড় গাছের নিচে রাত্রিবেলা ঘুমালে শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে।

উদ্ভিদ তার পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় গ্যাস সংগ্রহ করে। উদ্ভিদের পাতা যেরকম বাতাস থেকে

অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস সংগ্রহ করে, তেমনি মূল মাটি থেকে পানি শোষণ করে। শোষিত সেই পানির সাথে CO_2 এর বিক্রিয়ার ফলে O_2 গ্যাস উৎপাদন হয়, যা বায়ুমণ্ডলে চলে যায়। এভাবে উদ্ভিদ দেহে গ্যাস বিনিময় চলতে থাকে।

7.2 মানব শ্বসনতন্ত্র

অক্সিজেন জীবনধারণের অপরিহার্য উপাদান। কোনো প্রাণীই অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে না। মানবদেহে বাতাসের সাথে অক্সিজেন ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং তা রক্তের মাধ্যমে দেহের সব অঙ্গে পৌঁছায়। দেহকোষে পরিপাক হওয়া খাদ্যের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটে, ফলে তাপ এবং শক্তি উৎপন্ন হয়। এই তাপ দেহকে উষ্ণ রখে এবং প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়।

অক্সিজেন এবং খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানি উৎপন্ন হয়। রক্ত উপাদানগুলোকে ফুসফুসে নিয়ে যায়। যেখানে অক্সিজেন শোষিত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ছেড়ে দেয়। যে প্রক্রিয়া দিয়ে অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড নিষ্কাশন করা হয়, তাকে শ্বাসকার্য বলে। যে জৈবিক প্রক্রিয়া প্রাণিদেহের খাদ্যবস্তুকে বায়ুর অক্সিজেনের সাথে জারিত করে মজুত শক্তিকে ব্যবহারযোগ্য শক্তিতে রূপান্তর এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড নিষ্কাশন করে, তাকে শ্বসন বলে। দেহের ভিতর গ্যাসীয় আদান-প্রদান একবার ফুসফুসে এবং পরে দেহের প্রতিটি কোষে পর্যায়ক্রমে সম্পাদিত হয়। শ্বসনের সরল বিক্রিয়াটি এরকম:

$$\underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{অক্সিজেন}}{6O_2} \longrightarrow \underset{\text{কার্বন ডাই-অক্সাইড}}{6CO_2} + \underset{\text{পানি}}{6H_2O} + \underset{\text{শক্তি}}{ATP}$$

সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ প্রশ্বাসে অক্সিজেন গ্রহণ এবং নিঃশ্বাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড দেহ থেকে বের করতেই হয়, তা না হলে আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, কারণ তিন-চার মিনিটের বেশি দেহে অক্সিজেনের সরবরাহ বন্ধ থাকলে মৃত্যু অনিবার্য। দেহের সচেতন, অচেতন উভয় অবস্থাতেই অবিরাম অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের নির্গমন চলে। আর সাথে সাথে প্রতিনিয়ত দেহরক্ষার নানাবিধ প্রক্রিয়াও চলতে থাকে, যার ফলে প্রাণী বেঁচে থাকে।

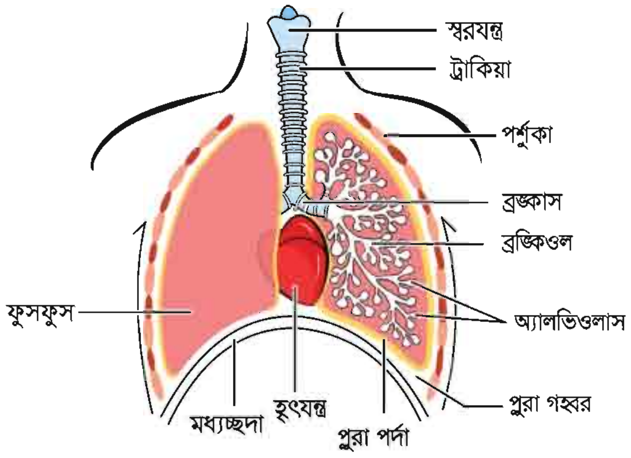

চিত্র 7.02: মানব শ্বসনতন্ত্র

7.2.1 শ্বসনতন্ত্র (Respriratory system):

যে অঙ্গগুলোর সাহায্যে শ্বাসকার্য পরিচালিত হয়, সেগুলোকে একত্রে শ্বসনতন্ত্র বলে। নিম্নলিখিত

শ্বসনতন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত অঙ্গাগুলো হলো: নাসারন্ধ্র এবং নাসাপথ, গলনালি বা গলবিল, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালি বা ট্রাকিয়া, বায়ুনালি বা ব্রংকাস, ফুসফুস এবং মধ্যচ্ছদা।

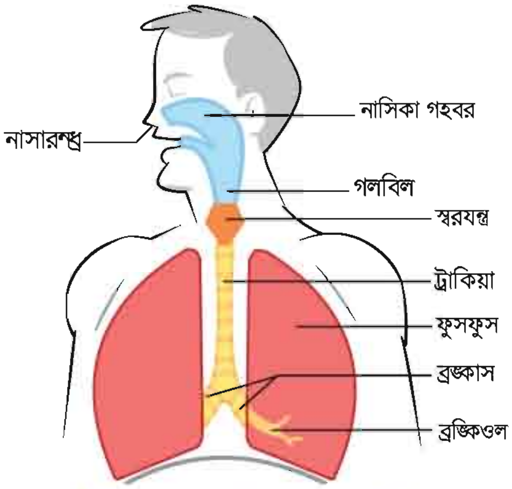

চিত্র 7.03: নাসাপথ ও গলবিল

(a) নাসারন্ধ্র ও নাসাপথ (Nasal cavity):

শ্বসনতন্ত্রের প্রথম অংশের নাম নাসিকা বা নাক। এটা মুখগহ্বরের উপরে অবস্থিত একটি ত্রিকোণাকার গহ্বর। নাক বা নাসিকার সাহায্যে কোনো বস্তুর সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ বুঝা যায়। এক বিশেষ ধরনের স্নায়ু এই অঙ্গাকে উদ্দীপিত করে, ফলে আমরা গন্ধ পাই। নাসিকা এমনভাবে বিবর্তিত হয়েছে যে সেটি প্রশ্বাসের সময় বাতাসকে ফুসফুসের গ্রহণের উপযোগী করে দেয়।

নাসাপথ সামনে নাসিকাছিদ্র এবং পিছনে গলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত। একটি পাতলা প্রাচীর দিয়ে এটি দুই ভাগে বিভক্ত। এর সামনের অংশ লোমাবৃত এবং পিছনের অংশ শ্লেষ্মা প্রস্তুতকারী একটি পাতলা পর্দা দিয়ে আবৃত। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় বায়ুতে বিদ্যমান ধূলিকণা, রোগজীবাণু এবং আবর্জনা থাকলে তা এই লোম এবং পর্দাতে আটকে যায়। এতে বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করার পূর্বে কিছু পরিমাণে নির্মল হয়ে যায়। এছাড়া শ্বসনের জন্য গৃহীত বায়ু নাসাপথ দিয়ে যাওয়ার সময় কিছুটা উষ্ণ এবং আর্দ্র হয়। এর ফলে হঠাৎ ঠাণ্ডা বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে সাধারণত কোনো প্রকার ক্ষতি করতে পারে না।

(b) গলবিল (Pharynx):

মুখ হাঁ করলে মুখগহ্বরের পিছনে যে অংশটি দেখা যায়, সেটাই গলবিল। নাসাপথের পিছনের অংশ থেকে স্বরযন্ত্রের উপরিভাগ পর্যন্ত এটি বিস্তৃত। এর পিছনের অংশের উপরিতলে একটি ছোট জিহ্বার মতো অংশ থাকে, এটাই আলাজিহ্বা (Soft palate)।

খাদ্য এবং পানীয় গলাধঃকরণের সময় এটা নাসাপথের পশ্চাৎপথ বন্ধ করে দেয়। ফলে কোনো প্রকার খাদ্য নাসিকা পথে বাইরে আসতে পারে না। খাদ্যগ্রহণের সময় প্রচুর পরিমাণে পিচ্ছিল পদার্থ নিঃসরণ করাও এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সম্ভবত উন্নততর স্বরযন্ত্রের বিবর্তনের সাথে আলাজিহ্বার উদ্ভবের একটা সম্পর্ক আছে, যেটি কেবল মানুষেই সবচেয়ে বেশি বিকশিত।

(c) স্বরযন্ত্র (Larynx):

এটা গলবিলের নিচে এবং শ্বাসনালির উপরে অবস্থিত। স্বরযন্ত্রের দুই ধারে দুটি পেশি থাকে। এগুলোকে (Vocal cord) বলে। স্বরযন্ত্রের উপরে একটি জিহ্বা আকৃতির ঢাকনা রয়েছে। একে উপজিহ্বা (Epiglottis) বলে। শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার সময় এটি খোলা থাকে এবং এ পথে বাতাস ফুসফুসে

যাতায়াত করতে পারে। খাবার সময় ঐ ঢাকনাটা স্বরযন্ত্রের মুখ ঢেকে দেয় ফলে আহার্য দ্রব্যাদি সরাসরি খাদ্যনালিতে প্রবেশ করে। শ্বাস-প্রশ্বাসে এর কোনো ভূমিকা নেই।

(d) শ্বাসনালি (Trachea):

এটি খাদ্যনালির সামনে অবস্থিত একটি ফাঁপা নল। এই নালিটি স্বরযন্ত্রের নিচের অংশ থেকে শুরু করে কিছু দূর নিচে গিয়ে দুভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি বায়ুনলের সৃষ্টি হয়, এগুলো শ্বাসনালি। এর প্রাচীর কতগুলো অসম্পূর্ণ বলায়াকার তরুণাস্থি ও পেশি দিয়ে গঠিত। এর অন্তর্গাত্র ঝিল্লি দিয়ে আবৃত। এ ঝিল্লিতে সূক্ষ্ম লোমযুক্ত কোষ থাকে। এর ভিতর দিয়ে বায়ু আসা-যাওয়া করে। শ্বাসনালির ভিতর দিয়ে কোনো অপ্রয়োজনীয় বস্তুকণা প্রবেশ করলে সূক্ষ্ম লোমগুলো সেগুলোকে শ্লেষ্মার সাথে বাইরে বের করে দেয়।

(e) ব্রংকাস (Bronchus):

শ্বাসনালি স্বরযন্ত্রের নিম্নাংশ থেকে শুরু হয়ে ফুসফুসের নিকটবর্তী স্থানে গিয়ে ডান এবং বাম দিকে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। এ শাখাগুলো যথাক্রমে বাম এবং ডান ফুসফুসে প্রবেশ করে। এগুলো ব্রংকাই (একবচনে ব্রংকাস) নামে পরিচিত। ফুসফুসে প্রবেশ করার পর ব্রংকাই দুটি অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়। এগুলোকে অণুক্লোম শাখা (bronehicole) বলে। এদের গঠনশৈলী শ্বাসনালির অনুরূপ।

(f) ফুসফুস (Lung):

ফুসফুস শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ। বক্ষগহ্বরের ভিতর হৃৎপিণ্ডের দুই পাশে দুটি ফুসফুস অবস্থিত। এটি স্পঞ্জের মতো নরম এবং কোমল, হালকা লালচে রঙের। ডান ফুসফুস তিন খণ্ডে এবং বাম

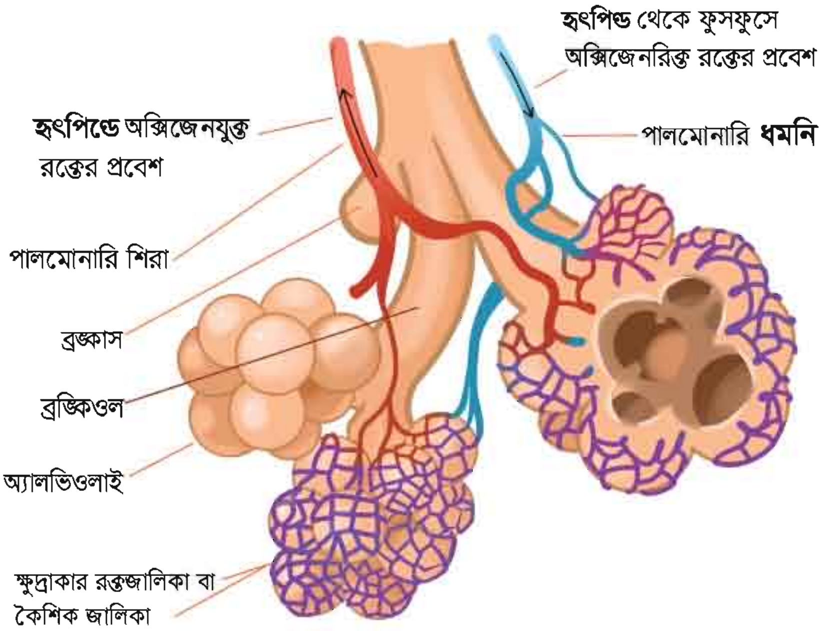
হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুসে অক্সিজেনরিক্ত রক্তের প্রবেশ
হৃৎপিণ্ডে অক্সিজেনযুক্ত রক্তের প্রবেশ
পালমোনারি ধমনি
পালমোনারি শিরা
ব্রঙ্কাস
ব্রঙ্কিওল
অ্যালভিওলাই
ক্ষুদ্রাকার রক্তজালিকা বা কৈশিক জালিকা

চিত্র 7.04: ফুসফুস মধ্যস্থ বায়ুথলি

ফুসফুস দুই খণ্ডে বিভক্ত। ফুসফুস দুই ভাঁজবিশিষ্ট প্লুরা নামক পর্দা দিয়ে আবৃত। দুই ভাঁজের মধ্যে এক প্রকার রস নির্গত হয়। ফলে শ্বাসক্রিয়া চলার সময় ফুসফুসের সাথে বক্ষগাত্রের কোনো ঘর্ষণ হয় না। ফুসফুসে অসংখ্য বায়ুথলি বা বায়ুকোষ, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শ্বাসনালি ও রক্তনালি থাকে। বায়ুথলিগুলোকে বলে অ্যালভিওলাস (Alveolus)। বায়ুথলিগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুক্লোম শাখাপ্রান্তে মৌচাকের মতো অবস্থিত। নাসাপথ দিয়ে বায়ু সরাসরি বায়ুথলিতে যাতায়াত করতে পারে। বায়ুথলি পাতলা আবরণী দিয়ে আবৃত এবং প্রতিটি বায়ুথলি কৈশিকনালিকা দিয়ে পরিবেষ্টিত। বায়ু প্রবেশ করলে এগুলো বেলুনের মতো ফুলে ওঠে এবং পরে আপনা-আপনি সংকুচিত হয়। বায়ুথলি ও কৈশিক নালিকার গাত্র এত পাতলা যে এর ভিতর দিয়ে গ্যাসীয় আদান-প্রদান ঘটে।

একক কাজ

কাজ : ফুসফুসের চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত কর।

(g) মধ্যচ্ছদা (Diaphragm):
বক্ষগহ্বর ও উদরগহ্বর পৃথককারী পেশিবহুল পর্দাকে মধ্যচ্ছদা বলে। এটি দেখতে অনেকটা প্রসারিত ছাতার মতো। মধ্যচ্ছদা সংকুচিত হলে নিচের দিকে নামে, তখন বক্ষগহ্বরের আয়তন বৃদ্ধি পায়। এটি প্রসারিত হলে উপরের দিকে উঠে এবং বক্ষ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। মধ্যচ্ছদা প্রশ্বাস গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

7.2.2 শ্বাসক্রিয়া

শ্বাস-প্রশ্বাসের অঙ্গাগুলো কেবল গলবিলের দিকে খোলা, অন্য সবদিকে বন্ধ। ফলে নাসাপথের ভিতর দিয়ে ফুসফুসের বায়ুথলি পর্যন্ত বাতাস নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে। স্নায়বিক উত্তেজনা দিয়ে শ্বাসকার্য পরিচালিত হয়। স্নায়বিক উত্তেজনার কারণে পিঞ্জরাস্থির মাংসপেশি ও মধ্যচ্ছদা সংকুচিত হয়। ফলে মধ্যচ্ছদা নিচের দিকে নেমে যায় এবং বক্ষগহ্বর প্রসারিত হয়। বক্ষগহ্বরের আয়তন বেড়ে গেলে বায়ুর চাপ কমে যায়, ফলে ফুসফুসের ভিতরের বায়ুর চাপ বাইরের বায়ুর চাপের চেয়ে কমে যায়। বক্ষগহ্বরের ভিতর এবং বাইরের চাপের সমতা রক্ষার জন্য প্রশ্বাস বায়ু ফুসফুসের ভিতর সহজে প্রবেশ করতে পারে। এই পেশি সংকোচনের পরপরই পুনরায় প্রসারিত হয়। তাই মধ্যচ্ছদা পুনরায় প্রসারিত হয়ে উপরের দিকে উঠে যায় এবং বক্ষগহ্বরের আয়তন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এতে ফুসফুসের ভিতরের বায়ুর চাপ বেড়ে যায়, ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বায়ুসমৃদ্ধ বাতাস নিঃশ্বাসরূপে বাইরে বের হয়ে যায়। এভাবে মানবদেহে প্রতিনিয়ত শ্বাসকার্য চলতে থাকে। মূলত এটা বহিঃশ্বসন।

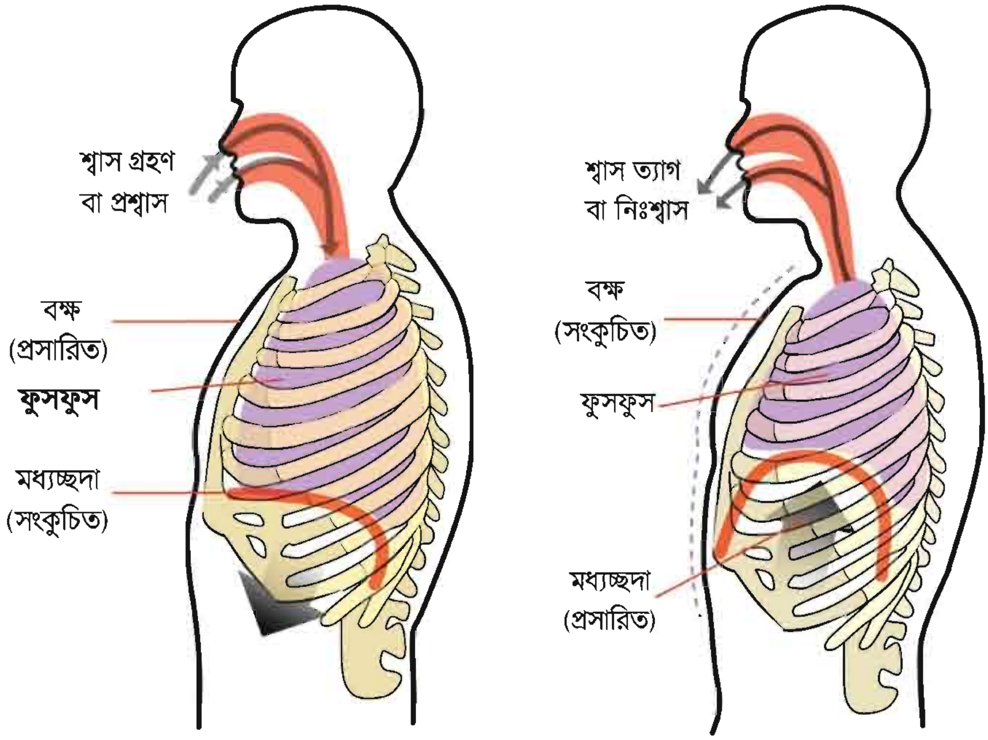
শ্বাস গ্রহণ
বা প্রশ্বাস
বক্ষ
(প্রসারিত)
ফুসফুস
মধ্যচ্ছদা
(সংকুচিত)
শ্বাস ত্যাগ
বা নিঃশ্বাস
বক্ষ
(সংকুচিত)
ফুসফুস
মধ্যচ্ছদা
(প্রসারিত)

চিত্র 7.05: শ্বাস গ্রহণ ও নিঃশ্বাস ত্যাগ

গ্যাসীয় বিনিময়:

গ্যাসীয় বিনিময় বলতে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বিনিময়কে বুঝায়। এটি মূলত বায়ু ও ফুসফুসের রক্তনালির ভিতরে ঘটে। সব ধরনের গ্যাসীয় বিনিময়ের মূলে রয়েছে ব্যাপন প্রক্রিয়া। গ্যাসীয় বিনিময়কে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়, অক্সিজেন শোষণ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ।

অক্সিজেন শোষণ:

ফুসফুসের বায়ুথলি বা অ্যালভিওলি ও রক্তের চাপের পার্থক্যের জন্য অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্তে প্রবেশ করে। ফুসফুস থেকে ধমনির রক্তে অক্সিজেন প্রবেশ করার পর রক্তে অক্সিজেন দুভাবে পরিবাহিত হয়। সামান্য পরিমাণ অক্সিজেন রক্তরসে দ্রবীভূত হয়ে পরিবাহিত হয়। বেশির ভাগ অক্সিজেনই হিমোগ্লোবিনের লৌহ অংশের সাথে হালকা বন্ধনের মাধ্যমে অক্সিহিমোগ্লোবিন নামে একটি অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। অক্সিহিমোগ্লোবিন থেকে অক্সিজেন সহজে বিচ্ছিন্ন হতে পারে।

হিমোগ্লোবিন + অক্সিজেন ⟶ অক্সিহিমোগ্লোবিন (অস্থায়ী যৌগ)
অক্সিহিমোগ্লোবিন ⟶ মুক্ত অক্সিজেন + হিমোগ্লোবিন

রক্ত কৈশিকনালিতে পৌঁছার পর অক্সিজেন পৃথক হয়ে প্রথমে লোহিত রক্তকণিকার আবরণ ও পরে কৈশিনালির প্রাচীর ভেদ করে লসিকাতে প্রবেশ করে। অবশেষে লসিকা থেকে কোষ আবরণ ভেদ করে কোষে পৌঁছে।

কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহন:

খাদ্য জারণ বিক্রিয়া কোষে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি করে। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রথমে কোষ আবরণ ভেদ করে আন্তঃকোষীয় তরল ও লসিকাতে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে কৈশিকনালির প্রাচীর ভেদ করে রক্তরসে প্রবেশ করে। কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রধানত সোডিয়াম বাইকার্বোনেট ($NaHCO_3$) রূপে রক্তরসের মাধ্যমে এবং পটাশিয়াম বাই কার্বোনেট $KHCO_3$ রূপে লোহিত রক্তকণিকা দিয়ে পরিবাহিত হয়ে ফুসফুসে আসে, সেখানে কৈশিকনালি ও বায়ুথলি ভেদ করে দেহের বাইরে নির্গত হয়।

একক কাজ

কাজ: নিঃশ্বাসের সাথে নির্গত গ্যাসের প্রকৃতি নির্ণয়।

উপকরণ: দুটি টেস্টটিউব, একটি 10 mL ইনজেকশন সিরিঞ্জ (সুচ বাদে), দুটি প্লাস্টিকের নল (যার অন্তত একটি নল সিরিঞ্জের মুখে বায়ুরোধী করে আটকানো যায়) এবং চুনের পানি।

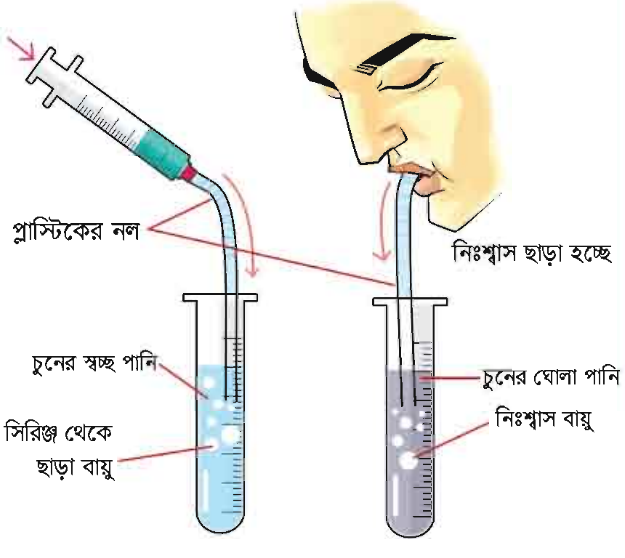

চিত্র 7.06: নিঃশ্বাসের সাথে নির্গত গ্যাসের প্রকৃতি নির্ণায়ক পরীক্ষা।

পদ্ধতি: টেস্টটিউব দুটিতে সমপরিমাণ চুনের পানি নিতে হবে। তারপর দুটি টেস্টটিউবের প্রতিটির মধ্যে একটি করে নল এমনভাবে প্রবেশ করাতে হবে যাতে দুটি নলেরই এক প্রান্ত চুনের পানিতে ডুবে থাকে। এবার একটি নলের এক প্রান্ত সিরিঞ্জের মুখে বায়ুরোধী করে আটকাতে হবে। তবে আটকানোর আগে সিরিঞ্জের পিস্টন প্রায় পুরোটা টেনে 10 mL দাগ পর্যন্ত নিতে হবে। নলের সাথে সিরিঞ্জ আটকানোর পর পিস্টন পুরোটা চেপে দিতে হবে। এর ফলে টেস্টটিউবের চুনের পানির মধ্যে বুদ্বুদ সৃষ্টি হবে। একইভাবে আরও কয়েকবার বায়ু চালনা করো। অপর টেস্টটিউবে চুনের পানিতে ডোবানো নলের উপরের প্রান্তে মুখ লাগিয়ে শ্বাস ছাড়তে থাকো, শ্বাস ছাড়ার সময় নাক চেপে ধরলে ভালো হয়। তবে শ্বাস নেওয়ার সময় নল থেকে প্রতিবার মুখ সরিয়ে নাও। উভয় টেস্টটিউবের চুনের পানি প্রায় 15 সেকেন্ড ধরে পর্যবেক্ষণ করো। টেস্টটিউব দুটির কোনোটিতেই পরিবর্তন না ঘটলে আরও 15 সেকেন্ড ধরে পরীক্ষা চালাতে থাকো।

পর্যবেক্ষণ: একটু লক্ষ করলে দেখতে পাবে যে টেস্টটিউবের চুনের পানিতে সিরিঞ্জের মাধ্যমে সাধারণ বাতাস চালনা করা হয়েছে সেটিতে কোনো পরিবর্তন হয়নি। আর যেটিতে নিঃশ্বাস বায়ু চালনা করা হয়েছে, সেটি ঘোলা হয়ে দুধের মতো রং ধারণ করেছে।

সিদ্ধান্ত: নিঃশ্বাস বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতির ফলে চুনের পানি ঘোলা হয়ে গেছে। কারণ নিঃশ্বাস বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ সাধারণ বাতাসের (যা আমরা প্রশ্বাসের সাথে গ্রহণ করি) তুলনায় বেশি থাকে। এজন্য সাধারণ বায়ু চালনা করায় চুনের পানির কোনো পরিবর্তন হয়নি।

একক কাজ

কাজ : নিচের ছকটি পূরণ কর।

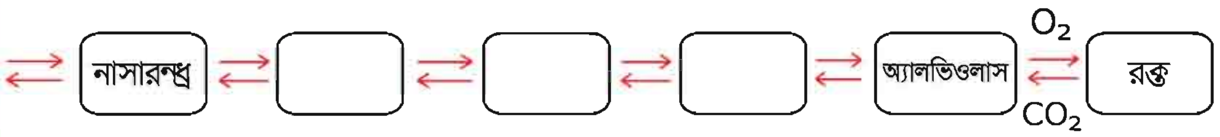

7.3 শ্বাসনালি-সংক্রান্ত রোগ

ফুসফুস শ্বসনতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে অনেক সময় এ অঙ্গটি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বায়ুদূষণ এবং বিভিন্ন প্রকার ভাসমান কণা এবং রাসায়নিকের প্রভাবেও ফুসফুস অসুস্থ হতে পারে। অনেক সময় অজ্ঞতা ও অসাবধানতার কারণে ফুসফুসে নানা জটিল রোগ দেখা দেয় এবং সংক্রমণ ঘটে। ফুসফুসের সাধারণ রোগগুলোর কারণ, লক্ষণ, প্রতিকার ও সাবধানতাগুলো জানা থাকলে অনেক জটিল সমস্যা এমনকি মৃত্যুঝুঁকিও অনেকাংশে কমানো যায়।

(a) অ্যাজমা বা হাঁপানি (Asthma)

অ্যাজমা সাধারণত রোগ প্রতিরোধ-ব্যবস্থার অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়ার ফলে হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো একটি বহিঃস্থ পদার্থ ফুসফুসে প্রবেশ করলে সেটিকে নিষ্ক্রিয় করতে দেহের প্রতিরোধ-ব্যবস্থার যেটুকু প্রতিক্রিয়া দেখানোর কথা, তার চেয়ে অনেক তীব্রভাবে প্রতিক্রিয়া ঘটলে অ্যাজমা হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই অ্যাজমা আক্রান্ত শিশু বা ব্যক্তির বংশে হাঁপানি বা অ্যালার্জির ইতিহাস থাকে। এটি ছোঁয়াচে নয়, জীবাণুবাহিত রোগও নয়।

কারণ: যেসব খাবার খেলে এলার্জি হয় (চিংড়ি, গরুর মাংস, ইলিশ মাছ ইত্যাদি), বায়ুর সাথে ধোঁয়া, ধূলাবালি, ফুলের রেণু ইত্যাদি শ্বাস গ্রহণের সময় ফুসফুসে প্রবেশ করলে হাঁপানি হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণত সর্দি কাশি থেকে হাঁপানি হওয়ার আশংকা থাকে। বছরের বিশেষ ঋতুতে বা ঋতু পরিবর্তনের সময় এ রোগ বেড়ে যেতে পারে।

লক্ষণ

- হঠাৎ শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়।
- শ্বাসকষ্টে দম বন্ধ হওয়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়, ঠোঁট নীল হয়ে যায়, গলার শিরা ফুলে যায়।
- রোগী জোরে জোরে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করে, এ সময় বুকের ভিতর সাঁই সাঁই আওয়াজ হয়।
- ফুসফুসের বায়ুথলিতে ঠিকমতো অক্সিজেন সরবরাহ হয় না বা বাধাগ্রস্ত হয়, ফলে রোগীর বেশি কষ্ট হয়।
- কাশির সাথে কখনো কখনো সাদা কফ বের হয়।
- সাধারণত জ্বর থাকে না।
- শ্বাস নেওয়ার সময় রোগীর পাঁজরের মাঝে চামড়া ভিতরের দিকে ঢুকে যায়।
- রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে।

প্রতিকার

- চিকিৎসায় এ রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয় না। তবে ঔষধ সেবনে রোগী কিছুটা আরাম বোধ করে।
- যেসব খাদ্য খেলে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়, সেগুলো না খাওয়া।
- আলো-বাতাসপূর্ণ গৃহে বসবাস করা।
- যেসব জিনিসের সংস্পর্শ হাঁপানি বাড়ায় তা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা। যেমন- পশুর লোম, কৃত্রিম আঁশ ইত্যাদি।
- ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নেওয়া ও সাবধানতা অবলম্বন করা।
- ধূমপান, গুল, সাদা পাতা, জর্দা ইত্যাদির ব্যবহার পরিহার করা।
- শ্বাসকষ্টের সময় রোগীকে তরল খাদ্য খাওয়নো।

প্রতিরোধ

- স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করা।
- বায়ুদূষণ, বাসস্থান বা কর্মক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট হতে পারে, এমন সব বস্তুর সংস্পর্শ পরিহার করা।
- হাঁপানি রোগীর শ্বাসকষ্ট লাঘবের জন্য সবসময় সাথে ঔষধ রাখা ও প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা।

এখানে লক্ষণীয় যে হাতুড়ে চিকিৎসকেরা অনেক সময় উচ্চমাত্রায় ক্ষতিক্ষারক স্টেরয়েড দিয়ে এর চিকিৎসা করে থাকে, যেটি উচ্চমাত্রায় প্রয়োগ করলে রোগীর কষ্ট তাৎক্ষণিকভাবে উপশম হলেও দীর্ঘমেয়াদি এবং অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়। তাই এ ধরনের চিকিৎসা বা চিকিৎসক থেকে দূরে থাকতে হবে।

(b) ব্রংকাইটিস (Bronchitis)

শ্বাসনালির ভিতরে আবৃত প্রদাহকে ব্রংকাইটিস বলে। ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে ঝিল্লিগাত্রে প্রদাহ হতে পারে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্যাঁতসেঁতে ধূলিকণা মিশ্রিত আবহাওয়া, ঠান্ডা লাগা এবং ধূমপান থেকেও এ রোগ হওয়ার আশংকা থাকে। একবার ব্রংকাইটিস হলে বারবার এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সাধারণত শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তিরা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। ধূমপান, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও দূষণ (যেমন কলকারখানার ধুলাবালি এবং ধোঁয়াময় পরিবেশ) এ রোগের কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

লক্ষণ

- কাশি, বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট হয়।
- কাশির সময় রোগী বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে।
- শক্ত খাবার খেতে পারে না।
- কাশির সাথে অনেক সময় কফ বের হয়। যদি কমপক্ষে একটানা 3 মাস কাশির সাথে কফ থাকে এবং এরকম অসুস্থতা পরপর 2 বছর দেখা যায়, তাহলে রোগীর ক্রনিক ব্রংকাইটিস হয়ে থাকতে পারে।

প্রতিকার

- ধূমপান, মদ্যপান, তামাক বা সাদাপাতা খাওয়া বন্ধ করা।
- ডাক্তারের পরমার্শ অনুযায়ী রোগীর চিকিৎসা করানো।
- রোগীকে সহনীয় উষ্ণতা ও শুষ্ক পরিবেশে রাখা।
- পুষ্টিকর তরল ও গরম খাবার খাওয়ানো। যেমন: গরম দুধ, স্যুপ ইত্যাদি।
- রোগীর পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া।

প্রতিরোধ

- ধূমপান ও তামাক সেবনের মতো বদ অভ্যাস ত্যাগ করা।
- ধুলাবালি ও ধোঁয়াপূর্ণ পরিবেশে কাজ করা থেকে বিরত থাকা।
- শিশু বা বয়স্কদের যেন মাথায় ঠান্ডা না লাগে সেদিকে নজর রাখা।

(c) নিউমোনিয়া (Pneumonia)

নিউমোনিয়া একটি ফুসফুসের রোগ। অত্যধিক ঠান্ডা লাগলে এ রোগ হতে পারে। হাম ও ব্রংকাইটিস রোগের পর ঠান্ডা লেগে নিউমোনিয়া হতে দেখা যায়। শিশু এবং বয়স্কদের জন্য এটি একটি মারাত্মক রোগ।

কারণ: নিউমোকক্কাস *(Pneumococcus)* নামক ব্যাকটেরিয়া এ রোগের অন্যতম কারণ। এছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ছত্রাকের আক্রমণে নিউমোনিয়া হতে পারে। এমনকি বিষম খেয়ে খাদ্যনালির রস শ্বাসনালিতে ঢুকলে সেখান থেকেও নিউমোনিয়া হতে পারে।

লক্ষণ

- ফুসফুসে শ্লেষ্মা-জাতীয় তরল পদার্থ জমে কফ সৃষ্টি হয়।
- কাশি ও শ্বাসকষ্ট হয়।
- দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ বেশি জ্বর হয়।
- চূড়ান্ত পর্যায়ে বুকের মধ্যে ঘড়ঘড় আওয়াজ হয়, মারাত্মক শ্বাসকষ্ট হয়।

প্রতিকার

- ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- তরল ও গরম পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো।
- বেশি করে পানি পান করানো।

প্রতিরোধ

- শিশু ও বয়স্কদের যেন ঠান্ডা না লাগে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।
- ধূমপান পরিহার করা।
- আলো-বাতাসপূর্ণ গৃহে বসবাস করা।
- রোগীকে সহনীয় উষ্ণতায় ও শুষ্ক পরিবেশে রাখা।

(d) যক্ষ্মা (Tuberculosis)

যক্ষ্মা একটি পরিচিত বায়ুবাহিত সংক্রামক রোগ। তবে ক্ষেত্রবিশেষে যক্ষ্মার জীবাণুযুক্ত ত্বকের ক্ষতের সংস্পর্শে এলে কিংবা সংক্রমিত গরুর দুধ খেয়েও কেউ এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। উল্লেখ্য, যেকোনো লোক, যেকোনো সময়ে এ রোগ দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে। যারা অধিক পরিশ্রম করে, দুর্বল, স্যাঁতসেঁতে বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে, অপুষ্টিতে ভোগে অথবা যক্ষ্মা রোগীর সাথে বসবাস করে, তারা এ রোগে সহজে আক্রান্ত হয়। আমাদের অনেকের ধারণা, যক্ষ্মা শুধু ফুসফুসের রোগ। আসলে ধারণাটা একেবারেই সঠিক নয়। যক্ষ্মা অন্ত্র, হাড়, ফুসফুস এরকম দেহের প্রায় যেকোনো স্থানে হতে পারে।

দেহে এ রোগের আক্রমণ ঘটলে সহজে এর লক্ষণ প্রকাশ পায় না। যখন জীবাণুগুলো দেহের রোগ প্রতিরোধক শ্বেত রক্তকণিকাকে পরাস্ত করে দেহকে দুর্বল করে, তখনই এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কারণ: সাধারণত *Mycobacterium tuberculosis* নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়। তবে *Mycobacterium* গণভুক্ত আরও কিছু ব্যাকটেরিয়া যক্ষ্মা সৃষ্টি করতে পারে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করলে অতি সহজে দেহে রোগ জীবাণুর বিস্তার ঘটে।

রোগ নির্ণয়: কফ পরীক্ষা, চামড়ার পরীক্ষা (MT test), সাইটো ও হিস্টোপ্যাথলজি পরীক্ষা এবং এক্স-রের সাহায্যে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। তবে যক্ষ্মায় ঠিক কোন অঙ্গটি আক্রান্ত হয়েছে, তার উপরে নির্ভর করবে কোন পরীক্ষাটি করতে হবে। বর্তমানে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে রোগটি নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায় কিনা তা নিয়ে গবেষণা চলছে। ইদানীং আমাদের দেশে রোগীর কফসহ বিভিন্ন নমুনায় যক্ষা জীবাণু আছে কি না তা নির্ণয়ের জন্য DNA ভিত্তিক পরীক্ষা চালু হয়েছে।

লক্ষণ

- রোগীর ওজন কমতে থাকে, আস্তে আস্তে শরীর দুর্বল হতে থাকে।
- সাধারণত তিন সপ্তাহের বেশি সময় কাশি থাকে।
- খুসখুসে কাশি হয় এবং কখনো কখনো কাশির সাথে রক্ত যায়।
- রাতে ঘাম হয়, বিকেলের দিকে জ্বর আসে। দেহের তাপমাত্রা খুব বেশি বাড়ে না।
- বুকে পিঠে ব্যথা হয়।
- অজীর্ণ ও পেটের পীড়া দেখা দেয়।

প্রতিকার

- ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করা।
- এ রোগের চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদি। ডাক্তারের পরমার্শ অনুযায়ী রোগ নিবারণের নিয়মগুলো কঠিনভাবে মেনে চলা।
- প্রয়োজনে রোগীকে হাসপাতালে বা স্যানাটোরিয়ামে পাঠানো।
- রোগীর ব্যবহারের সবকিছু পৃথক রাখা।
- রোগীর কফ বা থুতু মাটিতে পুঁতে ফেলা।
- রোগীর জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা ও পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা রাখা।
- ডাক্তারের নির্দেশ ব্যতীত কোনো অবস্থায় ঔষধ সেবন বন্ধ না করা।

প্রতিরোধ

- এ মারাত্মক রোগের আক্রমণ থেকে রেহাই পেতে হলে শিশুদের যক্ষ্মা প্রতিষেধক বিসিজি টিকা দিতে হবে। শিশুর জন্মের পর থেকে এক বছর বয়সের মধ্যে এ টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে

হয়। বিসিজি টিকা শিশুদের প্রাণঘাতী যক্ষ্মা থেকে সুরক্ষা দিলেও বড় হয়ে গেলে তা সাধারণত আর কার্যকর থাকে না। তাই শিশু বয়সে টিকা দিলে তা আজীবন যক্ষ্মা থেকে সুরক্ষা দেয় না।

- বর্তমানে দেশের বিভিন্ন টিকাদান কেন্দ্রে এ টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

(e) ফুসফুসের ক্যান্সার (Lung cancer)

সব ধরনের ক্যান্সারের মধ্যে ফুসফুস ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি। আমাদের দেশে পুরুষের ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর প্রধান কারণ ফুসফুস ক্যান্সার।

ফুসফুস ক্যান্সারের অন্যতম প্রধান কারণ ধূমপান।

- বায়ু ও পরিবেশদূষণ এবং বাসস্থান অথবা কর্মক্ষেত্রে দূষণ ঘটতে পারে এমন সব বস্তুর (যেমন: এ্যাসবেস্টাস, আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম, নিকেল, কঠিন ধাতুর গুঁড়া ইত্যাদি) সংস্পর্শে আসার কারণে ফুসফুসে ক্যান্সার হয়।
- যক্ষ্মা বা কোনো ধরনের নিউমোনিয়া ফুসফুসে এক ধরনের ক্ষত সৃষ্টি করে যা পরবর্তীতে ক্যান্সারে রূপান্তরিত হয়।

লক্ষণ: ফুসফুস ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণগুলো যত দ্রুততার সাথে নির্ণয় করা যায় এবং চিকিৎসা প্রদান করা যায়, তত বেশি দিন বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। প্রাথমিক অবস্থায় যেসব লক্ষণ প্রকাশ পায় সেগুলো হলো:

- দীর্ঘদিন ধরে খুসখুসে কাশি ও বুকে ব্যথা।
- ভগ্নস্বর, ওজন হ্রাস এবং ক্ষুধামান্দ্য।
- হাঁপানি, ঘনঘন জ্বর হওয়া।
- বারবার ব্রংকাইটিস বা নিউমোনিয়া দিয়ে সংক্রমিত হওয়া।

রোগ নির্ণয়

প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সারের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য থুথু বা শ্লেষা বিশ্লেষণ করা, বুকের এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, এমআরআই ইত্যাদি করতে হয়। চূড়ান্ত রোগনির্ণয়ের জন্য সাধারণত সাইটো ও হিস্টোপ্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করতে হয়।

প্রতিকার

- রোগের লক্ষণগুলো দেখা গেলে অনতিবিলম্বে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া।
- রোগ নির্ণয়ের পর ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- প্রয়োজনে রেডিয়েশন থেরাপি প্রয়োগ করা, যেখানে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাধ্যমে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করা হয়।

প্রতিরোধ

বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্যান্সার প্রতিরোধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, যথা:

- ধূমপান ও মদ্যপান না করা।
- অতিরিক্ত চর্বিজাতীয় খাদ্য না খাওয়া।
- নিয়মিত ব্যায়াম করা।
- পরিমাণমতো শাকসবজি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

1. কোষীয় শ্বসন কাকে বলে?
2. প্লুরার কাজ কী?
3. ব্রংকাইটিস কী?
4. মধ্যচ্ছদার কাজ কী?
5. নিউমোনিয়া কেন হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

1. যক্ষ্মা রোগের লক্ষণগুলো লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. নিচের কোনটির সংক্রমণে যক্ষ্মা হয়?

ক. ভাইরাস খ. ব্যাকটেরিয়া

গ. ছত্রাক ঘ. প্রোটোজোয়া

2. **উদ্ভিদের গ্যাসীয় বিনিময়ে সাহায্য করে—**

i. স্টোমাটা ii. লেন্টিসেল iii. মূলরোম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে 3 ও 4 নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

শারীরিক দুর্বলতার জন্য রিতা ডাক্তারের শরণাপন্ন হলো। ডাক্তার তার দেহে রক্তের একটি বিশেষ কণিকার অপর্যাপ্ততার কথা জানান। ঘাটতি পূরণে ডাক্তার তাকে পুষ্টিকর খাবার ও শাকসবজি অধিক পরিমাণে খেতে পরামর্শ দিলেন।

3. **রিতার রক্তে কোনটির অভাব রয়েছে?**

ক. লোহিত রক্তকণিকা খ. শ্বেত রক্তকণিকা
গ. অণুচক্রিকা ঘ. রক্তরস

4. **বিশেষ কণিকাটি—**

i. লৌহ উপাদান যুক্ত
ii. অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে
iii. কার্বন ডাই-অক্সাইড ধারণ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. I ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

1.

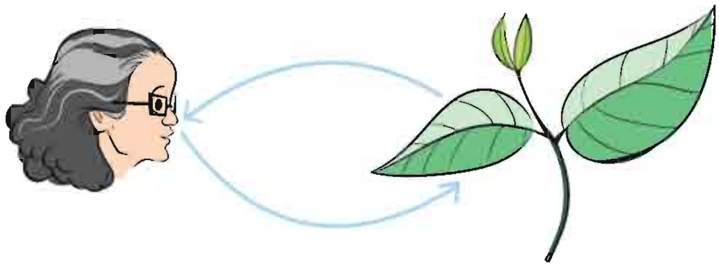

চিত্র- P চিত্র- Q

ক. রক্তের কোন কণিকা অক্সিজেন বহন করে?
খ. ট্রাকিয়া বলতে কী বোঝায়?
গ. চিত্রে P-এর সংঘটিত প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্রে গ্যাস বিনিময়ের ক্ষেত্রে P ও Q একে অপরের উপর নির্ভরশীলতার বিষয়টি তোমার যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ কর।

2. রাশেদ ও জামিল জাহাজ ভাঙা শিল্পে কাজ করেন। কাশি ও বুকে ব্যথাসহ অন্যান্য শারীরিক সমস্যায় ভোগায় উভয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। ডাক্তার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিশ্চিত হন যে রাশেদের শ্বসন অঙ্গের কোষ বিভাজন অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে জামিলের রোগটি শ্বসন অঙ্গ ছাড়াও অন্ত্র ও হাড়ে বিস্তার লাভ করেছে।

ক. মধ্যচ্ছদা কী?

খ. বহিঃশ্বসন বলতে কী বোঝায়?

গ. রাশেদের দেহে রোগটি কীভাবে ছড়ায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রাশেদ ও জামিলের রোগ দুটির মধ্যে কোনটির নিরাময় তুলনামূলকভাবে সহজতর— কারণ বিশ্লেষণ কর।

অষ্টম অধ্যায়

রেচন প্রক্রিয়া

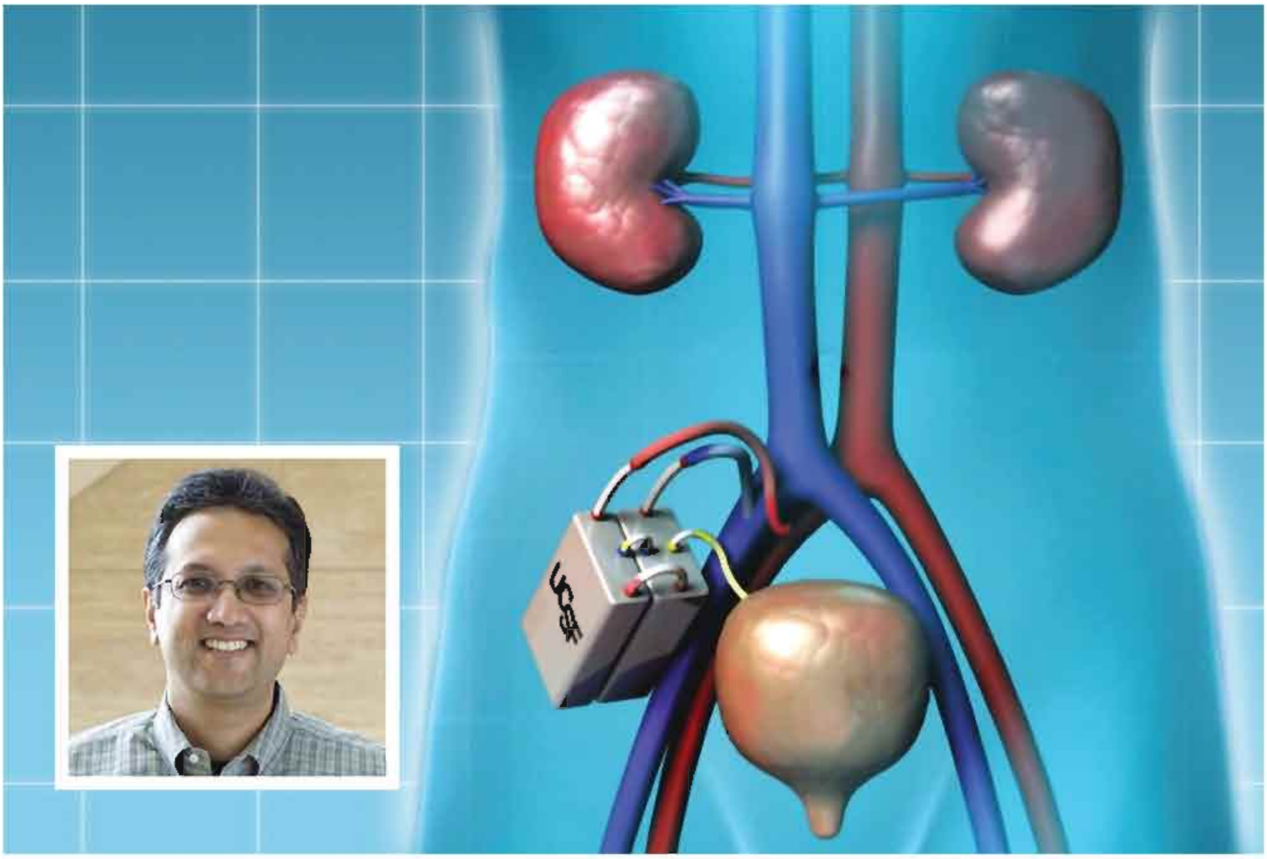

শরীরের ভিতরে প্রতিস্থাপনের উপযোগী কিডনি আবিষ্কার করেছেন
বাংলাদেশের বিজ্ঞানি ড. শুভ রায়

জীবদেহে কোষের ভিতরে অসংখ্য রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে। এতে জীবদেহের শারীরবৃত্তীয় কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়, জীব বেঁচে থাকে। রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন কিছু পদার্থ দেহের জন্য অপরিহার্য আবার কিছু পদার্থ দেহের জন্য ক্ষতিকর। এই ক্ষতিকর পদার্থগুলো দেহ থেকে বের করে দেওয়া খুবই জরুরি। যেমন শ্বসনের সময় গ্লুকোজ ভেঙে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়, রক্ত এই কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহন করে ফুসফুসে নিয়ে যায় এবং ফুসফুস থেকে দেহের বাইরে নির্গত হয়। একইভাবে বৃক্ক বা কিডনি নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য ও অতিরিক্ত অম্ল শরীর থেকে বের করে দেয়।

এ অধ্যায়ে দেহ থেকে বৃক্ক কর্তৃক ঘটিত বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন এবং বৃক্কের নানা রোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- মানুষের রেচন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানবদেহে উৎপন্ন রেচন পদার্থের বর্ণনা করতে পারব।
- বৃক্কের গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- নেফ্রনের গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- অসমোরেগুলেশনে বৃক্কের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বৃক্কে পাথর সৃষ্টি প্রতিরোধ এবং প্রতিকার বর্ণনা করতে পারব।
- বৃক্ক বিকলের লক্ষণ ও করণীয় বর্ণনা করতে পারব।
- বৃক্কের স্বাভাবিক কার্যক্রম বজায় রাখতে ডায়ালাইসিসের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বৃক্ক প্রতিস্থাপন এবং মরণোত্তর বৃক্কদানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মূত্রনালির রোগ ও সুস্থ থাকার উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- মরণোত্তর বৃক্কদান বিষয়ে জনমত নিরূপণের একটি অনুসন্ধান কাজ করতে পারব।
- মানববৃক্ক ও নেফ্রনের চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত করতে পারব।
- সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য মরণোত্তর বৃক্ক দান বিষয়ে পোস্টার অঙ্কন করতে পারব।
- বৃক্ক ও মূত্রনালির সুস্থতা রক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টি করতে লিফলেট অঙ্কন করতে পারব।
- বৃক্ক ও মূত্রনালির সুস্থতায় সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব।
- মরণোত্তর বৃক্কদান বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব।

8.1 রেচন

রেচন মানবদেহের একটি জৈবিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দেহে বিপাক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থগুলো বের করে দেওয়া হয়। দেহের এই বর্জ্য পদার্থগুলো শরীরে কোনো কারণে জমতে থাকলে নানা রকমের অসুখ দেখা দেয়, পরবর্তীতে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। যে তন্ত্রের মাধ্যমে দেহের বিষাক্ত পদার্থ নিষ্কাশিত হয়, তাকে রেচনতন্ত্র বলে। শরীরের অতিরিক্ত পানি, লবণ এবং জৈব পদার্থগুলো সাধারণত রেচনের মাধ্যমে দেহ থেকে বের করে দিয়ে বৃক্ক দেহের শারীরবৃত্তীয় ভারসাম্য রক্ষা করে।

মানবদেহের রেচন অঙ্গ হলো কিডনি অথবা বৃক্ক। আর বৃক্কের একক হলো নেফ্রন।

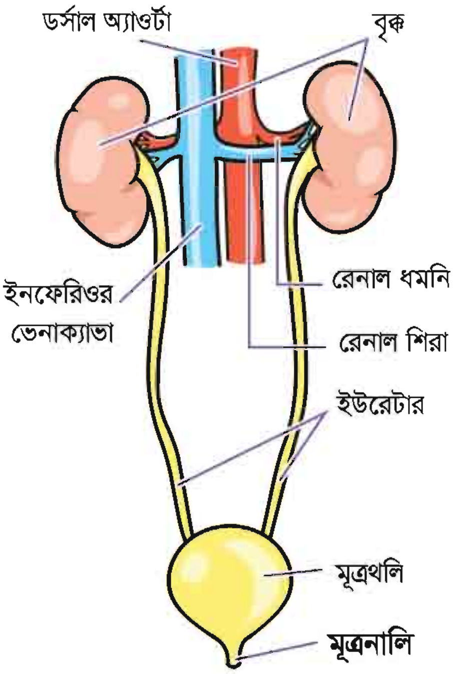

চিত্র 8.01: মানব রেচনতন্ত্র

রেচন পদার্থ:

রেচন পদার্থ বলতে মূলত নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থকে বোঝায়। মানবদেহের রেচন পদার্থ মূত্রের মাধ্যমে শরীর থেকে বের হয়ে আসে। মূত্রের প্রায় 90 ভাগ উপাদান হচ্ছে পানি। অন্যান্য উপাদানের মধ্যে আছে ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন ও বিভিন্ন ধরনের লবণ। ইউরোক্রোম নামে এক ধরনের রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতিতে মূত্রের রং হালকা হলুদ হয়। আমিষ-জাতীয় খাদ্য খেলে মূত্রের অম্লতা বৃদ্ধি পায় আবার ফলমূল এবং তরিতরকারি খেলে সাধারণত ক্ষারীয় মূত্র তৈরি হয়।

8.2 বৃক্ক (Kidney)

মানবদেহের উদরগহ্বরের পিছনের অংশে, মেরুদণ্ডের দুদিকে বক্ষপিঞ্জরের নিচে পিঠ-সংলগ্ন অবস্থায় দুটি বৃক্ক অবস্থান করে। প্রতিটি বৃক্ক দেখতে শিমবিচির মতো এবং এর রং লালচে হয়। বৃক্কের বাইরের পার্শ্ব উত্তল এবং ভিতরের পার্শ্ব অবতল হয়। অবতল অংশের ভাঁজকে হাইলাস (Hilus) বা হাইলাম বলে। হাইলামের ভিতর থেকে ইউরেটার এবং রেনাল শিরা বের হয় এবং রেনাল ধমনি বৃক্কে প্রবেশ করে। দুটি বৃক্ক থেকে দুটি ইউরেটার বের হয়ে মূত্রাশয়ে প্রবেশ করে। ইউরেটারের ফানেল আকৃতির প্রশস্ত অংশকে রেনাল পেলভিস বলে।

বৃক্ক সম্পূর্ণরূপে এক ধরনের তন্তুময় আবরণ দিয়ে বেষ্টিত থাকে, একে রেনাল ক্যাপসুল বলে।

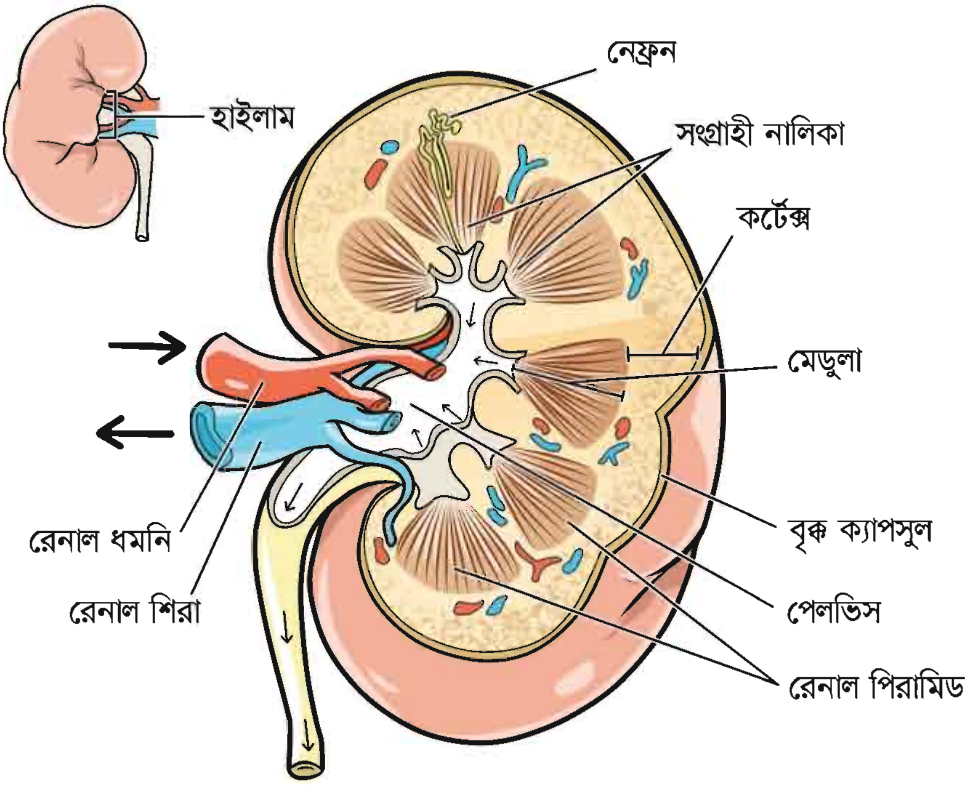

চিত্র 8.02: বৃক্কের লম্বচ্ছেদ

ক্যাপসুল-সংলগ্ন অংশকে কর্টেক্স এবং ভিতরের অংশকে মেডুলা বলে। উভয় অঞ্চলই যোজক কলা এবং রক্তবাহী নালি দিয়ে গঠিত। মেডুলায় সাধারণত 8-12টি রেনাল পিরামিড থাকে। এদের অগ্রভাগ প্রসারিত হয়ে রেনাল প্যাপিলা (Papilla) গঠন করে। এসব প্যাপিলা সরাসরি পেলভিসে উন্মুক্ত হয়।

প্রতিটি বৃক্কে বিশেষ এক ধরনের নালিকা থাকে, যাকে ইউরিনিফেরাস নালিকা বলে। প্রতিটি ইউরিনিফেরাস নালিকা, নেফ্রন, (Nephron) এবং সংগ্রাহক বা সংগ্রাহী নালিকা (Collecting tubule)-এই দু'টি প্রধান অংশে বিভক্ত। নেফ্রন মূত্র তৈরি করে আর সংগ্রাহী নালিকা রেনাল পেলভিসে মূত্র বহন করে।

নেফ্রন

বৃক্কের ইউরিনিফেরাস নালিকার ক্ষরণকারী অংশ এবং কাজ করার একককে নেফ্রন বলে। মানবদেহের প্রতিটি বৃক্কে প্রায় 10-12 লক্ষ নেফ্রন থাকে। প্রতিটি নেফ্রন একটি রেনাল করপাসল (Renal corpuscle) বা মালপিজিয়ান অঙ্গা এবং রেনাল টিউব্যুল (Renal tubule) নিয়ে গঠিত।

প্রতিটি রেনাল করপাসল আবার গ্লোমেরুলাস (Glomerulus) এবং বোম্যান্স ক্যাপসুল— এ দুটি অংশে বিভক্ত। বোম্যান্স ক্যাপসুল গ্লোমেরুলাসকে বেষ্টন করে থাকে।

বোম্যান্স ক্যাপসুল দুই স্তরবিশিষ্ট পেয়ালার মতো প্রসারিত একটি অংশ। গ্লোমেরুলাস একগুচ্ছ কৈশিক

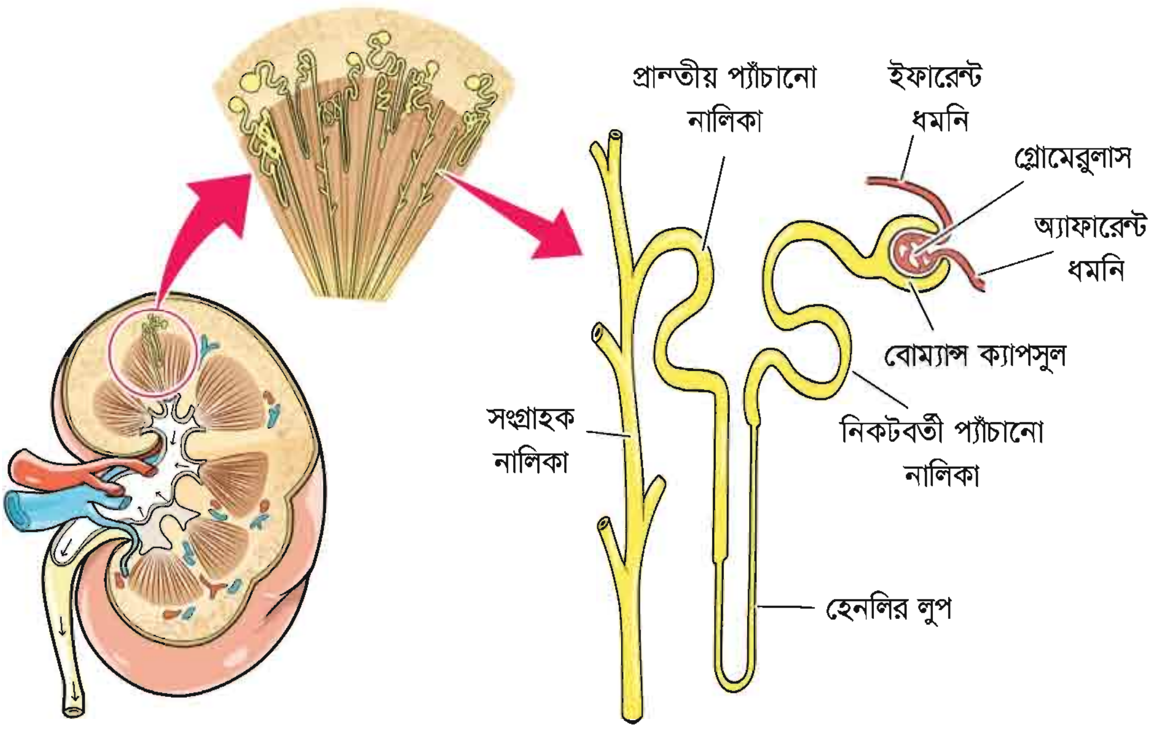
প্রান্তীয় প্যাঁচানো নালিকা
ইফারেন্ট ধমনি
গ্লোমেরুলাস
অ্যাফারেন্ট ধমনি
বোম্যান্স ক্যাপসুল
সংগ্রাহক নালিকা
নিকটবর্তী প্যাঁচানো নালিকা
হেনলির লুপ

চিত্র 8.03: একটি নেফ্রন

জালিকা দিয়ে তৈরি। রেনাল ধমনি থেকে সৃষ্ট অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল (Afferent arteriole) ক্যাপসুলের ভিতরে ঢুকে প্রায় 50টি কৈশিকনালিকা তৈরি করে। এগুলো আবার বিভক্ত হয়ে সূক্ষ্ম রক্তজালিকার সৃষ্টি করে। এসব জালিকার কৈশিকনালিগুলো মিলিত হয়ে ইফারেন্ট অ্যার্টারিওল (Efferent arteriole) সৃষ্টি করে এবং ক্যাপসুল থেকে বেরিয়ে আসে।

গ্লোমেরুলাস ছাঁকনির মতো কাজ করে রক্ত থেকে পরিস্রুত তরল উৎপন্ন করে। এই তরলকে বলে আল্ট্রাফিলট্রেট। সেই আল্ট্রাফিলট্রেট রেনাল টিউব্যুলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় আরও কয়েক দফা শোষণ এবং নিঃসরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়। সবশেষে যে তরলটি পাওয়া যায়, সেটিই মূত্র, যা সংগ্রাহী নালিকার মধ্য দিয়ে ইউরেটার হয়ে মূত্রথলিতে জমা হতে থাকে।

বোমলেন্স ক্যাপসুলে অক্ষিয়দেশ থেকে সংগ্রাহী নালি পর্যন্ত বিস্তৃত চওড়া নালিকাটিকে রেনাল টিউব্যুল বলে। প্রতিটি রেনাল টিউব্যুল 3টি অংশে বিভক্ত, গোড়াদেশীয় বা নিকটবর্তী প্যাঁচানো নালিকা (Proximal convoluted tubule), হেনলি-র লুপ (Henle's loop) এবং প্রান্তীয় প্যাঁচানো নালিকা (Distal convoluted tubule)।

একক কাজ

কাজ: মানববৃক্ক এবং নেফ্রনের চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত কর।

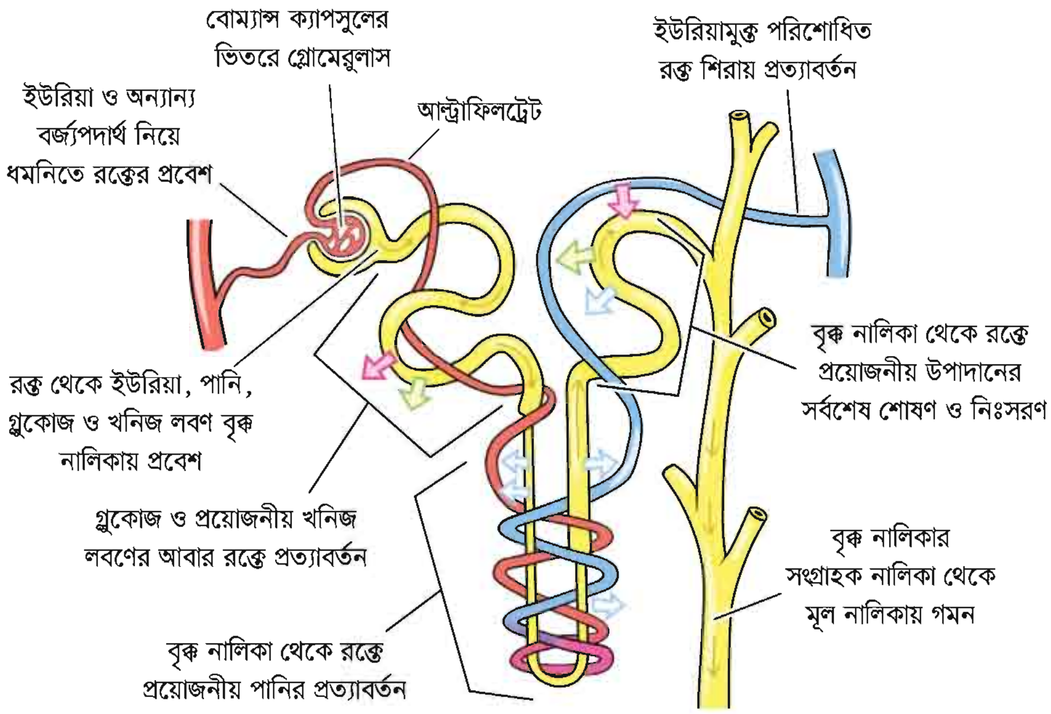
বোম্যান্স ক্যাপসুলের ভিতরে গ্লোমেরুলাস
ইউরিয়ামুক্ত পরিশোধিত রক্ত শিরায় প্রত্যাবর্তন
ইউরিয়া ও অন্যান্য বর্জ্যপদার্থ নিয়ে ধমনিতে রক্তের প্রবেশ
আল্ট্রাফিলট্রেট
বৃক্ক নালিকা থেকে রক্তে প্রয়োজনীয় উপাদানের সর্বশেষ শোষণ ও নিঃসরণ
রক্ত থেকে ইউরিয়া, পানি, গ্লুকোজ ও খনিজ লবণ বৃক্ক নালিকায় প্রবেশ
গ্লুকোজ ও প্রয়োজনীয় খনিজ লবণের আবার রক্তে প্রত্যাবর্তন
বৃক্ক নালিকার সংগ্রাহক নালিকা থেকে মূল নালিকায় গমন
বৃক্ক নালিকা থেকে রক্তে প্রয়োজনীয় পানির প্রত্যাবর্তন

চিত্র 8.04 নেফ্রনের কার্যপ্রণালি

বৃক্কের কাজ

একজন স্বাভাবিক মানুষ প্রতিদিন প্রায় 1500 মিলিলিটার মূত্র ত্যাগ করে। মূত্রে ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, অ্যামোনিয়া, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ থাকে। এগুলো মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর। এসব অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ মূত্রের মাধ্যমে অপসারণে বৃক্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৃক্ক বা কিডনির ভিতরের নেফ্রন একটি জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে মূত্র উৎপন্ন করে। উৎপন্ন মূত্র সংগ্রাহী নালিকার মাধ্যমে বৃক্কের পেলভিসে পৌঁছায় এবং পেলভিস থেকে ইউরেটারের ফানেল আকৃতির প্রশস্ত অংশ বেয়ে ইউরেটারে প্রবেশ করে। ইউরেটার থেকে মূত্র মূত্রথলিতে আসে এবং সাময়িকভাবে জমা থাকে। মূত্র দিয়ে মূত্রথলি একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত পূর্ণ হলে মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা জাগে এবং মূত্রথলির নিচের দিকে অবস্থিত ছিদ্রপথে মূত্রনালির মাধ্যমে দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে। এভাবে বৃক্ক বা কিডনি মানবদেহ থেকে ক্ষতিকর নাইট্রোজেন জাতীয় পদার্থসহ বিভিন্ন বর্জ্য অপসারণ করে।

বৃক্ক মানবদেহে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরাইড ইত্যাদির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়াও মানবদেহের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, পানি, অম্ল এবং ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে।

একক কাজ

কাজ: পরের পৃষ্ঠার ছকে বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনে কোন অঙ্গ কীভাবে অংশ নেয় তা লেখ।

বর্জ্য পদার্থ	অঙ্গ	মন্তব্য
কার্বন ডাই-অক্সাইড		
নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ		
ইউরিয়া, ইউরিক এসিড		
অতিরিক্ত পানি		

অসমোরেগুলেশনে বৃক্কের ভূমিকা:

যাবতীয় শারীরবৃত্তিক কাজ সম্পাদনের জন্য মানবদেহে পরিমিত পানি থাকা অপরিহার্য। মূলত মূত্রের মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি পানি দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। দেহের পানিসাম্য নিয়ন্ত্রণে বৃক্ক প্রধান ভূমিকা পালন করে। বৃক্ক নেফ্রনের মাধমে পুনঃশোষণ প্রক্রিয়ায় দেহে পানির সমতা বজায় রাখে। গ্লোমেরুলাসে রেচন বর্জ্য, পানি এবং অন্যান্য তরল পদার্থ পরিস্রুত হয়। বৃক্ক অকার্যকর হয়ে গেলে দেহে পানি জমতে থাকে। চোখ-মুখসহ সারা শরীর ফুলে যেতে পারে, এমনকি উচ্চ রক্তচাপও সৃষ্টি হতে পারে। এগুলো প্রকৃতপক্ষে অসমোরেগুলেশন জনিত ত্রুটির লক্ষণ।

বৃক্কে পাথর

নানারকম রোগের কারণে বৃক্ক বা কিডনির স্বাভাবিক কাজে বিঘ্ন ঘটে। কিডনির প্রদাহ, প্রস্রাবে সমস্যা, কিডনিতে পাথর হওয়া এর মাঝে উল্লেখযোগ্য। কিডনির রোগের লক্ষণগুলো হলো শরীর ফুলে যাওয়া, প্রস্রাবে অতিরিক্ত প্রোটিন যাওয়া, রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব হওয়া, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া করা, ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া বা ক্ষেত্রবিশেষে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া। মানুষের কিডনিতে ছোট আকারের পাথর জাতীয় পদার্থের সৃষ্টিই বৃক্ক বা কিডনির পাথর হিসেবে পরিচিত। কিডনিতে পাথর সবারই হতে পারে, তবে দেখা গেছে, মেয়েদের থেকে পুরুষের পাথর হওয়ার আশঙ্কা বেশি। অতিরিক্ত শারীরিক ওজন, কিডনির সংক্রমণ, কম পানি পান করা ইত্যাদি বৃক্ক বা কিডনিতে পাথর হওয়ার কারণ হতে পারে।

প্রাথমিকভাবে বৃক্কে পাথর হলে তেমন সমস্যা ধরা পড়ে না। সমস্যা হয় যখন পাথর প্রস্রাব নালিতে চলে আসে এবং প্রস্রাবে বাধা দেয়। উপসর্গ হিসেবে কোমরের পিছনে ব্যথা হবে। অনেকের প্রস্রাবের সাথে রক্ত বের হয়। অনেক সময় কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। বৃক্কের পাথরের চিকিৎসা নির্ভর করে পাথরের আকার এবং অবস্থানের উপর। সাধারণত অধিক পানি গ্রহণ এবং ঔষধ সেবনে পাথর অপসারণ করা যায়। আধুনিক পদ্ধতিতে ইউরেটারোস্কোপিক কিংবা আল্ট্রাসনিক লিথট্রিপসি অথবা বৃক্কে অস্ত্রোপচার করে পাথর অপসারণ করা যায়।

8.3 বৃক্ক বিকল, ডায়ালাইসিস ও প্রতিস্থাপন

নেফ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনিতে পাথর ইত্যাদি কারণে কিডনি ধীরে ধীরে বিকল হয়ে যায়। আকস্মিক কিডনি অকেজো বা বিকল হওয়ার কারণগুলো হলো কিছু ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, মারাত্মক ডায়রিয়া, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ইত্যাদি।

কিডনি বিকল হলে মূত্রের পরিমাণ কমে যাবে। রক্তে ক্রিয়েটিনিন বৃদ্ধি পাবে। তখন রক্তের বর্জ্য দ্রব্যাদি অপসারণের জন্য নির্দিষ্ট সময় পর পর রোগীকে ডায়ালাইসিস করা হয়।

ডায়ালাইসিস (Dialysis)

বৃক্ক সম্পূর্ণ অকেজো বা বিকল হওয়ার পর বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ত পরিশোধিত করার নাম ডায়ালাইসিস। সাধারণত 'ডায়ালাইসিস মেশিনের' সাহায্যে রক্ত পরিশোধিত করা হয়। এ মেশিনের ডায়ালাইসিস টিউবটির এক প্রান্ত রোগীর হাতের কব্জির ধমনির সাথে এবং অন্য প্রান্ত ঐ হাতের কব্জির শিরার সাথে সংযোজন করা হয়। ধমনি থেকে রক্ত ডায়ালাইসিস টিউবের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করানো হয়। এর প্রাচীর আংশিক বৈষম্যভেদ্য হওয়ায় ইউরিয়া, ইউরিক এসিড এবং অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ বাইরে বেরিয়ে আসে। পরিশোধিত রক্ত রোগীর দেহের শিরার মধ্য দিয়ে দেহের ভিতর পুনরায় প্রবেশ করে। এখানে উল্লেখ্য, ডায়ালাইসিস টিউবটি এমন একটি তরলের মধ্যে ডুবানো থাকে, যার গঠন রক্তের প্লাজমার

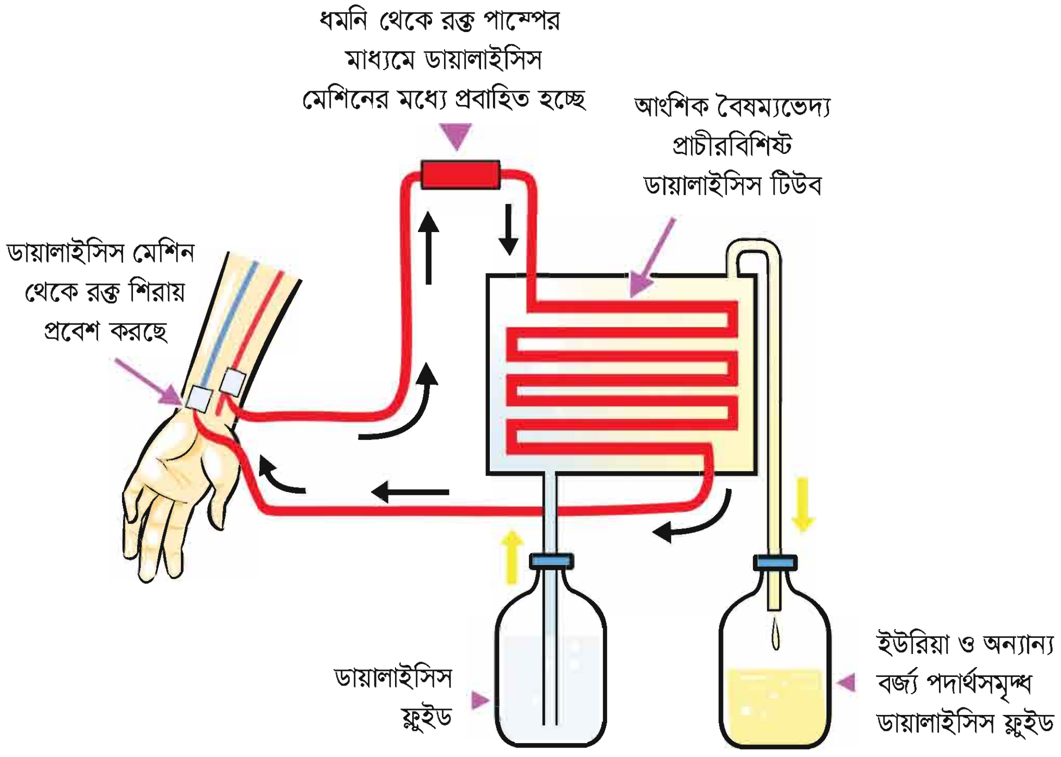
ধমনি থেকে রক্ত পাম্পের মাধ্যমে ডায়ালাইসিস মেশিনের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে
আংশিক বৈষম্যভেদ্য প্রাচীরবিশিষ্ট ডায়ালাইসিস টিউব
ডায়ালাইসিস মেশিন থেকে রক্ত শিরায় প্রবেশ করছে
ডায়ালাইসিস ফ্লুইড
ইউরিয়া ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থসমৃদ্ধ ডায়ালাইসিস ফ্লুইড

চিত্র 8.05: ডায়ালাইসিস

অনুরূপ হয়। এভাবে ডায়ালাইসিস মেশিনের সাহায্যে নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ (ইউরিয়া এবং অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ) বাইরে নিষ্কাশিত হয়। তবে এটি একটি ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া।

প্রতিস্থাপন

যখন কোনো ব্যক্তির কিডনি বিকল বা অকেজো হয়ে পড়ে তখন কোনো সুস্থ ব্যক্তির কিডনি তার দেহে প্রতিস্থাপন করা যায়, তাকে কিডনি সংযোজন বলে। কিডনি সংযোজন দুভাবে করা যায়: কোনো নিকট আত্মীয়ের কিডনি অথবা কোনো মৃত ব্যক্তির কিডনি রোগীর দেহে প্রতিস্থাপন করা যায়। নিকট আত্মীয় বলতে বাবা, মা, ভাইবোন, মামা, খালাকে বোঝায়। মৃত ব্যক্তি বলতে 'ব্রেন ডেড' মানুষকে বোঝায়, যাঁর আর কখনোই জ্ঞান ফিরবে না কিন্তু তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কৃত্রিমভাবে জীবিত রাখা হয়েছে। মরণোত্তর চক্ষুদানের মতো মরণোত্তর বৃক্ক দানের মাধ্যমে একজন কিডনি বিকল রোগীর জীবন বাঁচানো সম্ভবপর হতে পারে। মরণোত্তর সুস্থ কিডনি দানে মানবজাতির উপকার করা যায়।

পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কিডনি অকেজো রোগী কিডনি সংযোজনের মাধ্যমে সুস্থ জীবন যাপন করছে। আমাদের দেশেও কিডনি সংযোজন কার্যক্রম সাফল্যের সাথে করা হচ্ছে। তবে আমাদের দেশে আইনগত জটিলতার কারণে রক্তের সম্পর্ক না থাকলে রোগীকে কিডনি দান করা যায় না, এজন্য অনেক সময় রোগী জরুরি কিডনি প্রতিস্থাপন থেকে বঞ্চিত হন। একটি কিডনি কার্যক্ষম থাকলেই সেটি দিয়েই জীবনধারণ করা সম্ভব, তাই একটি সুস্থ কিডনি প্রতিস্থাপন করে রোগের চিকিৎসা করা যায়। তবে দেখতে হবে যে টিস্যু ম্যাচ করে কি না। পিতামাতা, ভাইবোন এবং নিকট আত্মীয়ের কিডনির টিস্যু ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপনে, দৈনিক অপর্যাপ্ত পানি পান করলে এবং অন্যান্য নানা কারণে মূত্রনালির রোগ দেখা দেয়। মূত্রনালির সংক্রমণ হলে মূত্রনালি জ্বালাপোড়াসহ নানা উপসর্গ দেখা দেয়। ডাক্তারের সত্বর পরামর্শ এবং চিকিৎসা গ্রহণে অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করা সম্ভব। আগে ধারণা করা হতো, সবার দৈনিক আট গ্লাস পানি পান করা উচিত। তবে আধুনিক গবেষণায় দেখা যায়, পানি পানের স্বাভাবিক মাত্রা ব্যক্তি, লিঙ্গ, কাজের ধরন, শারীরিক অসুস্থতার প্রকৃতি এবং আবহাওয়া ভেদে ভিন্ন হতে পারে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি পান করা ঠিক নয়। তাই পিপাসা পেলেই পানি পান করা উচিত।

সতর্কতা

অনেকে ডায়রিয়া বা বমি হওয়া ছাড়াই গরমে ঘেমে গেলে, ক্লান্ত অবস্থায় কিংবা তেমন কোনো কারণ ছাড়াই খাবার স্যালাইন পান করে থাকেন। এটি একেবারেই ঠিক নয়, বিশেষ করে বয়স্ক মানুষের বেলায় ডায়রিয়া বা বমি ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত খাবার স্যালাইন বিপদ ডেকে আনতে পারে। এমনকি ডায়রিয়া বা বমি হলেও তাঁদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক পরিমাণে স্যালাইন দিতে হবে। সাধারণ ক্লান্তি বা ঘামের ক্ষেত্রে লেবুর রস এবং সামান্য লবণমিশ্রিত শরবতই যথেষ্ট। ডায়াবেটিস

না থাকলে এতে কিছুটা চিনিও যোগ করা যেতে পারে।

একক কাজ

কাজ: মরণোত্তর বৃক্কদানের বিষয়ে পোস্টার অঙ্কন কর ও শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

মূত্রনালি সুস্থ রাখার উপায়

শিশুদের টনসিল এবং খোসপাঁচড়া থেকে সাবধান হওয়া প্রয়োজন; কেননা সেখান থেকে কিডনির অসুখ হতে পারে। ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। ডায়রিয়া ও রক্তক্ষরণ ইত্যাদির দ্রুত চিকিৎসা করতে হবে। ধূমপান ত্যাগ করা এবং ব্যথা নিরাময়ের ঔষধ যথাসম্ভব পরিহার করা প্রয়োজন। পরিমাণমতো পানি পান করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, নিয়ম মেনে জীবন যাপন করতে হবে।

একক কাজ

কাজ: কীভাবে বৃক্ক ও মূত্রনালির সুস্থতা রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে দলগতভাবে লিফলেট তৈরি কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

1. ডায়ালাইসিস কী?
2. মালপিজিয়ান অঙ্গা কাকে বলে?
3. পেলভিস কাকে বলে?
4. রেচন পদার্থ বলতে কী বোঝায়?
5. বৃক্কে পাথর বলতে কী বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

1. মূত্রনালি সুস্থ রাখার উপায়গুলো ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. ইউরিয়া কোথায় তৈরি হয়?

ক. বৃক্কে খ. যকৃতে গ. দেহকোষে ঘ. রেনাল ধমনিতে

2. বৃক্কে পাথর হওয়ার আশঙ্কা কমে—

i. শারীরিক ওজন হ্রাস পেলে
ii. কম পানি পান করলে
iii. স্বল্প পরিমাণ আমিষ খেলে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে 3 ও 4 নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

তান্নি পানি ও অন্যান্য খাদ্র গ্রহণে নিয়মনীতি মেনে চলে না। ইদানীং তার মূত্রের পরিমাণ কম হওয়াসহ কোমরের পিছনে ব্যথা হচ্ছে।

3. তান্নির দেহে উক্ত উপাদানটি কম হওয়ার কারণ—

i. ঘাম বেশি হওয়া
ii. ফল কম খাওয়া
iii. লবণাক্ত খাদ্য গ্রহণ।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

4. তান্নির শরীরের উক্ত সমস্যার কারণ-

i. শরীরে পানি আসা
ii. মূত্রনালির প্রদাহ
iii. প্রস্রাবের সাথে শর্করা যাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

1.

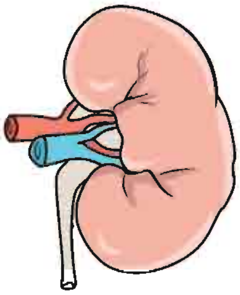

চিত্র: A

ক. মেডুলা কী?

খ. গ্লোমেরুলাস বলতে কী বোঝায়?

গ. চিত্র A কে ছাঁকনির সাথে তুলনা করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্র A বিকল হলে কীভাবে এর প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মতামত দাও।

নবম অধ্যায়

দৃঢ়তা প্রদান ও চলন

প্রতিকূল পরিবেশে খাদ্য অনুসন্ধান, আত্মরক্ষা, বংশবিস্তার— এই ধরনের শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজনে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। যে পদ্ধতিতে প্রাণী নিজ চেষ্টায় সাময়িকভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়, তাকে ঐ প্রাণীর চলন বলে। যে তন্ত্র দেহের কাঠামো গঠন করে, নির্দিষ্ট আকৃতি দেয় এবং বিভিন্ন অঙ্গকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে এবং চলনে সাহায্য করে, তাকে কঙ্কালতন্ত্র বলে।

এ অধ্যায়ে আমরা কঙ্কালতন্ত্রের গঠন, কাজ এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জানতে পারব ।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- মানবকঙ্কালের বর্ণনা করতে পারব।
- দৃঢ়তা প্রদান এবং চলনে কঙ্কালের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার অস্থি ও অস্থিসন্ধির কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পেশির ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- টেনডন ও লিগামেন্টের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অস্টিওপোরোসিসের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার বর্ণনা করতে পারব।
- আর্থ্রাইটিসের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার বর্ণনা করতে পারব।
- অস্টিওপোরোসিস ও আর্থ্রাইটিসের কারণ অনুসন্ধান করতে পারব।
- মানবকঙ্কালের বিভিন্ন অংশের চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত করতে পারব।
- অস্থির সুস্থতা রক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব।

২০১৬

9.1 মানবকঙ্কালের সাধারণ পরিচিতি

একটি ঘর তৈরি করতে হলে প্রথম এর কাঠামো বানাতে হয়। আমাদের দেহের কাঠামো হলো কঙ্কাল (Skeleton)। লম্বা, ছোট, চ্যাপ্টা এবং অসমান মোট 206টি অস্থি দিয়ে পূর্ণবয়স্ক মানুষের কঙ্কাল গঠিত হয়। শিশুর কঙ্কালে অস্থির সংখ্যা আরও বেশি থাকে। এটি মানবদেহকে নির্দিষ্ট আকার দেয়। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, অন্ত্র, মস্তিষ্ক– এরকম দেহের কোমল অংশগুলোকে অস্থি দিয়ে তৈরি আবরণ সুরক্ষিত রাখে।

অস্থি দিয়ে তৈরি শক্ত কাঠামো ছাড়া দেহের স্থিতিশীল আকার সম্ভব নয়। মানবদেহের সব অস্থি এবং এদের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য অংশ মিলে কঙ্কাল তৈরি হয়। অস্থি এবং তরুণাস্থি দুটোই কঙ্কালের

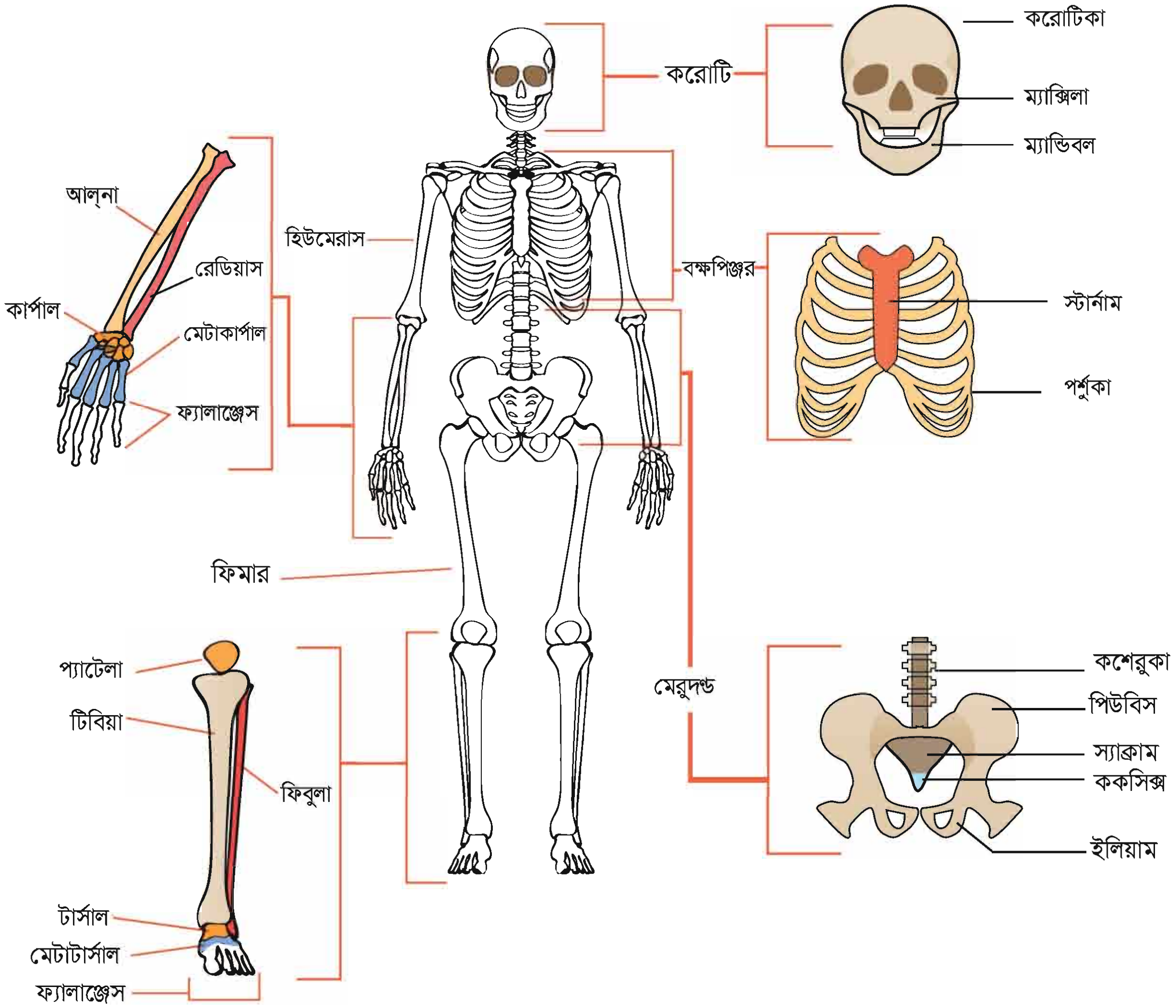
করোটিকা
করোটি
ম্যাক্সিলা
ম্যান্ডিবল
আল্‌না
রেডিয়াস
কার্পাল
মেটাকার্পাল
ফ্যালাঞ্জেস
হিউমেরাস
বক্ষপিঞ্জর
স্টার্নাম
পর্শুকা
ফিমার
প্যাটেলা
টিবিয়া
ফিবুলা
মেরুদণ্ড
কশেরুকা
পিউবিস
স্যাক্রাম
ককসিক্স
ইলিয়াম
টার্সাল
মেটাটার্সাল
ফ্যালাঞ্জেস

চিত্র 9.01: মানব কঙ্কাল

অংশ। অস্থিসন্ধি অস্থিতন্ত্রের অংশগুলোকে সংযুক্ত করে এবং অস্থির চলনে সাহায্য করে। অস্থিগুলো ঐচ্ছিক মাংসপেশি দিয়ে পরস্পর সংলগ্ন থাকায় ইচ্ছামতো অঙ্গ সঞ্চালন এবং চলাফেরা করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ অস্থি এবং তরুণাস্থি, পেশি, পেশিবন্ধনী এবং অস্থিবন্ধনী নিয়ে কঙ্কালতন্ত্র গঠিত।

মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্রকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়, বহিঃকঙ্কাল এবং অন্তঃকঙ্কাল।

বহিঃকঙ্কাল (Exoskeleton): কঙ্কালের এ অংশগুলো বাইরে অবস্থান করে, নখ, চুল, কিংবা লোম এর অন্তর্ভুক্ত।

অন্তঃকঙ্কাল (Endoskeleton): কঙ্কাল বলতে আমরা আসলে শরীরের ভিতরকার অন্তঃকঙ্কালই বুঝি। কঙ্কালের এ অংশগুলো আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাই না। অস্থি এবং তরুণাস্থি দিয়ে এই কঙ্কালতন্ত্র গঠিত।

9.1.1 দৃঢ়তা প্রদান এবং চলনে কঙ্কালের ভূমিকা

কঙ্কালের সাহায্যে নিম্নলিখিত কাজ সম্পন্ন হয়:

(a) দেহকাঠামো গঠন: কঙ্কাল মানবদেহকে একটি নির্দিষ্ট আকার ও কাঠামো দান করে। এটি নিচের অঙ্গগুলোর সাথে উপরের অঙ্গগুলোর সংযুক্তি সাধন করে।

(b) রক্ষণাবেক্ষণ ও ভারবহন: মস্তিষ্ক করোটির মধ্যে, মেরুরজ্জু মেরুদণ্ডের ভিতরে এবং হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস বক্ষগহ্বরে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকে। পেশিগুলো কঙ্কালের সাথে আটকে থাকে এবং দেহের ভারবহনে সাহায্য করে।

(c) নড়াচড়া ও চলাচল: হাত, পা, স্কন্ধচক্র ও শ্রোণিচক্র নড়াচড়ায় সাহায্য করে। এ কাজে পেশিতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অস্থির সাথে পেশি আটকানোর ফলে অস্থি নাড়ানো সম্ভব হয় এবং আমরা চলাচল করতে পারি।

(d) লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন: অস্থিমজ্জা থেকে লোহিত রক্তকণিকা উৎপন্ন হয়।

(e) খনিজ লবণ সঞ্চয়: ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি খনিজ লবণ অস্থি সঞ্চয় করে রাখে। এতে অস্থি শক্ত এবং মজবুত থাকে।

9.1.2 অস্থি, তরুণাস্থি এবং অস্থিসন্ধি (Bone, Cartilage এবং Joint)

অস্থি (Bone)

অস্থি যোজক কলার রূপান্তরিত রূপ। এটি দেহের সবচেয়ে দৃঢ় কলা। অস্থির মাতৃকা বা আন্তঃকোষীয় পদার্থ এক ধরনের জৈব পদার্থ দিয়ে গঠিত। মাতৃকার মধ্যে অস্থিকোষগুলো ছড়ানো থাকে। একদিকে

অস্থির পুরাতন অংশ ক্ষয় হতে থাকে এবং অন্যদিকে অস্থির মধ্যে নতুন অংশ গঠন হতে থাকে। এই ভারসাম্য নষ্ট হলে অস্থির বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়। বয়স বাড়লে অবশ্য এমনিতেই ভারসাম্যটি হাড় ক্ষয়ের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে। অস্থি মূলত ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাশিয়াম এবং ক্যালসিয়ামের বিভিন্ন যৌগ দিয়ে তৈরি। এছাড়া অস্থিতে প্রায় 40-50 ভাগ পানি থাকে। জীবিত অস্থিকোষে 40% জৈব এবং 60% অজৈব যৌগ পদার্থ নিয়ে গঠিত। অস্থি বৃদ্ধির জন্য ভিটামিন 'ডি' এবং ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার প্রয়োজন। এসব খাবারের অভাবে অস্থির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। সূর্যের আলো ত্বকে অবস্থিত কোলেস্টেরলের এমন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়, যা যকৃৎ এবং বৃক্কে আরও কিছু ধারাবাহিক পরিবর্তনের পর ভিটামিন ডি সংশ্লেষণ করে। তাই পর্যাপ্ত পরিমাণ সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসা উচিত। যারা সবসময় ঘরে বসে থাকেন বা সারা শরীর আবৃতকারী পোশাক পরেন, তাদের ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

তরুণাস্থি (Cartilage)

তরুণাস্থি অস্থির মতো শক্ত নয়। এগুলো অপেক্ষাকৃত নরম এবং স্থিতিস্থাপক। এটি যোজক কলার ভিন্নরূপ। এর কোষগুলো একক বা জোড়ায় জোড়ায় খুব ঘনভাবে স্থিতিস্থাপক মাতৃকাতে বিস্তৃত থাকে। তরুণাস্থি কোষগুলো থেকে কন্ড্রিন নামক এক ধরনের শক্ত, ঈষদচ্ছ রাসায়নিক বস্তু বের হয়। মাতৃকা কন্ড্রিন দিয়ে গঠিত, এর বর্ণ হালকা নীল। জীবিত অবস্থায় তরুণাস্থি কোষের প্রোটোপ্লাজম খুব স্বচ্ছ এবং নিউক্লিয়াসটি গোলাকার থাকে। কন্ড্রিনের মাঝে গহ্বর দেখা যায়। এগুলোকে ক্যাপসুল বা ল্যাকিউনি বলে। এর ভিতর কন্ড্রিওব্লাস্ট বা কন্ড্রিওসাইট থাকে। সব তরুণাস্থি একটি তন্তুময় যোজক কলা নির্মিত আবরণী দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকে, একে পেরিকন্ড্রিয়াম বলে। এই আবরণটি দেখতে চকচকে সাদা, তাই আমরা সাধারণত তরুণাস্থিকে সাদা, নীলাভ এবং চকচকে দেখতে পাই। আমাদের দেহে কয়েক রকম তরুণাস্থি আছে (যেমন কানের পিনার তরুণাস্থি)। তরুণাস্থি বিভিন্ন অস্থির সংযোগস্থলে, কিংবা অস্থির কিছু অংশে উপস্থিত থাকে।

একক কাজ

কাজ: অস্থি ও তরুণাস্থির মধ্যে পার্থক্য কর।

অস্থিসন্ধি (Bonejoint বা Joint)

দুই বা ততোধিক অস্থির সংযোগস্থলকে অস্থিসন্ধি বলে। প্রতিটি অস্থিসন্ধির অস্থিগুলো একরকম স্থিতিস্থাপক রজ্জুর মতো বন্ধনী দিয়ে দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে, ফলে অস্থিগুলো সহজে সন্ধিস্থল থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। সন্ধিস্থল বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে সাহায্য করে।

আমাদের শরীরে সব অস্থিসন্ধি এক রকম নয়। এদের কোনোটি একেবারে অনড়, যেমন আন্তঃকশেরুকীয় অস্থিসন্ধি, কোনোটি আবার সহজে সঞ্চালন করা যায়, যেমন হাত এবং পায়ের অস্থিসন্ধি।

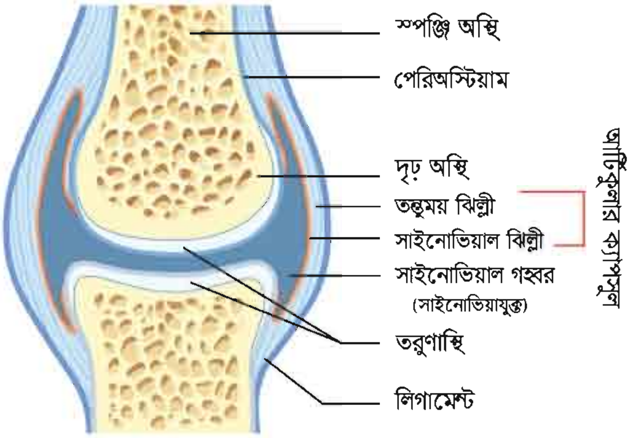
স্পঞ্জি অস্থি
পেরিঅস্টিয়াম
দৃঢ় অস্থি
তন্তুময় ঝিল্লী
সাইনোভিয়াল ঝিল্লী
সাইনোভিয়াল গহ্বর
(সাইনোভিয়াযুক্ত)
তরুণাস্থি
লিগামেন্ট
অস্থিসন্ধির ক্যাপসুল

চিত্র 9.02 সাইনোভিয়াল সন্ধি

সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি (Synovial Joint): একটি অস্থিসন্ধিতে দুটি মাত্র অস্থির বহির্ভাগে এসে মিলিত হয়ে একটি সরল সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি গঠন করে। আর যখন দুয়ের অধিক অস্থি মিলিত হয়, তখন একে জটিল সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি বলে।

সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধির অংশগুলো হলো: তরুণাস্থিতে আবৃত অস্থিপ্রান্ত, সাইনোভিয়াল রস (Synovial fluid) এবং অস্থিসন্ধিকে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখার জন্য অস্থিবন্ধনী বা লিগামেন্ট বেষ্টিত একটি মজবুত আবরণী বা ক্যাপসুল। অস্থিসন্ধিতে সাইনোভিয়াল রস এবং তরুণাস্থি থাকাতে অস্থিতে অস্থিতে ঘর্ষণ এবং তজ্জনিত ক্ষয় হ্রাস পায় ও অস্থিসন্ধি নড়াচড়া করাতে কম শক্তি ব্যয় হয়।

অস্থিসন্ধি কয়েক ধরনের। যেমন:

(a) নিশ্চল অস্থিসন্ধি (Fixed Joint): নিশ্চল অস্থিসন্ধিগুলো অনড়, অর্থাৎ এগুলো নাড়ানো যায় না, যেমন করোটিকা অস্থিসন্ধি।

(b) ঈষৎ সচল অস্থিসন্ধি (Slightly movable Joint): এসব অস্থিসন্ধি একে অন্যের সাথে সংযুক্ত থাকলেও সামান্য নাড়াচাড়া করতে পারে, ফলে আমরা দেহকে সামনে, পিছনে এবং পাশে বাঁকাতে পারি। যেমন মেরুদণ্ডের অস্থিসন্ধি।

(c) পূর্ণ সচল অস্থিসন্ধি (Freely movable joint): এ সকল অস্থিসন্ধি সহজে নড়াচড়া করানো যায়। এ জাতীয় অস্থিসন্ধির মধ্যে বল ও কোটরসন্ধি, কবজাসন্ধি প্রধান। সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধিই কেবল পূর্ণ সচল হতে পারে।

(i) বল ও কোটরসন্ধি (Ball & Socket Joint): বল ও কোটরসন্ধিতে সন্ধিস্থলে একটি অস্থির মাথার মতো গোল অংশ অন্য

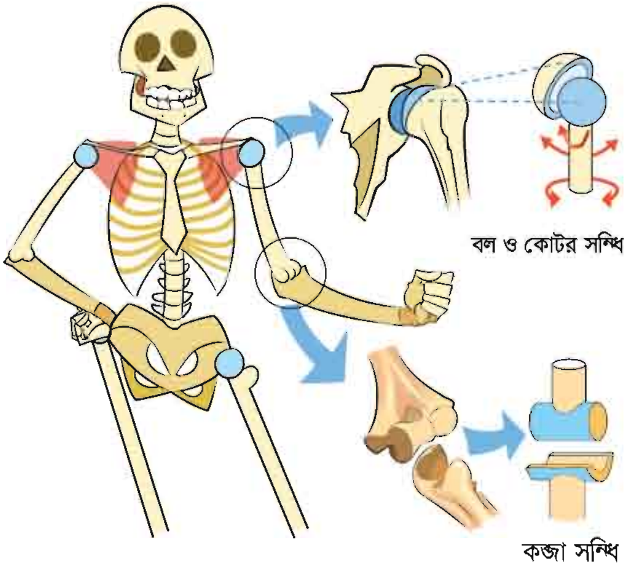
বল ও কোটর সন্ধি
কব্জা সন্ধি

চিত্র 9.03: বল ও কোটর এবং কবজা অস্থিসন্ধি

অস্থির কোটরে এমনভাবে স্থাপিত থাকে যেন অস্থিটি বাঁকানো, পাশে চালনা করা কিংবা সকল দিকে নাড়ানো সম্ভবপর হয়। এটি এক ধরনের সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি। উদাহরণ: কাঁধ এবং উরুসন্ধি।

(ii) কব্জা সন্ধি (Hinge Joint): কব্জা যেমন দরজার পাল্লাকে কাঠামোর সাথে আটকে রাখে, সেরূপ কব্জার মতো সন্ধিকে কব্জা সন্ধি বলে। যেমন: হাতের কনুই, জানু এবং আঙুলগুলিতে এ ধরনের সন্ধি দেখা যায়। এসব সন্ধি কেবল এক দিকে নাড়ানো যায়। এগুলোও সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধির উদাহরণ।

একক কাজ

কাজ: মানবকঙ্কালের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

9.2 পেশি

তোমরা সপ্তম শ্রেণিতে বিভিন্ন পেশি সম্পর্কে জেনেছ। অভ্যন্তরীণ অঙ্গ এবং রক্তনালির গায়ের অনৈচ্ছিক পেশি, হৃৎপিণ্ডের হৃৎপেশি এবং অস্থিগাত্রের সাথে লাগানো ঐচ্ছিক কঙ্কাল পেশি নিয়ে পেশিতন্ত্র গঠিত। পেশিতন্ত্র বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। যেমন:

- অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন, চলাফেরায় সহায়তা, অঙ্গবিন্যাস এবং ভারসাম্য রক্ষা করা।
- কঙ্কালতন্ত্রের সাথে যৌথভাবে দেহের নির্দিষ্ট আকার গঠন করা।
- পেশিতে গ্লাইকোজেন সঞ্চয় করে ভবিষ্যৎ জরুরি প্রয়োজনে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা।
- বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হওয়ায় হৃৎপেশির হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন এবং রক্ত সঞ্চালনের দায়িত্ব পালন করা।
- মলমূত্র ত্যাগ, পরিপাকনালির মধ্য দিয়ে খাদ্যবস্তুর চলন প্রভৃতি স্বয়ংক্রিয় কাজে ভূমিকা পালন।

9.2.1 মানুষের চলনে অস্থি ও পেশির ভূমিকা

মানুষের চলনে অস্থি ও পেশির ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অস্থি দেহের কাঠামো কঙ্কাল গঠন করে, আর পেশিতন্ত্র এই কাঠামোর উপর আচ্ছাদন তৈরি করে। ঐচ্ছিক পেশি টেন্ডন নামক দৃঢ় এবং স্থিতিস্থাপক এক ধরনের পেশি দিয়ে অস্থিকে আটকে রাখে। স্নায়বিক উত্তেজনা পেশির মধ্যে উদ্দীপনা জাগানোর ফলে পেশি সংকুচিত হয় আবার উদ্দীপনা সরিয়ে দিলে পেশি পুনরায় শিথিল বা প্রসারিত হয়। এই সংকোচন এবং প্রসারণের সাহায্যে সংলগ্ন অস্থির নড়াচড়া সম্ভব হয়। এভাবে পেশি কোনো অঙ্গকে

প্রসারিত করে, কোনো অঙ্গকে ভাঁজ করে, কোনো অঙ্গকে উপরের দিকে উঠায়, কোনো অঙ্গকে নিচে নামায় বা কোনো অঙ্গকে প্রধান অক্ষের চারপাশে, ডানে-বাঁয়ে ঘোরায়।

একটি উদাহরণ দিয়ে পেশির কার্যক্রম ব্যাখ্যা করা যায়। কনুই বাঁকা বা সোজা করতে হলে ঐচ্ছিক পেশি কীভাবে কাজ করে সেটি লক্ষ কর। কনুই বাঁকা করতে হলে ইচ্ছাধীন স্নায়ুর তাড়নায় বাইসেপস পেশি সংকুচিত হয় এবং ট্রাইসেপস পেশি শিথিল হয়ে প্রসারিত হয়। ফলে রেডিয়াস ও আলনাকে হিউমেরাসের কাছে নিয়ে আসে। কনুই সোজা করতে হলে ঠিক তার বিপরীত কার্যক্রমটি ঘটে, অর্থাৎ ইচ্ছাধীন স্নায়ুর তাড়নায় ট্রাইসেস পেশি সংকুচিত হয় এবং রেডিয়াস এবং আলনাকে টেনে সোজা করে হিউমেরাসের সাথে প্রায় এক সরলরেখায় নিয়ে আসে। এ সময় বাইসেপস পেশি শিথিল হয়ে প্রসারিত হয়। এভাবে বাইসেপস এবং ট্রাইসেপস পেশির সংকোচন এবং শ্লথ হওয়ার মাধ্যমে আমরা কনুই ভাঁজ করতে আর খুলতে পারি। এভাবে দেহের বিভিন্ন পেশি কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ঘটে।

9.2.2 টেনডন (Tendon) ও লিগামেন্ট বা অস্থিবন্ধনী (Ligament)

আমরা তোমাদের যখন বলি পেশি হাড়ের সাথে আটকে থাকে অথবা একটি হাড়ের সাথে অন্য হাড় বন্ধনীর সাহায্যে আটকে থাকে, তখন সেটি কীভাবে ঘটে তা নিয়ে তোমাদের নিশ্চয় কৌতূহল হয়। মাংসপেশির প্রান্তভাগ দড়ি বা রজ্জুর মতো শক্ত হয়ে অস্থির গায়ের সাথে সংযুক্ত হয়। এই শক্ত প্রান্তকে টেনডন বলে। টেনডন ঘন, শ্বেত তন্তুময় যোজক টিস্যু দিয়ে গঠিত। এ ধরনের টিস্যুর অন্তঃকোষীয় পদার্থ বা ম্যাট্রিক্সে শাখা-প্রশাখাবিহীন শ্বেততন্তু ছড়ানো থাকে। এরা গুচ্ছাকারে এবং পরস্পর সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত থাকে। অনেকগুলো তন্তু একত্রে আঁটি বা বান্ডিল তৈরি করে। আঁটিগুলো একত্রে দলবদ্ধ হয়ে আঁটিগুচ্ছ তৈরি করে। আঁটিগুচ্ছগুলো আবার তন্তুময় টিস্যুগুচ্ছ বা অ্যারিওলার টিস্যু দিয়ে বেষ্টিত হয়ে আরো বড় আঁটিতে শ্রেণিবদ্ধ হয়। অ্যারিওলার টিস্যুর দৈর্ঘ্য বরাবর টেনডনের মধ্যে রক্তনালি, লসিকানালি এবং স্নায়ু প্রবেশ করে। টেনডনের স্থিতিস্থাপকতা তুলনামূলকভাবে বেশ কম।

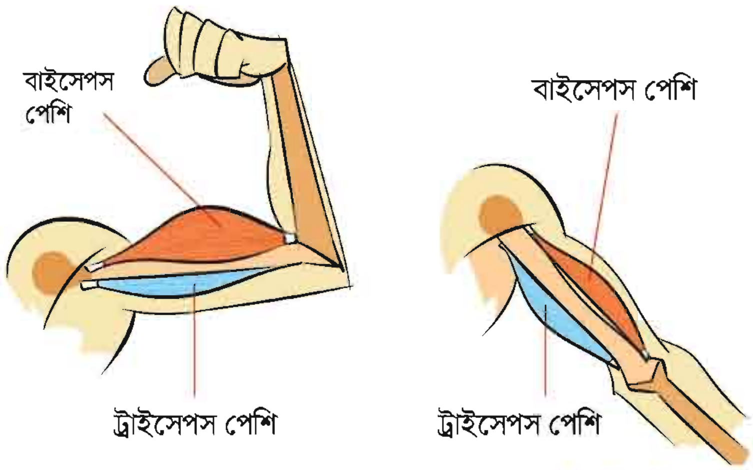

চিত্র 9.04: বাহু নাড়ার কাজে বাইসেপস ও ট্রাইসেপস পেশির বিপরীত ক্রিয়া প্রদর্শন

পেশি এবং টেনডনের সংযোগস্থলে টেনডন তন্তুগুলো পেশিতন্তুর সারকোলেমায় সংযোজিত হয়। পেশি এবং টেনডনের সংযোগকে আরও শক্তিশালী করার জন্য টেনডনের আঁটিগুচ্ছ বেষ্টনকারী অ্যারিওলার টিস্যু, পেশি বান্ডিল বা আঁটির আবরক টিস্যুর সাথে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ তৈরি করে । টেনডন বেশ শক্ত। অস্থি বা পেশির তুলনায় টেনডনের ভেঙে বা ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম, তবে কোনোভাবে যদি তা ছিঁড়ে যায়, তাহলে সহজে জোড়া লাগে না। পেশিবন্ধনী পেশিপ্রান্তে রজ্জুর মতো শক্ত হয়ে অস্থির সাথে সংযুক্ত থাকে। পেশি অস্থির সাথে আবদ্ধ হয়ে দেহকাঠামো গঠনে, দৃঢ়তা দানে, অস্থিবন্ধনী গঠনে সাহায্য করে এবং চাপটানের (tensile strength) বিরুদ্ধে যান্ত্রিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

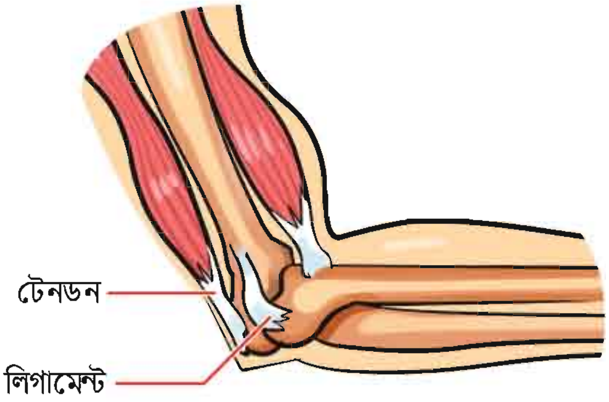

চিত্র 9.05: টেনডন ও লিগামেন্ট

পাতলা কাপড়ের মতো কোমল অথচ দৃঢ়, স্থিতিস্থাপক যে বন্ধনী দিয়ে অস্থিগুলো পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে তাকে অস্থিবন্ধনী বা লিগামেন্ট বলে। লিগামেন্ট শ্বেততন্তু এবং পীততন্তু এই দুই ধরনের ইলাস্টিক তন্তু দিয়ে গঠিত। এতে পীতবর্ণের স্থিতিস্থাপক তন্তুর সংখ্যা বেশি থাকে। এর মধ্যে সরু, শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট জালাকারে বিন্যস্ত কতগুলো তন্তুও ছড়ানো থাকে। এ তন্তুগুলো গুচ্ছাকারে না থেকে আলাদাভাবে অবস্থান কর। এদের স্থিতিস্থাপকতা তুলনামূলকভাবে বেশি। ইলাস্টিক তন্তুগুলো ইলাস্টিন নামক প্রোটিন দিয়ে তৈরি। কব্জা যেমন পাল্লাকে দরজার কাঠামোর সাথে আটকে রাখে। একইভাবে অস্থিবন্ধনী বা লিগামেন্ট হাড়কে আটকে রাখে। এতে অঙ্গটি সবদিকে সোজা বা বাঁকা হয়ে নড়াচড়া করতে পারে এবং হাড়গুলি স্থানচ্যুত ও বিচ্যুত হয় না।

একক কাজ

কাজ: ছকটি খাতায় আঁক ও পূরণ কর।

বৈশিষ্ট্য	টেনডন	লিগামেন্ট
গঠন		
কাজ		
স্থিতিস্থাপকতা		

9.3 অস্থিসংক্রান্ত রোগ

(a) অস্টিওপোরোসিস (Osteoporosis)

তোমরা আগে জেনেছ, অস্থির গঠন এবং দৃঢ়তার জন্য ক্যালসিয়াম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অস্থির বৃদ্ধির জন্য চাই ভিটামিন এবং ক্যালসিয়াম-সমৃদ্ধ খাদ্য। অস্টিওপোরোসিস ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত একটি রোগ।

বয়স্ক পুরুষ ও নারীদের সাধারণত এ রোগটি হয়। যেসব বয়স্ক পুরুষ বহুদিন যাবৎ স্টেরওয়েডযুক্ত ঔষধ সেবন করেন, তাদের ও নারীদের মেনোপজ (রজ-নিবৃত্তি, অর্থাৎ মাসিক চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়া) হওয়ার পর এ রোগ হওয়ার আশঙ্কা বেশি। যারা অলস জীবন যাপন করেন কিংবা কায়িক পরিশ্রম কম করেন, তাদেরও এ রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাছাড়া অনেক দিন ধরে আর্থ্রাইটিসে (অস্থিসন্ধির প্রদাহ) ভুগলে এ রোগ হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি হয়।

কারণ: দেহে খনিজ লবণ বিশেষ করে ক্যালসিয়ামের ঘাটতির কারণে এ রোগটি হয়। নারীদের মেনোপজ হওয়ার পর অস্থির ঘনত্ব এবং পুরুত্ব কমতে থাকে।

লক্ষণ

- অস্থি ভঙ্গুর হয়ে যায়, ঘনত্ব কমতে থাকে,
- পেশির শক্তি কমতে থাকে,
- পিঠের পিছন দিকে ব্যথা অনুভব হয়,
- অস্থিতে ব্যথা অনুভব হয়।

রোগ নির্ণয়

ঘনত্বমাপক যন্ত্রের সাহায্যে অস্থির খনিজ পদার্থের এ রোগ নির্ণয় করা হয়। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় তেমন কোনো উপসর্গ দেখা দেয় না। হঠাৎ করেই সামান্য আঘাতে কোমর বা দেহের অন্যান্য কোনো অঙ্গের হাড় ভেঙ্গে যায়।

প্রতিকার

- পঞ্চাশোর্ধ পুরুষ ও নারীদের দৈনিক 1200 মিলিগ্রাম (বা চিকিৎসক নির্দেশিত অন্য কোনো পরিমাণ) ক্যালসিয়াম গ্রহণ করা।
- ননিতোলা দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য গ্রহণ করা।
- কমলার রস, সবুজ শাকসবজি, সয়াদ্রব্য ও ক্যালসিয়াম-সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া।

প্রতিরোধ

- যথেষ্ট পরিমাণে সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসা।
- ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ‘ডি’ সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করা।
- নিয়মিত ব্যায়াম করা (যদি কেউ ইতোমধ্যে অস্টিওপোরোসিসে আক্রান্ত হয় তাহলে ব্যায়াম করার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে)।
- সুষম ও আঁশযুক্ত খাবার গ্রহণ করা।

(b) রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বা গেঁটেবাত (Rheumatoid Arthritis)

শতাধিক প্রকারের বাতরোগের মধ্যে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস অন্যতম। সাধারণত বয়স্করা এ রোগে আক্রান্ত হয়। কম বয়সী ছেলেমেয়েদের বেলায় গিঁটে ব্যথা বা যন্ত্রণা হওয়া রিউমেটিক ফিভার বা বাতজ্বর (rheumatic fever) জাতীয় অন্য রোগের লক্ষণ হতে পারে (ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অস্থিসন্ধির অসুখের প্রকারভেদ অনুসারে চিকিৎসার পার্থক্য হয়। দুইজন ব্যক্তি দুটি ভিন্ন প্রকারের অস্থিসন্ধির অসুখে আক্রান্ত হলেও তাদের লক্ষণ আপাতদৃষ্টিতে একইরকম হতে পারে। সেক্ষেত্রে দুইজনের ভিন্ন প্রকারের চিকিৎসা প্রয়োজন। এজন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ ছাড়া বাতের চিকিৎসা করা উচিত নয়। এতে উপকারের চেয়ে অপকার বেশি হতে পারে।

লক্ষণ

- অস্থিসন্ধি বা গিঁটে প্রদাহ বা ব্যথা হয়
- অস্থিসন্ধিগুলো শক্ত হয়ে যায়
- অস্থিসন্ধি নাড়াতে কষ্ট হয়
- গিঁট ফুলে যায়।

প্রতিকার

বয়স্কদের বেলায় এ রোগ পুরোপুরি সারানো যায় না। তবে নিচের ব্যবস্থাগুলো নিলে কিছুটা উপশম হয়।

- অত্যধিক পরিশ্রম আর ভারী কাজ থেকে বিরত থাকা।
- যন্ত্রণাদায়ক গিঁটের উপর কুসুম গরম স্যাঁক নেওয়া।
- অস্থিসন্ধির নড়াচড়া ঠিক রাখতে হালকা ব্যায়াম করা।
- ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী বেদনা উপশমকারী ঔষধ সেবন ও সঠিক চিকিৎসা দিয়ে এ রোগের কষ্ট থেকে আংশিক পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

প্রতিরোধ

- চিকিৎসক নির্দেশিত পদ্ধতিতে নিয়মিত ব্যায়াম করা।
- সুষম ও আঁশযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা।

একক কাজ

কাজ: তোমার এলাকায় পঞ্চাশোর্ধ মহিলাদের জীবনধারা, খাদ্যগ্রহণের তথ্য সংগ্রহ কর। তাদের মধ্যে অস্টিওপোরোসিস ও আর্থ্রাইটিস এর কারণ অনুসন্ধান করে লিপিবদ্ধ কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

1. অস্থিসন্ধি কাকে বলে।
2. কঙ্কালের পাঁচটি কাজ উল্লেখ কর।
3. টেনডন ও লিগামেন্টের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।
4. সাইনোভিয়াল সন্ধির বৈশিষ্ট্য কী?
5. অস্থি ও তরুণাস্থির মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

1. অস্টিওপোরোসিসের কারণ ও লক্ষণগুলো লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. কোনটি অস্থির বৈশিষ্ট্য?

ক. স্থিতিস্থাপক খ. তন্তুময়
গ. দৃঢ় ঘ. নরম

2. টেনডনের টিস্যু হচ্ছে-

i. সাদা বর্ণের ও উজ্জ্বল
ii. অশাখ ও তরঙ্গিত
iii. তন্তুময় ও গুচ্ছাকার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে 3 ও 4 নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

60 বছরের রহিমা বেগম হাত-পায়ের ব্যথার জন্য তেমন কাজ করতে পারেন না। চিকিৎসক বলেছেন তার শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাবে অস্টিওপোরোসিস রোগ হয়েছে।

3. রহিমা বেগমের উক্ত রোগের লক্ষণ কোনটি?

ক. অস্থির পুরুত্ব বেড়ে যাওয়া খ. অস্থি ভঙ্গুর হয়ে যাওয়া
গ. কোমরে ব্যথা অনুভব করা ঘ. পেশিশক্তি বাড়তে থাকা

4. রহিমা বেগমের উক্ত রোগটি প্রতিরোধের উপায় হচ্ছে—

i. রাফেজযুক্ত খাবার খাওয়া
ii. অলসময় জীবন পরিহার করা
iii. ভিটামিন ডি যুক্ত খাদ্য কম খাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

1. 12 বছরের বিনিতা বেশ স্বাস্থ্যবতী এবং চঞ্চল প্রকৃতির। সে তার সারা দিনের কার্যক্রমের অনেকটা সময় দৌড়ঝাঁপ, খেলাধুলা করে কাটায়। একদিন সে দৌড়াতে গিয়ে পড়ে গেলে পায়ের লিগামেন্টে আঘাত পায়।

ক. অস্থি কী?
খ. গেঁটেবাত বলতে কী বোঝায়?
গ. বিনিতার আঘাতপ্রাপ্ত অংশটি দরজার কব্জার সাথে তুলনা করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. বিনিতার কার্যক্রমটি সম্পন্ন করতে কীসের সমন্বয় অপরিহার্য— বিশ্লেষণ কর।

2.

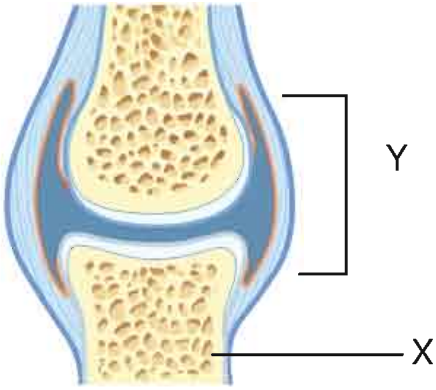

ক. টেনডন কী?
খ. অস্টিওপোরোসিস বলতে কী বোঝায়?
গ. চিত্রে দেহের X অংশটির কোষের গঠন ভিন্ন কেন? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. চিত্রে X ও Y উভয়ের সমন্বিত কার্যক্রম কীভাবে অঙ্গ সঞ্চালনে ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ কর।

দশম অধ্যায়

সমন্বয় (co-ordination)

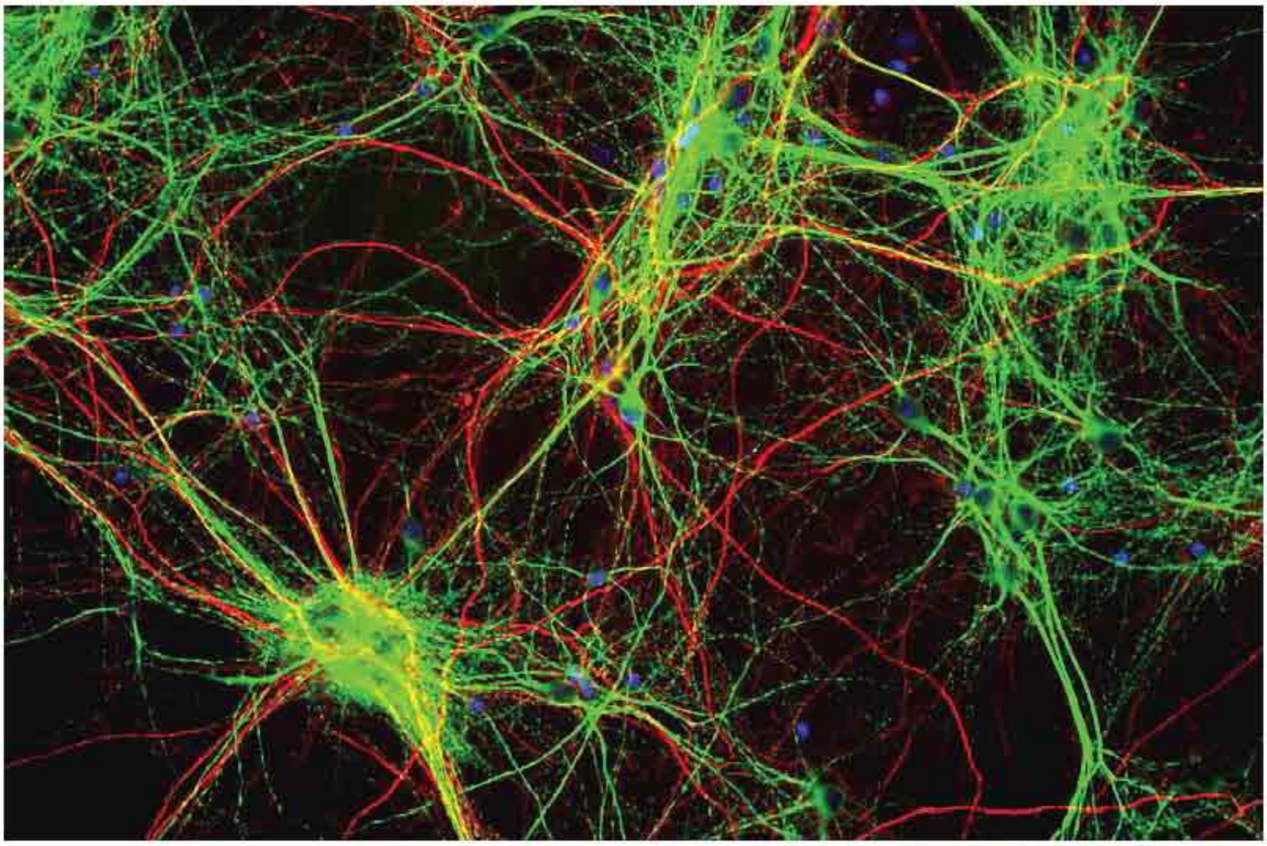

ইঁদুরের মস্তিষ্কের নিউরন সেল

আমরা জানি, জীবদেহে শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া বিক্রিয়া অবিরামভাবে চলছে। এ কাজগুলো একযোগে চলে বলে এ কাজগুলোর মধ্যে সমন্বয় (co-ordination) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয় না থাকলে জীবের জীবনে নানারকমের অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়।

উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন কাজ যেমন: প্রজনন, সুপ্তাবস্থা, অঙ্কুরোদগম, বিপাক, বৃদ্ধি, চলন ইত্যাদি সকল শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার মধ্যে একধরনের সমন্বয় লক্ষ করা যায়। মানবদেহেও তেমনি বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় রয়েছে। উদাহরণ দেওয়ার জন্য স্নায়ুতন্ত্র এবং হরমোনের সমন্বয়ের কথা বলা যায়।

এ অধ্যায়ে উদ্ভিদ ও মানবদেহের সংঘটিত বিভিন্ন সমন্বয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- উদ্ভিদের সমন্বয় প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাণীর সমন্বয় প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান অংশসমূহের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সাধারণ নিউরনের গঠন ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রতিবর্তী প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আবেগ সঞ্চালন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাণরস বা হরমোনের প্রধান কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাণরস বা হরমোনের অস্বাভাবিকতার কারণ ও এটি থেকে সৃষ্ট প্রধান শারীরিক সমস্যাগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- স্ট্রোকের কারণ ও লক্ষণ বর্ণনা করতে পারব।
- স্ট্রোকে তাৎক্ষণিক করণীয় ও প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- স্নায়বিক বৈকল্যজনিত শারীরিক সমস্যার লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকার বর্ণনা করতে পারব।
- সমন্বয় কার্যক্রমে তামাক ও মাদকদ্রব্যের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- হরমোনজনিত শারীরিক সমস্যা সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান করতে পারব।
- পোস্টার/লিফলেট অঙ্কন করে তামাক ও মাদক দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব।
- স্নায়ুতন্ত্রে তামাক ও মাদক দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হব।

10.1 উদ্ভিদে সমন্বয়

প্রাণীর মতো উদ্ভিদের প্রতিটি কোষেও বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম একযোগে এবং প্রতিনিয়ত চলতে থাকে। এ কাজগুলো একটি নিয়মশৃঙ্খলার মাধ্যমে সংঘটিত হয়, এ কারণে উদ্ভিদ জীবনে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কর্মকাণ্ডের সমন্বয় (co-ordination) অপরিহার্য। এ সমন্বয় না থাকলে উদ্ভিদ জীবনে বিভিন্ন রকমের অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়।

একটি উদ্ভিদের জীবনকালে সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জীবনচক্রের পর্যায়গুলো, যেমন অঙ্কুরোদগম, বৃদ্ধি ও বিকাশ, পুষ্পায়ন, ফল সৃষ্টি, পূর্ণতা, সুপ্তাবস্থা ইত্যাদি একটি সুশৃঙ্খল নিয়ম মেনে চলে। এসব কাজে আবহাওয়া এবং জলবায়ুজনিত প্রভাবকগুলোর গুরুত্বও লক্ষ করার মতো।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং চলনসহ বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজগুলো প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত জটিল এবং চলমান। তা সত্ত্বেও এ কাজ অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বিশেষ নিয়ম মেনে সম্পন্ন হয়, একটি কাজ কোনোভাবেই অন্য কাজকে বাধা প্রদান করে না। লক্ষ-কোটি বছরের বিবর্তনের মাধ্যমে এমন সূক্ষ্ম সমন্বয় অর্জিত হয়েছে।

10.1.1 ফাইটোহরমোন

যে জৈব রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভিদদেহে উৎপন্ন হয়ে উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং বিকাশ, বিভিন্ন অঙ্গ সৃষ্টি ইত্যাদি কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে হরমোন বা প্রাণরস বলে। উদ্ভিদ হরমোনকে ফাইটোহরমোন (Phytohormones) বলা হয়। কেউ কেউ ফাইটোহরমোনকে উদ্ভিদ বৃদ্ধিকারক বস্তু (Plant growth substances) হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের মতে, যে রাসায়নিক বস্তুটি কোষে উৎপন্ন হয় এবং উৎপত্তিস্থল থেকে বাহিত হয়ে দূরবর্তী স্থানের কোষ বা কোষপুঞ্জের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে, সেটাই হচ্ছে হরমোন (Hormone)। উদ্ভিদের প্রতিটি কোষই হরমোন উৎপন্ন করতে পারে। এরা কোনো পুষ্টিদ্রব্য নয় তবে ক্ষুদ্রমাত্রায় উৎপন্ন হয়ে উদ্ভিদের বিভিন্ন জৈবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন: অক্সিন (Auxin), জিবেরেলিন (Gibberellin), সাইটোকাইনিন (Cytokinin), অ্যাবসিসিক এসিড (Abscisic acid), ইথিলিন (Ethylene) ইত্যাদি।

উল্লিখিত এসব হরমোন ছাড়াও উদ্ভিদে আরও কিছু হরমোন রয়েছে, যাদের আলাদা করা বা শনাক্ত করা যায়নি। এদের পসটুলেটেড হরমোন (Postulated hormones) বলে। এরা প্রধানত উদ্ভিদের ফুল ও জনন সংশ্লিষ্ট অঙ্গের বিকাশে সাহায্য করে। এদের মধ্যে ফ্লোরিজেন (Florigen) এবং ভার্নালিন (Vernalin) প্রধান। ধারণা করা হয়, ফ্লোরিজেন পাতায় উৎপন্ন হয় এবং তা পত্রমূলে স্থানান্তরিত হয়ে পত্রমুকুলকে পুষ্পমুকুলে রূপান্তরিত করে। তাই দেখা যায়, ফ্লোরিজেন উদ্ভিদে ফুল ফোটাতে সাহায্য করে। নিচে প্রধান ফাইটোহরমোনগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

(a) অক্সিন:

চার্লস ডারউইন এ হরমোন প্রথম আবিষ্কার করেন। যাকে কোল (Kogl) এবং হ্যাগেন স্নিট (Haagen Snit) পরবর্তীতে অক্সিন নামে অভিহিত করেন। চার্লস ডারউইন উদ্ভিদের ভ্রূণমুকুলাবরণীর (Coleoptiles) উপর আলোর প্রভাব লক্ষ করেন। যখন আলো বাঁকাভাবে একদিকে লাগে, তখন ভ্রূণমুকুলাবরণী আলোর উৎসের দিকে বেঁকে যায়। অথচ অন্ধকারে এটি খাড়াভাবে বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হন যে ভ্রূণমুকুলাবরণীর অগ্রভাগে অবস্থিত এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ এর জন্য দায়ী। ঐ পদার্থটি অক্সিন নামক হরমোন। অক্সিন প্রয়োগ করা হলে শাখা কলমে মূল গজায় এবং অকালে ফলের ঝরে পড়া বন্ধ হয়। উদ্ভিদকোষে অক্সিনের পরিবহন নিম্নমুখীভাবে হয়। অক্সিনের প্রভাবে অভিস্রবণ এবং শ্বসন ক্রিয়ার হার বেড়ে যায়। বীজহীন ফল উৎপাদনেও এর ব্যবহার রয়েছে।

(b) জিবেরেলিন:

ধানের বাকানি (Bakanae) রোগের জীবাণু এক ধরনের ছত্রাক যা ধানগাছের অতিবৃদ্ধি ঘটায়। এই ছত্রাক থেকে এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ নিষ্কাশিত হয়, যার প্রভাবে এরকম অতিবৃদ্ধি হয়ে থাকে। এই পদার্থটি জিবেরেলিন। অধিকাংশ জিবেরেলিন উদ্ভিদের পাকা বীজে থাকে, তবে চারাগাছ, বীজপত্র এবং পত্রের বর্ধিষ্ণু অঞ্চলেও এটি দেখা যায়। এর প্রভাবে উদ্ভিদের পর্বমধ্যগুলো দৈর্ঘ্যে বেড়ে যায়, যার কারণে উদ্ভিদ কাণ্ডের অতিবৃদ্ধি ঘটে। এ জন্য খাটো উদ্ভিদে এই হরমোন প্রয়োগ করলে উদ্ভিদটি অন্যান্য সাধারণ উদ্ভিদ থেকেও অধিক লম্বা হয়ে যায়। ফুল ফোটাতে, বীজের সুপ্তাবস্থার দৈর্ঘ্য কমাতে এবং অঙ্কুরোদগমে এর কার্যকারিতা রয়েছে।

(c) সাইটোকাইনিন:

এই ফাইটোহরমোন বা উদ্ভিদ হরমোনটি ফল, শস্য এবং ডাবের পানিতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো উদ্ভিদের মূলেও এদের পাওয়া যায়। সাধারণভাবে এটি বিভিন্ন ঘনত্বে অক্সিনের সাথে যুক্ত হয়ে কোষ বিভাজনকে উদ্দীপিত করে। এছাড়া কোষবৃদ্ধি, অঙ্গের বিকাশসাধন, বীজ এবং অঙ্গের সুপ্তাবস্থা ভঙ্গকরণে ও বার্ধক্য বিলম্বিতকরণে এ হরমোন ভূমিকা পালন করে। কোষ বিভাজনের সময় সাইটোকাইনিন হরমোনের প্রভাবে কোষের সাইটোকাইনেসিস ঘটে।

(d) ইথিলিন:

এ হরমোনটি একটি গ্যাসীয় পদার্থ। এটি ফল পাকাতে সাহায্য করে। এই হরমোন ফল, ফুল, বীজ, পাতা এবং মূলেও দেখা যায়। ইথিলিন বীজ এবং মুকুলের সুপ্তাবস্থা ভঙ্গ করে, চারা গাছের কাণ্ডের বৃদ্ধি ঘটিয়ে চারা গাছকে লম্বা হতে সাহায্য করে, ফুল এবং ফল সৃষ্টির সূচনা করে। ইথিলিন পাতা, ফুল এবং ফলের ঝরে পড়া ত্বরান্বিত করে। কৃত্রিম উপায়ে ফল পাকাতেও এর ব্যবহার রয়েছে।

হরমোনের ব্যবহার:

অক্সিন ও অন্যান্য কৃত্রিম হরমোন শাখাকলমে মূল উৎপাদনে সাহায্য করে। ইন্ডোল অ্যাসিটিক এসিড (IAA) নামক এক ধরনের অক্সিনের প্রভাবে ক্যাম্বিয়ামের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। ফলে ক্যালাস নামক (Callus) এক ধরনের অনিয়ন্ত্রিত কোষগুচ্ছের সৃষ্টি হয় এবং ক্ষতস্থান পূরণ হয়। অক্সিন প্রয়োগ করে ফলের মোচন বিলম্বিত করা হয়। বীজহীন ফল উৎপাদনে অক্সিন ও জিবেরেলিনের ব্যবহার রয়েছে।

বৃদ্ধি (Growth):

উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ বিকাশের ক্ষেত্রে আলো এবং উষ্ণতার প্রভাব লক্ষণীয়। এর ফলে বিভিন্ন সংশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন উপাদান উৎপন্ন হয়ে নতুন অঙ্গের সৃষ্টি করে। আলোর উপস্থিতিতে সম্ভবত অক্সিন হরমোন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় ফলে অন্ধকারের দিকে অক্সিনের ঘনত্ব বাড়ে। বিজ্ঞানীদের মতে, আলোর দিকে থাকা অক্সিন অন্ধকার দিকে চলে যায়, ফলে সেদিকে বৃদ্ধি বেশি হয় এবং আলোকিত অংশের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, কাজেই উদ্ভিদটি আলোর দিকে বেঁকে বৃদ্ধি পায়।

ভ্রূণমূল বা ভ্রূণকাণ্ডের অগ্রাংশ অভিকর্ষের উদ্দীপনা অনুভব করতে পারে। একে অভিকর্ষ উপলব্ধি (Geoperception) বলে। অভিকর্ষণের ফলে কোষের উপাদানগুলো নিচের দিকে স্থানান্তরিত হয়। এদের চাপ পড়ে পার্শ্বীয় কোষের প্রাচীরে। এর ফলে অভিকর্ষণীয় চলন দেখা যায়।

অনেক উদ্ভিদের পুষ্প প্রস্ফুটন দিনের দৈর্ঘ্যের উপর অধিক নির্ভরশীল। যেমন চন্দ্রমল্লিকা একটি ছোটদিনের উদ্ভিদ। দীর্ঘ আলোক ঐসব উদ্ভিদে পুষ্প উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায়। উদ্ভিদে আলো-অন্ধকারের এ ছন্দ এক ধরনের জৈবিক ঘড়ি (biological clock)-এর উদাহরণ।

উদ্ভিদের আলো-অন্ধকারের ছন্দের উপর ভিত্তি করে পুষ্পধারী উদ্ভিদকে তিন ভাগে করা হয়:

(a) ছোটদিনের উদ্ভিদ (Short Day Plant): পুষ্পায়নে দৈনিক গড়ে 8-12 ঘণ্টা আলো প্রয়োজন। যেমন: চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া।

(b) বড়দিনের উদ্ভিদ (Long Day Plant): পুষ্পায়নে দৈনিক গড়ে 12-16 ঘণ্টা আলো প্রয়োজন। যেমন: লেটুস, ঝিঙা।

(c) আলোক নিরপেক্ষ উদ্ভিদ (Day Neutral Plant): পুষ্পায়নে দিনের আলো কোনো প্রভাব ফেলে না। যেমন: শসা, সূর্যমুখী।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং পুষ্পায়নে আলোর মতো তাপ এবং শৈত্যেরও প্রভাব রয়েছে। দেখা গেছে অনেক উদ্ভিদের অঙ্কুরিত বীজকে শৈত্য প্রদান করা হলে তাদের ফুল ধারণের সময় এগিয়ে আসে। শৈত্য প্রদানের মাধ্যমে উদ্ভিদের ফুল ধারণ ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়াকে ভার্নালাইজেশন (Vernalization) বলে। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে উদ্ভিদের পুষ্প সৃষ্টিতে উষ্ণতার প্রভাব পড়ে। শীতের গম গরমকালে লাগালে ফুল আসতে বহু দেরি হয়। কিন্তু বীজ রোপণের পূর্বে 2° সেলসিয়াস-5° সেলসিয়াস উষ্ণতা

প্রয়োগ করলে উদ্ভিদে স্বাভাবিক পুষ্প প্রস্ফুটন ঘটে।

কাজেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আলো, অভিকর্ষ, তাপ এ ধরনের উদ্দীপক উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। এভাবেই উদ্ভিদ তার শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় ঘটায়।

চলন (Movement):

উদ্ভিদ অন্যান্য জীবের মতো অনুভূতি ক্ষমতাসম্পন্ন। এজন্য অভ্যন্তরীণ বা বহি-উদ্দীপক উদ্ভিদদেহে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, তার ফলে উদ্ভিদে চলন ঘটে। কতগুলো চলন উদ্ভিদদেহের বৃদ্ধিজনিত আবার কিছু চলন অভ্যন্তরীণ এবং পারিপার্শ্বিক উদ্দীপকের প্রভাবে হয়ে থাকে। চলন যেভাবেই হোক না কেন তা অবশ্যই কোনো না কোনো প্রভাবকের কারণে ঘটে থাকে।

উদ্ভিদ চলনকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়, সামগ্রিক চলন (Movement of locomotion) এবং বক্রচলন (Movement of curvature)। উদ্ভিদদেহের কোনো অংশ যখন সামগ্রিকভাবে প্রয়োজনের তাগিদে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে তাকে সামগ্রিক চলন বলে। যেমন, ছত্রাক এবং উন্নত শ্রেণির উদ্ভিদের যৌনজনন কোষে (Gametes) কিংবা জুস্পোরে— এ ধরনের চলন দেখা যায়। তাছাড়া কিছু ব্যাকটেরিয়া এবং কিছু শৈবাল, যেমন: *Volvox, Chlamydomonas* ও ডায়াটম শৈবালে এই ধরনের চলন দেখা যায়। অন্যদিকে মাটিতে আবদ্ধ উন্নতশ্রেণির উদ্ভিদ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করতে পারে না। এবং এদের অঙ্গাগুলো নানাভাবে বেঁকে যায়। এ ধরনের চলনকে বক্রচলন বলে। কাণ্ডের আলোকমুখী চলন, মূলের অন্ধকারমুখী চলন, আকর্ষী অবলম্বনকে পেঁচিয়ে ধরা ইত্যাদি বক্রচলনের উদাহরণ। সামগ্রিক চলন এবং বক্রচলন আবার নানা ধরনের হয়। তার মধ্যে ফটোট্রপিক চলন উল্লেখযোগ্য।

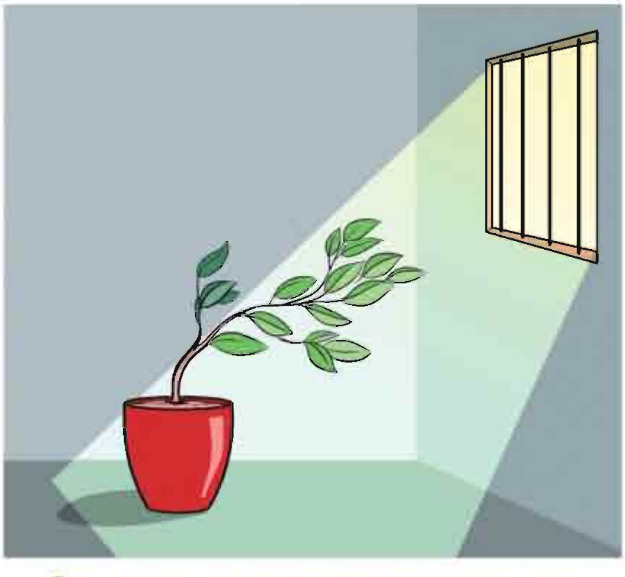

চিত্র 10.01: উদ্ভিদের আলোর প্রতি সাড়া প্রদান

ফটোট্রপিক চলন বা ফটোট্রপিজম (Phototropic movement or phototropism):

ফটোট্রপিক চলন এক ধরনের বক্রচলন। উদ্ভিদের কাণ্ড এবং শাখা-প্রশাখার সবসময় আলোর দিকে চলন ঘটে এবং মূলের চলন সবসময় আলোর বিপরীত দিকে হয়। কাণ্ডের আলোর দিকে চলনকে পজিটিভ ফটোট্রপিজম এবং মূলের আলোর বিপরীত দিকে চলনকে নেগেটিভ ফটোট্রপিজম বলে।

একক কাজ

কাজ : শ্রেণিকক্ষের জানালায় টবসহ একটি উদ্ভিদ রেখে এক সপ্তাহ পর্যবেক্ষণ কর এবং প্রাপ্ত ফলাফল যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

একক কাজ

কাজ : কয়েকটি অঙ্কুরিত ছোলা বীজের সাহায্যে মূলের ভূ-অভিমুখী চলন পরীক্ষা কর ও প্রাপ্ত ফলাফল যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

10.2 প্রাণীর সমন্বয় প্রক্রিয়া

হরমোনাল প্রভাব

প্রাণীর প্রয়োজনীয় সমন্বয় কাজ স্নায়ু ছাড়াও হরমোন দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। হরমোনের কারণে প্রাণী তার কার্যকলাপ অর্থাৎ নড়াচড়া বা আচরণের পরিবর্তন করে থাকে। এই বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রচুর গবেষণা হয়েছে। নানা ধরনের নালিহীন গ্রন্থি থেকে হরমোন নিঃসৃত হয়। নালিহীন গ্রন্থিগুলো একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করে। আবার স্নায়ুতন্ত্র নালিহীন গ্রন্থির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো কার্যক্রমে হরমোনকে যদি কারখানার শ্রমিক ধরা হয়, তাহলে সার্বিকভাবে কোন শ্রমিক কোথায়, কতক্ষণ কাজ করবে, সেটি যেরকম ব্যবস্থাপক নিয়ন্ত্রণ করেন, স্নায়ুতন্ত্রও তেমনি ব্যবস্থাপকের মতো হরমোনের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। উল্টো দিকে স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ এবং কাজের উপর রয়েছে হরমোনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব।

প্রথমে ধারণা ছিল, সব হরমোনই বুঝি উত্তেজক পদার্থ। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেছে সব হরমোন উত্তেজক নয়, এদের মধ্যে কিছু কিছু নিস্তেজকও আছে। হরমোন অতি অল্প পরিমাণে বিশেষ বিশেষ শারীরবৃত্তীয় কাজ বা পদ্ধতি সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এরা উত্তেজক বা নিস্তেজক হিসেবে দেহের পরিস্ফুটন, বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন টিস্যুর কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তির আচরণ, স্বভাব এবং আবেগপ্রবণতার উপরও হরমোনের প্রভাব অপরিসীম। এগুলো রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে উৎপত্তিস্থল থেকে দেহের

দূরবর্তী কোনো কোষ বা অঙ্গাকে উদ্দীপিত করে। এজন্য এদেরকে কখনো কখনো রাসায়নিক দূত (Chemical messenger) হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

জীবনের কর্মকাণ্ডে সমন্বয় সাধনে নানা প্রাণী হরমোন ব্যবহার করে। পিঁপড়া খাদ্যের খোঁজ পেলে খাদ্যের উৎস থেকে বাসায় আসার পথে এক ধরনের হরমোন নিঃসৃত করে, যাকে ফেরোমন বলে। এর উপর নির্ভর করে অন্য পিঁপড়াগুলোও খাদ্য উৎসে যায় এবং খাদ্য সংগ্রহ করে বাসায় ফিরে আসে। এ কারণে পিঁপড়াদের এক সারিতে চলাচল করতে দেখা যায়। খাদ্য শেষ হলে পিঁপড়া ফেরোমন নিস্বরণ বন্ধ করে দেয়, যা সহজেই বাতাসে উবে যায়, তখন অন্য পিঁপড়া আর খাদ্য সংগ্রহে যায় না। কোনো কোনো পতঙ্গ ফেরোমন দিয়ে তার স্বপ্রজাতির সঙ্গীকে খুঁজে পেতে পারে। দেখা গেছে কোনো কোনো পতঙ্গ বাতাসে ফেরোমন নিঃসৃত করলে 2-4 কিলোমিটার দূর থেকে তার সঙ্গীরা আকৃষ্ট হয়। তোমরা হয়তো ফেরোমন ব্যবহার করে পোকা ধ্বংসের ফাঁদ তৈরি করার কথা শুনেছ। এ পদ্ধতিতে ফেরোমনের কারণে আকৃষ্ট হয়ে অনিষ্টকারী পোকা ফাঁদে এসে পানিতে ডুবে মারা যায়। অনিষ্টকারী পোকা দমনে এ পদ্ধতিটিই খুবই পরিবেশবান্ধব।

স্নায়বিক প্রভাব

হাঁটাচলা, উঠাবসা, কথা বলা, চিন্তা করা, লেখা-পড়া করা, হাসিকান্না ইত্যাদি কাজ করার জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গ অংশ নেয়। এ অঙ্গগুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে একটি সমন্বয় ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। স্নায়ুতন্ত্র এবং হরমোনতন্ত্র মিলে দেহের এই কাজ পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় করে। যে তন্ত্রের সাহায্যে প্রাণী উত্তেজনায় সাড়া দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে, দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সংযোগ রাখে, তাদের কাজে শৃঙ্খলা আনে এবং শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, তাকেই স্নায়ুতন্ত্র বলে। আমাদের সারা শরীরের বিভিন্ন কাজের ভিতর সুসংবদ্ধতা আনার জন্য লক্ষ লক্ষ কোষের কাজের সমন্বয় সাধন (Co-ordination) করতে হয়। দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য স্নায়ুতন্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আমাদের দেহ চলে পরিবেশের উদ্দীপনায় সাড়া জাগানোর ফলে। দেহের বাইরের জগৎ হলো বাহ্যিক পরিবেশ এবং দেহের ভিতর হলো অভ্যন্তরীণ পরিবেশ। বাহ্যিক পরিবেশের উদ্দীপক হলো আলো, গন্ধ, স্বাদ এবং স্পর্শ— এগুলো আমাদের চোখ, কান, নাক, জিহ্বা এবং ত্বকের অনুভূতিবাহী স্নায়ুপ্রান্তে উদ্দীপনা জাগায়। আবার অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উদ্দীপক হলো চাপ, তাপ এবং বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তু। এরা অভ্যন্তরীণ অঙ্গের কেন্দ্রমুখী প্রান্তে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এই দুই ধরনের উদ্দীপকই অনুভূতি কিংবা কেন্দ্রমুখী স্নায়ুতে তাড়না সৃষ্টি করে। এই তাড়না মস্তিষ্কে পৌঁছে, মস্তিষ্ক সিদ্ধান্ত নিয়ে আজ্ঞাবাহী (বা মোটরস্নায়ু) এর মাধ্যমে পেশি কিংবা গ্রন্থিতে সাড়া জাগায় এবং কোনো কাজ করতে সাহায্য করে।

10.3 স্নায়ুতন্ত্র

স্নায়ুতন্ত্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গ এবং তন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় করে, দেহের বিভিন্ন অংশে উদ্দীপনা বহন করে এবং দেহের উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে।

নীচে স্নায়ুতন্ত্রের বিন্যাস ছকে দেওয়া হলো:

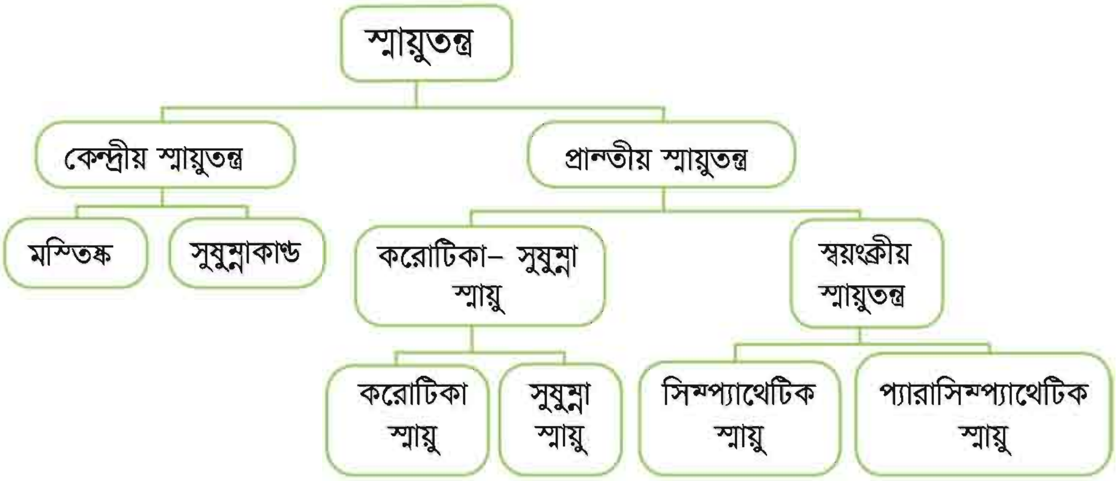
স্নায়ুতন্ত্র
কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র
প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র
মস্তিষ্ক
সুষুম্নাকাণ্ড
করোটিকা- সুষুম্না স্নায়ু
স্বয়ংক্রীয় স্নায়ুতন্ত্র
করোটিকা স্নায়ু
সুষুম্না স্নায়ু
সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু
প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ু

10.3.1 কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central nervous system)

মস্তিষ্ক এবং মেরুমজ্জা (বা সুষুম্নাকাণ্ড) দিয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। মস্তিষ্ক করোটিকার মধ্যে সুরক্ষিত থাকে।

মস্তিষ্ক (Brain)

সুষুম্নাকাণ্ডের শীর্ষে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে স্ফীত অংশ করোটিকার মধ্যে অবস্থান করে, তাকে মস্তিষ্ক বলে। মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্রের পরিচালক। মস্তিষ্ক তিনটি অংশে বিভক্ত— অগ্রমস্তিষ্ক, মধ্যমস্তিষ্ক এবং পশ্চাৎমস্তিষ্ক।

(a) অগ্রমস্তিষ্ক (Forebrain বা Prosencephalon)

মস্তিষ্কের মধ্যে অগ্রমস্তিষ্ক বা সেরিব্রাম সবচেয়ে বড় অংশ। সেরিব্রামকে গুরুমস্তিষ্কও বলা হয়ে থাকে। সেরিব্রামের ডান ও বাম অংশ দুটি সম্পূর্ণভাবে বিভক্ত। দুটি অংশের মাঝখানে বিভেদক খাঁজ থাকায় এ বিভক্তি ঘটে। এদের সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার (Cerbral hemisphere) বলা হয়। সেরিব্রামের ডান ও বাম হেমিস্ফিয়ারের মধ্যে খাঁজ থাকলেও এ দুটি অংশ একগুচ্ছ নিউরন দিয়ে সংযুক্ত থাকে, যার নাম কর্পাস ক্যালোসাম। বাম সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার দেহের ডান অংশ এবং ডান সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার দেহের বাম

অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে। মস্তিষ্কের এ অংশটির উপরিভাগ ঢেউ তোলা। এটি মেনেনজেস নামক পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে। সেরিব্রামের বাইরের স্তরের নাম কর্টেক্স। কর্টেক্স অসংখ্য নিউরনের কোষদেহ দিয়ে গঠিত। এর রং ধূসর। তাই কর্টেক্সের অপর নাম গ্রে ম্যাটার (Gray matter) বা ধূসর পদার্থ। অপরদিকে, সেরিব্রামের গভীর স্তরটি গঠিত হয় ঐসব নিউরনের অ্যাক্সন দিয়ে, যা সাদা রঙের মায়েলিন (mayalin) আবরণে আবৃত। তাই সেরিব্রাল কর্টেক্সের গভীরে থাকে সাদা রঙের স্তর বা হোয়াইট ম্যাটার (White matter)।

সেরিব্রাম হলো প্রত্যেক অঙ্গ থেকে স্নায়ুতাড়না গ্রহণের এবং প্রত্যেক অঙ্গে স্নায়ুতাড়না প্রেরণের উচ্চতর কেন্দ্র। দেহ সঞ্চালন তথা প্রত্যেক কাজ ও অনুভূতির কেন্দ্র হলো সেরিব্রাম। এটি আমাদের চিন্তা, চেতনা, জ্ঞান, স্মৃতি, ইচ্ছা, বাকশক্তি ও ঐচ্ছিক পেশির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। কোন উদ্দীপকের প্রতি কী ধরনের সাড়া দিবে, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষের অগ্রমস্তিষ্কের বিবর্তন সর্বাধিক অগ্রগামী এবং সবচেয়ে বিকশিত।

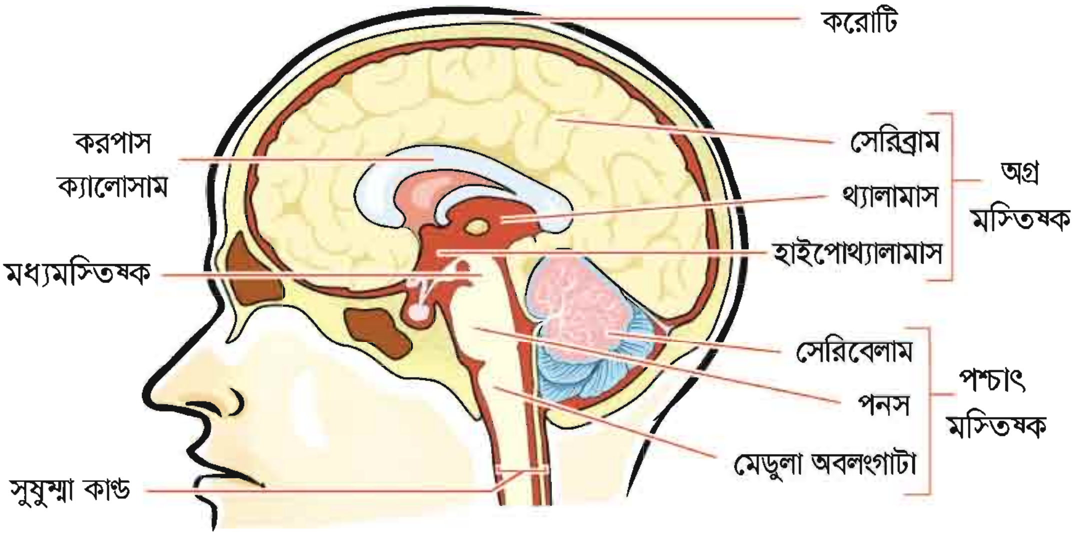

চিত্র 10.02 মস্তিষ্কের লম্বচ্ছেদ

(b) মধ্যমস্তিষ্ক (Midbrain বা Mesencephalon)

পশ্চাৎ মস্তিষ্কের উপরের অংশ হলো মধ্যমস্তিষ্ক। এটি অগ্র ও পশ্চাৎ মস্তিষ্ককে সংযুক্ত করে। মধ্যমস্তিষ্কের পিছনে অবস্থিত নলাকৃতি বৃহৎ অংশের নাম পনস (Pons)। এটি সেরিবেলাম ও মেডুলা অবলংগাটার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। বিভিন্ন পেশির কাজের সমন্বয়সাধন ও ভারসাম্য রক্ষা করা মধ্যমস্তিষ্কের কাজ। দর্শন ও শ্রবণের ক্ষেত্রেও রয়েছে মধ্যমস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

(c) পশ্চাৎমস্তিষ্ক (Hindbrain বা Rhombencephalon)

এটি সেরিবেলাম, পনস ও মেডুলা অবলংগাটা নিয়ে গঠিত।

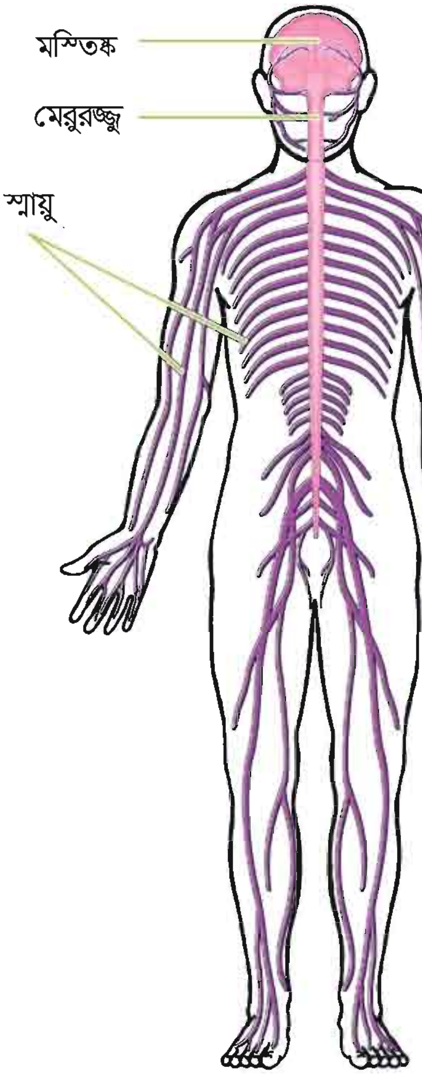

চিত্র 10.03: মানুষের স্নায়ুতন্ত্র

(i) সেরিবেলাম (Cerebellum): পনসের পৃষ্ঠভাগে অবস্থিত খণ্ডাংশটি সেরিবেলাম। এটি ডান এবং বাম দুই অংশে বিভক্ত। এর বাইরের দিকে ধূসর পদার্থের আবরণ এবং ভিতরের দিকে শ্বেত পদার্থ থাকে। সেরিবেলাম দেহের পেশির টান নিয়ন্ত্রণ, চলনে সমন্বয় সাধন, দেহের ভারসাম্য রক্ষা, দৌড়ানো এবং লাফানোর কাজে জড়িত পেশিগুলোর কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।

(ii) পনস (Pons): মেডুলা অবলংগাটা এবং মধ্যমস্তিষ্কের মাঝখানে পনস অবস্থিত। এটি একগুচ্ছ স্নায়ুর সমন্বয়ে তৈরি।

(iii) মেডুলা অবলংগাটা (Medulla Oblongata): এটি মস্তিষ্কের সবচেয়ে পিছনের অংশ। এর সামনের দিকে রয়েছে পনস, পিছনের দিক সুষুম্নাকাণ্ডের উপরিভাগের সথে যুক্ত।

মোট বারো জোড়া করোটিক স্নায়ুর (Cranial nerves) মধ্যে মেডুলা অবলংগাটা থেকে আট জোড়া করোটিক স্নায়ু উৎপন্ন হয়। এর স্নায়ু খাদ্য গলাধঃকরণ, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, গলবিল ইত্যাদির কিছু কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া এই স্নায়ুগুলো শ্রবণ এবং ভারসাম্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে জড়িত।

মস্তিষ্ক থেকে বের হওয়া বারো জোড়া করোটিক স্নায়ু মাথা, ঘাড়, মুখমণ্ডল, মুখগহ্বর, জিহ্বা, চোখ, নাক, কান ইত্যাদি অঞ্চলে বিস্তৃত। স্নায়ুগুলো সংবেদী, মোটর অথবা মিশ্র প্রকৃতির।

মেরুরজ্জু (Spinal cord)

মেরুরজ্জু করোটির পিছনে অবস্থিত ফোরামেন ম্যাগনাম (Foramen magnum) নামক ছিদ্র থেকে কটিদেশের কশেরুকা পর্যন্ত বিস্তৃত। মেরুরজ্জু বা সুষুম্না কাণ্ড মেরুদণ্ডের কশেরুকার ভিতরের ছিদ্রপথে সুরক্ষিত থাকে।

মেরুরজ্জুতে শ্বেত পদার্থ এবং ধূসর পদার্থ থাকে। তবে এদের অবস্থান মস্তিষ্কের ঠিক উল্টো। অর্থাৎ শ্বেত পদার্থ থাকে বাইরে আর ভিতরে থাকে ধূসর পদার্থ। দুই কশেরুকার মধ্যবর্তী ছিদ্র দিয়ে মেরুরজ্জু

থেকে 31 জোড়া মেরুরজ্জীয় স্নায়ু (Spinal nerves) বের হয়। এসব ঘাড়, গলা, বুক, পিঠ, হাত ও পায়ের স্নায়ু। এসব স্নায়ু মিশ্র প্রকৃতির।

স্নায়ুকলা (Nervous tissue)

যে কলা দেহের সব ধরনের সংবেদন এবং উদ্দীপনা গ্রহণ করে এবং তা পরিবহনের মাধ্যমে উদ্দীপনা অনুসারে উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করে, সেটাই স্নায়ুটিস্যু বা স্নায়ুকলা। বহুসংখ্যক স্নায়ুকোষ বা নিউরনের সমন্বয়ে স্নায়ুটিস্যু গঠিত। নিউরনই স্নায়ুতন্ত্রের গঠন এবং কার্যক্রমের একক।

নিউরনের গঠন

প্রতিটি নিউরন দুটি অংশ নিয়ে গঠিত— কোষদেহ এবং প্রলম্বিত অংশ।

(a) কোষদেহ (Cell body): প্লাজমামেমব্রেন, সাইটোপ্লাজম আর নিউক্লিয়াস নিয়ে গঠিত নিউরনের গোলাকার, তারকাকার, অথবা ডিম্বাকার অংশ কোষদেহ নামে পরিচিত। এখানে সাইটোপ্লাজমে মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজিবস্তু, লাইসোজোম, চর্বি, গ্লাইকোজেন, রঞ্জক কণাসহ অসংখ্য নিসল দানা থাকে।

(b) প্রলম্বিত অংশ: কোষদেহ থেকে সৃষ্ট শাখা-প্রশাখাকেই প্রলম্বিত অংশ বলে। প্রলম্বিত অংশ দুই ধরনের:

(i) ডেনড্রন (Dendron): কোষদেহের চারদিকের শাখাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রলম্বিত অংশকে ডেনড্রন বলে। ডেনড্রন থেকে যে শাখা বের হয় তাদের ডেনড্রাইট বলে। একটি নিউরনে ডেনড্রন সংখ্যা শূন্য থেকে শতাধিক পর্যন্ত হতে পারে। ডেনড্রাইট অন্য নিউরন থেকে স্নায়ু তাড়না গ্রহণ করে।

(ii) অ্যাক্সন (Axon): কোষদেহ থেকে উৎপন্ন বেশ লম্বা তন্তুটির নাম অ্যাক্সন। এর চারদিকে পাতলা আবরণটিকে নিউরিলেমা বলে। নিউরিলেমা এবং অ্যাক্সনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে স্নেহ পদার্থের একটি স্তর থাকে। একে মায়েলিন (Myelin) বলে। অ্যাক্সনের শেষ মাথা অ্যাক্সন টারমিনালে বিভক্ত হয়ে যায়, এবং এই টারমিনালগুলো দিয়ে সিন্যাপস মারফত অন্য নিউরনের ডেনড্রাইটে স্নায়ু তাড়না প্রেরণ করা হয়।

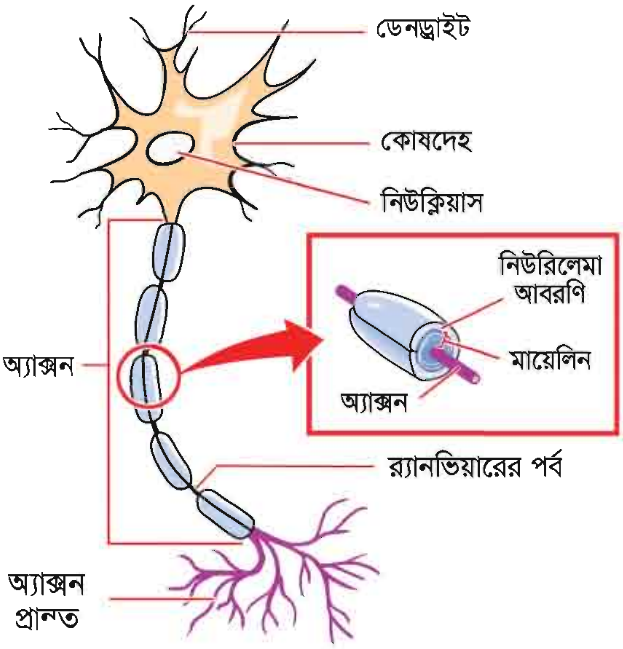

চিত্র 10.04: একটি নিউরন

বহুসংখ্যক অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইট মিলিত হয়ে স্নায়ু গঠন করে।

নিউরিলেমা আবরণটি অবিচ্ছিন্ন নয়। নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর এটি সাধারণত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। শুধু এই বিচ্ছিন্ন অংশে নিউরিলেমার সাথে অ্যাক্সনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ ঘটে। এই আবরণীবিহীন অংশগুলো র‍্যানভিয়ারের পর্ব (Node of Ranvier) নামে পরিচিত। অ্যাক্সনের মূল অক্ষের আবরণীকে অ্যাক্সলেমা (Axolema) বলে।

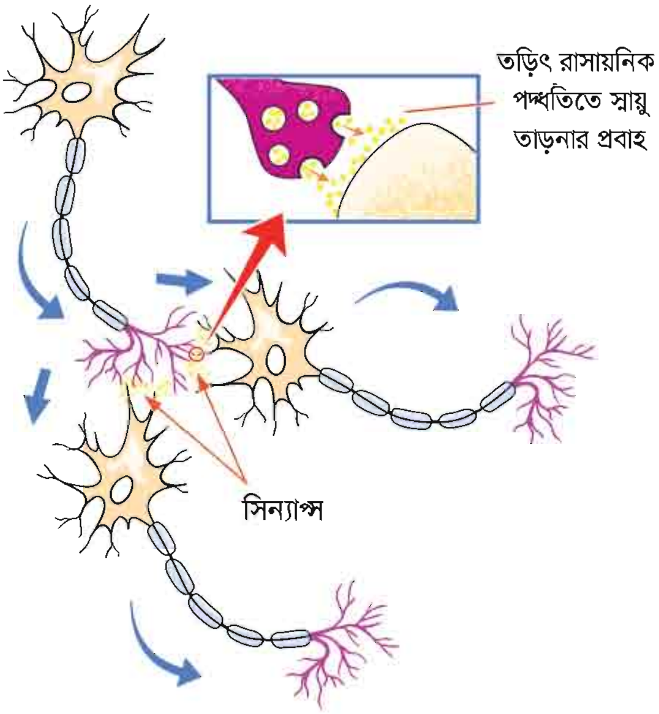
তড়িৎ রাসায়নিক পদ্ধতিতে স্নায়ু তাড়নার প্রবাহ
সিন্যাপ্স

চিত্র 10.05: স্নায়ু তাড়নার প্রবাহ

একটি নিউরনের অ্যাক্সনের টারমিনালের সাথে দ্বিতীয় একটি নিউরনের ডেনড্রাইট সরাসরি যুক্ত থাকে না। এই সূক্ষ্ম ফাঁকা সংযোগস্থলকে সিন্যাপস (Synapse) বলে। প্রকৃতপক্ষে পর পর অবস্থিত দুটি নিউরনের সন্ধিস্থল হলো সিন্যাপস। অ্যাক্সন টারমিনাল সিন্যাপসের মধ্য দিয়ে তড়িৎ রাসায়নিক (Electro chemical) পদ্ধতিতে স্নায়ু তাড়না প্রবাহিত হয়। সিন্যাপসে নিউরোহিউমার নামক তরল পদার্থ থাকে। কোনো একটি নিউরনের মধ্য দিয়ে স্নায়ু তাড়না প্রবাহিত হয়ে সিন্যাপস অতিক্রম করে পরবর্তী নিউরনে যায়। অর্থাৎ এর ভিতর দিয়ে স্নায়ু উদ্দীপনা বা স্নায়ু তাড়না একদিকে পরিবাহিত হয়। মানুষের মস্তিষ্কে প্রায় একশত বিলিয়ন নিউরন রয়েছে এবং প্রতিটি নিউরন অন্য সাত থেকে দশ হাজার নিউরনের সাথে সিন্যাপস সংযোগ

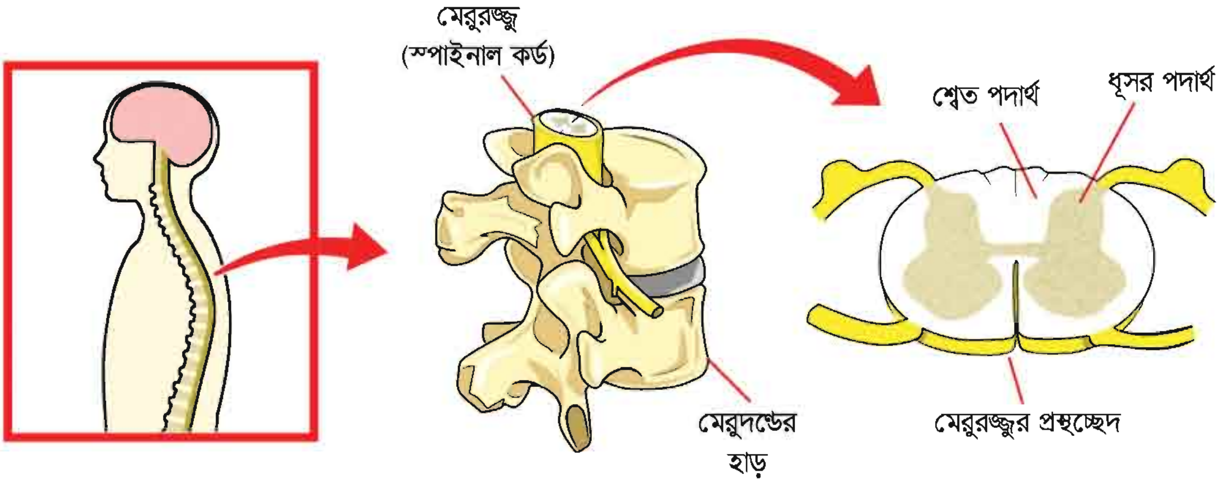
মেরুরজ্জু (স্পাইনাল কর্ড)
শ্বেত পদার্থ
ধূসর পদার্থ
মেরুদণ্ডের হাড়
মেরুরজ্জুর প্রস্থচ্ছেদ

চিত্র 10.06: মেরুরজ্জুর প্রস্থচ্ছেদ

করে থাকে।

নিউরনের প্রধান কাজ উদ্দীপনা বহন করা। অনুভূতিবাহী বা সংবেদী নিউরন গ্রাহক অঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে এবং মোটর বা অজ্ঞাবাহী নিউরন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে কার্যকরী অঙ্গে উদ্দীপনা প্রেরণ করে।

একক কাজ

কাজ : একটি নিউরনের চিত্র এঁকে এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

একটি টর্চ লাইট দিয়ে তোমার বন্ধুর চোখে আলো ফেল। লক্ষ করে দেখ, আলো ফেলার সঙ্গে সঙ্গে চোখের তারা ছোট হয়ে গেল। কেন এমন হলো? আলোর উদ্দীপনাজনিত তাড়না রেটিনা থেকে মস্তিষ্কে পৌঁছালে এর নির্দেশে আইরিশের বৃত্তাকার বা গোলাকার পেশি সংকুচিত হয়। ফলে চোখের তারা ছোট হয়ে যায়। উদ্দীপনার আকস্মিকতায় স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার ফলে তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ হয়ে যায়।

প্রতিবর্তী ক্রিয়া (Reflex action)

প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলতে উদ্দীপনার আকস্মিকতা এবং তার কারণে স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়াকে বোঝায়। হঠাৎ করে আঙ্গুলে সুচ ফুটলে অথবা হাতে গরম কিছু পড়লে আমরা দ্রুত হাতটি উদ্দীপনার স্থান থেকে সরিয়ে নিই, এটি প্রতিবর্তী ক্রিয়ার ফল। আমরা চাইলেও প্রতিবর্তী ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। প্রতিবর্তী ক্রিয়া মূলত সুষুম্নাকাণ্ড দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, মস্তিষ্ক দিয়ে নয়। অর্থাৎ যেসব উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া মস্তিষ্ক দিয়ে না হয়ে সুষুম্নাকাণ্ড দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে।

অসতর্কভাবে সেলাই করার সময় আঙ্গুলে সুঁচ ফুটলে তাৎক্ষণিকভাবে হাত অন্যত্র সরে যাওয়ার প্রতিবর্তী ক্রিয়াটি এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়:

আঙ্গুলে সুচ ফুটার সময় আঙ্গুলের ত্বকে অবস্থিত সংবেদী নিউরন ব্যথার উদ্দীপনা গ্রহণ করে। এখানে ত্বক গ্রাহক অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

আঙ্গুলের ত্বক থেকে এ উদ্দীপনা সংবেদী নিউরনের অ্যাক্সনের মাধ্যমে স্নায়ুকাণ্ডের ধূসর অংশে পৌঁছায়।

স্নায়ুকাণ্ডের ধূসর অংশে অবস্থিত সংবেদী নিউরনের অ্যাক্সন থেকে তড়িৎ রাসায়নিক পদ্ধতিতে উদ্দীপনা মধ্যবর্তী বা রিলে নিউরনের মাধ্যমে মোটর বা আজ্ঞাবাহী স্নায়ু কোষের ডেনড্রাইটে প্রবেশ করে।

আজ্ঞাবাহী স্নায়ুর অ্যাক্সনের মাধ্যমে এ উদ্দীপনা পেশিতে প্রবেশ করে।

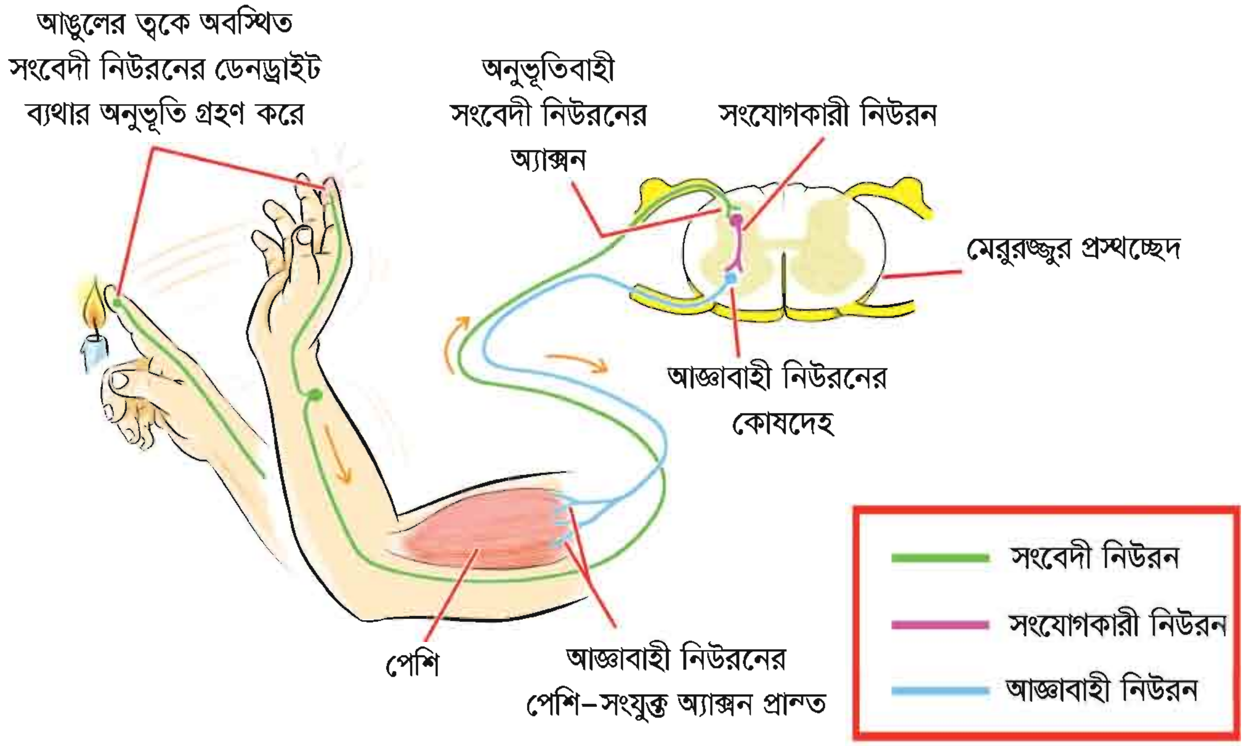
আঙুলের ত্বকে অবস্থিত সংবেদী নিউরনের ডেনড্রাইট ব্যথার অনুভূতি গ্রহণ করে
অনুভূতিবাহী সংবেদী নিউরনের অ্যাক্সন
সংযোগকারী নিউরন
মেরুরজ্জুর প্রস্থচ্ছেদ
আজ্ঞাবাহী নিউরনের কোষদেহ
পেশি
আজ্ঞাবাহী নিউরনের পেশি–সংযুক্ত অ্যাক্সন প্রান্ত
🟩 সংবেদী নিউরন
🟪 সংযোগকারী নিউরন
🟦 আজ্ঞাবাহী নিউরন

চিত্র 10.07: মানবদেহের প্রতিবর্তী চক্র

উদ্দীপনা পেশিতে পৌঁছালে পেশির সংকোচন ঘটে। ফলে উদ্দীপনাস্থল থেকে হাত দ্রুত আপনা-আপনি সরে যায়।

10.3.2 প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral nervous system)

মস্তিষ্ক থেকে 12 জোড়া এবং মেরুমজ্জা বা সুষুম্নাকাণ্ড থেকে 31 জোড়া স্নায়ু বের হয়ে আসে এবং সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর শাখায় বিভক্ত হয়ে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলোকে একত্রে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র বলে। মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন করোটিক স্নায়ু চোখ, নাক, কান, জিহ্বা, দাঁত, মুখমণ্ডল, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী প্রভৃতি অঙ্গের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। মেরুরজ্জু থেকে উদ্ভূত স্নায়ুগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা করে এবং দেহের বাকি অংশ থেকে যাবতীয় অনুভূতি মস্তিষ্কে বয়ে নিয়ে যায়।

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic nervous system)

যেসব অঙ্গের উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, সেগুলো স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। দেহের ভিতরের অঙ্গগুলো, যেমন: হৃৎপিণ্ড, অন্ত্র, পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদির কাজ স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে পরিচালিত হয়। এসব তন্ত্রের কার্যকারিতার উপর মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জুর প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকায় এরা অনেকটা স্বাধীন এবং স্বতন্ত্রভাবে আপন কর্তব্য সম্পাদন করে। ২০১৫

উদ্দীপনা সঞ্চালন (Transmission of Impulse)

পরস্পর সংযুক্ত অসংখ্য নিউরন তন্তুর ভিতর দিয়ে উদ্দীপনা বা তাড়না শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কে পৌঁছায়। প্রতি সেকেন্ডে এর বেগ প্রায় 100 মিটার তবে স্নায়ুর ধরনভেদে এর তারতম্য হতে পারে। পরিবেশ থেকে যে সংকেত স্নায়ুর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছে তাকে স্নায়ু তাড়না বা উদ্দীপনা বলে। নিউরনের কার্যকারিতার ফলে উদ্দীপনা প্রয়োজনীয় অঙ্গাগুলোতে সঞ্চালিত হয়। এটি মাংসপেশিতে সঞ্চালিত হলে পেশি সংকুচিত হয়ে সাড়া দেয়। ফলে প্রয়োজনমতো দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালিত হয়। এই তাড়না গ্রন্থিতে পৌঁছালে সেখানে রস ক্ষরিত হয়। অনুভূতিবাহী স্নায়ু উত্তেজিত হলে সেই উত্তেজনা মস্তিষ্কের দিকে অগ্রসর হয়ে যন্ত্রণাবোধ, স্পর্শজ্ঞান, দর্শন এ ধরনের অনুভূতি উপলব্ধি করায়।

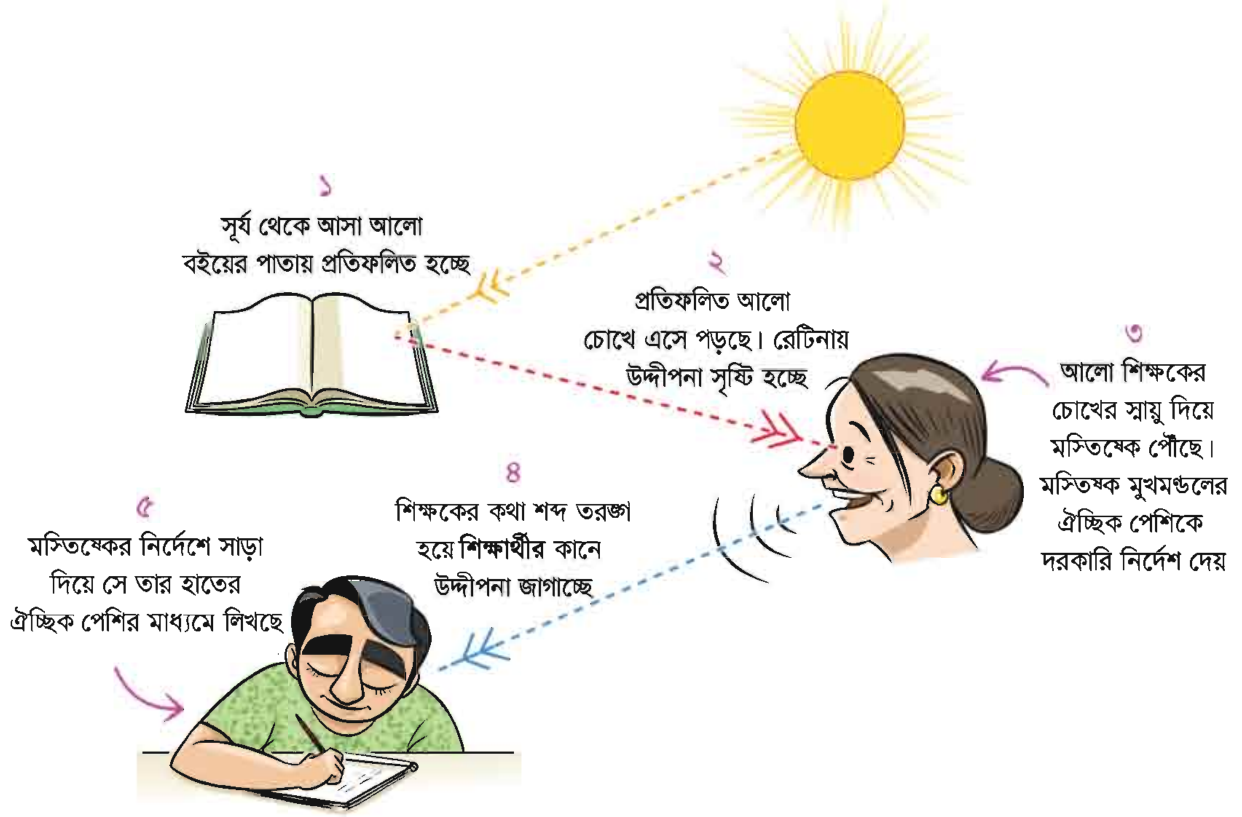
১
সূর্য থেকে আসা আলো
বইয়ের পাতায় প্রতিফলিত হচ্ছে
২
প্রতিফলিত আলো
চোখে এসে পড়ছে। রেটিনায়
উদ্দীপনা সৃষ্টি হচ্ছে
৩
আলো শিক্ষকের
চোখের স্নায়ু দিয়ে
মস্তিষ্কে পৌঁছে।
মস্তিষ্ক মুখমণ্ডলের
ঐচ্ছিক পেশিকে
দরকারি নির্দেশ দেয়
৪
শিক্ষকের কথা শব্দ তরঙ্গ
হয়ে শিক্ষার্থীর কানে
উদ্দীপনা জাগাচ্ছে
৫
মস্তিষ্কের নির্দেশে সাড়া
দিয়ে সে তার হাতের
ঐচ্ছিক পেশির মাধ্যমে লিখছে

চিত্র 10.08: উদ্দীপনা সঞ্চালন প্রক্রিয়া

স্নায়ু তাড়না কীভাবে কাজ করে তা একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝানো যায়। মনে কর, শিক্ষক শ্রুতলিপি দিচ্ছেন এবং তুমি লিখছ। এক্ষেত্রে পুস্তক থেকে প্রতিফলিত আলো শিক্ষকের চোখের রেটিনায় উদ্দীপনা জাগালে স্নায়ু তাড়নার সৃষ্টি হয়। এটা চোখের স্নায়ু দিয়ে মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে পৌঁছে। সেখান থেকে এ তাড়না পর পর চিন্তাকেন্দ্র, স্মৃতিকেন্দ্র প্রভৃতি হয়ে মুখমণ্ডলের ঐচ্ছিক পেশিকে নির্দেশ দেয়। মুখের পেশি সংকুচিত প্রসারিত হয়ে হয়ে সাড়া দেয়। এখানে শিক্ষকের কথা বলার পেশিগুলো হলো প্রধান সাড়া অঙ্গ।

শিক্ষকের কথা বাতাসে শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এই শব্দ তরঙ্গ ছাত্রের কানের পর্দায় উদ্দীপনা জাগায়, যা শ্রবণস্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের শ্রবণকেন্দ্রে পৌঁছে। সেখান থেকে তাড়না ছাত্রের স্মৃতিকেন্দ্র, চিন্তাকেন্দ্র প্রভৃতি হয়ে মোটরস্নায়ুযোগে ছাত্রের হাতের ঐচ্ছিক পেশিতে পৌঁছে। নির্দেশে সাড়া দিয়ে হাতের পেশি লিখতে থাকে। এখানে ছাত্রের পেশি হলো প্রধান সাড়া অঙ্গ।

10.4 হরমোন

মানুষ এবং বিভিন্ন প্রাণীর দেহে একধরনের বিশেষ নালিবিহীন গ্রন্থি থাকে। এসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস রক্তের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। নালিবিহীন গ্রন্থি নিঃসৃত এ ধরনের রসকে হরমোন বলে। হরমোন পরিবহনের জন্য পৃথক কোনো নালি নেই। হরমোন রক্তস্রোতের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যকোষে পৌঁছে কোষের প্রাণরাসায়নিক কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে, জৈবিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে। সুস্থ দেহের চাহিদা অনুসারে গ্রন্থি থেকে অবিরত ধারায় হরমোন নিঃসৃত হয়। তবে প্রয়োজন অপেক্ষা কম অথবা বেশি পরিমাণ হরমোন নিঃসৃত হলে শরীরে নানারকম অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

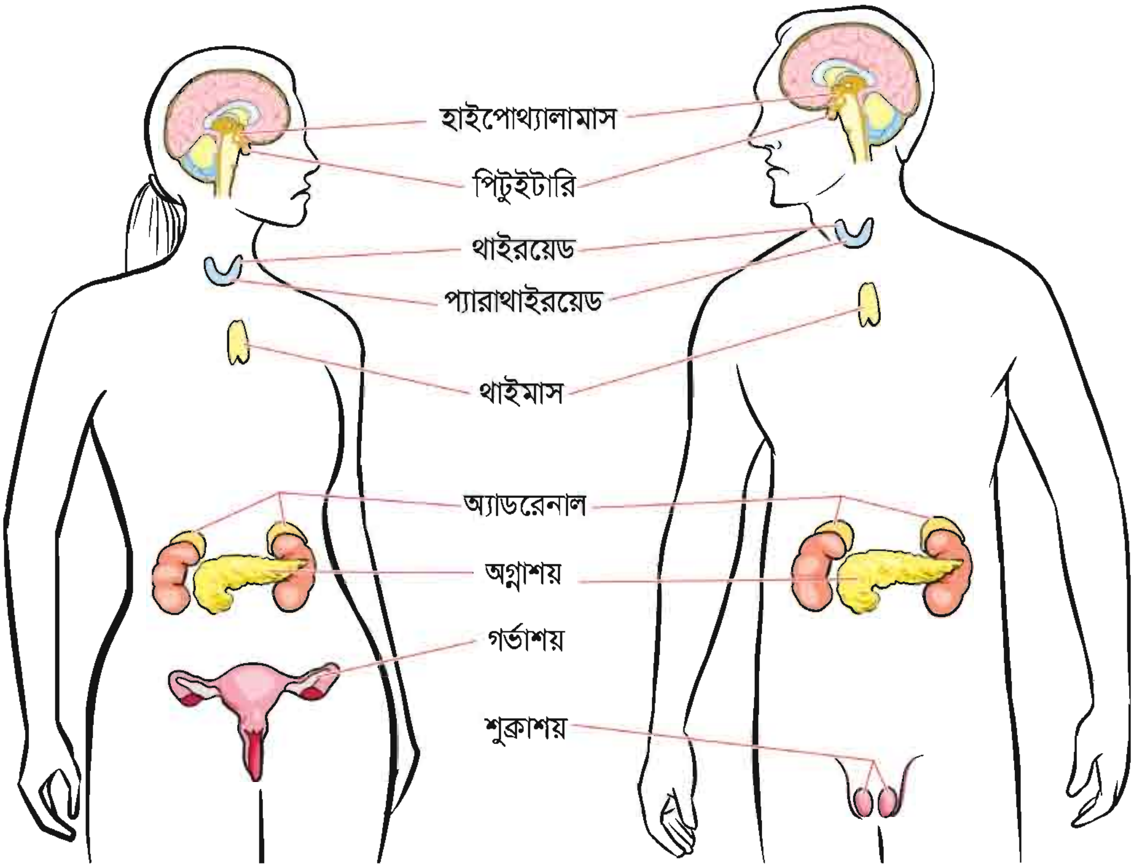

চিত্র 10.09: মানবদেহের কয়েকটি মুখ্য নালিবিহীন গ্রন্থির পরিচিতি, কাজ ও নিঃসৃত হরমোন

10.4.1 মানবদেহের কয়েকটি মুখ্য নালিবিহীন গ্রন্থির পরিচিতি, কাজ ও নিঃসৃত হরমোন

(a) পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary gland):

পিটুইটারি গ্রন্থি বা হাইপোফাইসিস মস্তিষ্কের নিচের অংশে অবস্থিত। এটি মানবদেহের প্রধান হরমোন উৎপাদনকারী গ্রন্থি। কারণ একদিকে পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন সংখ্যায় যেমন বেশি, অপরদিকে অন্যান্য গ্রন্থির উপর এসব হরমোনের প্রভাবও বেশি। দেহের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নালিবিহীন গ্রন্থি হলেও এটি আকারে সবচেয়ে ছোট। এই গ্রন্থি থেকে গোনাডোট্রপিক, সোমাটোট্রপিক, থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন (TSH), এডরেনোকর্টিকোট্রপিন ইত্যাদি হরমোন নিঃসৃত হয়। এটি অন্যান্য গ্রন্থিকে প্রভাবিত করা ছাড়াও মানবদেহের বৃদ্ধির হরমোন নির্গত করে।

(b) থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland):

থাইরয়েড গ্রন্থি গলায় ট্রাকিয়ার উপরের অংশে অবস্থিত। এই গ্রন্থি থেকে প্রধানত থাইরক্সিন হরমোন নিঃসরণ হয়। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন থাইরক্সিন (Thyroxine) সাধারণত মানবদেহে স্বাভাবিক বৃদ্ধি, বিপাকীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। থাইরয়েডের আরেকটি হরমোন ক্যালসিটোনিন (calcitonin) ক্যালসিয়াম বিপাকের সাথে জড়িত।

(c) প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (Parathyroid gland):

একজন মানুষের সাধারণত চারটি প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থাকে, যার সবগুলোই থাইরয়েড গ্রন্থির পিছনে অবস্থিত। এই গ্রন্থি হতে নিঃসৃত প্যারাথরমোন (Parathormone) মূলত ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাসের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।

(d) থাইমাস গ্রন্থি (Thymus gland):

থাইমাস গ্রন্থি গ্রীবা অঞ্চলে অবস্থিত। থাইমাস গ্রন্থি দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিকাশে সাহায্য করে। শিশুকালে এই গ্রন্থি বিকশিত থাকে পরে বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে ছোট হয়ে যায়। এই গ্রন্থি থেকে থাইমোসিন (thymosin) হরমোন নিঃসরণ হয়। পূর্ণবয়স্ক মানুষে সাধারণত এই হরমোন থাকে না, থাকলেও খুবই নিম্ন মাত্রায়।

(e) অ্যাডরেনাল বা সুপ্রারেনাল গ্রন্থি (Adrenal gland):

অ্যাডরেনাল গ্রন্থি কিডনির উপরে অবস্থিত। অ্যাডরেনাল গ্রন্থি দেহের অত্যাবশ্যকীয় বিপাকীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এই গ্রন্থি মূলত কঠিন মানসিক ও শারীরিক চাপ থেকে পরিত্রাণে সাহায্য করে। অ্যাডরেনালিন (adrenalin) এই গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোনগুলোর একটি।

(f) আইলেটস অফ ল্যাংগারহ্যানস (Islets of langerhans):

আইলেটস্ অফ ল্যাংগারহ্যানস অগ্ন্যাশয়ের মাঝে অবস্থিত, এই কোষগুচ্ছ শরীরের শর্করা বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। এর নালিহীন কোষগুলো ইনসুলিন (insulin)ও গ্লুকাগন (glucagon) নিঃসরণ করে যা রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

(g) গোনাড বা জনন অঙ্গ গ্রন্থি:

এটি মেয়েদের ডিম্বাশয় এবং ছেলেদের শুক্রাশয়ে অবস্থিত। জনন অঙ্গ থেকে নিঃসৃত হরমোন দেহের পরিণত বয়সের লক্ষণগুলো বিকশিত করতে ভূমিকা রাখে। এছাড়াও প্রাণীর জনন অঙ্গের বৃদ্ধির পাশাপাশি জননচক্র এবং যৌন আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। জনন অঙ্গ থেকে পরিণত বয়সের পুরুষ-দেহে টেস্টোস্টেরন (testosterone) এবং স্ত্রী-দেহে ইস্ট্রোজেন (estrogens) হরমোন উৎপন্ন হয়।

10.5 প্রাণরস বা হরমোনজনিত অস্বাভাবিকতা

(a) থাইরয়েড সমস্যা

সমুদ্রের পানিতে আয়োডিন থাকায় সামুদ্রিক মাছ মানুষের খাদ্যে আয়োডিনের অন্যতম মূল উৎস। আয়োডিনযুক্ত খাবার খেলে থাইরয়েড হরমোন তৈরি হয়। দেখা গেছে, সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থিত এলাকা যেমন হিমালয়ের পাদদেশে নেপাল কিংবা বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে গলগণ্ড বা গয়টার রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি। থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতি হলে শিশুদের মানসিক বিকাশ বাধা পায়। গায়ের চামড়া খসখসে হয়, মুখমণ্ডল গোলাকার এবং চেহারায় স্বাভাবিক শিশুদের থেকে বৈসাদৃশ্য থাকে। আয়োডিনের অভাবে হরমোন এর উৎপাদান ব্যাহত হলে শিশুদের বৃদ্ধির বিকাশ কমে যায়। এই জন্য খাদ্যে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। এছাড়া কলা, ফলমূল, কচু, সামুদ্রিক মাছ ইত্যাদি খেলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে পঞ্চম অধ্যায়ে আরও আলোচনা করা হয়েছে।

(b) বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস (Diabetes)

অগ্ন্যাশয়ের ভিতর আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস নামক এক ধরনের গ্রন্থি আছে, এই গ্রন্থি থেকে ইনসুলিন (Insulin) নিঃসৃত হয়। ইনসুলিন হলো এক ধরনের হরমোন, যা দেহের শর্করা পরিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। অগ্ন্যাশয়ে যদি প্রয়োজনমতো ইনসুলিন তৈরি না হয় তবে রক্তে শর্করার পরিমাণ স্থায়ীভাবে বেড়ে যায়, প্রস্রাবের সাথে গ্লুকোজ নির্গত হয়। এ অবস্থাকে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস মেলিটাস (সংক্ষেপে: ডায়াবেটিস) বলে। ডায়াবেটিস প্রধানত দুই ধরনের, টাইপ-1 এবং টাইপ-2। টাইপ-1 এ আক্রান্ত রোগীর দেহে একেবারেই ইনসুলিন তৈরি হয় না। তাই নিয়মিতভাবে ইনজেকশনের মাধ্যমে ইনসুলিন নিতে হয়। অন্যদিকে টাইপ-2 রোগীর দেহে আংশিকভাবে ইনসুলিন তৈরি হয়। এক্ষেত্রে ঔষধ, অগ্ন্যাশয় কোষকে শরীরের জন্য পরিমিত ইনসুলিন তৈরিতে সাহায্য করে। তবে টাইপ-2 ডায়াবেটিসেও কোনো

না কোনো পর্যায়ে ইনসুলিনের স্থায়ী ঘাটতি হয়ে যেতে পারে কিংবা বিভিন্ন অসুখ বা চিকিৎসাপদ্ধতির অংশ হিসেবে সেই সব ঔষধ বন্ধ রাখতে হতে পারে, তখন ইনসুলিন ছাড়া উপায় থাকে না। এ রোগটি সাধারণত বংশগতি এবং পরিবেশের প্রভাবে হয়ে থাকে। এটি সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ নয়।

রক্ত ও প্রস্রাবে গ্লুকোজের মাত্রা পরিমাণের চেয়ে বেড়ে গেলে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। লক্ষণগুলো হলো ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, অধিক পিপাসা লাগা, ক্ষুধা বেড়ে যাওয়া, পর্যাপ্ত খাবার খাওয়া সত্ত্বেও দেহের ওজন কমতে থাকা, দুর্বল বোধ করা, চোখে কম দেখা, চামড়া খসখসে ও রুক্ষ হয়ে যাওয়া, ক্ষতস্থান সহজে না শুকানো ইত্যাদি।

পুর্বে ধারণা করা হতো কেবল বয়স্কদের এ রোগটি হয়। এ ধারণাটি সঠিক নয়। ছোট-বড় সব বয়সে এ রোগ হতে পারে। তবে যারা কায়িক পরিশ্রম করেন না, দিনের বেশির ভাগ সময় বসে কাজ করেন অথবা অলস জীবন যাপন করেন, তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। তাছাড়া স্থূলকায় ব্যক্তিদের এ রোগ হওয়ার আশঙ্কা বেশি। যেহেতু এ রোগ বংশগত, তাই কোনো ব্যক্তির বাবা, মা, দাদা, দাদির এ রোগ থাকলে তার এ রোগ হওয়ার আশঙ্কা খুবই বেশি। বংশগতভাবে অনেক শিশুর দেহে ইনসুলিন উৎপাদন কম হয়, ফলে শিশুটি ইনসুলিন ঘাটতিজনিত অসুস্থতায় ভুগতে থাকে।

ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা: রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা করে গ্লুকোজের মাত্রা নির্ণয়ের মাধ্যমে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। চিকিৎসা করে ডায়াবেটিস রোগ একেবারে নিরাময় করা যায় না, কিন্তু এই রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। ডাক্তারদের মতে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনটি 'D' মেনে চলা অত্যাবশ্যক। এগুলো হলো: Discipline, Diet ও Dose।

(i) শৃঙ্খলা (Discipline): একজন ডায়াবেটিস আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য তার সুশৃঙ্খল জীবনব্যবস্থা মহৌষধস্বরূপ। এছাড়া নিয়মিত এবং ডাক্তারের পরামর্শমতো পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করা, নিয়মিত ব্যায়াম করা, রোগীর দেহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং বিশেষভাবে পায়ের যত্ন নেওয়া, নিয়মিত প্রস্রাব পরীক্ষা করা এবং দৈহিক কোনো জটিলতা দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া।

(ii) খাদ্য নিয়ন্ত্রণ (Diet): ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় হলো খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করা, মিষ্টিজাতীয় খাবার পরিহার করা ও ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত এবং সময়মতো খাদ্য গ্রহণ করা। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খাবারের মেনু অনুসরণ করলে সুফল পাওয়া যায়। তবে যার ডায়াবেটিস নেই, তার মিষ্টি খাওয়া বা না খাওয়ার সাথে ডায়াবেটিসের সম্পর্ক নেই।

(iii) ঔষধ সেবন (Dose): ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ঔষধ সেবন করা উচিত নয়। ডাক্তার রোগীর শারীরিক অবস্থা বুঝে ঔষধ খাওয়া বা ইনসুলিন নেওয়ার পরামর্শ দেন। সেই পরামর্শ অনুযায়ী রোগীকে নিয়মিত ঔষধ সেবন করতে হবে। ঠিকমতো চিকিৎসা না করা হলে রোগীর রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে কমে বা বেড়ে যায়। উভয় ক্ষেত্রেই রোগী বেহুঁশ হয়ে পড়তে পারে। এমনকি মৃত্যুও

হতে পারে। যদি ডায়াবেটিস রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যান, তখন তাকে বসিয়ে গ্লুকোজ বা চিনির পানি খাইয়ে দিলে অনেক সময় খারাপ পরিণতি এড়ানো যেতে পারে।

(c) স্ট্রোক (Stroke)

মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটার কারণে স্নায়ুতন্ত্রের কাজে ব্যাঘাত ঘটলে তাকে স্ট্রোক বলে। স্ট্রোক হয় মস্তিষ্কে, হৃৎপিণ্ডে নয়; যদিও এ ব্যাপারে অনেকের ভুল ধারণা রয়েছে। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বা রক্তনালির ভিতরে রক্ত জমাট বেঁধে রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত হওয়া— এই দুইভাবে স্ট্রোক হতে পারে। এর মধ্যে রক্তক্ষরণজনিত স্ট্রোক বেশি মারাত্মক। সাধারণত উচ্চ রক্তচাপের কারণে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ হতে পারে।

রোগের লক্ষণ: এই রোগের লক্ষণ হঠাৎ করেই প্রকাশ পায়। লক্ষণগুলো হলো: বমি হয়, প্রচণ্ড মাথাব্যথা হয়, কয়েক মিনিটের মধ্যে রোগী সংজ্ঞা হারায়, ঘাড় শক্ত হয়ে যেতে পারে, মাংসপেশি শিথিল হয়ে যায়, শ্বসন এবং নাড়ির স্পন্দন কমে যায়, মুখমণ্ডল লাল বর্ণ ধারণ করে। অনেক সময় অবশ্য খুব মারাত্মক উপসর্গ ছাড়াই শুধু মুখ বেঁকে যাওয়া বা অল্প সময়ের জন্য অজ্ঞান হয়ে গিয়ে আবার জ্ঞান ফিরে আসা— স্ট্রোকের এ জাতীয় লক্ষণ দেখা যায়। স্ট্রোক কতটা মারাত্মক তা বলতে হলে অন্তত কয়েক দিন রোগীকে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন, সে সময়ে তাঁকে হাসপাতালে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাখতে হয়। তাই, স্ট্রোক হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হবে এবং যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। উপযুক্ত চিকিৎসা করা হলে রোগী অনেক সময় বেঁচে যায়, তবে যদি রক্তক্ষরণজনিত স্ট্রোক হয়, তাহলে বাঁচার নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয়। রোগী যদি বেঁচে যায়, তাহলে কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পর সে তার সংজ্ঞা ফিরে পায়। তবে রোগী কিছুটা ছটফট করে এবং আস্তে আস্তে অসাড় হয়ে যাওয়া অঙ্গে দৃঢ়তা ফিরে আসে। জ্ঞান ফিরে এলেও বাক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে রোগীর কথা জড়িয়ে যায়। পক্ষাঘাত বা অবশ হয়ে যাওয়া অঙ্গ (যেমন: হাত) সংলগ্ন পেশি নড়াচড়ায় শক্তি ক্রমশ ফিরে আসে কিন্তু হাত দিয়ে সূক্ষ্ম কাজ করার ক্ষমতা সাধারণত পুরোপুরিভাবে ফিরে আসে না। চিকিৎসার প্রাথমিক পর্যায়ে আরোগ্য লাভ দ্রুত হতে থাকে কিন্তু দুমাস পরে উন্নতি ক্রমশ কমে আসে। হঠাৎ আক্রমণে যে স্নায়ু সাময়িকভাবে কার্যক্ষমতা হারায়, সেগুলো দ্রুত আরোগ্য লাভ করে এবং কার্যক্ষমতা ফিরে পায়। আর যেসব স্নায়ু সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেগুলোর কর্মক্ষমতা চিরতরে বিনষ্ট হয়ে যায়।

রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা: মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বা রক্ত জমাট বেঁধেছে কি না তা নির্ণয় করে এই রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। এই রোগটির সঠিক কারণ অনেক সময় নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ বন্ধ করা সম্ভব নয়, তবে মস্তিষ্কে জমে থাকা রক্ত অনেক সময় অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বের করার প্রয়োজন হতে পারে। রোগীর উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা, রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী সম্ভব হলে অস্ত্রোপচার করা যেতে পারে। রোগীকে উপযুক্ত শুশ্রূষা, মলমূত্র

ত্যাগের সুব্যবস্থা করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, পথ্যের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দরকার। প্রয়োজনবোধে রোগীকে নলের সাহায্যে খাবার খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ফিজিক্যাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এবং ফিজিওথেরাপিস্টের পরামর্শ মোতাবেক অবশ বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গ নির্দিষ্ট নিয়মে নড়াচড়া করানো দরকার, এতে ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গের অস্থিসন্ধি শক্ত হয়ে যাওয়া রোধ করা সম্ভব হয়। রোগীর জ্ঞান ফিরে এলে নিজ প্রচেষ্টায় নড়াচড়া করতে উৎসাহিত করা উচিত।

প্রতিরোধের উপায়: ধূমপান পরিহার করা, যারা উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন, তাদের উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা, যারা ডায়াবেটিসে ভুগছেন তাদের নিয়মিত ঔষধ সেবন করা, দুশ্চিন্তামুক্ত, সুন্দর এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করা।

10.6 স্নায়বিক বৈকল্যজনিত শারীরিক সমস্যা

(a) প্যারালাইসিস (Paralysis)

শরীরের কোনো অংশের ঐচ্ছিক মাংসপেশি ইচ্ছামতো নাড়াতে পারার ক্ষমতা নষ্ট হওয়াকে প্যারালাইসিস বলে। সাধারণত মস্তিষ্কের কোনো অংশের ক্ষতির কারণে ঐ অংশের সংবেদন গ্রহণকারী পেশিগুলো কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। একজনের আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ প্যারালাইসিস হতে পারে, ফলে শরীরের একপাশে কোনো অঙ্গ অথবা উভয় পাশের অঙ্গের কার্যকারিতা নষ্ট হয়, যেমন, দুই হাত ও পায়ের প্যারালাইসিস।

কারণ: প্যারালাইসিস সাধারণত স্ট্রোকের কারণে হয়। এছাড়া মেরুদণ্ডের বা ঘাড়ের সুষুম্নাকাণ্ড আঘাত বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে প্যারালাইসিস হতে পারে। স্নায়ু রোগ, সুষুম্নাকাণ্ডের কিংবা কশেরুকার ক্ষয় রোগও প্যারালাইসিসের কারণ হতে পারে।

(b) এপিলেপসি (Epilepsy)

এপিলেপসি মস্তিষ্কের একটি রোগ, যাতে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে খিঁচুনি বা কাঁপুনি দিতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এই রোগকে মৃগী রোগও বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই রোগের কারণে আক্রান্ত ব্যক্তি হঠাৎ করেই সাময়িকভাবে কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, শরীর কাঁপুনি ও খিঁচুনি দিতে দিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আগুন বা পানির সাথে এপিলেপ্সির লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু রোগাক্রান্ত অবস্থায় কোথাও পড়ে গেলে রোগী নিজ শক্তিতে উঠতে পারে না। এই কারণে এসব রোগীকে জলাশয় বা আগুন কিংবা অন্যান্য বিপজ্জনক বস্তু বা স্থান থেকে দূরে রাখতে হয়।

এপিলেপসির মূল কারণ এখনও সম্পূর্ণভাবে জানা যায়নি। স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীদের মৃগী রোগ দেখা দেয়। মাথায় আঘাতের কারণে ম্যানিনজাইটিস, এনসেফালাইটিস, জন্মগত মস্তিষ্কের বিকৃতি, টিউমার

ইত্যাদি কারণেও এপিলেপসির উপসর্গ দেখা দেয়। এপিলেপসি যেকোনো বয়সে হতে পারে। কোনো কোনো এপিলেপসির কোনো দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব নেই, আবার কোনোটা মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি করতে পারে। তাই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে এপিলেপসির ধরন নির্ণয় করে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

(c) পারকিনসন রোগ (Parkinson's disease)

পারকিনসন রোগ মস্তিষ্কের এমন এক অবস্থা, যেখানে হাতে ও পায়ের কাঁপুনি হয় এবং আক্রান্ত রোগীর নড়াচড়া, হাঁটাহাঁটি করতে সমস্যা হয়। এ রোগ সাধারণত 50 বছর বয়সের পরে হয়। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে যুবক-যুবতীদেরও হতে পারে। এই ক্ষেত্রে রোগটি তার বংশে রয়েছে বলে ধরা হয়।

স্নায়ু কোষ বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করে থাকে, যার একটি হলো ডোপামিন। ডোপামিন শরীরের পেশির নড়াচড়ায় সাহায্য করে। পারকিনসন রোগাক্রান্ত রোগীর মস্তিষ্কে ডোপামিন তৈরির কোষগুলো ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। ডোপামিন ছাড়া ঐ স্নায়ু কোষগুলো পেশি কোষগুলোতে সংবেদন পাঠাতে পারে না। ফলে মাংসপেশি তার কার্যকারিতা হারায়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে পারকিনসনের কারণে রোগীর মাংসপেশি আরও অকার্যকর হয়ে উঠে, ফলে রোগীর চলাফেরা, লেখালেখি ইত্যাদি কাজ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

পারকিনসন রোগ সাধারণত ধীরে ধীরে প্রকট রূপে দেখা দেয়। প্রাথমিক অবস্থায় রোগী হালকা হাত বা পা কাঁপা অবস্থায় থাকে। ফলে চলাফেরা বিঘ্নিত হয়। এছাড়াও চোখের পাতার কাঁপুনি, কোষ্ঠকাঠিন্য, খাবার গিলতে কষ্ট হওয়া, সোজাসুজি হাঁটার সমস্যা, কথা বলার সময় মুখের বাচনভঙ্গি না আসা অর্থাৎ মুখ অনড় থাকা মাংসপেশিতে টান পড়া বা ব্যথা হওয়া, নড়াচড়ায় কষ্ট হওয়া, যেমন চেয়ার থেকে উঠা কিংবা হাঁটতে শুরু করার সময় অসুবিধে হওয়া— এই ধরনের নানা উপসর্গ দেখা দিতে শুরু করে।

ডাক্তারের পরামর্শে নিয়মিত ফিজিওথেরাপি গ্রহণ, পরিমিত খাদ্য গ্রহণ এবং সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করার মাধ্যমে রোগী অনেকটা সুস্থ থাকে।

একক কাজ

কাজ : হরমোনজনিত শারীরিক সমস্যা সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান কর এবং একটি অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন তৈরি কর।

২০১৯

10.7 সমন্বয় কার্যক্রমে তামাক ও মাদকদ্রব্যের প্রভাব

আমাদের দেশে সাধারণত তামাক, গাঁজা, ভাং, চরস, আফিম, মরফিন, কোকেন, মদ ইত্যাদি মাদকদ্রব্য হিসেবে পরিচিত। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কোকেন ও আফিম থেকে কৃত্রিম উপায়ে ঔষধ তৈরি করা হচ্ছে। এগুলোও নেশার উদ্রেক করে। যেমন: ঘুমের ঔষধ।

মানুষ কেন মাদকাসক্ত হয় তার বহুবিধ কারণ রয়েছে। তার মাঝে মাদকদ্রব্যের প্রতি কৌতূহল, বন্ধুবান্ধব এবং সঙ্গীদের প্রভাব, নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের আগ্রহ, সহজ আনন্দ লাভের চেষ্টা, পরিবারে মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা, পারিবারিক কলহ এবং অশান্তি, বেকারত্ব, হতাশা, অভাব অনটন, মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে অজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য। তবে সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে ধারণা করা হচ্ছে যে মাদকাসক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হলো স্বাভাবিক সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের ঘাটতি।

তামাক ব্যবহারে, জর্দা চিবিয়ে খেলে কিংবা ধূমপান করলে রক্তে নিকোটিনের মাত্রা বেড়ে যায়। নিকোটিন প্রাথমিকভাবে স্নায়ু কোষগুলোকে উদ্দীপিত করে, পরবর্তীতে দেহে নিকোটিনের চাহিদা আরও বেড়ে যায়। নিকোটিনের এই চাহিদা মেটাতে জর্দা ব্যবহার বা ধূমপানের নেশায় মানুষ আসক্ত হয়ে পড়ে। নিকোটিন গ্রহণে ধীরে ধীরে স্নায়ুকোষের কার্যকারিতা নষ্ট হতে থাকে। হাত, পা কিংবা মাথা অনৈচ্ছিকভাবে কাঁপতে থাকে। ফলে কোনো সূক্ষ্ম কাজ, যেমন সুইয়ের ছিদ্রে সুতা ঢোকানো, সোজা দাগ টানা, লেখালেখিতে ব্যর্থতাজনিত সমস্যা ইত্যাদি দেখা দেয়।

মাদকদ্রব্য ব্যবহারে স্নায়ুতন্ত্রের উপর অনেক বড় প্রভাব পড়ে। মাদকাশক্তির কারণে একজন তার নিজস্ব ইচ্ছাশক্তির কাছে হার মেনে নেশাদ্রব্য গ্রহণে বাধ্য হয়। নেশা বস্তুর কারণে তার চিন্তাশক্তি ক্রমে লোপ পায়। মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারীরা কাজে মনোযোগ হারায়, সাধারণ জীবনযাপনে ব্যর্থ হয়। অতিরিক্ত নেশায় অচৈতন্য অবস্থায় কোনো স্থানে পড়েও থাকতে পারে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময় পর পর মাদক গ্রহণ করতে না পারলে তার মারাত্মক কষ্ট হয়, এমনকি শরীরে অনিয়ন্ত্রিত খিঁচুনিও হতে পারে। এ জন্য মাদকের অর্থ জোগাড় করতে সেই ব্যক্তি অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে।

মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের সাহায্যে মাদকের নেশা থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব। তবে এ কাজে পরিবারের সবার সহানুভূতি ও সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি।

মাদকাসক্তির কুফল:
মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে মানসিক, শারীরিক, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতিসাধন হয়।

এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায়:

- পারিবারিকভাবে এবং সামাজিকভাবে স্বাস্থ্যকর সম্পর্কের পরিবেশ বজায় রাখা।
- নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রসার করা।

- বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- অসৎ বন্ধুবান্ধব থেকে দূরে থাকা ও এর কুফল সম্পর্কে অবহিত করা।
- এ ব্যাপারে জনসচেতনতা গড়ে তোলা ও আইনের সঠিক প্রয়োগ করা।

মাদকাসক্তদের ঘৃণা বা অবহেলার চোখে না দেখে তাদেরকে সহানুভূতির সাথে ধৈর্য সহকারে সমাজে পুনর্বাসন বা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা উচিত। প্রয়োজনে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের সহায়তা গ্রহণ করা অপরিহার্য। এ উদ্দেশ্যে 1990 সালে বাংলাদেশ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। দিন দিন এ অধিদপ্তরের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের কার্যক্রমের মধ্যে মাদকদ্রব্য আইন প্রণয়ন, আইনের প্রয়োগ, নিরোধ, চিকিৎসা এবং পুনর্বাসন উল্লেখযোগ্য।

একক কাজ

কাজ : তামাক ও মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে পোস্টার/লিফলেট অঙ্কন কর এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

1. ফাইটোহরমোন কী?
2. অভিকর্ষ উপলব্ধি কী?
3. স্নায়ুতন্ত্র কাকে বলে?
4. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র কী নিয়ে গঠিত?
5. প্যারালাইসিস কেন হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

1. উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে হরমোনের ভূমিকা আলোচনা কর।
2. থাইরয়েড সমস্যার লক্ষণগুলো লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. থাইমাস গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন কোনটি?

ক. থাইরক্সিন	খ. প্যারাথাইরক্সিন
গ. থাইমোক্সিন	ঘ. থাইরোট্রপিন

2. আইলেটস অফ ল্যাংগারহ্যানস—

i. শরীরের শর্করা বিপাকে সহায়তা করে
ii. ইনসুলিন হরমোন নিঃসরণ করে
iii. দেহের বিপাকীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. i ও ii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্রের আলোকে 3 ও 4 নং প্রশ্নের উত্তর দাও

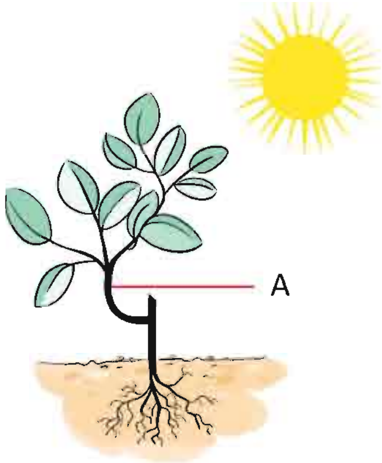

3. চিত্রে ‘A’-এর ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য।

ক. আলোক দিকমুখীনতা	খ. ভূ-দিকমুখীনতা
গ. পানি দিকমুখীনতা	ঘ. রাসায়নিক দিকমুখীনতা

4. চিত্রে ‘A’ অংশটি সৃষ্টিতে কোনটি কাজ করে?

ক. অক্সিজেন	খ. জিবেরেলিন
গ. সাইটোকাইনিন	ঘ. অ্যাবসিসিক এসিড

সৃজনশীল প্রশ্ন

1. অহনা বাবার সাথে কৃষি খামারে ঘুরতে যেয়ে বিভিন্ন ধরনের গাছ পর্যবেক্ষণ করে। সে দেখল, একটি করে আলো জ্বালিয়ে ছোট ছোট চারা গাছ রাখা আছে এবং ঘরটি বেশ ঠান্ডা। সে আরও দেখল, কিছু ফলদ গাছের ফুল ফুটছে না, কিছু গাছে ছোট অবস্থায় ফলগুলো ঝরে পড়ছে।

ক. বায়োলজিক্যাল ক্লক কী?
খ. ভার্নালাইজেশন বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকে ফলদ গাছগুলোতে এরূপ সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. অহনার দেখা গাছগুলো উক্ত পরিবেশে রাখার কারণ বিশ্লেষণ কর।

2.

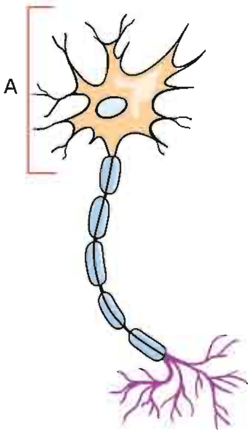

ক. প্রতিবর্তী ক্রিয়া কী?
খ. প্রাণরস কাকে বলে বুঝিয়ে লেখ।
গ. মানবদেহে উদ্দীপনা তৈরিতে চিত্রে ‘A’ চিহ্নিত অংশটির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. চিত্রের কোষটির গঠনপ্রকৃতি একটি সাধারণ কোষ অপেক্ষা ভিন্নতর— যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

একাদশ অধ্যায়

জীবের প্রজনন (Reproduction)

প্রজনন (Reproduction) জীবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জীব তার জীবদ্দশায় নিজের প্রতিরূপ সৃষ্টির মাধ্যমে তার প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখে। ভিন্ন ভিন্ন জীবের প্রজননের প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে প্রজনন প্রক্রিয়ায় বৈচিত্র্যগুলো লক্ষণীয়।

এই অধ্যায়ে সপুষ্পক উদ্ভিদ এবং মানব প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- জীবে প্রজননের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রজনন অঙ্গ হিসেবে ফুলের কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- সপুষ্পক উদ্ভিদের জীবনচক্রের সাহায্যে উদ্ভিদের যৌন প্রজনন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাণীর অযৌন ও যৌন প্রজনন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রজননের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বহিঃ ও অন্তঃ নিষেকের পার্থক্য করতে পারব।
- ব্লক চিত্রের সাহায্যে মানুষের প্রজননের ধাপসমূহ বর্ণনা করতে পারব।
- প্রজনন কার্যক্রমে হরমোনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানব ভ্রূণের বিকাশ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানবদেহে এইডসের সংক্রমণের কারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপর এইডসের ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- এইডস প্রতিরোধে পোস্টার/লিফলেট অঙ্কন করে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব।
- এইডস রোগীদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ প্রদর্শন করব।

11.1 জীবে প্রজননের ধারণা ও গুরুত্ব

জীবের ক্ষেত্রে জন্ম হলে মৃত্যু অবধারিত। জীবের শুধু মৃত্যু হলে পৃথিবী থেকে একসময় সেসব প্রজাতির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয়নি, কারণ একদিকে পৃথিবীতে যেমন জীবের মৃত্যু ঘটছে, অন্যদিকে তেমনি প্রজননের মাধ্যমে জীবের জন্ম হচ্ছে। প্রজনন হচ্ছে এমন একটি শারীরতত্ত্বীয় কার্যক্রম, যার মাধ্যমে জীব তার প্রতিরূপ সৃষ্টি করে ভবিষ্যৎ বংশধর রেখে যায়। যে প্রক্রিয়ায় কোনো জীব তার বংশধর সৃষ্টি করে, তাকেই প্রজনন বলে।

প্রজনন প্রধানত দুই ধরনের— যৌন এবং অযৌন। সাধারণত নিম্নশ্রেণির জীবে যৌন প্রজনন হয় না, তবে কোনো কোনো নিম্নশ্রেণির জীব যৌন উপায়েও প্রজনন ঘটায়। উচ্চশ্রেণির অধিকাংশ উদ্ভিদ এবং উচ্চশ্রেণির সকল প্রাণী যৌন প্রজননের মাধ্যমে বংশধর সৃষ্টি করে। যৌন জননে দুটি বিপরীতধর্মী জননকোষ পরস্পরের সাথে মিলিত হয়। এ ক্ষেত্রে একটিকে পুং জননকোষ বা শুক্রাণু (sperm), অন্যটিকে স্ত্রী জননকোষ বা ডিম্বাণু (Egg) বলে। এই দুই ধরনের জননকোষ একই ফুলে বা একই দেহে সৃষ্টি হতে পারে। উন্নত উদ্ভিদে এ দুই ধরনের জননকোষ একই দেহে সৃষ্টি হয়। এরা সহবাসী (monoecious) উদ্ভিদ। যখন দুই ধরনের জননকোষ আলাদা দেহে সৃষ্টি হয় তখন সেই উদ্ভিদকে ভিন্নবাসী (diecious) উদ্ভিদ বলে।

জননকোষ সৃষ্টির পূর্ব শর্ত হলো, জনন মাতৃকোষকে অবশ্যই মিয়োসিস (Meiosis) পদ্ধতিতে বিভাজিত হতে হয়। তোমরা জান, এই বিভাজনের ফলে ক্রোমোজোমের সংখ্যা জনন মাতৃকোষের অর্ধেক হয়ে যায়। কাজেই যখন পুং ও স্ত্রী জননকোষ দুটি মিলিত হয়ে যে জাইগোট সৃষ্টি করে, তাতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা আবার জনন মাতৃকোষের সমান হয়ে যায়। পরে এই জাইগোটটি মাইটোটিক কোষ বিভাজনের (Mitotic cell division) মাধ্যমে বারবার বিভাজিত হয়ে একটি নতুন জীবদেহ সৃষ্টি করে। এভাবে একটি জীব বহু জীবের জন্ম দিয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় জীব তার ভবিষ্যৎ বংশধর সৃষ্টি করে বংশধারা রক্ষা করে।

প্রজনন না হলে জীবের অস্তিত্ব বিলোপ হয়ে যেত। ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত সকল জীব এভাবে বংশধর সৃষ্টি করে প্রজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। তবে কী উপায়ে প্রজনন ঘটবে তা জীবের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। এ জন্যই নিম্নশ্রেণির জীব কোষ বিভাজনের মাধ্যমে জনন ঘটায় আবার উচ্চশ্রেণির জীবে জটিল প্রক্রিয়ায় যৌন জনন সংঘটিত হয়।

যৌন জনন, অযৌন জননের তুলনায় জটিল, শ্রমসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ একটি প্রক্রিয়া হওয়া সত্ত্বেও যৌন জনন বিবর্তনের ধারায় জীবজগতে নিজের স্থান করে নিয়েছে। কারণ এতে মিয়োসিস বিভাজনের ফলে খুব সহজে কোনো প্রজাতির এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে অচিন্তনীয় পরিমাণ জিনগত

বৈচিত্র্য সৃষ্টি হতে পারে। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে দেখেছি এবং দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়েও দেখতে পাব যে এই বৈচিত্র্য কোনো প্রজাতিকে প্রতিকূল পরিবেশে টিকিয়ে রাখার জন্য অত্যন্ত সহায়ক। অপরদিকে অযৌন জননে অপত্য জীবগুলো মাতৃজীবের (প্রায়) হুবহু অনুরূপ হয়, সে কারণে বৈচিত্র্য খুব কম থাকে। তুলনামূলকভাবে সরলতর জীবগুলো (যেমন: ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া ইত্যাদি) অযৌন জননের মাধ্যমে খুব কম সময়ে কম শক্তি ব্যয়ে অধিকসংখ্যক জীব জন্ম নিতে পারে বলে সেইসব জীবে প্রজননের এই প্রক্রিয়াটি এখনও টিকে আছে।

11.2 উদ্ভিদের প্রজনন

11.2.1 প্রজনন অঙ্গ: ফুল

প্রজননের জন্য রূপান্তরিত বিশেষ ধরনের বিটপ (Shoot) হলো ফুল। ফুল উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের প্রজনন অঙ্গ। আমরা জানি যে একটি আদর্শ ফুলের পাঁচটি স্তবকের মধ্যে দুটি স্তবক (পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক) প্রজননের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এরা সরাসরি প্রজননে অংশ নেয়, অন্য স্তবকগুলো সরাসরি অংশ না নিলেও প্রজননে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করে। যে ফুলে এই পাঁচটি স্তবকই উপস্থিত থাকে তাকে সম্পূর্ণ ফুল বলে। যেমন জবা, ধুতুরা। এর যেকোনো একটি স্তবক না থাকলে সে ফুলকে অসম্পূর্ণ ফুল বলে। যেমন- লাউ, কুমড়া। বৃন্তযুক্ত ফুলকে সবৃন্তক যেমন-জবা, কুমড়া এবং বৃন্তহীন ফুলকে অবৃন্তক ফুল বলে যেমন— হাতীশুঁড়। যখন কোনো ফুলে পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক দুটোই উপস্থিত থাকে, তাকে উভলিঙ্গ ফুল (Bisexual flower) যেমন- জবা, ধুতুরা, পুংস্তবক বা স্ত্রীস্তবকের যেকোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে তাকে একলিঙ্গ ফুল (Unisexual flower) যেমন লাউ, কুমড়া এবং দুটোই অনুপস্থিত থাকলে ক্লীব ফুল (Neuter flower) বলে।

ফুলের বিভিন্ন অংশ

(a) পুষ্পাক্ষ (Thalmus): পুষ্পাক্ষ সাধারণত গোলাকার এবং ফুলের বৃন্তশীর্ষে অবস্থান করে। এর উপর বাকি চারটি স্তবক পরপর সাজানো থাকে।

(b) বৃতি (Calyx): ফুলের বাইরের স্তবককে বৃতি বলে। বৃতি খণ্ডিত না হলে সেটি যুক্তবৃতি, কিন্তু যখন এটি সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হয়, তখন তাকে বিযুক্তবৃতি বলে। এর প্রতিটি খণ্ডকে বৃত্যাংশ বলে। সবুজ বৃতি খাদ্য প্রস্তুত কাজে অংশ নেয়। এদের প্রধান কাজ ফুলের ভিতরের অংশগুলোকে রোদ, বৃষ্টি এবং পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। তবে যখন বৃতি রং-বেরঙের হয়, তখন তারা পরাগায়নে সাহায্য করে অর্থাৎ পরাগায়নের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে এমন পোকামাকড়, পশু, পাখি ইত্যাদিকে আকর্ষণ করে।

(c) দলমণ্ডল (Corolla): এটি বাইরের দিক থেকে দ্বিতীয় স্তবক। প্রতিটি খণ্ডকে দল বা পাপড়ি বলে। পাপড়িগুলি যুক্ত থাকলে যুক্তদল এবং আলাদা থাকলে বিযুক্তদল বলা হয়। পাপড়ি সাধারণত রঙিন হয়।

এরা ফুলের অত্যাবশ্যকীয় অংশগুলোকে রোদ, বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে। উজ্জ্বল ঝলমলে রঙের দলমণ্ডল পোকামাকড় এবং পশুপাখি আকর্ষণ করে এবং পরাগায়নে সহায়তা করে। অনেক সময় ফুলের পাপড়ি কোনো কোনো পোকামাকড়কে বসে মধু খেতে সাহায্য করে। এসব কার্যক্রম চলাকালীন পরাগায়নের কাজটি হতে থাকে।

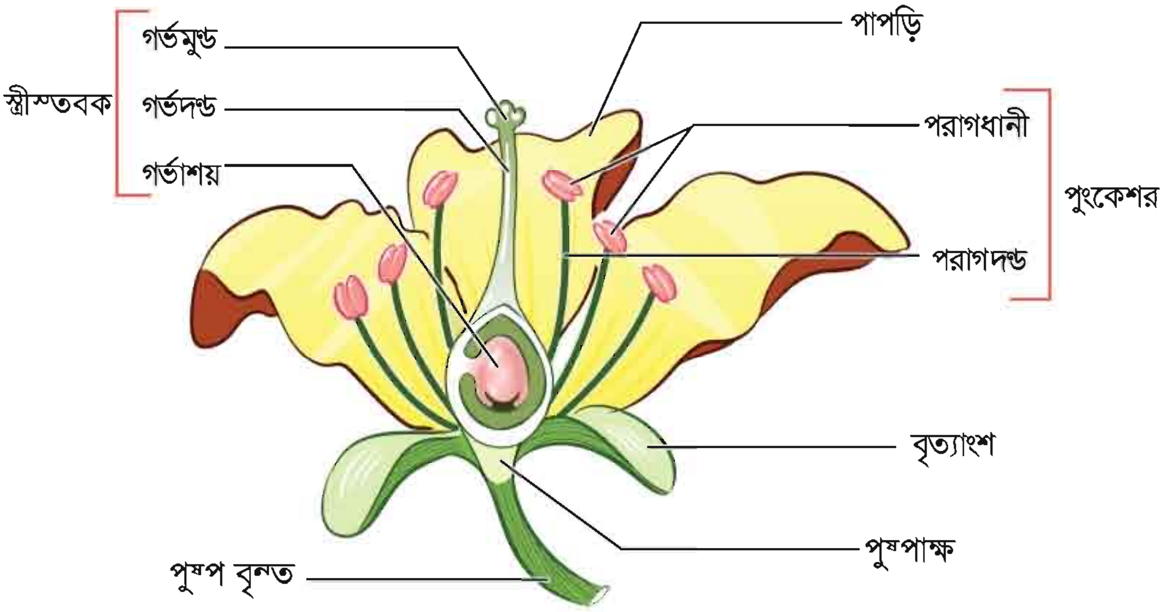

চিত্র 11.01: একটি ফুলের বিভিন্ন অংশ (লম্বচ্ছেদ)।

(d) পুংস্তবক (Androecium): এটি ফুলের তৃতীয় স্তবক এবং একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ। এই স্তবকের প্রতিটি অংশকে পুংকেশর (stamen) বলে। একটি পুংস্তবকে এক বা একাধিক পুংকেশর থাকতে পারে। প্রতিটি পুংকেশরের দুইটি অংশ যথা- পুংদণ্ড বা পরাগদণ্ড (filament) এবং পরাগধানী বা পরাগথলি (anther)। পুংকেশরের দণ্ডের মতো অংশকে পুংদণ্ড এবং শীর্ষের থলির মতো অংশকে পরাগধানী থলি বলে। পরাগধানী এবং পুংদণ্ড সংযোগকারী অংশকে যোজনী বলে। পরাগধানীর মধ্যে পরাগ উৎপন্ন হয়। এই পরাগরেণু অঙ্কুরিত হয়ে পরাগনালি (Pollen tube) গঠন করে। এই পরাগ নালিকায় পুংজননকোষ (Male gamete) উৎপন্ন হয়। পুংজননকোষ সরাসরি জনন কাজে অংশগ্রহণ করে। কখনো পুংস্তবকের পুংদণ্ডগুলো পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। আবার পরাগথলিগুলোও কখনো পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে। পরাগদণ্ড এক গুচ্ছে থাকলে তাকে একগুচ্ছ (Monadelphous), (যেমন: জবা), দুই গুচ্ছে থাকলে দ্বিগুচ্ছ (Diadelphous), (যেমন: মটর) এবং বহুগুচ্ছে থাকলে তাকে বহুগুচ্ছ (Polyadelphous) পুংস্তবক বলা হয়, (যেমন: শিমুল)। যখন পরাগধানী একগুচ্ছে থাকে, তখন তাকে যুক্তধানী বা সিনজেনেসিয়াস (Syngenesious), মুক্ত অবস্থায় এবং পুংকেশর দলমণ্ডলের সাথে যুক্ত থাকলে তাকে দললগ্ন (Epipetalous) পুংস্তবক বলে (যেমন: ধুতুরা)।

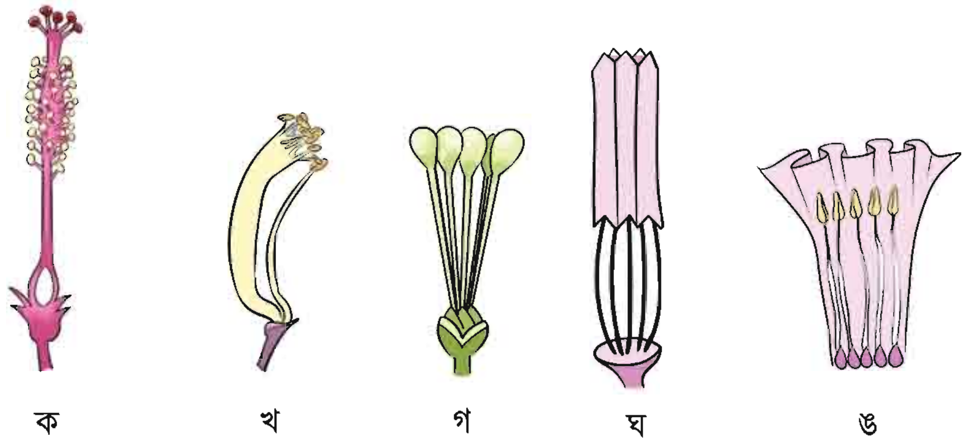

চিত্র-11.02: পুংকেশরের বিভিন্ন প্রকার সজ্জা (ক) একগুচ্ছ, (খ) দ্বিগুচ্ছ, (গ) বহুগুচ্ছ, (ঘ) যুক্তধানী এবং (ঙ) দললগ্ন

(e) স্ত্রীস্তবক (Gynoecium): স্ত্রীস্তবক বা গর্ভকেশরের অবস্থান ফুলটির কেন্দ্রে। এটি ফুলের আর একটি অত্যাবশ্যকীয় স্তবক। স্ত্রীস্তবক এক বা একাধিক গর্ভপত্র (Carpel) নিয়ে গঠিত হতে পারে। একটি গর্ভপত্রের তিনটি অংশ, যথা: গর্ভাশয় (Ovary), গর্ভদন্ড (Style) এবং গর্ভমুন্ড (Stigma)। যখন কতগুলো গর্ভপত্র নিয়ে একটি স্ত্রীস্তবক গঠিত হয় এবং এরা সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে, তখন তাকে যুক্তগর্ভপত্রী (Syncarpous), আর আলাদা থাকলে বিযুক্তগর্ভপত্রী (Polycarpous) বলে।

গর্ভাশয়ের ভিতরে এক বা একাধিক ডিম্বক বিশেষ নিয়মে সজ্জিত থাকে। এসব ডিম্বকের মধ্যে স্ত্রীপ্রজননকোষ বা ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। এই ডিম্বাণুই পুংস্তবকের মতো সরাসরি জননকাজে অংশগ্রহণ করে।

একক কাজ

কাজ: ফুলের বিভিন্ন স্তবক পর্যবেক্ষণ।
উপকরণ: একটি ফুল, ব্লেড, চিমটা, ব্লটিং পেপার।
পদ্ধতি: ফুল সংগ্রহ করে এর যেকোনো একটির বিভিন্ন অংশ আলাদা করে ব্লটিং পেপারে সাজিয়ে রাখ।

একক কাজ

কাজ: গর্ভাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ পর্যবেক্ষণ।
উপকরণ: একটি পরিণত ফুল, ব্লেড, সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র।
পদ্ধতি: ফুল থেকে গর্ভাশয় আলাদা করে নিয়ে ব্লেড দিয়ে প্রস্থচ্ছেদ কর এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা কর। যা যা দেখলে তা খাতায় লেখ।

পুষ্পমঞ্জরি (inflorescence)

পুষ্পমঞ্জরি তোমরা সবাই দেখেছ। অনেক গাছের ছোট একটি শাখায় ফুলগুলো বিশেষ একটি নিয়মে সাজানো থাকে, ফুলসহ এই শাখাকে পুষ্পমঞ্জরি বলে। যে শাখায় ফুলগুলো সজ্জিত থাকে, তাকে মঞ্জরিদণ্ড বলে। এ শাখার বৃদ্ধি অসীম হলে অনিয়ত (recemose) পুষ্পমঞ্জরি এবং পুষ্প উৎপাদনের ফলে বৃদ্ধি থেমে গেলে তাকে নিয়ত (cymose) পুষ্পমঞ্জরি বলে। পরাগায়নের জন্য পুষ্পমঞ্জরির গুরুত্ব অনেক বেশি।

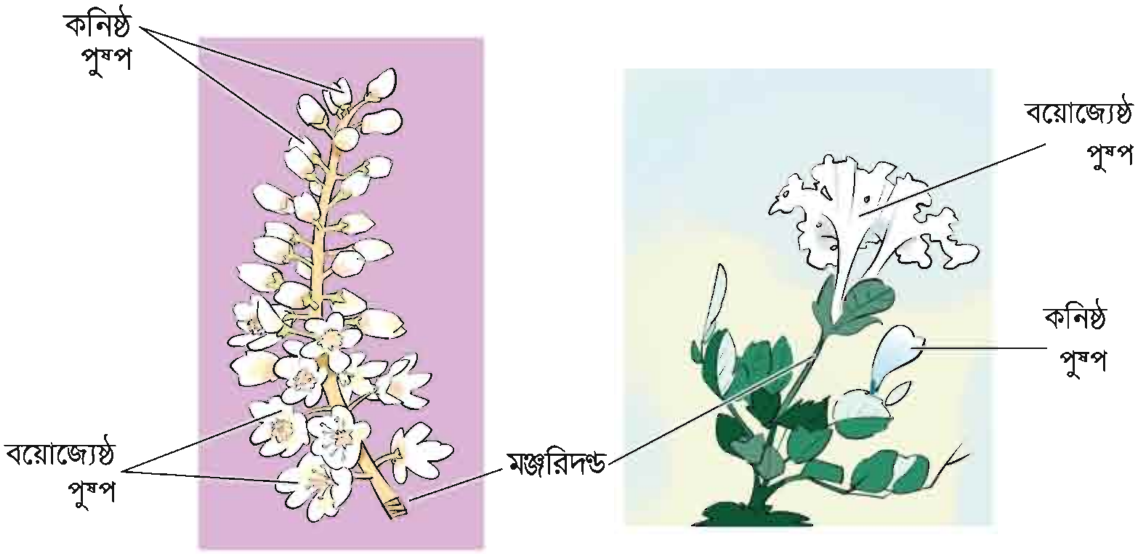

চিত্র 11.03: (ক) অনিয়ত পুষ্পমঞ্জরি, (খ) নিয়ত পুষ্পমঞ্জরি

প্রজননের প্রধান দুটি ধাপ হচ্ছে যথাক্রমে পরাগায়ন ও নিষেক। নিচে এ দুটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

11.2.2 পরাগায়ন (pollination)

পরাগায়নকে পরাগ সংযোগও বলা হয়। পরাগায়ন ফুল এবং বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়ার পূর্বশর্ত। ফুলের পরাগধানী থেকে পরাগরেণুর একই ফুলে অথবা একই জাতের অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হওয়াকে পরাগায়ন বলে। পরাগায়ন দুই ধরনের, স্ব-পরাগায়ন এবং পর-পরাগায়ন।

(a) স্ব-পরাগায়ন: একই ফুলে বা একই গাছের ভিন্ন দুটি ফুলের মধ্যে যখন পরাগায়ন ঘটে, তখন তাকে স্ব-পরাগায়ন বলে। সরিষা, ধুতুরা ইত্যাদি উদ্ভিদে স্ব-পরাগায়ন ঘটে থাকে।

স্ব-পরাগায়নের ফলে পরাগরেণুর অপচয় কম হয়, পরাগায়নের জন্য বাহকের উপর নির্ভর করতে হয় না এবং পরাগায়ন নিশ্চিত হয়। এর ফলে নতুন যে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, তাতে বৈশিষ্ট্যেরও কোনো পরিবর্তন

আসে না এবং কোনো একটি প্রজাতির চরিত্রগত বিশুদ্ধতা বজায় থাকে। তবে এতে জিনগত বৈচিত্র্য কম থাকে। এই বীজের থেকে জন্ম নেওয়া নতুন গাছের অভিযোজন ক্ষমতা কমে যায় এবং অচিরেই প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে।

(b) পর-পরাগায়ন: একই প্রজাতির দুটি ভিন্ন উদ্ভিদের ফুলের মধ্যে যখন পরাগ সংযোগ ঘটে, তখন তাকে পর-পরাগায়ন বলে। শিমুল, পেঁপে ইত্যাদি গাছের ফুলে পর-পরাগায়ন হতে দেখা যায়।

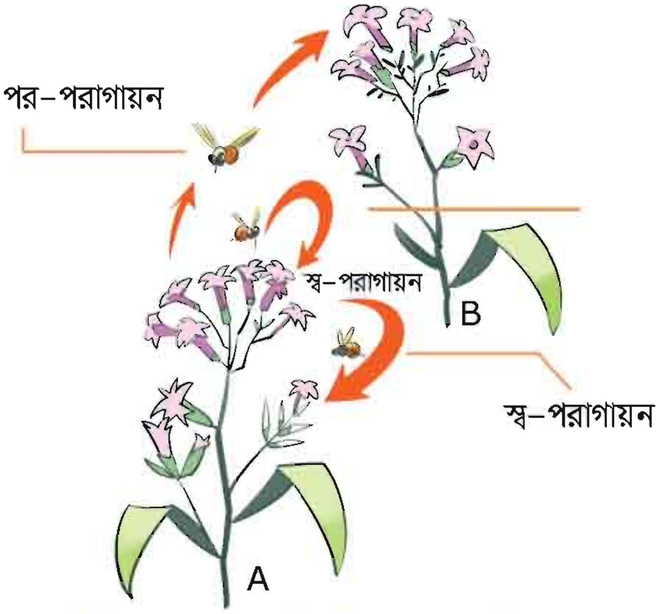

চিত্র 11.04: স্ব-পরাগায়ন ও পর-পরাগায়ন

পর-পরাগায়নের ফলে নতুন চরিত্রের সৃষ্টি হয়, বীজের অংকুরোদগমের হার বৃদ্ধি পায়, বীজ অধিক জীবনীশক্তিসম্পন্ন হয় এবং নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। দুটি ভিন্ন গুণসম্পন্ন গাছের মধ্যে পরাগায়ন ঘটে, তাই এর ফলে যে বীজ উৎপন্ন হয় তা নতুন গুণসম্পন্ন হয় এবং বীজ থেকে যে গাছ জন্মায় তাও নতুন গুণসম্পন্ন হয়। এ কারণে এসব গাছে নতুন বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। তবে এটি বাহকনির্ভর প্রক্রিয়া হওয়ায় পরাগায়নের নিশ্চয়তা থাকে না, এতে প্রচুর পরাগরেণুর অপচয় ঘটে। ফলে প্রজাতির বিশুদ্ধতা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

চিত্র 11.05: পতঙ্গপরাগী ফুল

পরাগায়নের মাধ্যম

পরাগ স্থানান্তরের কাজটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো না কোনো মাধ্যমের দ্বারা হয়ে থাকে। যে মাধ্যম পরাগ বহন করে গর্ভমুণ্ড পর্যন্ত নিয়ে যায়, তাকে পরাগায়নের মাধ্যম বলে। বায়ু, পানি, কীট-পতঙ্গ, পাখি, বাদুড়, শামুক এমনকি মানুষ এ ধরনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে থাকে। মধু খেতে অথবা সুন্দর রঙের আকর্ষণে পতঙ্গ বা প্রাণী ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায়। এ সময়ে ঐ ফুলের পরাগরেণু বাহকের গায়ে লেগে যায়। এই বাহকটি যখন অন্য ফুলে গিয়ে বসে তখন পরাগ পরবর্তী ফুলের গর্ভমুণ্ডে লেগে যায়। এভাবে পরাগায়ন ঘটে। পরাগায়নের মাধ্যমগুলোর সাহায্য পেতে ফুলের গঠনে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

পতঙ্গ পরাগী ফুল বড়, রঙিন ও মধুগ্রন্থিযুক্ত এবং পরাগরেণু ও গর্ভমুণ্ড আঠালো ও সুগন্ধযুক্ত হয়, যেমন: জবা, কুমড়া, সরিষা ইত্যাদি।

বায়ুপরাগী ফুল হালকা এবং মধুগ্রন্থিহীন। এসব ফুলে সুগন্ধ নেই। এরা সহজেই বাতাসে ভেসে যেতে পারে। এদের গর্ভমুণ্ড আঠালো এবং শাখান্বিত, কখনো পালকের মতো। ফলে বাতাস থেকে পরাগরেণু সহজেই সংগ্রহ করে নিতে পারে, যেমন: ধান। পানিপরাগী ফুল আকারে ক্ষুদ্র এবং হালকা। এরা সহজেই পানিতে ভাসতে পারে। এসব ফুলে সুগন্ধ নেই। স্ত্রীপুষ্পের বৃন্ত লম্বা কিন্তু পুংপুষ্পের বৃন্ত ছোট। পরিণত পুংপুষ্প বৃন্ত থেকে খুলে পানিতে ভাসতে থাকে এবং স্ত্রী পুষ্পের কাছে পৌঁছালে সেখানেই পরাগায়ন ঘটে, যেমন: পাতাশেওলা।

চিত্র 11.06: প্রাণীপরাগী ফুল।

প্রাণীপরাগী ফুল মোটামুটি বড় ধরনের হয়, তবে ছোট হলে ফুলগুলো পুষ্পমঞ্জরিতে সাজানো থাকে। এদের রং আকর্ষণীয় হয়। এসব ফুলে গন্ধ থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে, যেমন: কদম, শিমুল, কচু ইত্যাদি।

পুং গ্যামেটোফাইটের উৎপত্তি (Microsporogenesis)

পরাগরেণু পুং-গ্যামেটোফাইটের প্রথম কোষ। পরাগ মাতৃকোষটি (2n) মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে চারটি অপত্য পরাগ কোষ (n) সৃষ্টি করে। পূর্ণতাপ্রাপ্তির পরপর পরাগথলিতে থাকা অবস্থায়ই পরাগরেণুর অঙ্কুরোদগম শুরু হয়। পরাগরেণুর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকাটি মাইটোটিক পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়। এ বিভাজনে একটি বড় কোষ এবং একটি ক্ষুদ্র কোষ সৃষ্টি হয়। বড়কোষটিকে নালিকোষ (Tube cell) এবং ছোট কোষটিকে জেনারেটিভ কোষ (Generative Cell) বলে।

নালিকোষ বড় হয়ে পরাগনালি (Polen tube) এবং জেনারেটিভ কোষটি বিভাজিত হয়ে দুটি পুংজনন কোষ (Male gametes) উৎপন্ন করে। জেনারেটিভ কোষের এ বিভাজন পরাগরেণুতে অথবা পরাগনালিতে সংঘটিত হতে পারে।

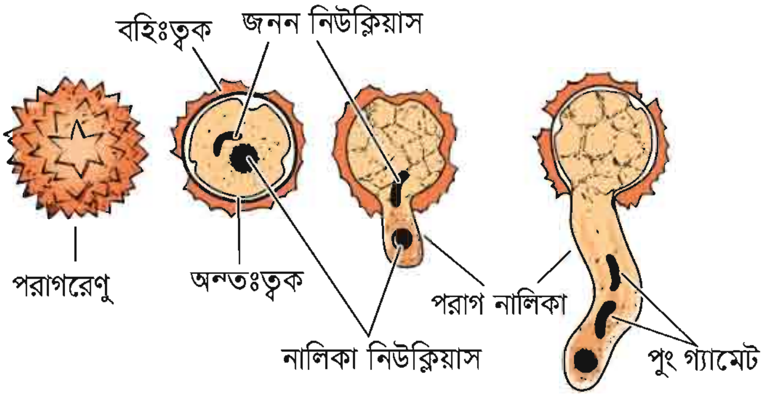

চিত্র 11.07: পুং-গ্যামেটোফাইট উৎপত্তির বিভিন্ন ধাপ

স্ত্রী-গ্যামেটোফাইটের উৎপত্তি (Megasporogenesis)

ভ্রূণপোষক কলায় (Nucellus tissue) ডিম্বকরন্ধ্রের কাছাকাছি একটি কোষ আকারে সামান্য বড় হয়। এর প্রোটোপ্লাজম ঘন এবং নিউক্লিয়াসটি তুলনামূলকভাবে বড়। এ কোষটি বিয়োজন বিভাজনের (Meiosis) মাধ্যমে চারটি হ্যাপ্লয়েড (n) কোষ সৃষ্টি করে। সর্বনিম্ন কোষটি ছাড়া বাকি তিনটি কোষ বিনষ্ট হয়ে যায়। সর্বনিম্ন এই বড় কোষটি বৃদ্ধি পেয়ে ক্রমশ ভ্রূণথলিতে পরিণত হয়। এ কোষটির নিউক্লিয়াস হ্যাপ্লয়েড (n)। এই নিউক্লিয়াসটি বিভক্ত হয়ে দুটি নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এ নিউক্লিয়াস দুটি ভ্রূণথলির দুই মেরুতে অবস্থান নেয়। এবার এ দুটি নিউক্লিয়াসের প্রতিটি পরপর দুবার বিভক্ত হয়ে চারটি করে নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে।

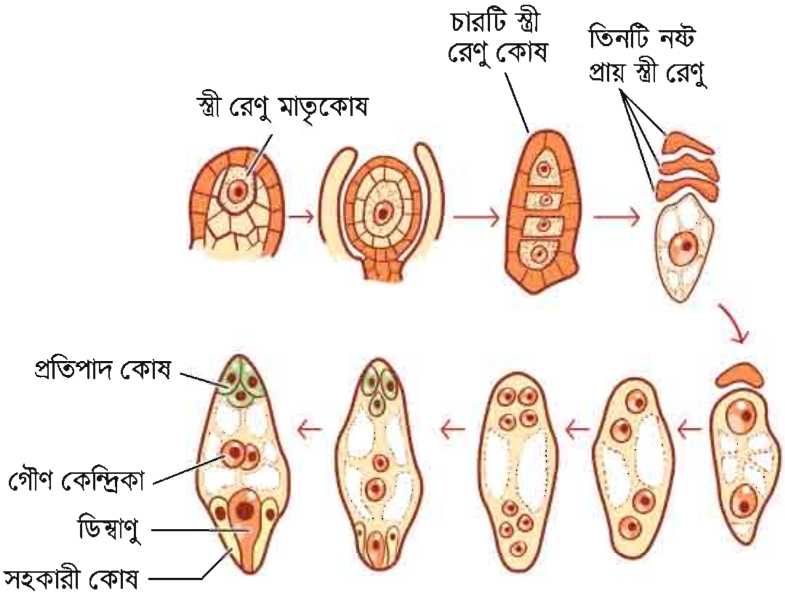

চিত্র 11.08: স্ত্রী-গ্যামেটোফাইট উৎপত্তির বিভিন্ন ধাপ

এর পরবর্তী ধাপে দুই মেরু থেকে একটি করে নিউক্লিয়াস ভ্রূণথলির কেন্দ্রস্থলে এসে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড (2n) গৌণ নিউক্লিয়াস (Secondary nucleus) সৃষ্টি করে। দুই মেরুর নিউক্লিয়াসগুলো সামান্য সাইটোপ্লাজম সহকারে কোষের সৃষ্টি করে। ডিম্বকরন্ধ্রের দিকের কোষ তিনটিকে গর্ভযন্ত্র (Egg apparatus) বলে। এর মাঝের কোষটি বড়। একে ডিম্বাণু (Egg) এবং অন্য কোষকে সহকারী কোষ (Synergids) বলা হয়। গর্ভযন্ত্রের বিপরীত দিকের কোষ তিনটিকে প্রতিপাদ কোষ (Antipodal cells) বলে। এভাবেই ভ্রূণথলির গঠনপ্রক্রিয়া শেষ হয়।

11.2.3 নিষেক (Fertilization)

পরাগায়নের ফলে পরিণত পরাগরেণু গর্ভপত্রের গর্ভমুণ্ডে (Style) পতিত হয়। এরপর পরাগনালিকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে গর্ভদণ্ড ভেদ করে এবং কিছু তরল পদার্থ শোষণ করে স্ফীত হয়ে উঠে। এক সময় এ

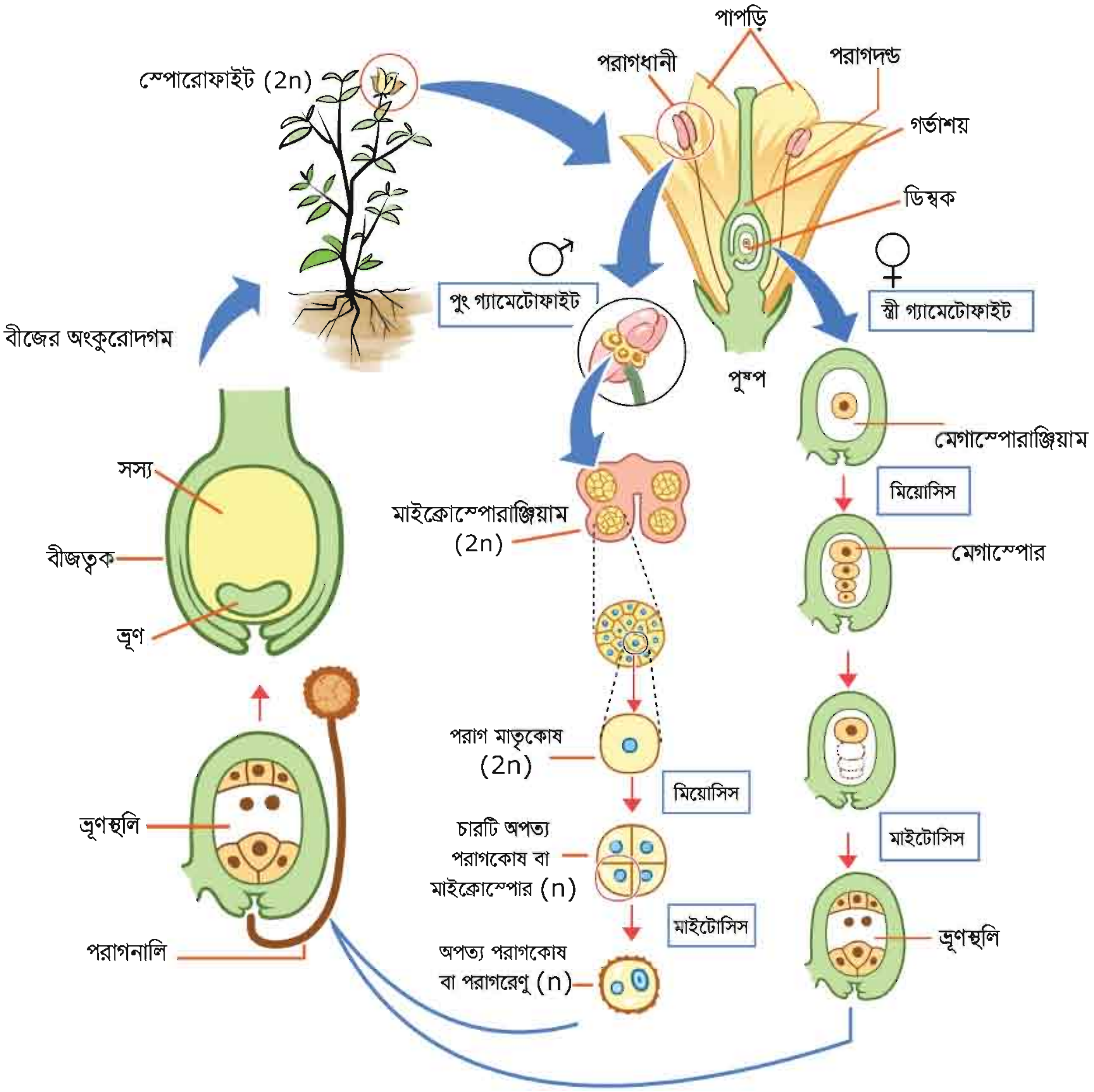
পাপড়ি
পরাগধানী
পরাগদন্ড
স্পোরোফাইট (2n)
গর্ভাশয়
ডিম্বক
♂
♀
পুং গ্যামেটোফাইট
স্ত্রী গ্যামেটোফাইট
বীজের অংকুরোদগম
পুষ্প
মেগাস্পোরাঞ্জিয়াম
সস্য
মিয়োসিস
মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়াম (2n)
মেগাস্পোর
বীজত্বক
ভ্রূণ
পরাগ মাতৃকোষ (2n)
মিয়োসিস
মাইটোসিস
ভ্রূণস্থলি
চারটি অপত্য পরাগকোষ বা মাইক্রোস্পোর (n)
মাইটোসিস
ভ্রূণস্থলি
পরাগনালি
অপত্য পরাগকোষ বা পরাগরেণু (n)

চিত্র 11.09: সপুষ্পক উদ্ভিদের জীবন চক্র

স্ফীত অগ্রভাগটি ফেটে পুংজনন কোষ দুটি ভ্রূণথলিতে মুক্ত হয়। এর একটি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে জাইগোট (Zygote) তৈরি করে। অপর পুংজনন কোষটি গৌণ নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়ে ট্রিপ্লয়েড (3n) সস্য কোষের (Endosperm cells) সৃষ্টি করে।

প্রায় একই সময়ে দুটি পুংজনন কোষের একটি ডিম্বাণু এবং অপরটি গৌণ নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়। এ ঘটনাকে দ্বিনিষেক (Double fertilization) বলা হয়।

নতুন স্পোরোফাইট গঠন (Development of new sporophyte)

জাইগোট কোষটি স্পোরোফাইটের প্রথম কোষ। এর প্রথম বিভাজনে দুটি কোষ সৃষ্টি হয়। একই সাথে সস্যের পরিস্ফুটনও ঘটতে শুরু করে। জাইগোটের বিভাজন অনুপ্রস্থে (Transversely) ঘটে। ডিম্বকরন্ধ্রের দিকের কোষকে ভিত্তি কোষ (Basal cell) এবং ভ্রূণথলির কেন্দ্রের দিকের কোষটিকে এপিক্যাল কোষ (Apical cell) বলা হয়। একই সাথে এ কোষ দুটির বিভাজন চলতে থাকে। ধীরে ধীরে এপিক্যাল কোষটি একটি ভ্রূণে পরিণত হয়। একই সাথে ভিত্তি কোষ থেকে ভ্রূণধারক (Suspensor) গঠন করে। ক্রমশ বীজপত্র, ভ্রূণমূল এবং ভ্রূণকাণ্ডের সৃষ্টি হয়। ক্রমান্বয়ে গৌণ নিউক্লিয়াসটি সস্যটিস্যু উৎপন্ন করে। এই সস্য কোষগুলো ট্রিপ্লয়েড অর্থাৎ এর নিউক্লিয়াসে 3n সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। পরিণত অবস্থায় ডিম্বকটি সস্য ও ভ্রূণসহ বীজে পরিণত হয়। এ বীজ অঙ্কুরিত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ স্পোরোফাইটের সৃষ্টি করে।

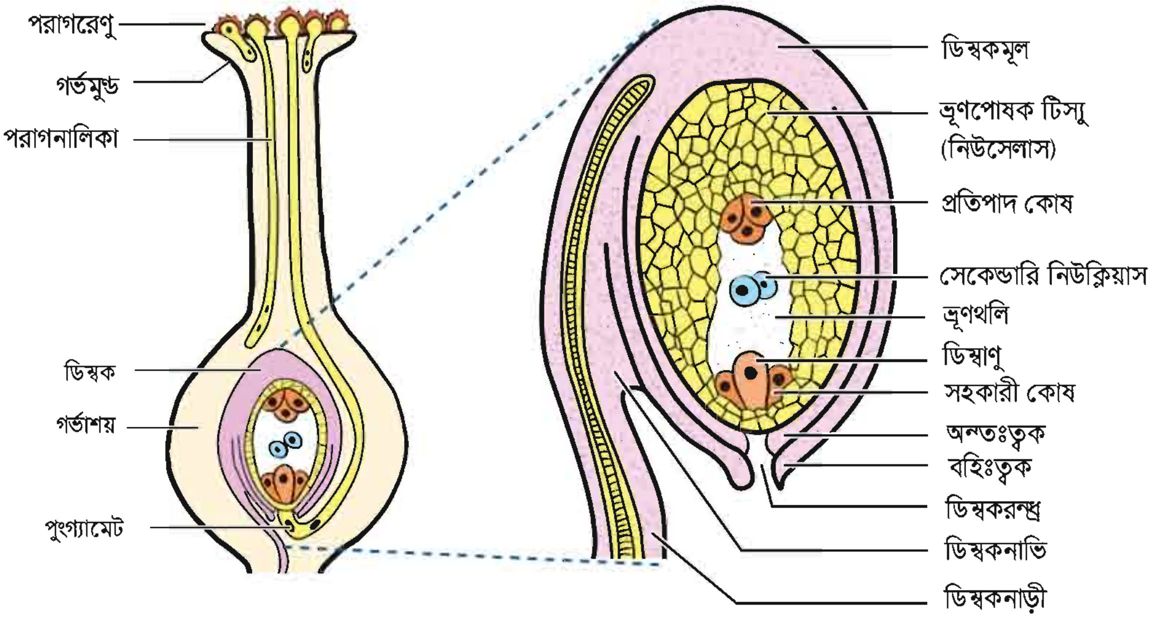
পরাগরেণু
গর্ভমুণ্ড
পরাগনালিকা
ডিম্বক
গর্ভাশয়
পুংগ্যামেট
ডিম্বকমূল
ভ্রূণপোষক টিস্যু
(নিউসেলাস)
প্রতিপাদ কোষ
সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস
ভ্রূণথলি
ডিম্বাণু
সহকারী কোষ
অন্তঃত্বক
বহিঃত্বক
ডিম্বকরন্ধ্র
ডিম্বকনাভি
ডিম্বকনাড়ী

চিত্র 11.10: ডিম্বকের গঠন ও নিষেক প্রক্রিয়া

অতএব দেখা গেল, একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের জীবনচক্রে স্পোরোফাইট এবং গ্যামেটোফাইট নামে দুটি পর্যায় একটির পর একটি চক্রাকারে চলতে থাকে।

ফলের উৎপত্তি

আমরা ফল বলতে সাধারণত আম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, আঙুর, আপেল, পেয়ারা, সফেদা ইত্যাদি সুমিষ্ট ফলগুলোকে বুঝি। লাউ, কুমড়া, ঝিঙা, পটল ইত্যাদি সবজি হিসেবে খাওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলো সবই ফল। নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া শেষ হলেই ফল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া গর্ভাশয়ে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে, তার কারণে ধীরে ধীরে এটি ফলে পরিণত হয় এবং এর ডিম্বকগুলো বীজে

রূপান্তরিত হয়। নিষিক্তকরণের পর গর্ভাশয় এককভাবে অথবা ফুলের অন্যান্য অংশসহ পরিপুষ্ট হয়ে যে অঙ্গ গঠন করে, তাকে ফল বলে।

শুধু গর্ভাশয় ফলে পরিণত হলে তাকে প্রকৃত ফল বলে, যেমন: আম, জাম। গর্ভাশয়সহ ফুলের অন্যান্য অংশ পুষ্ট হয়ে যখন ফলে পরিণত হয়, তখন তাকে অপ্রকৃত ফল বলে, যেমন: আপেল, চালতা ইত্যাদি। সব প্রকৃত এবং অপ্রকৃত ফলকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন: সরল ফল, গুচ্ছ ফল এবং যৌগিক ফল।

11.3 প্রাণীর প্রজনন

প্রাণিজগতে দুই ধরনের প্রজনন দেখা যায়, অযৌন প্রজনন (Asexual reproduction) এবং যৌন প্রজনন (Sexual reproduction)।

অযৌন প্রজনন: নিম্নশ্রেণির প্রাণীতে অযৌন প্রজনন ঘটে। মুকুলোদ্গম (Budding), বিভাজন, খণ্ডায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতিতে অযৌন প্রজনন হয়।

যৌন প্রজনন: যে প্রক্রিয়ায় দুইটি বিপরীত লিঙ্গের প্রাণী পুং ও স্ত্রীজনন কোষ বা গ্যামেট (Gamete) উৎপন্ন করে এবং তাদের নিষেকের মাধ্যমে প্রজনন ঘটায় এবং সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন করে, তাকে যৌন প্রজনন বলে।

11.3.1 নিষেক (Fertilization):

যৌন প্রজননের জন্য নিষেক প্রয়োজন। এটি একটি জৈবিক প্রক্রিয়া। যৌন প্রজননে ডিম্বাণু এবং শুক্রাণুর মিলনকে নিষেক বলে। শুক্রাণু সক্রিয়ভাবে ডিম্বাণুতে প্রবেশ করে এবং এদের নিউক্লিয়াস দুটি পরস্পর একীভূত হয়। একীভূত হয়ে যে কোষটি উৎপন্ন হয়, তাকে জাইগোট বলে। নিষেক ক্রিয়া সংঘটিত করার জন্য কিছু সময় লাগে। ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু উভয়ই হ্যাপ্লয়েড (n) অর্থাৎ এক প্রস্থ ক্রোমোজোম (Chromosome) বহন করে। জাইগোট ডিপ্লয়েড (2n) বা দুই প্রস্থ ক্রোমোজোমবিশিষ্ট। স্ত্রী ও পুং উভয় জননকোষের পূর্ণতা প্রাপ্তি নিষেকের পূর্বশর্ত।

নিষেক প্রক্রিয়া বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। প্রাকৃতিকভাবে একই প্রজাতির পরিণত শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মধ্যে এটি সংঘটিত হয়। নিষেক সাধারণত অপরিবর্তনশীল। একবার নিষিক্ত হলে ঐ ডিম্বাণুকে পুনরায় নিষিক্ত করা যায় না। নিষেক দুই ধরনের: বহিঃ নিষেক (External Fertilization) এবং অন্তঃ নিষেক (Internal Fertilization)।

(a) বহিঃ নিষেক: যে নিষেক ক্রিয়া প্রাণিদেহের বাইরে সংঘটিত হয় তা বহিঃ নিষেক নামে পরিচিত। এ ধরনের নিষেক সাধারণত পানিতে বাস করে এমন সব প্রাণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন:

বিভিন্ন ধরনের মাছ, ব্যাঙ প্রভৃতি। তবে এর ব্যতিক্রম রয়েছে, যেমন: হাঙ্গর।

(b) অন্তঃ নিষেক: স্ত্রীদেহের জননাঙ্গে সংঘটিত নিষেক অন্তঃ নিষেক নামে পরিচিত। সাধারণত শারীরিক মিলনের মাধ্যমে পুরুষ প্রাণী তার শুক্রাণু স্ত্রী জননাঙ্গে প্রবেশ করিয়ে এ ধরনের নিষেক ঘটায়। অন্তঃ নিষেক ডাঙায় বসবাসকারী অধিকাংশ প্রাণীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

নিষেকের কয়েকটি মৌলিক তাৎপর্য:

নিষেক ভ্রূণে ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যাকে পুনঃস্থাপিত করে, ডিম্বাণুকে পরিস্ফুটনের জন্য সক্রিয় করে তোলে, ক্রোমোজোম কর্তৃক বহনকৃত পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্যগুলোকে একত্রিত করে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করে।

নিচে ব্লকচিত্রের সাহায্যে মানুষের প্রজননের ধাপগুলো দেখানো হলো:

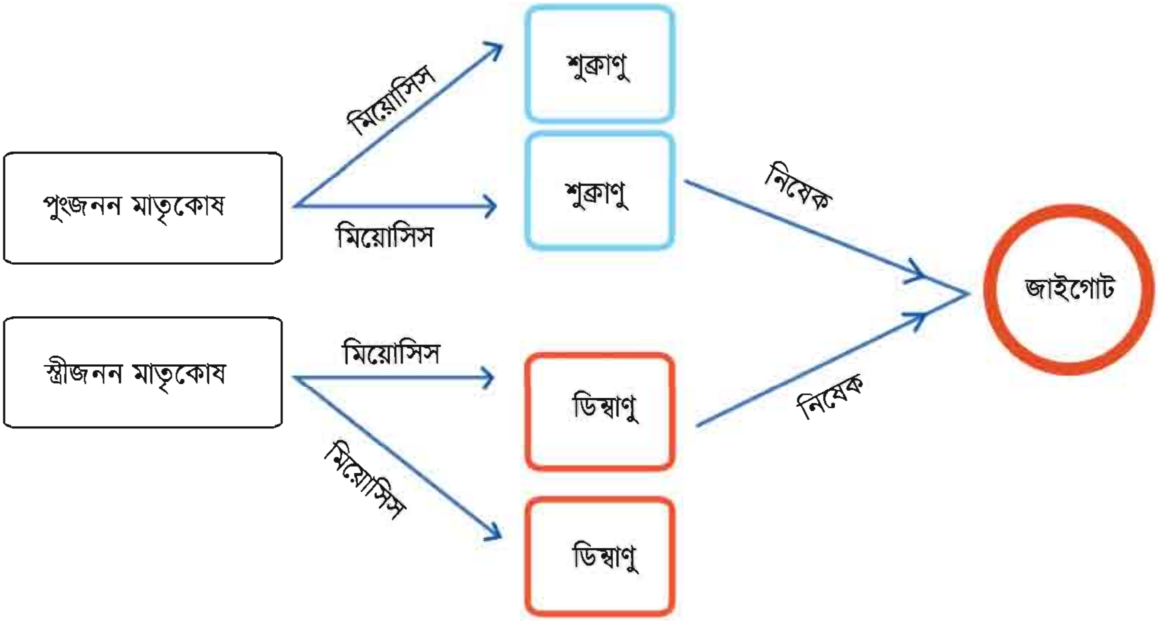

চিত্র 11.11: মানব প্রজননের বিভিন্ন ধাপ (ব্লকচিত্র)

বংশবিস্তার এবং বংশ রক্ষার জন্য প্রজনন প্রক্রিয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এ প্রক্রিয়ায় মাতৃগর্ভে ভ্রূণের সৃষ্টি হয় এবং সন্তান জন্ম নেয়। মানুষ একলিঙ্গবিশিষ্ট প্রাণী অর্থাৎ প্রজননের জন্য স্ত্রী ও পুরুষে পৃথক পৃথক অঙ্গ বর্তমান।

11.3.2 মানব প্রজননে হরমোনের ভূমিকা

ইতোমধ্যে তোমরা জেনেছ যে হরমোন এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ; যা নালিহীন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়। এটি রাসায়নিক দূত হিসেবে সরাসরি রক্তের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে

এবং দেহের বিভিন্ন বিপাকীয় ও শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটাতে সাহায্য করে। হরমোন নির্দিষ্ট অথচ স্বল্পমাত্রায় নিঃসৃত হয়ে নানাবিধ শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে বেশি বা কম নিঃসরণ হলে দেহের বিভিন্ন কাজের ব্যাঘাত ঘটে। দেহে নানা রকম অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়।

আমাদের শরীরে নিম্নলিখিত গ্রন্থিগুলো প্রজনন-সংক্রান্ত হরমোন নিঃসরণ করে:

(i) পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary gland)
(ii) থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland)
(iii) অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি (Adrenal gland)
(iv) শুক্রাশয়ের অনালগ্রন্থি (Testis)
(v) ডিম্বাশয়ের অনালগ্রন্থি (Ovary)
(vi) অমরা (Placenta)।

পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন ধরনের বৃদ্ধি উদ্দীপক হরমোন এবং উৎপাদক হরমোন নিঃসৃত হয়। এ হরমোনগুলো জননগ্রন্থির বৃদ্ধি, ক্ষরণ এবং কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, মাতৃদেহে স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি এবং দুগ্ধ ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া এগুলো জরায়ুর সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন নিঃসৃত হয়। এ হরমোন দৈহিক এবং মানসিক বৃদ্ধি, যৌনলক্ষণ প্রকাশ এবং বিপাকে সহায়তা করে। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত কিছু হরমোন যৌনাঙ্গ বৃদ্ধি ও যৌনলক্ষণ প্রকাশে সহায়তা করে। শুক্রাশয় থেকে নিঃসৃত টেস্টোস্টেরন ও অ্যান্ড্রোজেন শুক্রাণু উৎপাদন, দাড়ি-গোঁফ গজানো, গলার স্বর পরিবর্তন ইত্যাদি যৌনলক্ষণ প্রকাশে সহায়তা করে। ডিম্বাশয় থেকে নিঃসৃত ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন হরমোন মেয়েদের নারীসুলভ লক্ষণগুলো সৃষ্টি, ঋতুচক্র নিয়ন্ত্রণ এবং গর্ভাবস্থায় জরায়ু, ভ্রূণ, অমরা ইত্যাদির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া ডিম্বাণু উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অমরা থেকে নিঃসৃত গোনাডোট্রপিন ও প্রোজেস্টেরন ডিম্বাশয়ের অনাল গ্রন্থিকে উত্তেজিত করে এবং স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।

মানবশিশু জন্মগ্রহণের সময় তাদের প্রজননতন্ত্র অপরিণত অবস্থায় তাকে। শিশু তার বাল্যকাল অতিক্রম করে কৈশোর এবং তারুণ্যে উপনীত হয়। কৈশোর এবং তারুণ্যের সন্ধিকালই হলো বয়ঃসন্ধিকাল। এ সময় ছেলেমেয়েদের দৈহিক, মানসিক এবং যৌন বৈশিষ্ট্যগুলোর বিকাশ ঘটে। তাদের প্রজননতন্ত্রের অঙ্গগুলোর বৃদ্ধি এবং বিকাশ ঘটতে শুরু করে। হরমোন এসব কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাদের দেহের বাইরে এবং ভিতরে পরিবর্তন ঘটে, যেমন: ছেলেদের গোঁফ-দাড়ি গজায়, গলার স্বর পরিবর্তন হয় এবং কাঁধ চওড়া হয়।

বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের দেহে যেসব পরিবর্তন দেখা যায় তা হলো: দেহত্বক কোমল হয়, চেহারায় কমনীয়তা বৃদ্ধি পায় এবং ঋতুস্রাব বা মাসিক হয়। বয়ঃসন্ধিকাল থেকে মেয়েদের নির্দিষ্ট সময় পরপর

রক্তস্রাব হয়। একে মাসিক বা ঋতুস্রাব বলে। বয়ঃসন্ধিকালের 1-2 বছর পর মেয়েরা প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে। সাধারণত 40-50 বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের ঋতুস্রাব চক্র চলতে থাকে। এরপর ঋতুস্রাব চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। একে মেনোপজ (Menopause) বা রজনিবৃত্তিকাল বলে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিষয়টি মনে রাখা দরকার, গর্ভাবস্থায় মেয়েদের রক্তস্রাব সাময়িক বন্ধ থাকে। সন্তান প্রসবের প্রায় দেড় মাস পর আবার স্বাভাবিক রক্তস্রাব শুরু হয়।

বিয়ে একটি সামাজিক, ধর্মীয় এবং পারিবারিক বন্ধন। বিয়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় একটি পরিবার গড়ে ওঠে। তাঁরা দুজনে নির্দ্বিধায় মেলামেশা করতে পারে। তাদের মাঝে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিয়ের ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমা মেনে চলা দরকার। মেয়েদের 20 বছর বয়সের আগে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েরা অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ করে। এর ফলে গর্ভবতী মা এবং সন্তান উভয়েরই ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্কের মাধ্যমে পুরুষের শুক্রাণু স্ত্রী প্রজনন অঙ্গে প্রবেশ করে। শুক্রাণুতে লেজ থাকে। যা তাকে সাঁতরিয়ে স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের ভিতর প্রবেশ করতে সাহায্য করে। পরিণত শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলন ঘটে স্ত্রীর ডিম্বনালিতে। এ মিলনকে নিষেক বলে। তবে জেনে রাখা প্রয়োজন, একটি শুক্রাণু দিয়ে একটিমাত্র ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়। এভাবে মানবদেহের ভিতরে অন্তঃ নিষেক ঘটে। এ বিশেষ পদ্ধতিতে শুক্রাণুর একপ্রস্থ ক্রোমোজোম (n) ও ডিম্বাণুর একপ্রস্থ ক্রোমোজোমের (n) মিলন ঘটে, ফলে দুই প্রস্থ ক্রোমোজোমের (2n) সমন্বয়ে জাইগোট (Zygote) উৎপন্ন হয়।

11.3.3 ভ্রূণের বিকাশ

নিষিক্ত ডিম্বাণু ধীরে ধীরে ডিম্বনালি বেয়ে জরায়ুর দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় নিষিক্ত ডিম্বাণুর কোষ বিভাজন বা ক্লিভেজ (cleavage) চলতে থাকে। কোষ বিভাজনের শেষ পর্যায়ের গঠনমুখ ভ্রূণ ডিম্বনালি থেকে জরায়ুতে পৌঁছায় । এ পর্যায়ে ভ্রূণকে ব্লাস্টোসিস্ট (Blastocyst) বলে। জরায়ুতে এর পরে যে ঘটনাবলির অবতারণা হয়, তা ভ্রূণ গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ব্লাস্টোসিস্টের পরবর্তী পর্যায়গুলো সম্পন্ন হওয়ার জন্য ভ্রূণকে জরায়ুর প্রাচীরে সংলগ্ন হতে হয়। জরায়ুর প্রাচীরে ভ্রূণের এ সংযুক্তিকে ভ্রূণ সংস্থাপন (Implantation) বা গর্ভধারণ বলে। জরায়ুর অন্তঃগাত্রে সংলগ্ন অবস্থায় ভ্রূণটি বাড়তে থাকে এবং ধীরে ধীরে মানবশিশুতে পরিণত হয়। জরায়ুর অন্তঃগাত্রে ভ্রূণের সংস্থাপন হওয়ার পর থেকে শিশু ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত সময়কে গর্ভাবস্থা বলে। এ সময় মাসিক বা রজচক্র বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণত 38-40 সপ্তাহ পর্যন্ত গর্ভাবস্থা বিদ্যমান থাকে।

অমরা (Placenta)

যে বিশেষ অঙ্গের মাধ্যমে মাতৃ জরায়ুতে ক্রমবর্ধমান ভ্রূণ এবং মাতৃ জরায়ু-টিস্যুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাকে অমরা বা গর্ভফুল বলে। ভ্রূণ জরায়ুতে পৌঁছানোর 4-5 দিনের মধ্যে সংস্থাপন সম্পন্ন হয়।

ক্রমবর্ধমানশীল ভ্রূণের কিছু কোষ এবং মাতৃ জরায়ুর অন্তঃস্তরের কিছু কোষ মিলিত হয়ে ডিম্বাকার ও রক্তনালিসমৃদ্ধ এই অমরা তৈরি করে। নিষেকের 12 সপ্তাহের মধ্যে অমরা গঠিত হয়। এভাবে ভ্রূণ এবং মাতৃ জরায়ুর অন্তঃস্তরের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য অস্থায়ী অঙ্গ তৈরি হয়। প্রসবের সময় অমরা দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

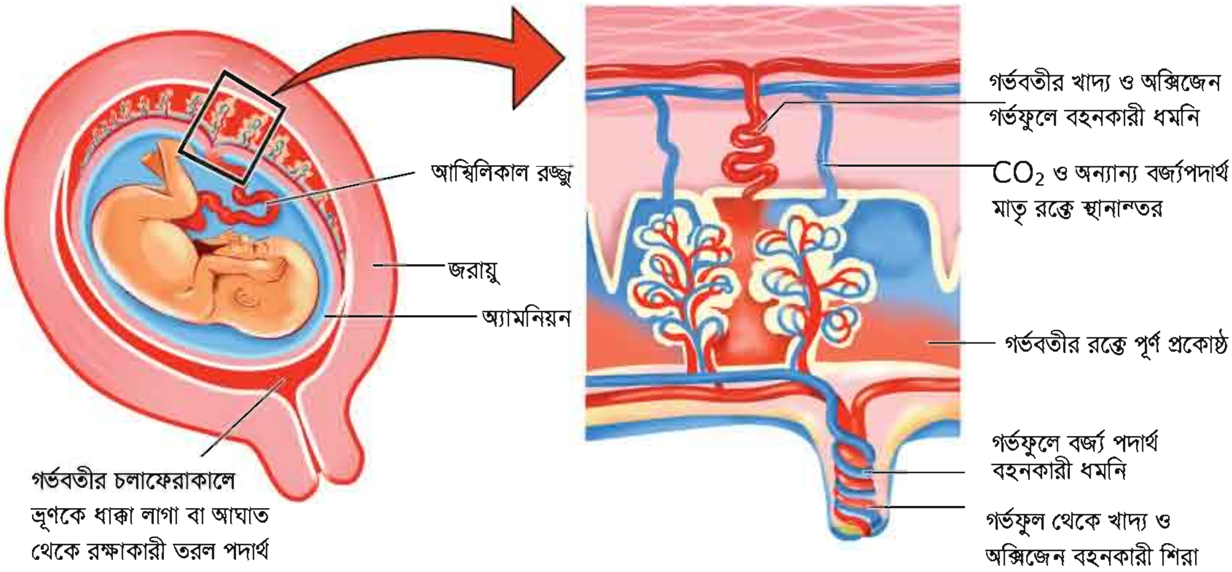
আম্বিলিকাল রজ্জু
জরায়ু
অ্যামনিয়ন
গর্ভবতীর চলাফেরাকালে ভ্রূণকে ধাক্কা লাগা বা আঘাত থেকে রক্ষাকারী তরল পদার্থ
গর্ভবতীর খাদ্য ও অক্সিজেন গর্ভফুলে বহনকারী ধমনি
CO₂ ও অন্যান্য বর্জ্যপদার্থ মাতৃ রক্তে স্থানান্তর
গর্ভবতীর রক্তে পূর্ণ প্রকোষ্ঠ
গর্ভফুলে বর্জ্য পদার্থ বহনকারী ধমনি
গর্ভফুল থেকে খাদ্য ও অক্সিজেন বহনকারী শিরা

চিত্র 11.12: মাতৃগর্ভে অমরা ও ভ্রূণ

অমরার সাহায্যে ভ্রূণ জরায়ুর গায়ে সংস্থাপিত হয়। ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের দরকার। শর্করা, আমিষ, স্নেহ, পানি এবং খনিজ লবণ ইত্যাদি অমরার মাধ্যমে মায়ের রক্ত থেকে ভ্রূণের রক্তে প্রবেশ করে। অমরা অনেকটা ফুসফুসের মতো কাজ করে। অমরার মাধ্যমে ভ্রূণ মায়ের রক্ত থেকে অক্সিজেন গ্রহণ এবং ভ্রূণ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডের বিনিময় ঘটে। অমরা একই সাথে বৃক্কের মতো কাজ করে। বিপাকের ফলে যে বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয় তা অমরার মাধ্যমে ভ্রূণের দেহ থেকে অপসারিত হয়। অমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ হরমোন তৈরি করে। এ হরমোন ভ্রূণের রক্ষণাবেক্ষণ ও তার স্বাভাবিক গঠনে সাহায্য করে।

অমরাতে প্রচুর রক্তনালি থাকে। অমরা, আম্বিলিকাল কর্ড দ্বারা ভ্রূণের নাভির সাথে যুক্ত থাকে। একে নাড়িও বলা হয়। এটা মূলত একটি নালি, যার ভিতর দিয়ে মাতৃদেহের সাথে ভ্রূণের বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় ঘটে। গর্ভাবস্থায় অমরা থেকে এমন কতগুলো হরমোন নিঃসৃত হয়, যা মাতৃদুগ্ধ উৎপাদন এবং প্রসব সহজ করতে সহায়তা করে।

ভ্রূণ আবরণী (Foetal membranes)

প্রত্যেক প্রজাতিতে ভ্রূণের জন্য মাতৃদেহের ভিতর সহজ, স্বাভাবিক এবং নিরাপদ পরিবর্ধনের ব্যবস্থা হিসেবে ভ্রূণের চারদিকে কতগুলো ঝিল্লি বা আবরণ থাকে। এগুলো ভ্রূণের পুষ্টি, গ্যাসীয় আদান-প্রদান,

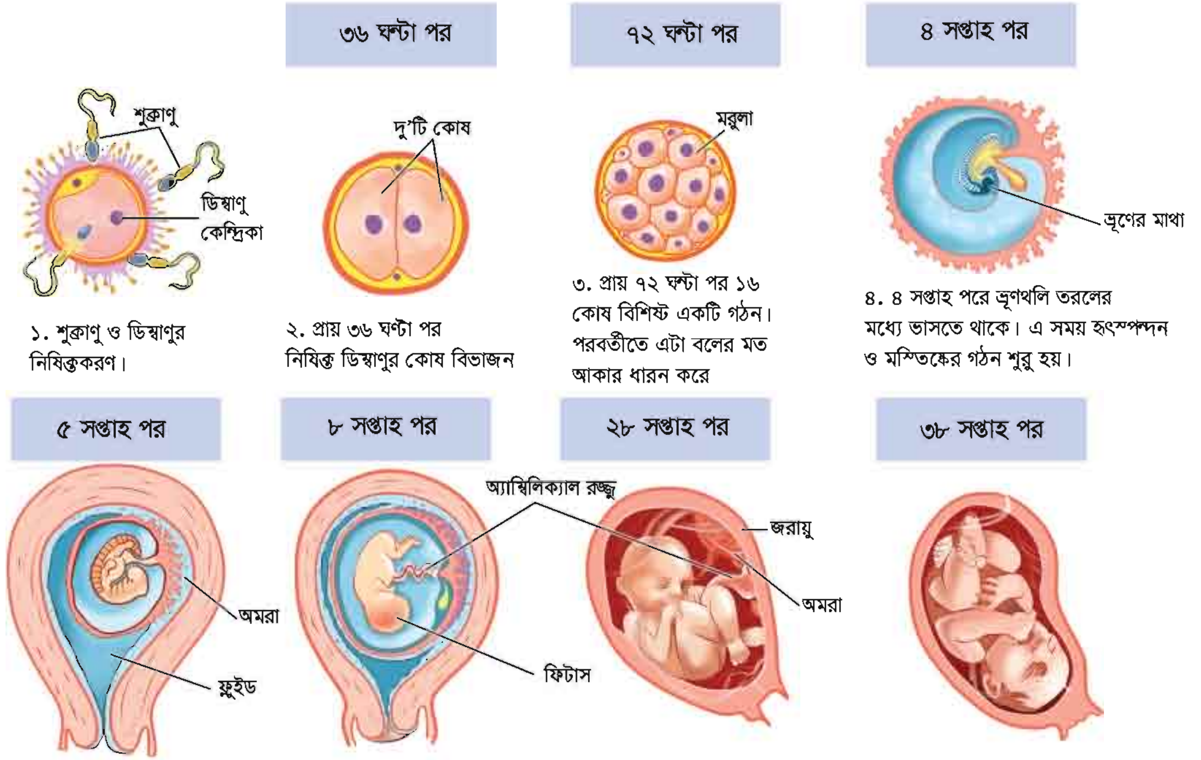
৩৬ ঘন্টা পর
৭২ ঘন্টা পর
৪ সপ্তাহ পর
শুক্রাণু
ডিম্বাণু
কেন্দ্রিকা
দু'টি কোষ
মরুলা
ভ্রূণের মাথা
৫ সপ্তাহ পর
৮ সপ্তাহ পর
২৮ সপ্তাহ পর
৩৮ সপ্তাহ পর
অ্যাম্বিলিক্যাল রজ্জু
জরায়ু
অমরা
ফ্লুইড
অমরা
ফিটাস

১. শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর নিষিক্তকরণ।

২. প্রায় ৩৬ ঘণ্টা পর নিষিক্ত ডিম্বাণুর কোষ বিভাজন

৩. প্রায় ৭২ ঘন্টা পর ১৬ কোষ বিশিষ্ট একটি গঠন। পরবর্তীতে এটা বলের মত আকার ধারন করে

৪. ৪ সপ্তাহ পরে ভ্রূণথলি তরলের মধ্যে ভাসতে থাকে। এ সময় হৃৎস্পন্দন ও মস্তিষ্কের গঠন শুরু হয়।

৫. প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পরে ভ্রূণের বৃদ্ধি চলতে থাকে এবং হাত ও পায়ের গঠনের মুকুলের মত অজ্ঞানু সৃষ্টি হয়।

৬. প্রায় ৮ সপ্তাহ পরে ভ্রূণকে 'ফিটাস' বলা হয়। কিন্তু অঙ্গগুলো ছোট আকারে থাকে।

৭. ২৮ সপ্তাহ পরে ফিটাস পূর্নাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়। ভ্রূণের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

৮. ৩৮ সপ্তাহ পরে জরায়ুর ভিতর ফিটাসের মাথা নিচের দিকে ঘুরে যায় এবং ভূমিষ্ঠ প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি চলতে থাকে।

চিত্র 11.13: ভ্রূণের বৃদ্ধি ও বিকাশ

বর্জ্য নিষ্কাশন ইত্যাদি কাজে সহায়তা করে। ভ্রূণ আবরণীগুলো ক্রমবর্ধনশীল ভ্রূণকে রক্ষা করে এবং অতিগুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ন্ত্রণে অংশ নেয়।

ভ্রূণ মাতৃগর্ভে গড়ে প্রায় 40 সপ্তাহ অবস্থান করে। ঐ একই সময়ে গর্ভবতী মায়ের অগ্র পিটুইটারি ও অমরা থেকে হরমোন নিঃসরণ শুরু হয়। প্রসবের পূর্বে জরায়ু নির্দিষ্ট ব্যবধানে সংকুচিত হতে থাকে এবং ব্যথা-বেদনার সৃষ্টি হয়। এই ক্রমবর্ধমান বেদনাকে প্রসববেদনা (Labour pain) বলে। প্রসবের শেষ পর্যায়ে ভ্রূণের বাইরের পর্দাগুলো ফেটে যায়। এর ভিতরের তরল বাইরে নির্গত হয়। এক পর্যায়ে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়।

11.4 প্রজনন-সংক্রান্ত রোগ

11.4.1 এইডস (Acquired Immune Deficiency Syndrome বা AIDS)

বর্তমান বিশ্বে এইডস একটি মারাত্মক ঘাতক ব্যাধি হিসেবে পরিচিত। 1981 সালে রোগটি আবিষ্কৃত হয়। Acquired Immune Deficiency Syndrome-এর শব্দগুলোর আদ্যক্ষর দিয়ে এ রোগটির নামকরণ

করা হয়েছে AIDS। UNAIDS-এর এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে সারা বিশ্বে বর্তমানে প্রায় 2 কোটি 30 লাখের বেশি লোক AIDS-এর জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত। এর মধ্যে প্রায় 40 শতাংশ হলো নারী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, প্রায় 164টি দেশে এই রোগের বিস্তার ঘটেছে। Human Immune Deficiency Virus সংক্ষেপে HIV ভাইরাসের আক্রমণে এইডস হয়। এই ভাইরাস শ্বেত রক্ত কোষের ক্ষতিসাধন করে এবং এ কোষের এন্টিবডি তৈরিসহ রোগ প্রতিরোধ-সংক্রান্ত কাজে বিঘ্ন ঘটায়। ফলে শ্বেত রক্ত কোষের সংখ্যা (বিশেষ করে CD4 জাতীয় শ্বেত রক্তকোষ) ও এন্টিবডির পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে। এই ভাইরাস মানবদেহে সুপ্ত অবস্থায় অনেক দিন থাকতে পারে। এই ভাইরাসের আক্রমণে রোগীর দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যায় বলে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়ে। কারণ এইডস রোগীর রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করার মতো কোনো ঔষধ এখনও আবিষ্কার হয়নি।

এইডস রোগের কারণ

নিম্নলিখিত কারণে একজন সুস্থ ব্যক্তি এই ঘাতক রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন। যেমন:

(i) এইডস আক্রান্ত পুরুষ বা মহিলার সাথে অনিরাপদ যৌনমিলনের মাধ্যমে এ রোগ হয়।

(ii) দুর্ঘটনাজনিত রক্তক্ষরণ, প্রসবজনিত রক্তক্ষরণ, বড় অস্ত্রোপচার, রক্তশূন্যতা, থ্যালাসেমিয়া, ক্যান্সার ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেহে রক্ত পরিসঞ্চালন প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় এইডস রোগে আক্রান্ত রোগীর রক্ত সুস্থ ব্যক্তির দেহে সঞ্চালন করলে এইডস রোগ হয়।

(iii) এইডসে আক্রান্ত বাবা থেকে সরাসরি সন্তানে রোগটি ছড়ায় না। বাবার সাথে যৌনমিলনের মাধ্যমে মায়ের এইডস হতে পারে এবং আক্রান্ত মায়ের গর্ভের সন্তান তখন এইডস রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগে আক্রান্ত মায়ের দুধ শিশু পান করলে সে শিশুও এইডসে আক্রান্ত হতে পারে।

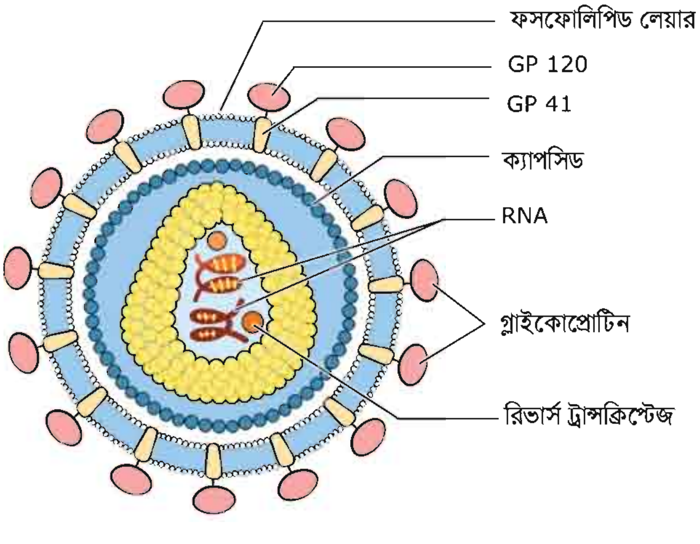

চিত্র 11.14: HIV ভাইরাসের গঠন

(iv) HIV জীবাণুযুক্ত ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, সুচ, দন্ত চিকিৎসার যন্ত্রপাতি এবং অপারেশনের যন্ত্রপাতির ব্যবহারের মাধ্যমেও সুস্থ ব্যক্তি এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এমনকি সেলুনে একই ব্লেড একাধিক ব্যক্তি ব্যবহার করলে তার মাধ্যমেও রোগটি ছড়াতে পারে।

(v) এইডসে আক্রান্ত ব্যক্তির কোনো অঙ্গ অন্য ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করলে এ রোগ সংক্রমিত হয়।

এইডস রোগের লক্ষণ

রোগ জীবাণু সুস্থ দেহে প্রবেশ করার প্রায় 6 মাস পরে এই রোগের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। তখন এর প্রকাশ অত্যন্ত মৃদু থাকে এবং কিছুদিনের মধ্যেই মিলিয়ে যায়। তারপর কয়েক মাস থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত রোগী আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ থাকে কিন্তু তার দেহের মধ্যে এইডসের ভাইরাস সংখ্যাবৃদ্ধি করতে থাকে। ভাইরাস যথেষ্ট সংখ্যায় বৃদ্ধি পেলে হঠাৎ করেই অসুখ মারাত্মকভাবে ফিরে আসে। তখন আর বেশি কিছু করার থাকে না। এর আগে সেই ব্যক্তি যে এইডস রোগের বাহক তা বোঝা মুশকিল। এইডসের লক্ষণগুলো হলো:

- দ্রুত রোগীর ওজন কমতে থাকে।
- এক মাসেরও বেশি সময়ব্যাপী একটানা জ্বর থাকে অথবা জ্বর জ্বর ভাব দেখা দেয়।
- এক মাস বা তারও বেশি সময় ধরে পাতলা পায়খানা হয়।
- অনেক দিন ধরে শুকনো কাশি হতে থাকে।
- ঘাড় এবং বগলে ব্যথা অনুভব হয়, মুখমণ্ডল খসখসে হয়ে যায়।
- মুখমণ্ডল, চোখের পাতা, নাক ইত্যাদি অঙ্গ হঠাৎ ফুলে যায় এবং সহজে এই ফোলা কমে না।
- সারা দেহে চুলকানি হয়।

এইডস রোগ প্রতিরোধের উপায়

তোমরা ইতিমধ্যে এই রোগ সম্পর্কে জেনেছ। এসো এগুলো মনে আছে কি না তা পরীক্ষা করে নেওয়া যাক।

- এইডস প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কী?
- এই রোগ বিস্তারের কারণগুলো থেকে বিরত থেকে রোগটি প্রতিরোধ করা কি সম্ভব? তোমরা প্রতিরোধের উপায়গুলো বোর্ডে লেখ ও একটি সংক্ষিপ্তসার তৈরি কর।

একক কাজ

কাজ : তোমরা 5 জন করে এক একটি দলে ভাগ হয়ে এইডস প্রতিরোধের বিষয়ে পোস্টার/ লিফলেট অঙ্কন কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

1. মানুষকে এক লিঙ্গাবিশিষ্ট প্রাণী বলা হয় কেন?
2. জরায়ু কী? এর প্রয়োজনীয়তা কী?
3. অমরা কী? অমরার কাজ কী?
4. এইডস রোধে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত?
5. প্রজনন-সংক্রান্ত হরমোনগুলোর কাজ ব্যাখ্যা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

1. ফুলকে উদ্ভিদের প্রজনন অঙ্গ বলা হয় কেন? বর্ণনা কর।
2. এইডস রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. কোন ফুলে দ্বিগুচ্ছ পরাগদন্ড থাকে?

ক. জবা খ. মটর
গ. শিমুল ঘ. সূর্যমুখী

2. বায়ুপরাগী ফুল—

i. আকারে বড় হয়
ii. গর্ভমুণ্ডযুক্ত হয়
iii. মধুগ্রন্থি অনুপস্থিত থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং 3 ও 4 নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

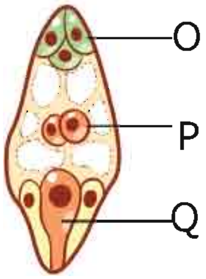

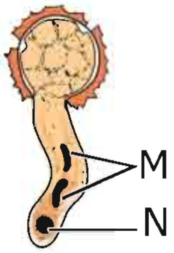

3. চিত্রের কোন অংশটি পরিবর্তিত হয়ে বীজ হয়?

ক. N খ. O
গ. P ঘ. Q

4. সস্যকলা সৃষ্টিতে চিত্রের কোন অংশটি ভূমিকা রাখে?

ক. M ও Q খ. M ও P
গ. M ও N ঘ. N ও P

সৃজনশীল প্রশ্ন

1.

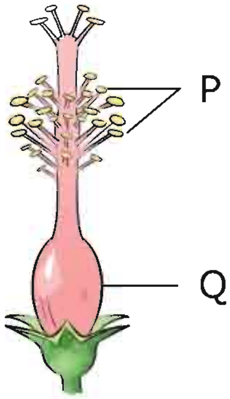

ক. পরাগথলি কী?
খ. অনিয়ত পুষ্পমঞ্জরি বলতে কী বোঝায়?
গ. P অংশটি এই ফুলে অনুপস্থিত থাকলে পরাগায়নের ক্ষেত্রে কী ঘটবে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. Q চিহ্নিত অংশটি কীভাবে প্রজাতিকে রক্ষা করে যুক্তিসহ তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

2. 12 বছরের হৃদয় ছোটবেলা থেকে সুরেলা কণ্ঠে গান গায়। ইদানীং কিছু দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের পাশাপাশি তার গলার স্বর মোটা হয়ে গেছে। তাই তার মা চিকিৎসকের কাছে গেলে তিনি বললেন, এ সময়ে শিশুদের মধ্যে এরূপ পরিবর্তন ঘটাই স্বাভাবিক।

ক. অমরা কী?
খ. AIDS-কে ঘাতক রোগ বলা হয় কেন?
গ. হৃদয়ের ঐ সময়ের ঘটনাগুলো ঘটার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. হৃদয়ের ঐ সময়ে পরিবারের বড়দের তার প্রতি করণীয় ভূমিকাগুলো ব্যাখ্যা কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

জীবের বংশগতি ও বিবর্তন

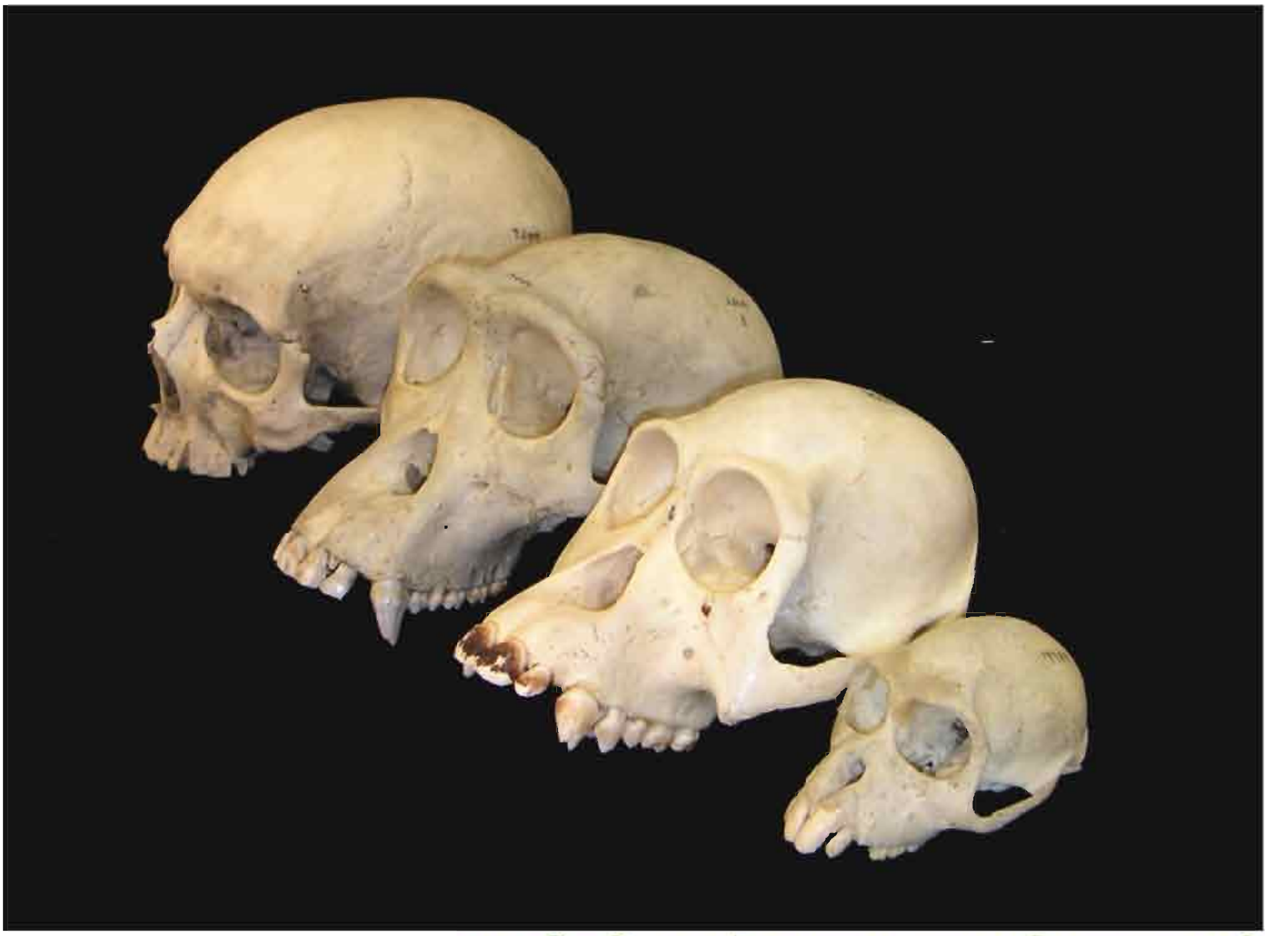

মানুষ, শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং ও ম্যাকাক বানরের খুলির তুলনামূলক ছবি

মাতা-পিতার আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যাবলি বংশানুক্রমে সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হয়। মাতাপিতা থেকে বৈশিষ্ট্য সন্তানে কীসের মাধ্যমে কীভাবে স্থানান্তরিত হয়, তা আমরা এ অধ্যায়ে জানতে পারব। এ অধ্যায়ে আরও জানতে পারব যে জীবজগতের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণি বর্তমান এবং তারা তাদের পূর্বপুরুষ (Ancestor) থেকে উদ্ভূত হয়ে বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের মাধ্যমে ক্রমাগত পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- বংশগতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বংশপরম্পরায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহনকারী উপাদানসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় স্থানান্তর ব্যাখ্যা করতে পারব।
- DNA প্রতিরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বংশগতির তথ্য স্থানান্তরে ডিএনএ (DNA)-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- DNA টেস্টের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- লিঙ্গ নির্ধারণে পুরুষের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জেনেটিক ডিসঅর্ডারের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারব।
- বিবর্তনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিবর্তনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ বর্ণনা করতে পারব।
- প্রজাতির টিকে থাকায় বিবর্তনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- মা-বাবার সাথে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্ণয় করতে পারব।
- আমাদের জীবনে ডিএনএ (DNA) টেস্টের অবদান উপলব্ধি করতে পারব।

12.1 জীবের বংশগতি

পৃথিবীর সব জীব তার নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তী প্রজন্মে প্রায় অবিকল স্থানান্তর ও পরিস্ফুটিত হয়। পৃথিবীর সব জীবের ক্ষেত্রেই এই প্রাকৃতিক নিয়ম প্রযোজ্য। তাই আমরা ধানগাছের বীজ থেকে ধানগাছ, আমের বীজ থেকে আমগাছ, পাটের বীজ থেকে পাটগাছ জন্মাতে দেখি। এভাবেই বংশানুক্রমে প্রজাতির বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। পিতামাতার বৈশিষ্ট্যগুলো বংশানুক্রমে সন্তান সন্ততির দেহে সঞ্চারিত হওয়ার প্রক্রিয়াই হলো "বংশগতি" (Heredity)। বংশগতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা ও গবেষণা করা হয় বংশগতিবিদ্যা (Genetics) নামের জীববিজ্ঞানের বিশেষ শাখায়।

একক কাজ

কাজ : মা-বাবার সাথে তোমার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত কর এবং ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।

12.1.1 বংশপরম্পরায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহনকারী উপাদান (বংশগতিবস্তু)

মাতাপিতার বৈশিষ্ট্যাবলি তাদের সন্তান সন্ততিতে সঞ্চারিত হয় বংশগতিবস্তুর (Hereditary material) মাধ্যমে। এগুলো হলো ক্রোমোজোম, জিন, ডিএনএ (DNA) এবং আরএনএ (RNA)। নিচে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

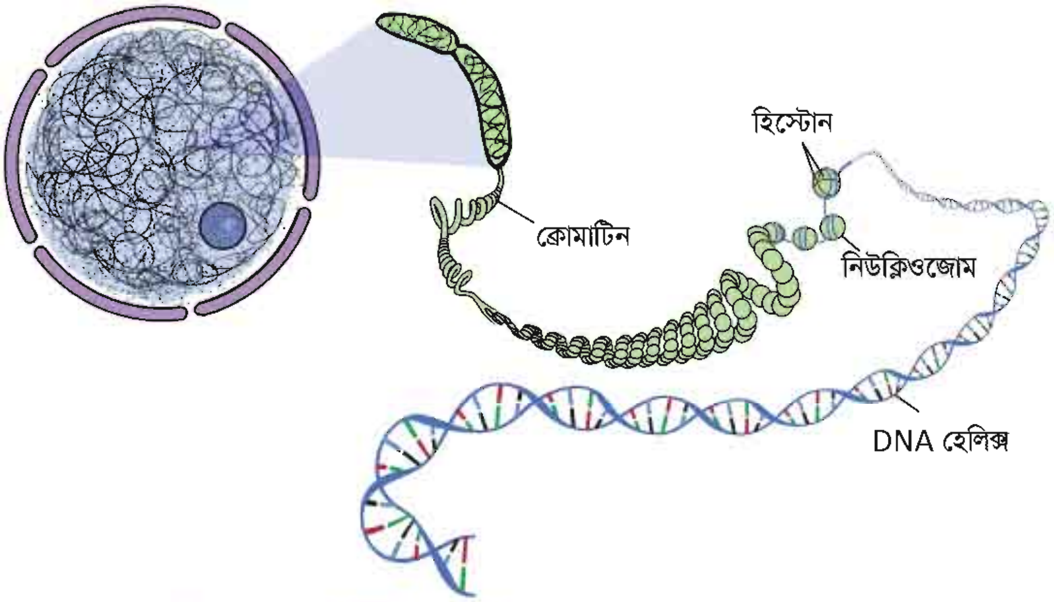

চিত্র 12.01: নিউক্লিয়াসের ভিতরে ক্রোমোজোমের অবস্থান

a) ক্রোমোজোম (Chromosome)

বংশগতির প্রধান উপাদান হচ্ছে ক্রোমোজোম। তোমরা জান, এটি নিউক্লিয়াসের নিউক্লিওপ্লাজমে বিস্তৃত এবং সূত্রাকার ক্রোমাটিন দিয়ে গঠিত। বিজ্ঞানী Strasburger (1875) প্রথম ক্রোমোজোম আবিষ্কার করেন। প্রজাতির বৈশিষ্ট্যভেদে কোষে এর ডিপ্লয়েড (দুই সেট ক্রোমোজোম, যার একসেট পিতা থেকে আসে এবং আর একসেট মাতা থেকে আসে) সংখ্যা 2 হতে 1600 পর্যন্ত হতে পারে। একটি ক্রোমোজোম দৈর্ঘ্যে সাধারণত 3.5 থেকে 30.0 মাইক্রন এবং প্রস্থে 0.2 থেকে 2.0 মাইক্রন হয়ে থাকে। (1 মাইক্রন = 1/1000 মিমি)। ক্রোমোজোমের কাজ হলো মাতাপিতা থেকে জিন (যা জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে) সন্তান সন্ততিতে বহন করে নিয়ে যাওয়া। মানুষের চোখের রং, চুলের প্রকৃতি, চামড়ার গঠন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ক্রোমোজোম কর্তৃক বাহিত হয়ে বংশগতির ধারা অক্ষুণ্ন রাখে। এ কারণে ক্রোমোজোমকে বংশগতির ভৌতভিত্তি (Physical basis of heredity) বলে আখ্যায়িত করা হয়।

b) ডিএনএ (DNA)

ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান ডিএনএ হলো ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড (Deoxyribo Nucleic Acid)। এটি সাধারণত দুই সূত্রবিশিষ্ট পলিনিউক্লিওটাইডের সর্পিলাকার গঠন। একটি সূত্র অন্যটির

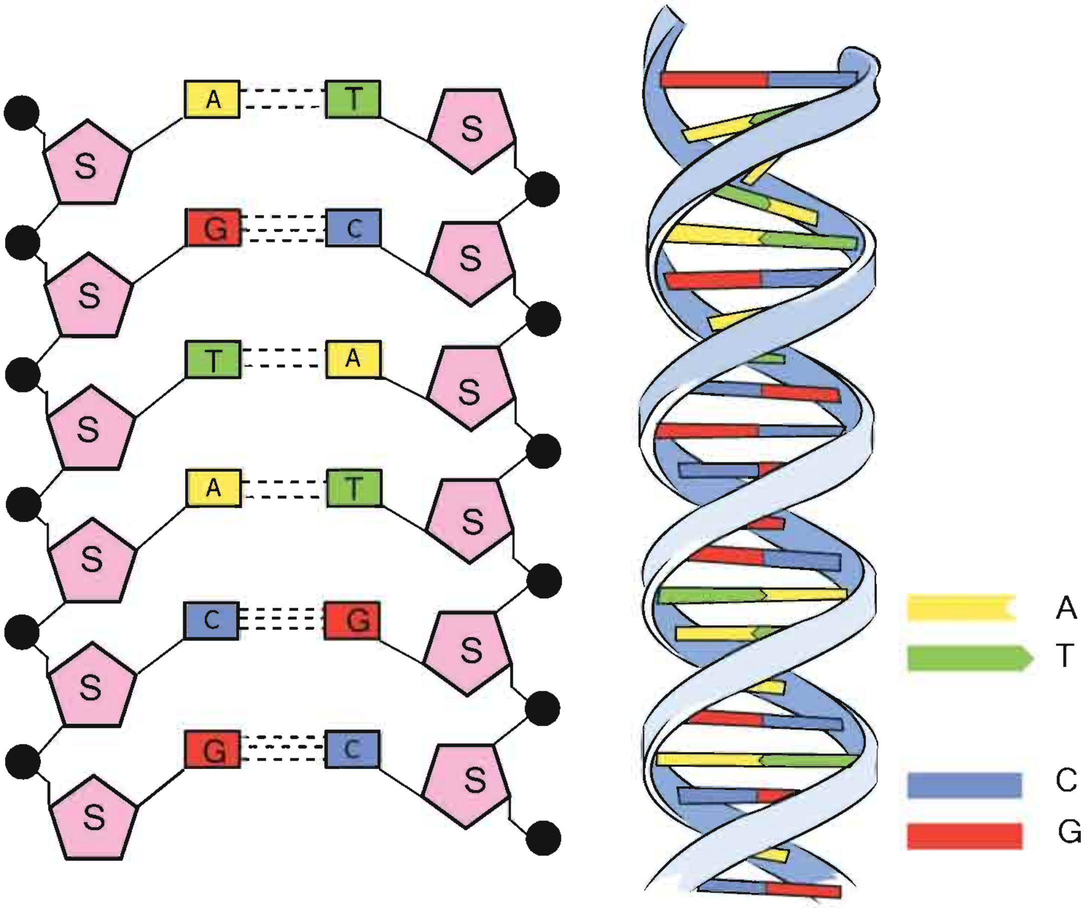

চিত্র 12.02: ডিএনএ

পরিপূরক। এতে পাঁচ কার্বনযুক্ত শর্করা, নাইট্রোজেনঘটিত বেস বা ক্ষার (এডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও থাইমিন) এবং অজৈব ফসফেট থাকে। এই তিনটি উপাদানকে একত্রে 'নিউক্লিওটাইড' বলে। DNA ক্রোমোজোমের স্থায়ী পদার্থ। মার্কিন বিজ্ঞানী Watson এবং ইংরেজ বিজ্ঞানী Crick 1953 সালে প্রথম DNA অণুর ডাবল হেলিক্স (Double helix) বা দ্বি-সূত্রী কাঠামোর বর্ণনা দেন এবং এ কাজের জন্য তাঁরা নোবেল পুরস্কার পান। নাইট্রোজেন বেসগুলো দুধরনের, পিউরিন এবং পাইরিমিডিন। এডিনিন (A) এবং গুয়ানিন (G) বেস হলো পিউরিন এবং সাইটোসিন (C) এবং থায়ামিন (T) বেস হলো পাইরিমিডিন। একটি সূত্রের এডিনিন (A) অন্য সূত্রের থায়ামিন (T)-এর সাথে দুইটি হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে যুক্ত ($A=T$) থাকে এবং একটি সূত্রের গুয়ানিন (G), অন্য সূত্রের সাইটোসিনের (C) সাথে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে যুক্ত ($G\equiv C$) থাকে। অর্থাৎ এই বন্ধন সর্বদা একটি পিউরিন এবং পাইরিমিডিনের মধ্যে হয়ে থাকে। সুতরাং দুটি সূত্রের একটি অন্যটির পরিপূরক কিন্তু এক রকম নয়। হেলিক্সের প্রতিটি পূর্ণ ঘূর্ণন 34 Å (Angstrom) দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এবং একটি পূর্ণ ঘূর্ণনের মধ্যে 10টি নিউক্লিওটাইড থাকে। সুতরাং পার্শ্ববর্তী দুটি নিউক্লিওটাইডের দূরত্ব (উপর থেকে নিচে) 3.4 Å (1 Å = 10^{-10} মিটার)।

DNA-এর দুটি পলিনিউক্লিওটাইড সূত্র বিপরীতভাবে (Antiparallel) অবস্থান করে। অনেকটা প্যাঁচানো সিঁড়ির ধাপের মতো, ক্ষারগুলো শায়িতভাবে (Flat) প্রধান অক্ষের সাথে লম্বভাবে অবস্থান করে। অর্থাৎ DNA অণুর বাইরের দিকের দণ্ড দুটি (প্রধান অক্ষ) পর পর সুগার এবং ফসফেট দিয়ে গঠিত এবং এদের ভিতরের দিকে N_2 বেস অবস্থান করে। প্রকৃত কোষেও DNA সূক্ষ্ম সুতার মতো কিন্তু আদি কোষের DNA সাধারণত গোলাকার হয়ে থাকে এবং এর দৈর্ঘ্য কয়েক মাইক্রন থেকে কয়েক সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এটি হাজার হাজার নিউক্লিওটাইডের বা নিউক্লিক এসিডের সমন্বয়ে গঠিত। DNA ডবল হেলিক্সের ব্যাস সর্বত্র 20Å। DNA ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান এবং বংশগতির রাসায়নিক ভিত্তি (Chemical basis of heredity)। DNA-ই জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত ধারক এবং বাহক, যা জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সরাসরি বহন করে মাতাপিতা থেকে তাদের বংশধরে নিয়ে যায়।

দলগত কাজ

কাজ: DNA-এর মডেল নির্মাণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ: 1m সাধারণ লোহার তার, 2টি পুরোনো বল পয়েন্ট কলম, 40টি 1.5 cm ব্যাসের পুঁতি, 7/8টি প্লাস্টিকের (তরল পান করার) ড্রিংকিং স্ট্র, লাল, নীল, হলুদ এবং সবুজ রঙের কাগজ, আঠা, কাঁচি এবং একটি খালি জুতার বাক্স।

কাজের ধারা:

1. এই মডেলের জন্য 40টি 1.5 cm ব্যাসের পুঁতির দরকার হবে। যদি জোগাড় করা কঠিন হয়

তাহলে এক কাপ ময়দার মাঝে আধা কাপ লবণ মিশিয়ে একটু পানি দিয়ে মাখিয়ে 1-1.5 cm ব্যাসের 40 থেকে 50টি গোল বল তৈরি করে টুথ পিক দিয়ে মাঝখানে ফুটো করে নাও। এগুলো শুকিয়ে নিলেই পুঁতির মতো ব্যবহার করা যাবে। ডিএনএ মডেলে এই পুঁতিগুলো হবে ফসফেট।

2. প্রতিটি ড্রিংকিং স্ট্রকে সমান তিন ভাগে কেটে 20 থেকে 25 টুকোরা করে নাও। প্রতিটি টুকরা 8 থেকে 9 cm লম্বা হওয়ার কথা। এগুলো হবে ডিএনএ মডেলে নিউক্লিওটাইড।

3. মোটা সেফটি-পিন দিয়ে স্ট্রয়ের টুকরাগুলোর দুই পাশে সমান্তরালভাবে ফুটো কর।

4. রঙিন কাগজগুলো 2 cm চওড়া করে ফিতার মতো কেটে নাও।

5. এবারে ফিতার মতো কেটে রাখা রঙিন কাগজগুলো থেকে প্রথমে সবুজ কাগজ 3 cm করে কেটে নিয়ে আঠা দিয়ে স্ট্রয়ের উপর এমনভাবে প্যাঁচিয়ে লাগাও যেন স্ট্রয়ের ঠিক মাঝখান থেকে একপাশে 2 cm সবুজ রংয়ের কাগজে ঢেকে যায়। এবারে মাঝখান থেকে অন্য পাশে হলুদ রংয়ের কাগজ একইভাবে আঠা দিয়ে প্যাঁচিয়ে দাও। এভাবে স্ট্রয়ের টুকরার অর্ধেকগুলোর (10/12 টি) মাঝখানে সবুজ ও হলুদ রংয়ের কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে দাও। সবুজ অংশটুকু A এবং হলুদ অংশটুকু T নিউক্লিওটাইড ধরে নিলে স্ট্রয়ের একেকটি টুকরা হবে একেকটি বেস পেয়ার।

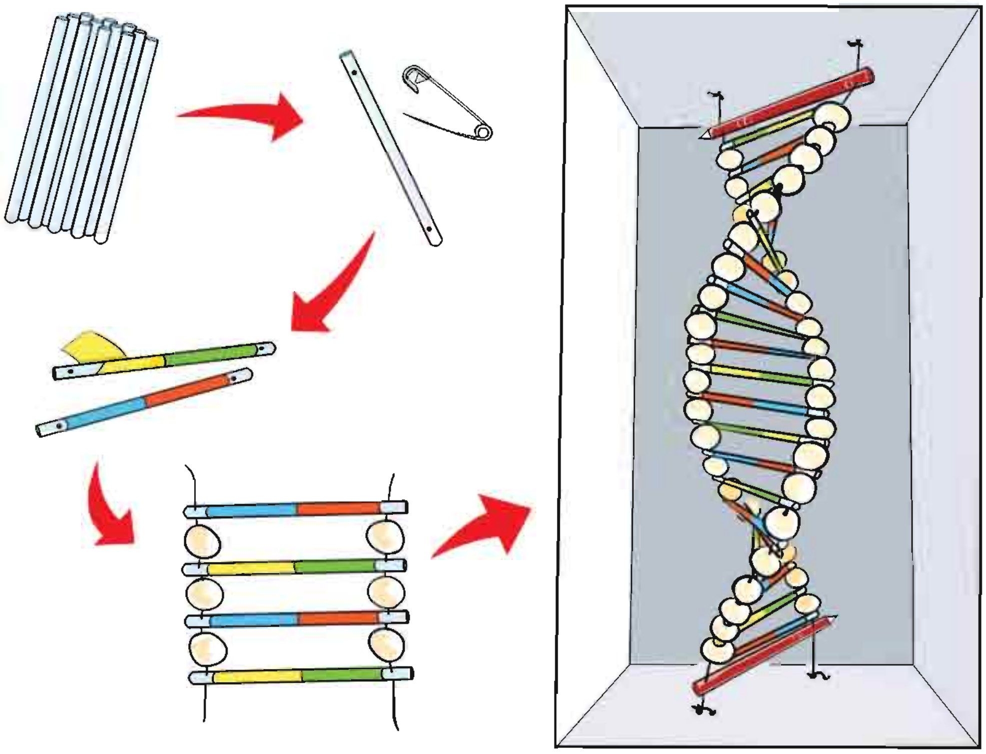

চিত্র 12.03: ডিএনএ মডেল তৈরির বিভিন্ন ধাপ

6. একইভাবে বাকি অর্ধেক (10/12 টি) স্ট্রয়ের টুকরার মাঝখানের অংশটুকু নীল এবং লাল কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে নাও। এখানে নীল অংশটুকু C এবং লাল অংশটুকু G নিউক্লিওটাইড ধরে নিলে স্ট্রয়ের একেকটি টুকরা হবে একেকটি CG বেস পেয়ার। মনে রাখতে হবে অবশ্যই সবুজ রঙের সাথে শুধু হলুদ কাগজ এবং নীল রঙের সঙ্গে শুধু লাল কাগজ লাগাতে হবে, এর ব্যতিক্রম হতে পারবে না।

7. 1 m তারকে দুই টুকরা করে একটি পুরোনো বলপয়েন্ট কলমের দুই পাশে 7-8 cm জায়গা রেখে বেঁধে নাও।

8. এবারে বলপয়েন্ট কলমের সাথে বেঁধে রাখা দুটি তার একটি স্ট্রয়ের টুকরার দুই পাশের ফুটো দিয়ে ঢুকিয়ে নাও।

9. স্ট্রটি বলপয়েন্ট কলমের কাছাকাছি টেনে নিয়ে তার দুটি দিয়ে দুটি পুঁতি (কিংবা তোমার তৈরি গোলক) ঢুকিয়ে নামিয়ে আনো।

10. এভাবে একবার একটি স্ট্রয়ের টুকরা এবং তারপর দুই পাশে দুইটি পুঁতি ঢুকাতে থাকো। ঢোকানোর সময় বিভিন্ন রংয়ের বেস পেয়ারের একটি সুন্দর সমন্বয় করার চেষ্টা কর।

11. সবগুলো স্ট্রয়ের টুকরা এবং পুঁতি ঢুকানো শেষ হওয়ার পর অন্য মাথায় তার দুইটি দ্বিতীয় বলপয়েন্ট কলমটিতে বেঁধে নাও। বাড়তি তারটিকে কেটে ফেলে দাও।

12. প্রকৃত ডি.এন.এতে প্রতি দশটি বেস পেয়ারে একবার ঘূর্ণন হয়। এখানে যেহেতু 20টির মতো বেস পেয়ার আছে, তাই দুইবার ঘূর্ণন হতে হবে। কাজেই দুই পাশের দুটি বল পয়েন্ট কলম দুই হাতে ধরে দুটি পূর্ণ পাক দাও। দেখবে এটি ডি.এন.এর চমৎকার একটি মডেল হয়েছে।

13. কল্পনা করে নাও স্ট্রয়ের হলুদ অংশ A, কাজেই সবুজ হচ্ছে T। একইভাব নীল অংশ C এবং লাল অংশ G নিউক্লিওটাইড। পুঁতি কিংবা তোমার তৈরি গোলকগুলো হচ্ছে ফসফেট। দুটি গোলকের মাঝখানে স্ট্রয়ের বাকি অংশটুকু হচ্ছে শর্করা!

14. মডেলটিকে পাকাপাকিভাবে রক্ষা করার জন্য খালি জুতোর বাক্সের ভিতরে বলপয়েন্ট কলম দুটি উপরে এবং নিচে (দুইটি পূর্ণ ঘূর্ণনসহ) বেঁধে নাও।

মন্তব্য

সবকিছু ঠিকঠাক করে থাকলে তোমার হাতে এখন আছে DNA-এর একটি মডেল, যাতে প্রায় 20/22টি বেস পেয়ার রয়েছে। বিভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটি লক্ষ কর। বিভিন্ন কোণে মডেলটির উপর আলো ফেললে কেমন ছায়া পড়ে তা দেখো। এটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ রোজালিন্ড

ফ্রাঙ্কলিন (1920-1958) বিভিন্ন কোণে DNA অণুর উপর এক্স-রে ফেলে তার ছায়ার ছবি তুলেছিলেন এবং তাঁর তোলা সেই ছবিগুলো বিশ্লেষণ করে DNA-এর গঠন আবিষ্কার করেন জেমস ওয়াটসন (1928-বর্তমান) এবং ফ্রান্সিস ক্রিক (1916-2004)। এজন্য এই দুইজন 1962 সালে নোবেল পুরস্কার পান।

সীমাবদ্ধতা

এই মডেলটি আসল DNA-এর মতো হলেও বিভিন্ন পরমাণু ও রাসায়নিক গ্রুপের আকারগত অনুপাত এখানে রক্ষিত হয়নি।

(c) আরএনএ (RNA)

RNA হলো রাইবোনিউক্লিক এসিড (Ribonucleic Acid)। অধিকাংশ RNA-তে একটি পলিউক্লিওটাইডের সূত্র থাকে। এতে পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট রাইবোজ শর্করা, অজৈব ফসফেট এবং নাইট্রোজেন বেস (এডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন এবং থায়ামিনের পরিবর্তে ইউরাসিল) থাকে। RNA ভাইরাসের ক্রোমোজোমে স্থায়ী উপাদান হিসেবে RNA পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুসংখ্যক ভাইরাসের ক্ষেত্রে (যেমন— TMV, Tobacco Mosaic Virus) DNA অনুপস্থিত। অর্থাৎ যে সমস্ত ভাইরাস DNA দিয়ে গঠিত নয় তাদের নিউক্লিক এসিড হিসেবে থাকে RNA। এসব ক্ষেত্রে RNA-ই বংশগতির বস্তু হিসেবে কাজ করে।

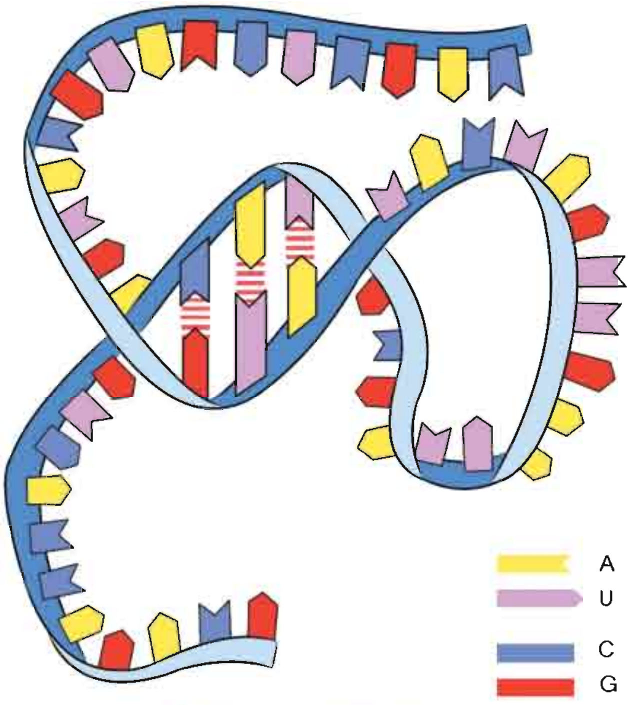

চিত্র 12.04: আরএনএ

(d) জিন (Gene)

জীবের সব দৃশ্য এবং অদৃশ্যমান লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী এককের নাম জিন। এর অবস্থান জীবের ক্রোমোজোমে। ক্রোমাজোমের যে স্থানে জিন অবস্থান করে, তাকে লোকাস (Locus) বলে। সাধারণত একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট জিন থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক জিন মিলিতভাবে একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়তা করে। আবার কোনো কোনো সময় একটি জিন একাধিক

বৈশিষ্ট্যও নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন গবেষণার তত্ত্ব থেকে জানা গেছে, জিনই বংশগতির নিয়ন্ত্রক। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে দ্বিসূত্রক DNA নিজের হুবহু অনুলিপি করতে পারে। আবার, DNA থেকে প্রয়োজনীয় সংকেতের অনুলিপি নিয়ে RNA সাইটোপ্লাজমের রাইবোজোমে আসে এবং সেই সংকেত অনুসারে সেখানে প্রোটিন তৈরি হয়। সুকেন্দ্রিক কোষের ক্ষেত্রে সেই প্রোটিন প্রথমে জমা হয় এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে এবং সেখান থেকে গলজি বস্তু এবং ভেসিকলগুলোর দ্বারা সেই প্রোটিনে নানাবিধ পরিবর্তন হয় এবং তা উপযুক্ত স্থানে বাহিত হয়। প্রাককেন্দ্রিক কোষে অবশ্য সরাসরি প্রোটিনগুলো গন্তব্যে পৌঁছায়। প্রোটিনগুলোই মূলত নির্ধারণ করে প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোর গতি-প্রকৃতি এবং তা থেকেই পরিবেশের সাপেক্ষে নির্ধারিত হয় জীবের বৈশিষ্ট্যাবলি। কোনো জীবের গঠন থেকে আচরণ পর্যন্ত সবই এই বৈশিষ্ট্যগুলোর আওতায় পড়ে। তাই বলা যায়:

DNA ⟶ RNA ⟶ প্রোটিন ⟶ বৈশিষ্ট্য।

বিভিন্ন জীবে জিনের সংখ্যা এক নয়। তবে একই প্রকৃতির জীবে তা প্রায় সবসময় একই থাকে। জিনগুলো সাধারণ নিয়মে ক্রোমোজোমের DNA অনুসূত্রের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৃথক ও রৈখিকভাবে পরপর সাজানো থাকে।

একই জিনের বিভিন্ন সংস্করণ একই ধরনের বৈশিষ্ট্যকে বিভিন্ন রূপে বা মাত্রায় প্রকাশ করতে পারে। যেমন: মটরশুঁটির উচ্চতা নির্ধারিত জিনের লম্বা সংস্করণটি হলো T এবং খাটো সংস্করণটি হলো t। যখন এ দুটি একত্রে থাকে (Tt), তখন লম্বা হওয়ার বৈশিষ্ট্যটিই প্রকাশ পায়। তাই t-এর সাপেক্ষে T কে প্রকট (dominant) বলে এবং T-এর সাপেক্ষে t কে বলে প্রচ্ছন্ন (recessive)। যখন কোনো জীবে জিনের দুটি সংস্করণই প্রচ্ছন্ন হয়, কেবল তখনই প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পায়। যেমন: শুধু tt হলেই মটরশুঁটি খাটো হয়।

গ্রেগর জোহান মেন্ডেল 1866 সালে মটরশুঁটি নিয়ে গবেষণাকালে বংশগতির ধারক ও বাহকরূপে যে ফ্যাক্টরের (factor) কথা উল্লেখ করেছিলেন সেটি আজ ‘জিন’ রূপে পরিচিত হয়েছে। গ্রেগর জোহান মেন্ডেলকে বংশগতিবিদ্যার জনক বলা হয়।

মাতা-পিতার বৈশিষ্ট্য উদ্ভিদের বংশধরদের মধ্যে কীভাবে প্রকাশ পায়, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানী গ্রেগর জোহান মেন্ডেল মটর গাছ নিয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যবান তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন।

মেন্ডেল একটি লম্বা ও একটি খাটো মটর গাছ নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে লম্বা গাছের পরাগরেণু খাটো গাছের গর্ভমুণ্ডে এবং খাটো গাছের পরাগরেণু লম্বা গাছের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তর করে এদের প্রজনন ঘটান। অন্য কোনো পরাগরেণু যাতে আসতে না পারে, সেজন্য তিনি যথাযথ ব্যবস্থা নেন। যেহেতু লম্বা গাছের জিন প্রকট, তাই এ থেকে উৎপন্ন বীজ বুনে দেখা গেল সব গাছই লম্বা হয়েছে; কোনো খাটো গাছ নেই। এই গাছগুলোতে কোনো খাটো গাছের জিন বাহক হিসেবে রয়ে গেছে কি না পরীক্ষা করার জন্য এদের

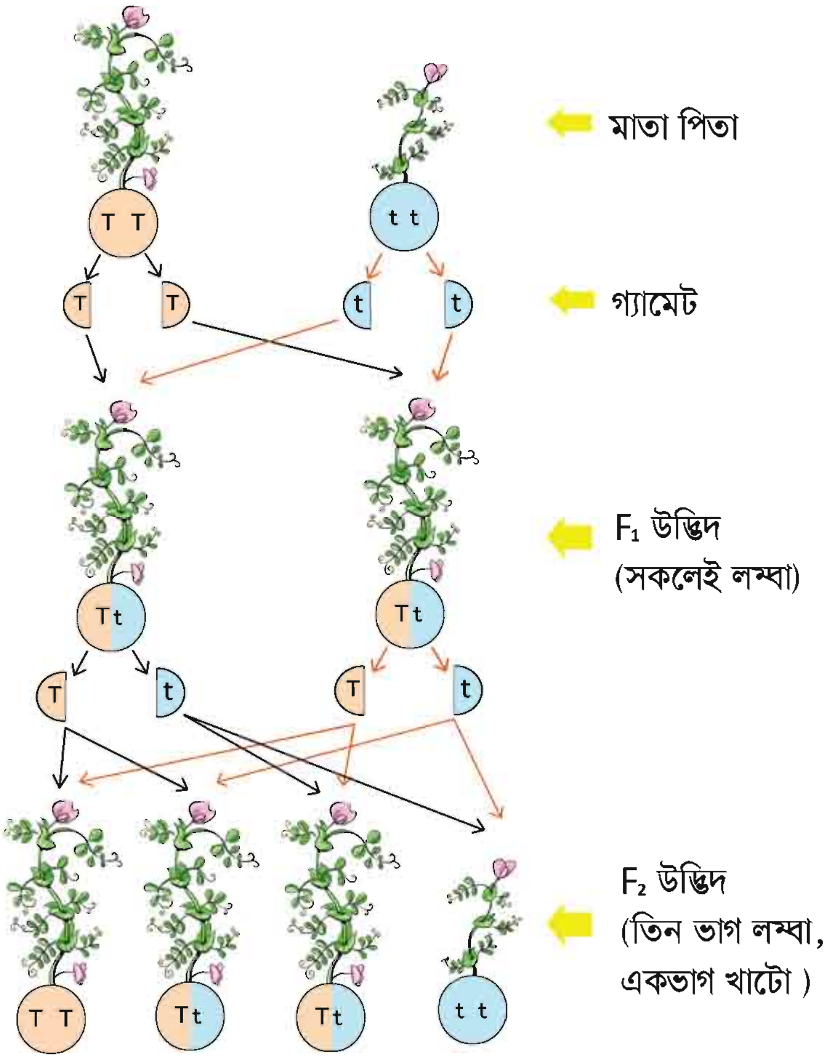
T T
t t
মাতা পিতা
T
T
t
t
গ্যামেট
Tt
Tt
F₁ উদ্ভিদ
(সকলেই লম্বা)
T
t
T
t
T T
Tt
Tt
t t
F₂ উদ্ভিদ
(তিন ভাগ লম্বা,
একভাগ খাটো)

চিত্র 12.05: মেন্ডেলের পরীক্ষা

একটি গাছকে স্বপরাগায়নের মাধ্যমে প্রজনন ঘটিয়ে তা থেকে উৎপন্ন বীজ বুনে দেখা গেল যে এতে লম্বা ও খাটো দুরকমের গাছই রয়েছে, যার মধ্যে তিন ভাগ গাছ লম্বা এবং এক ভাগ গাছ খাটো।

মেন্ডেলের এই তত্ত্ব উদ্ভিদ ও প্রাণীর সুপ্রজননে প্রয়োগ করা হয়। কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত যৌন প্রজনন ঘটিয়ে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বংশধর সৃষ্টি করা হয়। এদের মধ্যে থেকে কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্য বেছে নিয়ে সুপ্রজননের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টি করা হয়। বর্তমানে উন্নত জাতের শস্য উৎপাদনের এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

DNA অনুলিপন (DNA replication)

এই প্রক্রিয়ায় একটি DNA অণু থেকে আরেকটি নতুন DNA অণু তৈরি হয় বা সংশ্লেষিত হয়। DNA অর্ধ-রক্ষণশীল পদ্ধতিতে অনুলিপিত হয়। এই পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন বন্ধন ভেঙে গিয়ে DNA সূত্র

দুটি আলাদা হয়ে যায়। তখন কোষের ভিতর ভাসমান নিওক্লিওটাইডগুলো থেকে A-এর সাথে T , T আর সাথে A, C-এর সাথে G এবং G-এর সাথে C যুক্ত হয়ে সূত্রদুটি তার পরিপূরক (Complementary) নতুন সূত্র তৈরি করে। DNA এর দুটি সুত্রের ভিতর একটি পুরাতন সূত্র রয়ে যায়, তার সাথে একটি নতুন সূত্র যুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ DNA অণুর সৃষ্টি হয়। অর্ধেক পুরাতন এবং অর্ধেক নুতন দিয়ে এই অর্ধ-রক্ষণশীল পদ্ধতি বলে। 1956 সালে Watson ও Crick এ ধরনের DNA অনুলিপন প্রক্রিয়ার প্রস্তাব করেন।

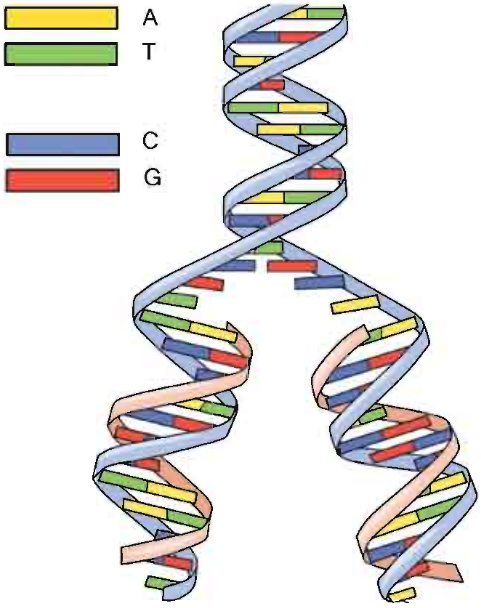

চিত্র 12.06: ডিএনএ অনুলিপন

একক কাজ

কাজ : শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের বড় কাগজে রঙিন পেন্সিল দিয়ে ডিএনএ অংকন করে প্রদর্শনের জন্য শ্রেণিকক্ষে টানিয়ে দিতে বলবেন।

12.1.2 ডিএনএ টেস্ট

বর্তমান শতাব্দীতে ডিএনএ প্রযুক্তির গুরুত্ব এবং এর ব্যবহার চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ এবং ঔষধশিল্পে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। প্রচলিত সাক্ষ্য-প্রমাণ ও প্রত্যক্ষদর্শীনির্ভর বিচারব্যবস্থার পাশাপাশি আজ বাংলাদেশেও সুবিচার পাওয়ার এক নতুন উপায় হচ্ছে এই ডিএনএ টেস্ট।

ডিএনএ টেস্টের বিজ্ঞানভিত্তিক এক ব্যবহারিক পদ্ধতিকে বলা হয় ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং। এ ধরনের প্রক্রিয়াগুলোর ডিএনএ টাইপিং, ডিএনএ টেস্টিং ইত্যাদি নামও প্রচলিত আছে। ডিএনএ টেস্ট সুসম্পন্ন করার জন্য প্রথম প্রয়োজন জৈবিক নমুনা। ব্যক্তির হাড়, দাঁত, চুল, রক্ত, লালা, বীর্য বা টিস্যু ইত্যাদি মূল্যবান জৈবিক নমুনা হতে পারে। অপরাধস্থল কিংবা অপরাধের শিকার এমন ব্যক্তির কাছ থেকে সংগ্রহ করা জৈবিক নমুনার ডিএনএ নকশাকে (DNA profile) সন্দেহভাজনের কাছ থেকে নেওয়া রক্ত বা জৈবিক নমুনার ডিএনএ নকশার সাথে তুলনা করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রথমে নমুনা থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ডিএনএ আলাদা করে নিতে হয় এবং একাধিক সীমাবদ্ধ এনজাইম (restriction enzyme) দিয়ে ডিএনএগুলো কেটে ছোট ছোট টুকরা করা হয়। তারপর এক বিশেষ পদ্ধতিতে (ইলেকট্রোফোরেসিস্

(electrophoresis) দ্বারা এগারোজ বা পলিএক্রিলামাইড জেল) ডিএনএ টুকরোগুলো তাদের দৈর্ঘ্য অনুসারে বিভিন্ন ব্যান্ড আকারে আলাদা করা হয়। এরপর এক ধরনের বিশেষ নাইট্রোসেলুলোজ কাগজে রেডিও অ্যাকটিভ আইসোটাপ ডিএনএ প্রোরের সাথে হাইব্রিডাইজ করে এক্স-রে ফিল্মের উপর রেখে অটোরেডিওগ্রাফ পদ্ধতিতে দৃশ্যমান ব্যান্ডের সারিগুলো নির্ণয় করা হয় এবং অপরাধস্থল থেকে প্রাপ্ত নমুনার সাথে সন্দেহভাজন নমুনার মিল ও অমিল চিহ্নিত করে তুলনা করা হয়। এই পদ্ধতিটিকে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং বলা হয়। বর্তমানে পলিমারেজ চেইন বিক্রিয়া (Polymerase chain reaction) বা পিসিআর (PCR) পদ্ধতিতে আরও নিপুণভাবে অল্প নমুনা ব্যবহার করে নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

12.2 মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ

মানুষ এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীতে প্রায় একই পদ্ধতিতে লিঙ্গ নির্ধারণ হয়। মানবদেহে ক্রোমোজোম সংখ্যা 46টি বা 23 জোড়া। এর মধ্যে 22 জোড়া বা 44টিকে অটোজোম (Autosome) এবং 1 জোড়াকে সেক্স-ক্রোমোজোম (Sex chromosome) বলা হয়। অটোজোমগুলো শারীরবৃত্তীয়, ভ্রূণ এবং দেহ গঠন ইত্যাদি কার্যাদিতে অংশগ্রহণ করে। লিঙ্গ নির্ধারণে এদের কোনো ভূমিকা নেই। সেক্স ক্রোমোজোম দুটি এক্স (X) এবং ওয়াই (Y) নামে পরিচিত। লিঙ্গ নির্ধারণে এরা মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

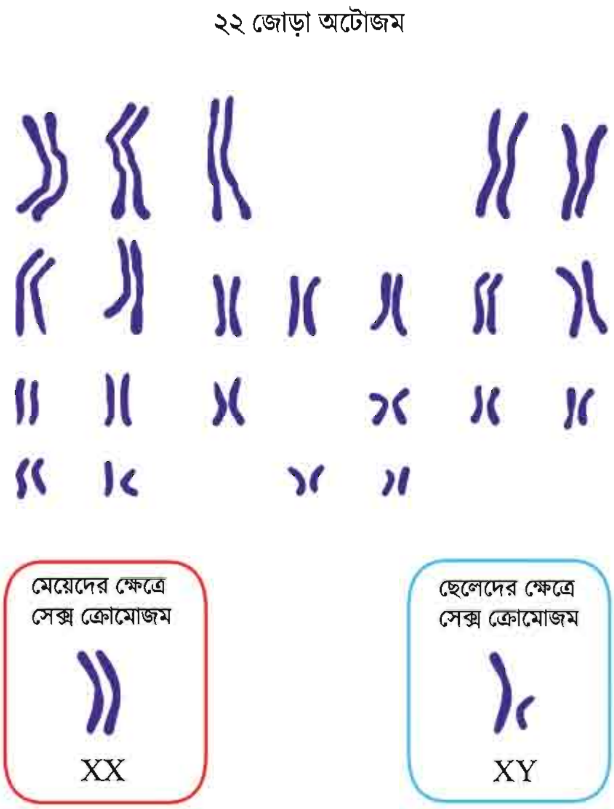
২২ জোড়া অটোজম
মেয়েদের ক্ষেত্রে সেক্স ক্রোমোজম
XX
ছেলেদের ক্ষেত্রে সেক্স ক্রোমোজম
XY

চিত্র 12.07: 22 জোড়া অটোজোম এবং 1 জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম

নারীদের ডিপ্লয়েড কোষে দুটি সেক্স ক্রোমোজোমই X ক্রোমোসোম অর্থাৎ XX, কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে দুটির মধ্যে একটি X অপরটি Y ক্রোমোজোম অর্থাৎ XY। X এবং Y উভয় ধরনের সেক্স-ক্রোমোজোমই আকৃতিতে লম্বা এবং রডের মতো, তবে Y ক্রোমোজোম X কোমোজোমের তুলনায় কিছুটা ছোট। নারীদের ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু তৈরি করার সময় যখন মিয়োসিস বিভাজন ঘটে, তখন প্রতিটি ডিম্বাণু অন্যান্য ক্রোমোজোমের সাথে একটি করে X ক্রোমোজোম লাভ করে। অন্যদিকে, পুরুষে শুক্রাণু সৃষ্টির সময় অর্ধেক সংখ্যক শুক্রাণু একটি করে X ক্রোমোজোম এবং অবশিষ্ট অর্ধেক শুক্রাণু একটি

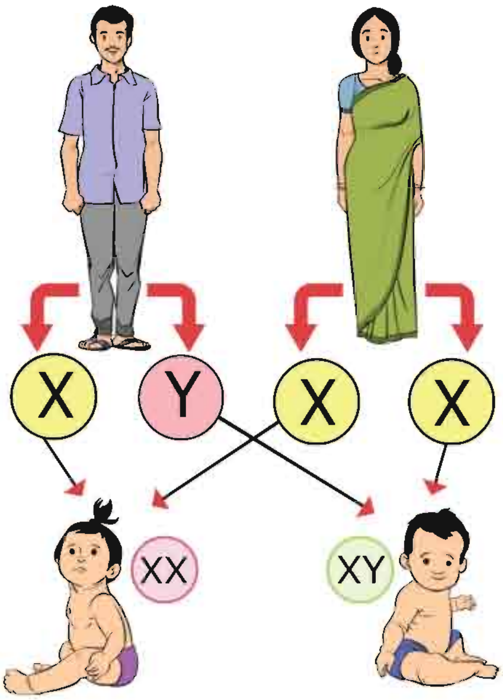

চিত্র 12.08: সেক্স ক্রোমোজোম দিয়ে মানুষের সন্তানের লিঙ্গা নির্ধারণ প্রক্রিয়া

করে Y ক্রোমোজোম লাভ করে। ডিম্বাণু পুরুষের X বা Y বহনকারী যেকোনো একটি শুক্রাণু দিয়ে নিষিক্ত হতে পারে। গর্ভধারণকালে কোন ধরনের শুক্রাণু মাতার X বহনকারী ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হবে তার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ সন্তানের লিঙ্গা। যেহেতু নিষেকে কেবল একটি শুক্রাণুই ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয়, তাই পিতার X অথবা Y শুক্রাণুর কোনটি সাফল্যজনকভাবে নিষেক ঘটাবে, তার উপর নির্ভর করে সন্তানের লিঙ্গা। যদি X বহনকারী শুক্রাণু নিষেক ঘটায়, তাহলে জাইগোট হবে XX, অর্থাৎ সন্তান হবে কন্যা। আর যদি Y বহনকারী শুক্রাণু নিষেকে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে জাইগোটে X এবং Y ক্রোমোজোম থাকবে অর্থাৎ ক্রোমোজোম দুটি হবে XY। ফলে সন্তান হবে পুত্র। মানুষের লিঙ্গা নির্ধারণে, অর্থাৎ কন্যা বা পুত্রসন্তানের জন্ম হওয়ার ব্যাপারে মায়ের আদৌ কোনো ভূমিকা নেই। কারণ মা সব সময় কেবল X বহনকারী ডিম্বাণু তৈরি করে। অন্যদিকে পিতা X এবং Y দুই ধরনেরই শুক্রাণু উৎপাদন করে লিঙ্গা নির্ধারণে ভূমিকা রেখে থাকে।

একক কাজ

কাজ : কখন সন্তান ছেলে হবে এবং কখন সন্তান মেয়ে হবে, সেটি নিচের ছক পূরণের মাধ্যমে নির্ণয় কর, XY (ছেলে) এবং XX (মেয়ে)।

মা♀ বাবা ♂	X	Y
X		
X		

একক কাজ

কাজ : পাখি, ঝিঁঝি পোকা এবং কুমিরের লিঙ্গা নির্ধারণ মানুষের লিঙ্গা নির্ধারণ প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন। তোমরা এই প্রাণীগুলোর লিঙ্গা নির্ধারণ প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করে তার উপর একটি নিবন্ধ লিখ।

12.3 জেনেটিক ডিসঅর্ডার বা বংশগতি ব্যাধি/অস্বাভাবিকতা

কিছু জিনগত অসুখ আছে, যেগুলোতে মিউটেশন হয় সেক্স ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোতে। এসব অসুখকে বলে সেক্স-লিংকড অসুখ (Sex-linked disorder)। যেহেতু Y ক্রোমোজোম খুবই ছোট আকৃতির এবং এতে জিনের সংখ্যা খুব কম, তাই বেশিরভাগ সেক্স-লিংকড অসুখ হয় X ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোর মিউটেশনের কারণে। মেয়েদের যেহেতু দুটি X ক্রোমোজোম থাকে, সেহেতু একটি X ক্রোমোজোমে মিউটেশন থাকলেও আরেকটি X ক্রোমোজোম স্বাভাবিক থাকার কারণে রোগলক্ষণ প্রকাশ পায় না। দুটি X ক্রোমোজোমেই একই সাথে একই অসুখের মিউটেশন থাকার সম্ভাবনা খুব কম বলে মেয়েরা সাধারণ সেক্স-লিংকড রোগে আক্রান্ত হয় না, বড়জোর বাহক (carrier) হিসেবে কাজ করে। (যে নিজে অসুস্থ নয় কিন্তু অসুস্থতার জিন বহন করে, তাকে বাহক বলে।) পুরুষের যেহেতু X ক্রোমোজোম মাত্র একটি, তাই তারা সেক্স-লিংকড অসুখের বাহক হয় না, সেটিতে অসুখ-সৃষ্টিকারী মিউটেশন থাকলেই তাদের ভিতর অসুখের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(a) কালার ব্লাইন্ডনেস বা বর্ণান্ধতা

যখন কেউ কোনো রং সঠিকভাবে চিনতে পারে না, সেটি হচ্ছে কালার ব্লাইন্ডনেস বা বর্ণান্ধতা। রং চেনার জন্য আমাদের চোখের স্নায়ু কোষে রং শনাক্তকারী পিগমেন্ট থাকে। কালার ব্লাইন্ড অবস্থায় রোগীদের চোখে স্নায়ু কোষের রং শনাক্তকারী পিগমেন্টের অভাব থাকে। যদি কারো একটি পিগমেন্ট না থাকে, তখন সে লাল আর সবুজ পার্থক্য করতে পারে না। এটা সর্বজনীন কালার ব্লাইন্ড সমস্যা। একাধিক পিগমেন্ট না থাকার কারণে লাল এবং সবুজ রং ছাড়াও রোগী নীল এবং হলুদ রং পার্থক্য করতে পারে না। পুরুষদের বেলায় সাধারণত প্রতি 10 জনে 1 জনকে কালার ব্লাইন্ড হতে দেখা যায়। তবে খুব কম নারীরাই এই অসুখে ভোগেন।

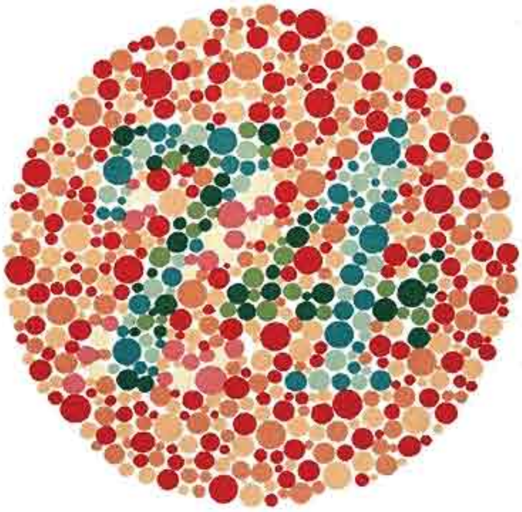

চিত্র 12.09: লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা নির্ণয় করার জন্য ব্যবহৃত ইশিহারা (Ishihara) চার্ট থেকে নেওয়া একটি ছবি। এটি এমনভাবে নকশা করা হয়েছে যে একজন কালার ব্লাইন্ড মানুষ এখানে 21 সংখ্যাটি দেখবে, যেখানে সুস্থ ব্যক্তি দেখবে 74!

বংশগতি ছাড়াও কোনো কোনো ঔষধ, যেমন বাত রোগের জন্য হাইড্রক্সি-ক্লোরোকুইনিন সেবনে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে চোখের রঙিন পিগমেন্ট নষ্ট হয়ে রোগী কালার ব্লাইন্ড হতে পারে। এই ধরনের অসুখ নির্ণয়ে চোখের ডাক্তারের কাছে যাওয়া শ্রেয় ।

একক কাজ

কাজ : 12.10 চিত্রে X' দিয়ে মিউট্যান্ট X ক্রোমোজোম বোঝানো হয়েছে। বাহক মা (XX') এবং অসুস্থ বাবার (X'Y) মিলনে উৎপন্ন সন্তানদের সুস্থ, অসুস্থ কিংবা বাহক হওয়ার সম্ভাব্য অনুপাত এরকম:

অসুস্থ মেয়ে (X'X'): বাহক মেয়ে (XX'): অসুস্থ ছেলে (X'Y): স্বাভাবিক ছেলে (XY) = 1: 1: 1: 1

একই পদ্ধতিতে (ক) অসুস্থ বাবা (X'Y) এবং সুস্থ মা (XX) (খ) অসুস্থ বাবা (X'Y) এবং অসুস্থ মা (X'X') (গ) সুস্থ বাবা (XY) এবং বাহক মা (XX') (ঘ) সুস্থ বাবা (XY) এবং অসুস্থ মায়ের (X'X') বেলায় সন্তানদের সুস্থ, অসুস্থ কিংবা বাহক হওয়ার সম্ভাব্য অনুপাত বের কর।

মা

বাবা

	X'	X	
X'	X'X'	X'X	কন্যা সন্তান
Y	X'Y	XY	পুত্র সন্তান

চিত্র 12.10: সেক্স-লিংকড অসুখ (যেমন: লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা) কীভাবে সন্তানে সঞ্চারিত হয় তা পানেট স্কয়ারের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

(b) থ্যালাসেমিয়া

থ্যালাসেমিয়া রক্তের লোহিত রক্ত কণিকার এক অস্বাভাবিক অবস্থাজনিত রোগের নাম। এই রোগে লোহিত রক্ত কণিকাগুলো নষ্ট হয়। ফলে রোগী রক্তশূন্যতায় ভোগে। এই রোগ বংশপরম্পরায় হয়ে থাকে। থ্যালাসেমিয়া বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বংশবাহিত রক্তজনিত সমস্যা। ধারণা করা হয়, দেশে প্রতিবছর 7000 শিশু থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং বর্তমানে প্রায় এক লাখ রোগী আছে। এটি একটি অটোসোমাল রিসিসিভ ডিজঅর্ডার, অর্থাৎ বাবা ও মা উভয়েই এ রোগের বাহক বা রোগী হলে তবেই তা সন্তানে রোগলক্ষণ হিসেবে প্রকাশ পায়। চাচাতো-মামাতো-খালাতো ভাইবোন বা অনুরূপ নিকট আত্মীয়য়ের মধ্যে বিয়ে হলে এ ধরনের রোগে আক্রান্ত সন্তান জন্ম দেওয়ার আশঙ্কা বহুগুণ বেড়ে যায়।

লোহিত রক্তকোষ দুধরনের প্রোটিন দিয়ে তৈরি, α-গ্লোবিউলিন এবং β-গ্লোবিউলিন। থ্যালাসেমিয়া হয় লোহিত রক্তকোষে এ দুটি প্রোটিনের জিন নষ্ট থাকার কারণে, যার ফলে ত্রুটিপূর্ণ লোহিত রক্তকোষ উৎপাদিত হয়। দুই ধরনের জিনের সমস্যার জন্য দুই ধরনের থ্যালাসেমিয়া দেখা যায়, আলফা (α) থ্যালাসেমিয়া এবং বিটা (β) থ্যালাসেমিয়া। আলফা থ্যালাসেমিয়া রোগ তখনই হয়, যখন α গ্লোবিউলিন তৈরির জিন অনুপস্থিত থাকে কিংবা ত্রুটিপূর্ণ হয়। এই ধরনের রোগ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, চীন ও আফ্রিকার জনগণের মাঝে বেশি দেখা যায়। একইভাবে বিটা (β) থ্যালাসেমিয়া তখনই হয়, যখন

(β) গ্লোবিউলিন প্রোটিন উৎপাদন ব্যাহত হয়। বিটা থ্যালাসেমিয়াকে 'কুলির থ্যালাসেমিয়া'ও বলা হয়। এ ধরনের রোগ ভূমধ্যসাগরীয় এলাকাবাসীদের মাঝে বেশি দেখা গেলেও কিছু পরিমাণ আফ্রিকান, আমেরিকান, চীন ও এশিয়াবাসীদের মধ্যেও দেখা যায়।

জিনের প্রাপ্তির উপর নির্ভর করেও থ্যালাসেমিয়াকে দুভাবে দেখা হয়, থ্যালাসেমিয়া মেজর এবং থ্যালাসেমিয়া মাইনর। থ্যালাসেমিয়া মেজরের বেলায় শিশু তার বাবা ও মা দুজনের কাছ থেকেই থ্যালাসেমিয়া জিন পেয়ে থাকে। থ্যালাসেমিয়া মাইনরের বেলায় শিশু থ্যালাসেমিয়া জিন তার বাবা অথবা তার মায়ের কাছ থেকে পেয়ে থাকে। এ ধরনের শিশুরা থ্যালাসেমিয়ার কোনো উপসর্গ দেখায় না। তবে থ্যালাসেমিয়া জিনের বাহক হিসেবে কাজ করে।

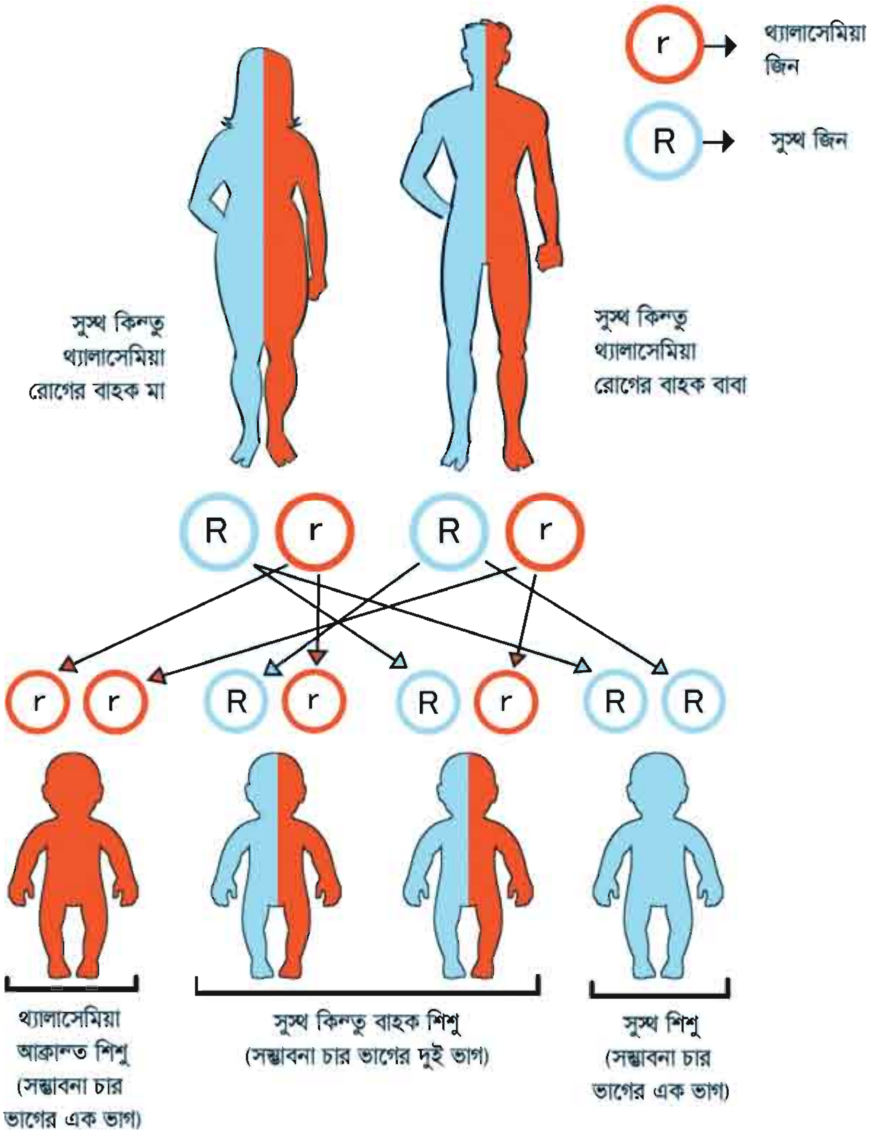
r → থ্যালাসেমিয়া জিন
R → সুস্থ জিন
সুস্থ কিন্তু থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক মা
সুস্থ কিন্তু থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক বাবা
R r R r
r r R r R r R R
থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু (সম্ভাবনা চার ভাগের এক ভাগ)
সুস্থ কিন্তু বাহক শিশু (সম্ভাবনা চার ভাগের দুই ভাগ)
সুস্থ শিশু (সম্ভাবনা চার ভাগের এক ভাগ)

চিত্র 12.11: বাহক বাবা এবং বাহক মায়ের সন্তানদের ভিতর থ্যালাসেমিয়া সন্তান জন্মের সম্ভাবনা চার ভাগের এক ভাগ।

লক্ষণ:

তীব্র থ্যালাসেমিয়ার কারণে জন্মের আগেই মায়ের পেটে শিশুর মৃত্যু হতে পারে। থ্যালাসেমিয়া মেজর আক্রান্ত শিশুরা জন্মের পর প্রথম বছরেই জটিল রক্তশূন্যতা রোগে ভোগে।

চিকিৎসা:

সাধারণত নির্দিষ্ট সময় পর পর রক্ত প্রদান এবং নির্দিষ্ট ঔষধ খাইয়ে থ্যালাসেমিয়ার চিকিৎসা দেওয়া হয়। রোগীদের লৌহসমৃদ্ধ ফল বা ঔষধ খেতে হয় না, কারণ তা শরীরে জমে গিয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষতিসাধন করে। এছাড়া যকৃৎ নষ্ট হলে জন্ডিস, অগ্ন্যাশয় নষ্ট হলে ডায়াবেটিস ইত্যাদি নানা প্রকার রোগ ও রোগলক্ষণ দেখা দিতে পারে। থ্যালাসেমিয়া রোগীর 30 বছরের বেশি বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কম, যদি এসব সমস্যা একবার শুরু হয়।

12.4 জৈব বিবর্তন তত্ত্ব

বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবীতে আমরা যেসব জীবের সঙ্গে পরিচিত, তাদের মধ্যে প্রায় তেরো লক্ষ প্রাণী-প্রজাতি এবং চার লাখের মতো উদ্ভিদ-প্রজাতিকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। একসময় মানুষের ধারণা ছিল, পৃথিবী অপরিবর্তিত, অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে পৃথিবীর যে আকার বা আয়তন ছিল, তার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তারা ভাবতো, আদি জীবজগতের সঙ্গে বর্তমানকালের জীবজগতের তেমন কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে জেনোফেন (Xenophane) নামের একজন বিজ্ঞানী প্রথম কতকগুলো জীবাশ্ম (fossil) আবিষ্কার করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে জীবদেহের আকার অপরিবর্তনীয় নয়, অর্থাৎ অতীত এবং বর্তমান যুগের জীবদেহের গঠনে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে।

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (Aristotle) প্রমাণ করেন যে জীবজগতের বিভিন্ন জীবের ভিতর এক শ্রেণির জীব অন্য শ্রেণির জীব থেকে উন্নত এবং সেই জীবগুলো তাদের পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তি লাভ করে বিবর্তনের (বা অভিব্যক্তি) মাধ্যমে ক্রমাগত পরিবর্তিত এবং রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। সাধারণত বিবর্তন একটি মন্থর এবং চলমান প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠনগতভাবে সরল জীবন থেকে ধীরে ধীরে জটিল জীবনের উৎপত্তি ঘটেছে। তবে খুব কম সময়ের মধ্যে বিবর্তন সংঘটিত হওয়ার নজিরও বর্তমান।

সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত অনুসারে, প্রায় সাড়ে চারশত কোটি বছর (সাড়ে চার বিলিওন) আগে সূর্য থেকে সৃষ্ট এই পৃথিবী একটি উত্তপ্ত গ্যাস-পিন্ড ছিল। এই উত্তপ্ত গ্যাস-পিন্ড ক্রমাগত তাপ বিকিরণ করায় এবং তার উত্তাপ কমে যাওয়ায় ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পরে এই পিণ্ডটি বাইরের দিক থেকে ভিতরের দিকে ক্রমশ কঠিন হতে থাকে এবং উদ্ভূত জলীয় বাষ্প থেকে মেঘের সৃষ্টি হয়। ঐরকম মেঘ থেকে বৃষ্টি হওয়ায় পৃথিবীর কঠিন বহিঃস্তরে জলভাগ অর্থাৎ সমুদ্রের আবির্ভাব ঘটে। এক সময়ে সমুদ্রের পানিতে প্রাণের আবির্ভাব হয় এবং সমুদ্রের পানিতে সৃষ্ট জীবকুলের ক্রমাগত

পরিবর্তনের ফলে বর্তমানের বৈচিত্র্যময় জীবজগতের সৃষ্টি হয়েছে।

গভীর যুক্তিনির্ভর চিন্তাভাবনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আধুনিক মানুষের ধারণা হয়েছে যে জীব সৃষ্টির মূলেই রয়েছে বিবর্তন। ল্যাটিন শব্দ 'Evolveri' থেকে বিবর্তন শব্দটি এসেছে। ইংরেজ দার্শনিক এবং শিক্ষাবিদ হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) প্রথম ইভোলিউশন কথাটি ব্যবহার করেন। এক সময় বলা হতো, যে ধীর, অবিরাম এবং চলমান পরিবর্তন দিয়ে কোনো সরলতর নিম্নশ্রেণির জীব থেকে জটিল এবং উন্নততর নতুন প্রজাতির বা জীবের উদ্ভব ঘটে, তাকে বিবর্তন বা অভিব্যক্তি বা ইভোলিউশন বলে। তবে বিবর্তন সব সময় ধীর গতিতে ঘটে না, পরিবেশের কারণে অনেক সময় দ্রুত ঘটতে দেখা গেছে। শুধু তা-ই নয়, বিবর্তনের কারণে জটিল জীব সরলতর রূপ নিয়েছে তারও উদাহরণ আছে। মেক্সিকান কেভ ফিশ পানির উপরের স্তর থেকে সরে গিয়ে গভীর পানিতে অন্ধকার গুহায় বাস করতে শুরু করার কারণে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। কাজেই এখন বিবর্তন বা ইভোলিউশনের সংজ্ঞা জিনের অ্যালিলের মাধ্যমে দেওয়া হয় (একটি নির্দিষ্ট জিন একাধিকভাবে থাকতে পারে, তখন সেই জিনটির ভিন্ন ভিন্ন রূপকে তার অ্যালিল বলা হয়)। কার্টিস-বার্নস (1989) প্রদত্ত আধুনিক সংজ্ঞা অনুসারে, বিবর্তন হলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে নির্দিষ্ট এলাকায় এক কিংবা কাছাকাছি প্রজাতির অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন।

ধরা যাক, সুন্দরবনের সমস্ত বাঘের সবগুলো জিন নির্ণয় করে তার একটি তালিকা করা হলো, যেখানে কোন জিনের কোন অ্যালিল কতগুলো করে আছে, সেটিও হিসাব রাখা হয়েছে। বেশ কিছু বছর পরে পরবর্তী কোনো প্রজন্মের সকল বাঘের সবগুলো জিন নির্ণয় করে আবার কোন অ্যালিল কতগুলো করে আছে, সেটিও হিসাব করা হলো। তারপর দুই প্রজন্মের জিনগুলো তুলনা করে যদি দেখা যায়, এক প্রজন্ম থেকে অপর প্রজন্মে কোনো জিনের কোনো অ্যালিলের সংখ্যার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে, তাহলে বলা যাবে, বাঘের এই পপুলেশনটিতে বিবর্তন ঘটছে।

12.4.1 জীবনের আবির্ভাব

পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছিল সে সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ বর্তমানে প্রচলিত আছে। তবে জীবনের উৎপত্তি যে প্রথমে সমুদ্রের পানিতে হয়েছিল, এ সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা যে যুক্তি রেখেছেন, সেগুলো এরকম: প্রথমত, অধিকাংশ জীবকোষ এবং দেহস্থ রক্ত ও অন্যান্য তরলে নানারকম লবণের উপস্থিতি, যার সঙ্গে সমুদ্রের পানির খনিজ লবণের সাদৃশ্য রয়েছে। দ্বিতীয়, সমুদ্রের পানিতে এখনো অনেক সরল এবং এককোষী জীব বসবাস করে।

পৃথিবীতে কীভাবে জীব সৃষ্টি হয়েছিল, সে সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত অনুমান এরকম: প্রায় 260 কোটি বছর আগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং জলীয় বাষ্প, নাইট্রোজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছিল; কিন্তু অক্সিজেন গ্যাস ছিল না। অহরহ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটত এবং বজ্রপাতের ফলে ও অতিবেগুনি রশ্মির

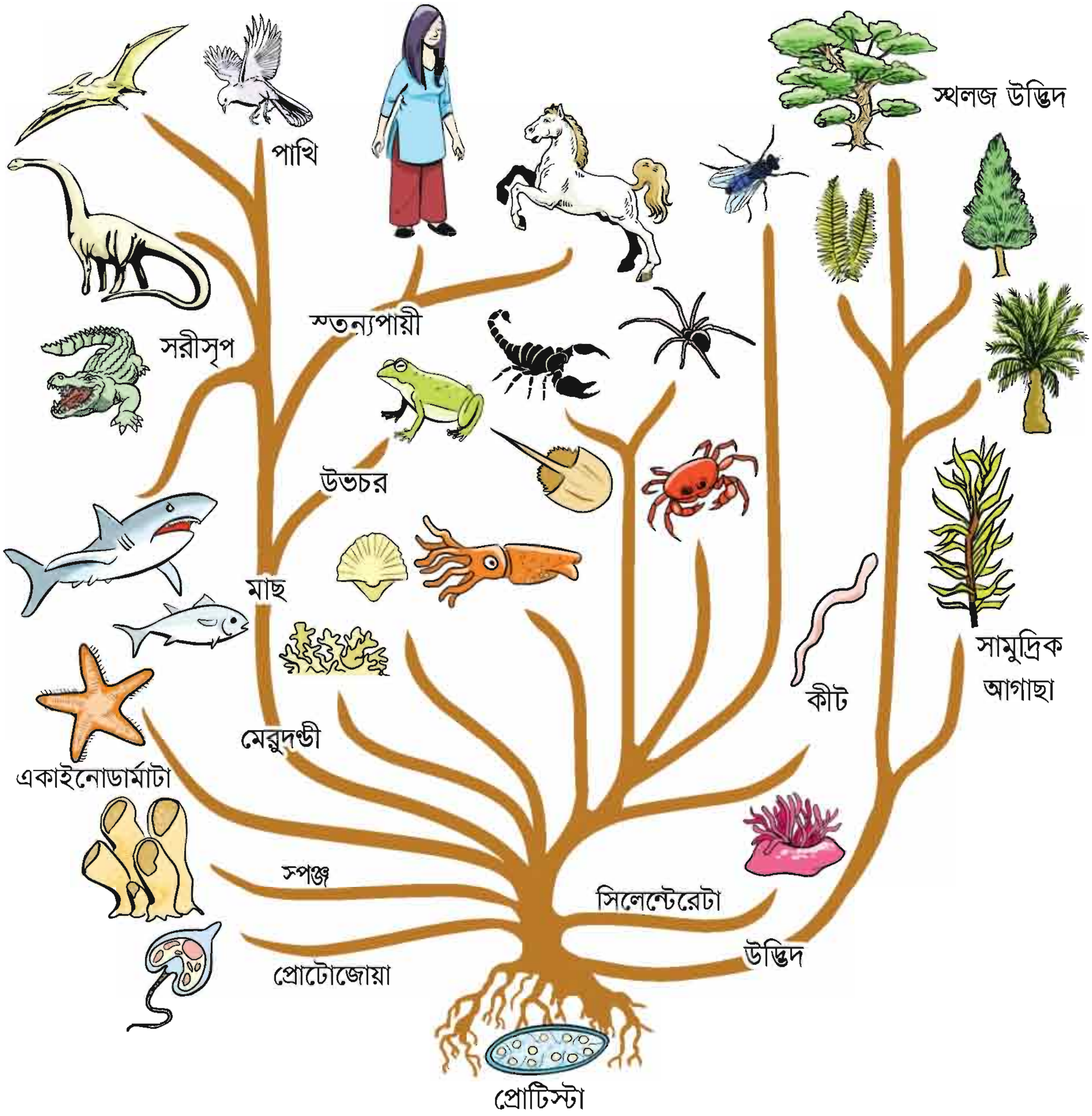
পাখি
স্থলজ উদ্ভিদ
সরীসৃপ
স্তন্যপায়ী
উভচর
মাছ
সামুদ্রিক আগাছা
কীট
মেরুদণ্ডী
একাইনোডার্মাটা
স্পঞ্জ
সিলেন্টেরেটা
উদ্ভিদ
প্রোটোজোয়া
প্রোটিস্টা

চিত্র 12.12: বিবর্তন বহু শাখা-প্রশাখায় একই সাথে ঘটে চলা অসংখ্য পরিবর্তনের একটি জটিল নেটওয়ার্ক।

প্রভাবে এই যৌগ পদার্থগুলো মিলিত হয়ে অ্যামাইনো এসিড এবং নিউক্লিক এসিড উৎপন্ন করে। ল্যাবরেটরিতে এই প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করে প্রমাণ করা হয়েছে। পরে অ্যামাইনো এসিড এবং নিউক্লিক এসিড মিলিত হওয়ায় নিউক্লিওপ্রোটিন অণুর সৃষ্টি হয়। নিউক্লিওপ্রোটিন অণুগুলো ক্রমে নিজেদের প্রতিরূপ-গঠনের (replication) ক্ষমতা অর্জন করে এবং জীবনের সূত্রপাত ঘটায়। পৃথিবীর উৎপত্তি এবং তার ধারাবাহিকতায় জীবনের উৎপত্তির ঘটনাপ্রবাহকে বলে রাসায়নিক বিবর্তন বা অভিব্যক্তি।

ধারণা করা হয়, প্রোটিন এবং নিউক্লিক এসিড সহযোগে সৃষ্টি হয় নিউক্লিওপ্রোটিন। এই নিউক্লিওপ্রোটিন থেকেই সৃষ্টি হয় প্রোটোভাইরাস এবং তা থেকে সৃষ্টি হয় ভাইরাস। ভাইরাস এমন একটা অবস্থা নির্দেশ করে, যা জীব এবং জড়ের মধ্যবর্তী অবস্থা।

এরপর সম্ভবত উদ্ভব হয় ব্যাকটেরিয়া এবং আরও পরে সৃষ্টি হয় প্রোটোজোয়া। ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিয়াস আদি প্রকৃতির, তাই এদেরকে আদি কোষ বলা হয়। পরে প্রোটাজোয়াদের দেহে দেখা গেল সুগঠিত নিউক্লিয়াস। কিছু এককোষী জীবদেহে সৃষ্টি হলো ক্লোরোফিল, ফলে একদিকে যেমন খাদ্য সংশ্লেষ সম্ভব হলো, তেমনি খাদ্য সংশ্লেষের উপজাত (by product) হিসেবে অক্সিজেন সৃষ্টি হতে শুরু করল। তখন সবাত শ্বসনকারী জীবদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল। উদ্ভব হলো এককোষী থেকে বহুকোষী জীব। এরপর একদিকে উদ্ভিদ ও অপরদিকে প্রাণী—দুটি ধারায় জীবের অভিব্যক্তি বা বিবর্তন শুরু হলো। জীবনের উদ্ভব তথা রাসায়নিক বিবর্তনের আরও কিছু সম্ভাব্য ব্যাখ্যা আছে, তবে উপরে উল্লিখিত ব্যাখ্যাটিই এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকভাবে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। বিবর্তন প্রকৃতপক্ষে সরলরেখায় ঘটে না, অসংখ্য জটিল শাখা-প্রশাখায় প্রতিনিয়ত ঘটে চলে বিবর্তন, 12.12 চিত্রে তার একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে।

12.4.2 ডারউইনবাদ বা ডারউইনের মতবাদ

ব্রিটিশ প্রকৃতি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন জীববিজ্ঞান তথা সমগ্র বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সৃষ্টি করেন। বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (Charles Robert Darwin, 1809-1882) ইংল্যান্ডের স্রাসবেরি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণকালে তিনি ঐ অঞ্চলের উদ্ভিদ এবং প্রাণিকুলের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য দেখে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে 1837 খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তনের প্রায় 20 বছর পরে 1859 খ্রিষ্টাব্দে 'প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা প্রজাতির উদ্ভব' (Origin of Species by Means of Natural Selection) নামে একটি বইয়ে তাঁর মতবাদটি প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, ডারউইনের তত্ত্বটি বিবর্তন তত্ত্ব নামে প্রচলিত হলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে বিবর্তনের আবিষ্কারক নন। এ অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে জৈব বিবর্তন যে প্রকৃতই ঘটে তা খ্রিষ্টপূর্ব সময় থেকেই বিজ্ঞানীরা জানতেন। ডারউইনের সাফল্য ছিল, জৈব বিবর্তনের কারণ হিসেবে পর্যাপ্ত সংখ্যক বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে একটি প্রক্রিয়ার (mechanism) ধারণা প্রতিষ্ঠা করা যা, বিবর্তনের যাবতীয় বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবে। জৈব বিবর্তনের কারণ হিসেবে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে উল্লেখ করে আরও একজন সমসাময়িক ব্রিটিশ প্রকৃতি বিজ্ঞানী, আলফ্রেড ওয়ালেস (Alfred Russel Wallace, 1823-1913), একই সময়ে কিন্তু স্বাধীনভাবে অনুরূপ তত্ত্ব প্রণয়ন করেন। তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে তাঁর চেয়ে ডারউইনের নামেই তত্ত্বটি অধিক প্রচলিত।

ডারউইনের দৃষ্টিতে প্রকৃতিতে সংঘটিত সাধারণ সত্যগুলো:

(a) অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধি: ডারউইনের মতে, অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধি করাই জীবের সহজাত বৈশিষ্ট্য। এর ফলে জ্যামিতিক এবং গাণিতিক হারে জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ: একটি সরিষা গাছ থেকে বছরে প্রায় 730,000টি বীজ জন্মায়। এই 730,000 বীজ থেকে 730,000 সরিষা গাছের জন্ম হওয়া সম্ভব। একটি স্ত্রী স্যামন মাছ প্রজনন ঋতুতে প্রায় 3 কোটি ডিম পাড়ে। ডারউইনের মতে, এক জোড়া হাতি থেকে উদ্ভূত সকল হাতি বেঁচে থাকলে 750 বছরে হাতির সংখ্যা হবে এক কোটি নব্বই লাখ।

(b) সীমিত খাদ্য ও বাসস্থান: ভূপৃষ্ঠের আয়তন সীমাবদ্ধ হওয়ায় জীবের বাসস্থান এবং খাদ্য সীমিত।

(c) অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম: জীবের জ্যামিতিক ও গাণিতিক হারে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় এবং খাদ্য ও বাসস্থান সীমিত থাকায় জীবকে বেঁচে থাকার জন্য কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। ডারউইন এ ধরনের সংগ্রামকে 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' বলে অভিহিত করেন। ডারউইন লক্ষ করেন যে জীবনে তিনটি পর্যায়ে এই সংগ্রাম করতে হয়। সেগুলো হচ্ছে:

(i) আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম (interspecific struggle): উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ব্যাঙ কীটপতঙ্গ খায়, অন্যদিকে সাপ ব্যাঙদের খায়। আবার, ময়ূর সাপ এবং ব্যাঙ দুটোকেই খায়- এভাবে নিতান্ত জৈবিক কারণেই বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্কের একটি নিষ্ঠুর জীবনসংগ্রাম গড়ে ওঠে।

(ii) অন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম (intraspecific struggle): একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যদের খাদ্য এবং বাসস্থান একই রকমের হওয়ায় এদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এরা নিজেদের মধ্যেই বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতা শুরু করে; উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে একটি দ্বীপে তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা বেড়ে গেল খাদ্য এবং বাসস্থান সীমিত থাকায় তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যেই সংগ্রাম শুরু করে। সবল প্রাণীগুলো দুর্বল প্রাণীদের প্রতিহত করে গ্রাসাচ্ছাদন করে। ফলে দুর্বল প্রাণীগুলো কিছুদিনের মধ্যেই অনাহারে মারা পড়ে।

(iii) পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম (struggle with environment): বন্যা, খরা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বালিঝড়, ভূমিকম্পন, অগ্ন্যুৎপাত— এ ধরনের প্রতিকূল পরিবেশ জীবের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে। সুতরাং জীবকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রতিনিয়ত এসব প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। যে প্রাণীগুলো এই পরিবেশে টিকে থাকতে পারে, তারা বেঁচে থাকে অন্যরা বিলুপ্ত হয়ে যায়। উদাহণরস্বরূপ বলা যায় যে উত্তর এবং মধ্য আমেরিকার কোয়েল পাখি প্রচণ্ড ঠান্ডা ও তুষারপাতের ফলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

(d) প্রকরণ বা জীবদেহে পরিবর্তন: চার্লস ডারউইনের মতে, পৃথিবীতে দুটি জীব কখনোই অবিকল একই ধরনের হয় না। যত কমই হোক এদের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকে। জীব দুটির মধ্যে যে

পার্থক্য দেখা যায়, তাকে প্রকরণ (variety) বা পরিবৃত্তি (mutation) বলে। অনুকূল প্রকরণ অস্তিত্বের জন্য জীবনসংগ্রামে একটি জীবকে সাহায্য করে।

(e) প্রাকৃতিক নির্বাচন: ডারউইন তত্ত্বের এই প্রতিপাদ্যটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। 'অনুকূল (বা অভিযোজনমূলক) প্রকরণ সমন্বিত জীবেরা অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, এই প্রক্রিয়াকে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে।' অনুকূল প্রকরণ সমন্বিত জীবেরা প্রকৃতির দ্বারা নির্বাচিত হয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যা বেঁচে থাকে এবং অত্যধিক হারে বংশবিস্তার করে। অপরদিকে, প্রতিকূল প্রকরণসম্পন্ন জীবেরা প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না। ফলে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়।

ডারউইনের মতবাদ অনুসারে পরিবর্তিত পরিবেশে যে জীবটি খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তাকে "যোগ্য" আখ্যা দিয়ে অনেক সময় সহজ করে বলা হয়, যোগ্য জীবটি পরিবেশে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে টিকে থাকবে।

(f) নতুন প্রজাতির উৎপত্তি: যেসব প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে সুবিধাজনক প্রকরণ দেখা যায়, প্রকৃতি তাদের নির্বাচন করে এবং তাদের লালন করে। সুবিধাজনক প্রকরণযুক্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদ পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে এবং অযোগ্যদের তুলনায় বেশি হারে বংশবিস্তার করতে পারে। উত্তরাধিকার সূত্রে এদের বংশধরদের মধ্যে প্রকরণগুলো যায়। এই বংশধরদের মধ্যে আবার যাদের সুবিধাজনক প্রকরণ বেশি থাকে, প্রকৃতি আবার তাদের নির্বাচন করে। এভাবে যুগ-যুগান্তর ধরে নির্বাচিত করে করে প্রকৃতি প্রাণী ও উদ্ভিদের নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করে।

বর্তমানে বংশগতিবিদ, কোষতত্ত্ববিদ এবং শ্রেণিবিদগণ নতুন প্রজাতির উৎপত্তির বিষয়ে বংশগতিবিদ্যা মতবাদের এবং বিবর্তন তত্ত্বের ভিত্তিতে বলেন, তিনটি ভিন্ন উপায়ে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হতে পারে:

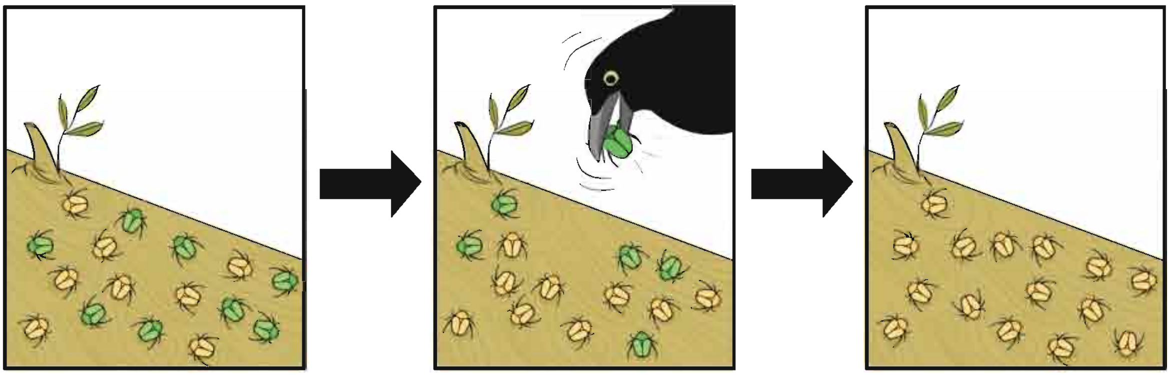

চিত্র 12.13: দুটি জীবের মধ্যে প্রতিযোগিতার ক্রমচিত্র। সবুজ বিটল পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারেনি বলে সহজে পাখিদের বেশি চোখে পড়েছে এবং তাদের খাদ্য হিসেবে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে এবং বাদামি বিটল টিকে গিয়েছে।

(a) মূল প্রজাতির থেকে পৃথক হয়ে (isolation) যাওয়ার ফলে

(b) সংকরায়ণের (hybridization) ফলে এবং

(c) সংকরায়ণ প্রজাতিতে কোষ বিভাজনের সময় ঘটনাক্রমে কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা বৃদ্ধির (Polyploidy) ফলে। এর ফলে নতুন জীবটির অভিযোজন ঘটবে এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা একটি নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হবে।

প্রজাতির টিকে থাকায় বিবর্তনের গুরুত্ব:

বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির উদ্ভবকালে দেখা যায় অনেক প্রজাতি কালের গর্ভে হারিয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে ডাইনোসরের কথা বলা যায়। দেখা গেছে সময়ের সাথে যে প্রজাতিটির টিকে থাকার ক্ষমতা যত বেশি, সে বিবর্তনের আবর্তে তত বেশি দিন টিকে থাকতে পারে। অর্থাৎ যে পরিবেশ, জীবনপ্রবাহ ও জনমিতির মানদণ্ডে বিবর্তনে যে যত বেশি খাপ খাওয়াতে পারবে, সেই প্রজাতিটি টিকে থাকবে। বিবর্তনের পথে খাপ খাওয়ানোর এই প্রক্রিয়াকে অনেক ক্ষেত্রে অভিযোজন (adaptation) বলা হয়।

বিবর্তন যে শুধু প্রকৃতির কোলে ঘটে, তা নয়। গবেষণাগারে পরীক্ষামূলকভাবে বিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। এটিও বিবর্তনের বাস্তবতার প্রমাণ। বিবর্তনের বিপক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। জীবজগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যতই সমৃদ্ধ হচ্ছে, বিবর্তনকে অস্বীকার করা ততই অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

1. RNA কী?
2. জিন কী ?
3. ক্রোমোজোমকে বংশগতির ভৌত ভিত্তি বলা হয় কেন?
4. অটোজোম কী?
5. থ্যালাসেমিয়া বলতে কী বুঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

1. DNA অনুলিপন কীভাবে হয় চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

1. ইউরাসিল কোথায় পাওয়া যায়?

ক. ডি এন এ খ. আর এন এ
গ. জিন ঘ. লোকাস

2. আর এন এ-তে থাকে—

i. রাইবোজ শর্করা
ii. অজৈব ফসফেট
iii. নাইট্রোজেনঘটিত বেস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পরবর্তী চিত্রের আলোকে 3 ও 4 নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

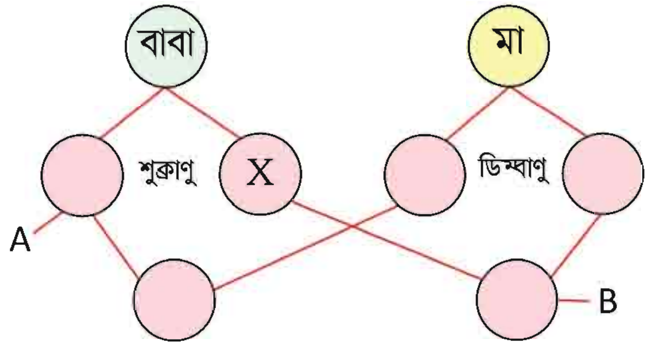

3. উদ্দীপকে X অবস্থায় ক্রোমোজোমের সংখ্যা কয়টি থাকে?

ক. 46টি খ. 44টি
গ. 23টি ঘ. 22টি

4. উদ্দীপকের A এবং B তে কোন ধরনের লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম আছে?

ক. X XY
খ. X XX
গ. Y XX
ঘ. Y XY

সৃজনশীল প্রশ্ন

1. সিফাত একজন কৃষক। তার দুইটি কন্যাসন্তান রয়েছে। বড় কন্যাটি দেখতে হুবহু বাবার মতো এবং ছোট কন্যাটির চুল, গায়ের রং বাবার মতো হলেও দেখতে মায়ের মতো। সম্প্রতি তাঁর আরও একটি কন্যাসন্তান হওয়াতে সে তার স্ত্রীর উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ। গ্রামের স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে সে জানতে পারে সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে তার স্ত্রীর কোনো ভূমিকা নেই।

ক. বংশগতিবিদ্যা কী ?
খ. অনুলিপন বলতে কী বুঝায়?
গ. সিফাতের সন্তানদের ক্ষেত্রে এরূপ শারীরিক গঠনগত ভিন্নতার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সিফাতের ক্ষুব্ধ হওয়াটা অযৌক্তিক কেন? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

2. সোহেল টেলিভিশনের একটি চ্যানেলে দেখতে পেল যে ব্রাজিলের একটি শহরে পোষা বিড়ালের মেলা হচ্ছে। সে দেখল, একই প্রজাতি হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন বিড়ালের আকার, রং, বর্ণ ভিন্ন। পরবর্তী সময়ে একদিন সে দেখে, বন্য পরিবেশে বিড়ালের বেড়ে ওঠার চিত্র। এ সম্পর্কে জানতে চাইলে তার বাবা তাকে বিবর্তন ও অভিযোজন সম্পর্কে ধারণা দেন।

ক. লোকাস কী?
খ. অভিযোজন বলতে কী বুঝায়?
গ. সোহেলের দেখা প্রাণীগুলোর ভিন্নতার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের প্রথম পরিবেশের প্রাণীকে যদি দ্বিতীয় পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে কী ঘটবে—বিশ্লেষণ কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জীবের পরিবেশ

জীবের চারপাশের জড় এবং জীবজ সবকিছু মিলেই জীবের পরিবেশ গঠিত হয়। আলো, বাতাস, ঝড়-বৃষ্টি, মাটি, পানি যেমন একটি জীবের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি তাকে ঘিরে যে জীবজগৎ থাকে, তার প্রভাবও ঐ জীবের জীবনে সমান গুরুত্বপূর্ণ। একটি জীব তার জীবনধারণের বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব পদক্ষেপ নেয়, সেগুলো অবশ্যই একই পরিবেশে বসবাসকারী অন্য জীবের জীবনে প্রভাব ফেলে। জীবজগতে খাদ্যশিকল কিংবা খাদ্যজাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেগুলোকে বাদ দিয়ে জীবের অস্তিত্বের কথা কল্পনা করা যায় না।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- বাস্তুতন্ত্র ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।
- খাদ্যশৃঙ্খল ও খাদ্যজাল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ ও পুষ্টি উপাদানের সম্পর্ক তুলনা করতে পারব।
- ট্রফিক লেভেলের মধ্যে শক্তির সম্পর্ক তুলনা করতে পারব।
- শক্তি পিরামিডের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্যশিকল সীমিত রাখতে শক্তি পিরামিডের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীববৈচিত্র্য এবং জীববৈচিত্র্যের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারব।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিভিন্ন জীবের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ও আন্তঃনির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশ সংরক্ষণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- একটি নির্বাচিত এলাকার উৎপাদক, খাদক, বিয়োজক এবং ভৌত পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারব।
- একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের উপাদানসমূহ দূষিত হওয়ার কারণ নির্ণয় করতে পারব।
- বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ, খাদ্যশিকল, খাদ্যজালের প্রবাহচিত্র অঙ্কন করতে সক্ষম হব।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বাস্তুতন্ত্রের উপাদানের অবদান উপলব্ধি করতে পারব এবং এর সংরক্ষণে সচেতন হব।

13.1 বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem)

পৃথিবীর সব জীব, জড় ও ভৌত অবস্থা— সবকিছু মিলেই আমাদের পরিবেশ। জীব সক্রিয়ভাবে জড়জগৎ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে তার জীবন অতিবাহিত করে এবং বর্জ্য পদার্থ হিসেবে বা মৃত্যুর পর পরিবেশে মিশে গিয়ে সে সব গৃহীত উপাদান আবার জড় পরিবেশেই ফিরিয়ে দেয়। সবুজ উদ্ভিদ বায়ু থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং মাটি থেকে পানি সংগ্রহ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তাদের প্রধান খাদ্য কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) তৈরির সময় অক্সিজেন ত্যাগ করে। উদ্ভিদ এবং প্রাণী মিলিয়ে পুরো জীবজগতের শ্বসনের জন্য যতটুকু অক্সিজেন প্রয়োজন, তার একটি বড় অংশ আসে এই সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া থেকে। সবুজ-অসবুজ এই দুই ধরনের উদ্ভিদই মাটি বা পানি থেকে কিছু খনিজ লবণ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। তৃণভোজী প্রাণীরা নানাভাবে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ খেয়ে বাঁচে। বিভিন্ন স্তরের মাংসাশী প্রাণীরা তৃণভোজী বা অন্যান্য ক্ষুদ্রতর মাংসাশী প্রাণীদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। সকল প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ পরিবেশেই মিশে যায়। তাছাড়া মৃত্যুর পর উদ্ভিদ আর প্রাণীর দেহ পচনক্রিয়ার মাধ্যমে আবার পরিবেশেই ফিরে যায়। এই পচানোর কাজটি করে ব্যাকটেরিয়াসহ কিছু অণুজীব। এভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য প্রাকৃতিক নিয়মেই বজায় থাকে।

প্রাকৃতিক পরিবেশে উদ্ভিদ এবং প্রাণী এই দুই ধরনের জীবের সাথে জড় পদার্থের মধ্যে যে শক্তি আর বস্তুর আদান-প্রদান হয়, তাকে বলা হয় মিথস্ক্রিয়া, আর এ ধরনের মিথস্ক্রিয়ায় আন্তঃসম্পর্ক ঘটে, পৃথিবীর এরকম যেকোনো অঞ্চলই হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem)। সুতরাং বাস্তুতন্ত্র বলতে ভূপৃষ্ঠের এমন কোনো একককে বোঝায়, যেখানে জড়, খাদ্য উৎপাদনকারী সবুজ উদ্ভিদ, খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল কিছু প্রাণী এবং মৃত জীবদেহকে পরিবেশে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য অণুজীব রয়েছে এবং এসব উপাদানের মধ্যে যথাযথ আন্তঃসম্পর্ক বর্তমান। জীবজগতের পুষ্টি এবং অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার বিভিন্ন উপাদানের উৎস হিসেবে মাটি, পানি ও বায়ুর প্রয়োজন হয়।

13.1.1 বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহ

জীব সম্প্রদায়, পরিবেশের জড় পদার্থ এবং ভৌত পরিবেশ মিলেই কোনো স্থানের বাস্তুতন্ত্র গড়ে ওঠে। এই তিনটি প্রধান উপাদানের প্রত্যেকটিতে রয়েছে আবার অনেক ধরনের ছোট ছোট উপাদান এবং জীব উপাদানগুলো সবচেয়ে বৈচিত্র্যময়।

(a) জড় উপাদান (Nonliving matters)

পরিবেশের জড় পদার্থগুলো জীব উপাদানের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করে, শ্বসনের জন্য অক্সিজেন যোগায় এবং বেশ কিছু পুষ্টি উপাদানও সরবরাহ করে। বাস্তুতন্ত্রের সকল জড় উপাদানকে আবার অজৈব এবং

জৈব এই দুভাগে ভাগ করা যায়।

(i) অজৈব বস্তু (Inorganic matters): পানি, বায়ু, ও মাটিতে অবস্থিত খনিজ পদার্থ অর্থাৎ যেসব পদার্থ কোনো জীবদেহ থেকে আসেনি, বরং জীবের উদ্ভবের আগেই পরিবেশে ছিল, সেগুলো বাস্তুতন্ত্রের অজৈব উপাদান। যেমন, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, লৌহ, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি।

(ii) জৈব বস্তু (Organic matters): উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ বা এসব জীবের মৃতদেহ থেকে যেসব জড় বস্তু বাস্তুতন্ত্রে যোগ হয়, তাদের বলা হয় জৈব উপাদান। এগুলো সচরাচর হিউমাস নামে পরিচিত। হিউমাসের উপাদানের মধ্যে আছে ইউরিয়া, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বিভিন্ন কোষ, টিস্যু, অঙ্গ ইত্যাদি। জৈব বস্তু উদ্ভিদের জন্য বেশি পুষ্টিকর। তাই উদ্ভিদ চাষে বেশি করে জৈব সার দিতে হয়। বহু প্রাণীও হিউমাসসমৃদ্ধ মাটি বেশি পছন্দ করে।

(b) ভৌত উপাদান (Physical components)

পরিবেশে সূর্যালোকের পরিমাণ, তাপমাত্রা, বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, বায়ুর চাপ এবং বায়ুপ্রবাহ, ভূপৃষ্ঠ বা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গভীরতা (মাটির নিচে বা পানির নিচে) এবং উচ্চতা ইত্যাদি বহু উপাদান বাস্তুতন্ত্রকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। এসব উপাদান মিলে গড়ে ওঠে কোনো অঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ু। এসবই হচ্ছে কোনো বাস্তুতন্ত্রের ভৌত উপাদান।

(c) জীবজ উপাদান (Living components)

জীবকুল বাস্তুতন্ত্রের সক্রিয় উপাদান। এরাই তাদের কাজের মাধ্যমে পরিবেশে বিভিন্ন পরিবর্তন আনে। পরিবেশের জীবজ উপাদানগুলো প্রধানত তিন প্রকার— উৎপাদক, খাদক ও বিয়োজক।

(i) উৎপাদক (producer): সবুজ উদ্ভিদ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং মাটি থেকে পানি সংগ্রহ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তাদের প্রধান খাদ্য কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) তৈরি করে। এ সময় উপজাত হিসেবে উদ্ভিদ অক্সিজেন ত্যাগ করে। তাই সালোকসংশ্লেষণ হচ্ছে বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদন প্রক্রিয়া, উৎপাদক হলো সবুজ উদ্ভিদকুল। এই উৎপাদক উদ্ভিদগুলোকে অন্য কথায় বলা হয় স্বভোজী (Autotroph)। কারণ তারা নিজের খাবার নিজেরাই তৈরি করতে পারে, অন্য কোনো জীবের উপর খাদ্যের জন্য নির্ভর করতে হয় না।

(ii) খাদক (Consumer): কোনো প্রাণীই পরিবেশের জড় পদার্থ থেকে খাদ্য তৈরি করতে পারে না। তারা খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবুজ উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। তাই এদের বলা হয় পরভোজী জীব। যেসব প্রাণী সরাসরি উদ্ভিদ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে, তাদেরকে বলা হয় তৃণভোজী প্রাণী (herbivorous)। এদের অপর নাম প্রথম শ্রেণির খাদক। ঘাস ফড়িং, মুরগি, গরু, ছাগল, হরিণ ইত্যাদি প্রথম শ্রেণির খাদক।

যেসব প্রাণী তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাদের বলা হয় গৌণ খাদক বা দ্বিতীয় শ্রেণির খাদক। এরা এক ধরনের মাংসাশী প্রাণী। ব্যাঙ, শিয়াল, বাঘ ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণির খাদক।

যেসব প্রাণী গৌণ খাদকদের খেয়ে বাঁচে তারাও মাংসাশী প্রাণী (carnivorous)। এদের বলা যায় তৃতীয় শ্রেণির বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ খাদক। সাপ, ময়ূর, বাঘ ইত্যাদি এই শ্রেণির খাদক। একটি বিশেষ শ্রেণির খাদক জীবন্ত প্রাণীর চেয়ে মৃত প্রাণীর মাংস বা আবর্জনা খেতে বেশি পছন্দ করে। যেমন: কাক, শকুন, শিয়াল, হায়েনা ইত্যাদি। এদের নাম দেওয়া হয়েছে আবর্জনাভুক বা ধাঙড় (scavenger)। কারণ এরা মৃতদেহ বা আবর্জনা খেয়ে পরিবেশ পরিষ্কার রাখে। উল্লেখ্য, কখনো কখনো বাস্তুতন্ত্রে এমন প্রাণী দেখা যায়, যারা একাই বিভিন্ন স্তরের খাদক হিসেবে ভূমিকা রাখে। যেমন: মানুষ একই তৃণভোজী এবং মাংসাশী (omnivorous)।

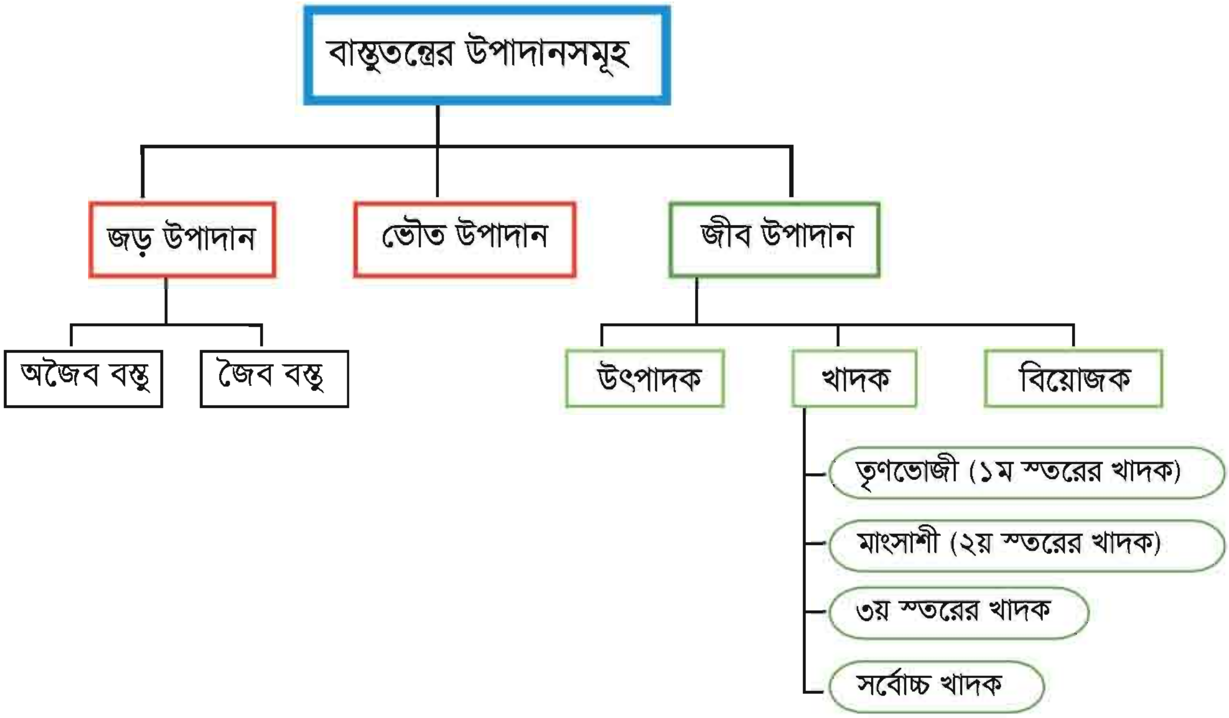
বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহ
জড় উপাদান
ভৌত উপাদান
জীব উপাদান
অজৈব বস্তু
জৈব বস্তু
উৎপাদক
খাদক
বিয়োজক
তৃণভোজী (১ম স্তরের খাদক)
মাংসাশী (২য় স্তরের খাদক)
৩য় স্তরের খাদক
সর্বোচ্চ খাদক

চিত্র 13.01: বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহ (ছক আকারে)

(iii) বিয়োজক (Decomposer): ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি অতিক্ষুদ্র জীব বা অণুজীব, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ এবং মৃতদেহ থেকে তাদের খাদ্য গ্রহণ করে এবং পরিণামে এসব বর্জ্য বিয়োজিত হয়ে মাটি বা পানির সাথে মিশে যায়। এই মিশে যাওয়া উপাদান তখন উদ্ভিদের পক্ষে আবার খাদ্য উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। তাই এই অণুজীবগুলোকে বলা হয় বিয়োজক বা পরিবর্তক।

13.2 পুকুরের বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem of a pond)

জলভাগের বাস্তুতন্ত্র কাছে থেকে ভালো করে দেখার জন্য সবচেয়ে উপযোগী হচ্ছে পুকুর। পুকুরে বসবাসরত জীব ও জড় পদার্থের নিবিড় সম্পর্ক ভালোভাবে বোঝা যায়। জড় উপাদানগুলো হলো বিভিন্ন প্রকার জৈব এবং অজৈব পদার্থ, পানি, সূর্যালোক, কার্বন ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি। সজীব উপাদানগুলোর মধ্যে আছে উৎপাদক, প্রথম স্তরের খাদক, দ্বিতীয় স্তরের খাদক তৃতীয় স্তরের খাদক এবং বিভিন্ন রকম বিয়োজক।

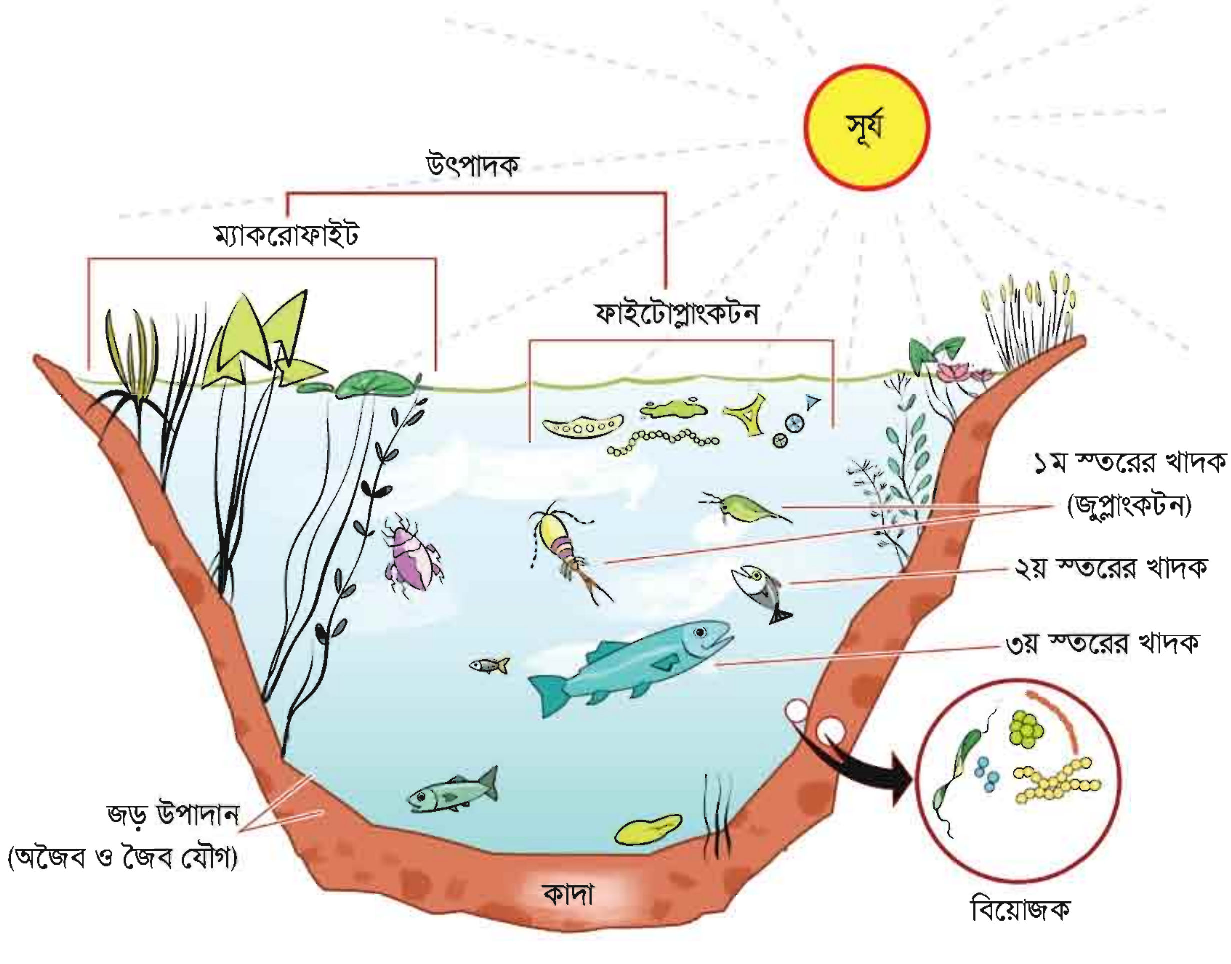
সূর্য
উৎপাদক
ম্যাকরোফাইট
ফাইটোপ্লাংকটন
১ম স্তরের খাদক
(জুপ্লাংকটন)
২য় স্তরের খাদক
৩য় স্তরের খাদক
জড় উপাদান
(অজৈব ও জৈব যৌগ)
কাদা
বিয়োজক

চিত্র 13.02: একটি পুকরের বাস্তুতন্ত্র

(a) উৎপাদক: উৎপাদক হচ্ছে সালোকসংশ্লেষণকারী বিভিন্ন প্রকার শৈবাল ও অগভীর পানির উদ্ভিদ। পানিতে ভাসমান ক্ষুদ্র জীবদের প্ল্যাংকটন বলে। ফাইটোপ্লাংকটন বা উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন সবুজ জলজ শৈবাল ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে। তাই এদের উৎপাদক বলে।

(b) প্রথম স্তরের খাদক: নানা ধরনের ভাসমান ক্ষুদে পোকা, মশার শূককীট, অতিক্ষুদ্র প্রাণী, জুপ্ল্যাংকটন ছাড়াও রুই, কাতলা মাছও প্রথম স্তরের খাদক। ভাসমান ক্ষুদ্র প্রাণীদের জুপ্ল্যাংকটন বলে। এ খাদকগুলো নিজেরা খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না, তাই সরাসরি উৎপাদককে ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে।

(c) দ্বিতীয় স্তরের খাদক: ছোট মাছ, কিছু জলজ পতঙ্গ, ব্যাঙ প্রভৃতি দ্বিতীয় স্তরের খাদক। এরা নিজে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না এবং উৎপাদককেও খাদ্য হিসেবে সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। এরা প্রথম স্তরের খাদকদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

(d) তৃতীয় স্তরের খাদক: যেসব খাদক ছোট মাছ, চিংড়ি ইত্যাদি দ্বিতীয় স্তরের খাদককে ভক্ষণ করে তাদের তৃতীয় স্তরের খাদক বলে। শোল, বোয়াল, ভেটকি প্রভৃতি বড় মাছ, বক ইত্যাদি হচ্ছে তৃতীয় স্তর বা সর্বোচ্চ খাদক।

(e) বিয়োজক: পুকুরের পানিতে বহু ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া মৃতজীবী হিসেবে বাস করে। এদের বিয়োজক বলে। এরা পানিতে ভাসমান বা পানির তলায় কাদার মধ্যে বাস করে। এরা জীবিত বা মৃত প্রাণীদের আক্রমণ করে এবং পচনে সাহায্য করে। ফলে উৎপাদকের ব্যবহার উপযোগী জৈব ও অজৈব রাসায়নিক পদার্থ পুনরায় সৃষ্টি হয়। এসব বিয়োজিত উপাদানগুলো আবার পুকুরের উৎপাদক শ্রেণির জীব ব্যবহার করে।

13.3 খাদ্যশিকল বা খাদ্যশৃঙ্খল (Food chain)

উৎপাদক হিসেবে সবুজ উদ্ভিদ যেকোনো বাস্তুতন্ত্রের জীব উপাদানগুলোর মধ্যে সবার প্রথম কাজে নামে। তারা খাদ্য তৈরি না করলে তৃণভোজী প্রাণী এবং মাংসাশী প্রাণীরা খাদ্যসংকটে পড়ে মারা যেত। যখন খাদ্য শক্তি উৎপাদক থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের খাদকদের মধ্যে প্রবাহিত হয়, তখন সেই প্রবাহকে এক সাথে খাদ্যশিকল বা খাদ্যশৃঙ্খল বলা হয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় মাঠের সবুজ ঘাস হচ্ছে উৎপাদক। ঘাসফড়িং সে ঘাসের অংশবিশেষ খেয়ে বাঁচে। ব্যাঙ ঐ ঘাসফড়িংকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, আর সাপ সেই ব্যাঙকে আস্ত গিলে খায়। যদি মনে করা হয়, সাপটি আকারে ছোট এবং আশপাশে বেশ বড় একটি গুঁইসাপ আছে। তাহলে সুযোগ পেলে ঐ গুঁইসাপ আবার সাপটিকে গিলে খাবে। সেক্ষেত্রে খাদ্যশিকলটিকে নিচের মতো করে লেখা যাবে:

ঘাস ⟶	ফড়িং ⟶	ব্যাঙ ⟶	সাপ ⟶	গুঁইসাপ
উৎপাদক	**প্রথমস্তরের খাদক**	**দ্বিতীয়স্তরের খাদক**	**তৃতীয়স্তরের খাদক**	**সর্বোচ্চস্তরের খাদক**

বিভিন্ন ধরনের বাস্তুতন্ত্রে খাদ্যশিকল বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন শিকারজীবী খাদ্যশিকল, পরজীবী খাদ্যশিকল এবং মৃতজীবী খাদ্যশিকল।

(a) শিকারজীবী খাদ্যশিকল (Predator food chain): যে খাদ্যশিকলে প্রথম স্তরের খাদক আকারে সবচেয়ে ছোট থাকে এবং পর্যায়ক্রমে উপরের খাদকেরা নিচের স্তরের খাদকগুলো শিকার করে খায়, সেরূপ শিকলকে বলা হয় শিকারজীবী খাদ্যশিকল। উপরে বর্ণিত খাদ্যশিকলটি একটি শিকারজীবী খাদ্যশিকল।

(b) পরজীবী খাদ্যশিকল (Parasitic food chain): পরজীবী উদ্ভিদ ও প্রাণী অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের চেয়ে বড় আকারের পোষকদেহ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি পরজীবীর উপর আরেক ধরনের ক্ষুদ্রতর পরজীবী তার খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল হয়। এ ক্ষেত্রে খাদ্যশিকলের প্রথম ধাপে সবসময় সবুজ উদ্ভিদ না-ও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে শিকলটি অসম্পূর্ণ থাকে, যেমন:

মানুষ → মশা → ডেঙ্গু ভাইরাস।

উল্লেখ্য, এখানে মানবদেহের রক্ত শোষণকারী স্ত্রী এডিস মশা নিজে সেই রক্ত থেকে পুষ্টি লাভ করে না, কিন্তু তার গর্ভস্থ ডিমগুলোর বিকাশে কাজে লাগায়।

(c) মৃতজীবী খাদ্যশিকল (Saprophytic food chain): জীবের মৃতদেহ থেকে শুরু হয়ে যদি কোনো খাদ্যশৃঙ্খল একাধিক খাদ্যস্তরে বিন্যস্ত হয়, তবে সেরূপ শিকলকে বলা হয় মৃতজীবী খাদ্য শিকল। যেমন:

মৃতদেহ → ছত্রাক → কেঁচো।

বলা বাহুল্য, এই খাদ্যশিকলগুলো অসম্পূর্ণ এবং এ ধরনের শিকল বাস্তুতন্ত্রের যাবতীয় মিথস্ক্রিয়া বা আন্তঃসম্পর্কের অংশমাত্র তৈরি করে। পরজীবী ও মৃতজীবী খাদ্যশিকল সব সময়ই অসম্পূর্ণ থাকে। কারণ এখানে কোনো উৎপাদক নেই। এই উভয় প্রকার খাদ্যশিকল তাদের কার্যকারিতা বজায় রখার জন্য শিকারজীবী খাদ্যশিকলের প্রথম এক বা একাধিক স্তরের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যশিকল উৎপাদক সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার কার্যকারিতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

13.4 খাদ্যজাল (Food web)

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যশিকলে একই খাদক বিভিন্ন স্তরে স্থান পেতে পারে। এভাবে বেশ কয়েকটি খাদ্যশিকল একত্রিত হয়ে একটি জালের মতো গঠন তৈরি করে। একে খাদ্যজাল

বলে। স্থলজ ও জলজ উভয় পরিবেশের জন্য এই ঘটনা সত্য। পুকুরের বাস্তুতন্ত্রের নিচের উদাহরণটি থেকে এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

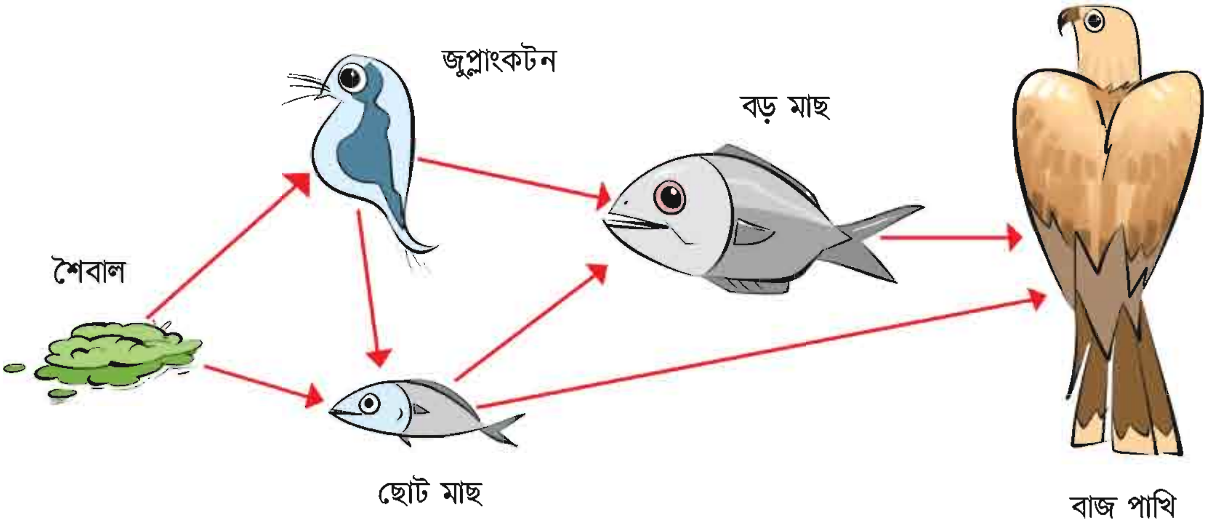

চিত্র 13.03: খাদ্যজাল

উপরের চিত্রে দেখা যায়, উৎপাদক শৈবাল জুপ্ল্যাংকটন এবং ছোট মাছকে সরাসরি খাদ্য সরবরাহ করে।

জুপ্ল্যাংকটনকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে ছোট এবং বড় মাছ উভয়ই। বড় মাছ আবার ছোট মাছকে খায়। বাজ পাখি ছোট মাছ এবং বড় মাছের একই প্রজাতির একটু ছোট সদস্যদের সহজেই খেতে পারে। এখানে পাঁচটি বিভিন্নভাবে বেশ কয়েকটি খাদ্যশিকল তৈরি করে। এভাবে যে খাদ্যজাল তৈরি হয়েছে বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে এর চেয়েও জটিল খাদ্যজাল তৈরি হতে পরে।

উপরের খাদ্যজালে মোট পাঁচটি খাদ্যশিকল পাওয়া যায়।

(a) শৈবাল ⟶ ছোট মাছ ⟶ বাজ পাখি।

(b) শৈবাল ⟶ জুপ্ল্যাংকটন ⟶ বড় মাছ ⟶ বাজ পাখি।

(c) শৈবাল ⟶ ছোট মাছ ⟶ বড় মাছ ⟶ বাজ পাখি।

(d) শৈবাল ⟶ জুপ্ল্যাংকটন ⟶ ছোট মাছ ⟶ বড় মাছ ⟶ বাজ পাখি।

(e) শৈবাল ⟶ জুপ্ল্যাংকটন ⟶ ছোট মাছ ⟶ বাজ পাখি।

বনভূমির বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যজাল হতে পারে নিম্নরূপ:

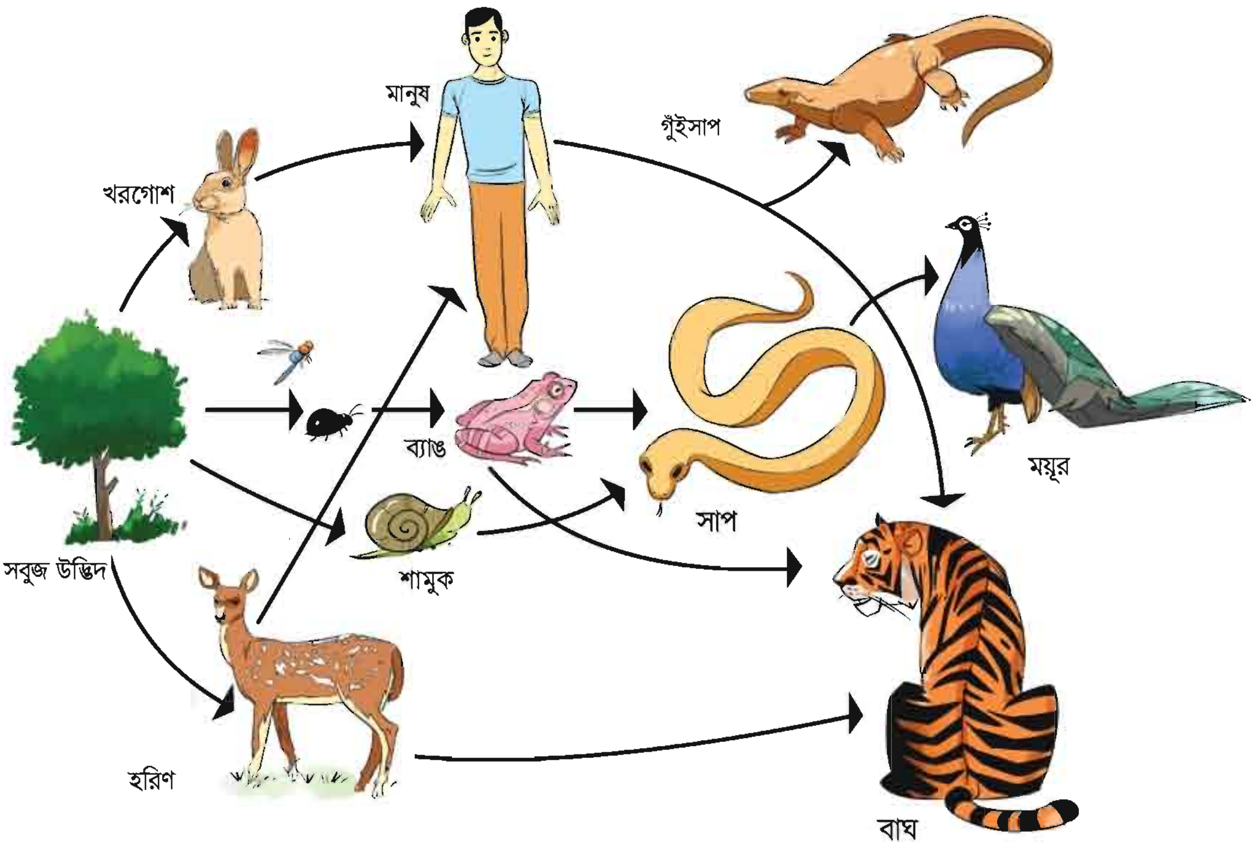

চিত্র 13.04: বনভূমির একটি খাদ্যজাল

একক কাজ

কাজ : চিত্র 13.04 এ উল্লিখিত খাদ্যজালে যেসব খাদ্যশিকল আছে তা লেখ।

বাস্তুতন্ত্রে পুষ্টিপ্রবাহ (Nutrient flow in ecosystems):

উদ্ভিদ অজৈব বস্তু গ্রহণ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করে। উদ্ভিদ যে খাদ্য তৈরি করে, তার কিছু অংশ নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করে, অবশিষ্টাংশ উদ্ভিদ দেহেই জমা থাকে। তৃণভোজী প্রাণী এসব উদ্ভিদ খায় এবং পর্যায়ক্রমে মাংসাশী প্রাণী এসব তৃণভোজীদের খায়। এসব উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের মৃত্যুর পর বিয়োজকগুলো এদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে অজৈব বস্তুতে রূপান্তরিত করে পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়। সবুজ উদ্ভিদ এসব অজৈব বস্তু গ্রহণ করে এবং পুনরায় খাদ্য প্রস্তুতে ব্যবহার করে থাকে। পুষ্টিদ্রব্যের এরূপ চক্রাকারে প্রবাহিত হওয়ার প্রক্রিয়াটিকে পুষ্টিপ্রবাহ বলে। খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে এরূপ পুষ্টির প্রবাহ বাস্তুতন্ত্রের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

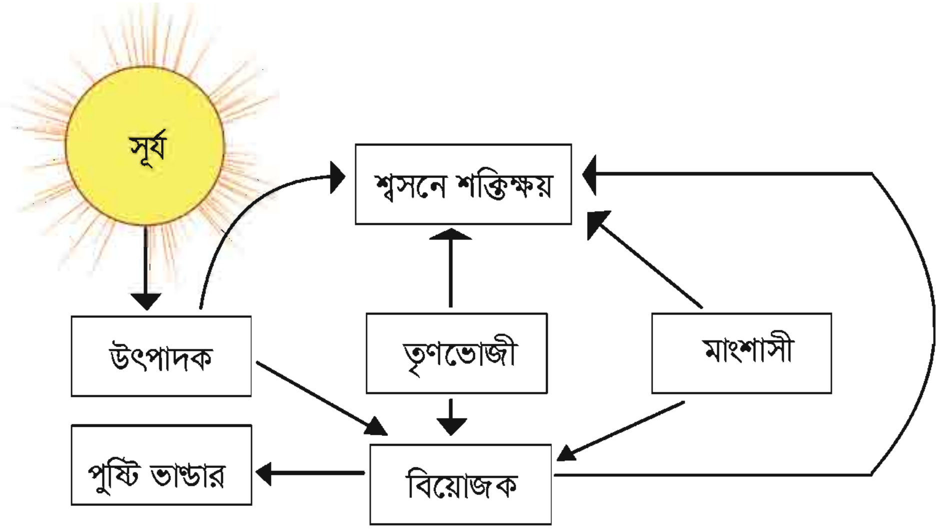

চিত্র 13.05: পুষ্টিদ্রব্য প্রবাহ এবং শক্তিপ্রবাহের সংক্ষিপ্ত চিত্র

বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ (Energy flow in the ecosystem):

যেকোনো বাস্তুতন্ত্রের শক্তির মূল উৎস সূর্য। সূর্য থেকে যে পরিমাণ আলো এবং তাপশক্তি পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় তার বড়জোড় 2% সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ ব্যবহার করে। বাস্তুতন্ত্রের পরবর্তী ধাপগুলোর জন্য প্রাথমিকভাবে শর্করায় আলো ও তাপশক্তি রাসায়নিক শক্তি হিসেবে মজুত করে। বিভিন্ন প্রকার খাদ্যশিকলের মাধ্যমে উদ্ভিদে জমা হওয়া এই শক্তি বিভিন্ন খাদ্যস্তরে পৌঁছায়। শেষ পর্যন্ত বিয়োজকের কাজের ফলে সকল শক্তি আবার পরিবেশে ফিরে আসে।

তৃণভোজী প্রাণীরা অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্রের প্রথম স্তরের খাদকেরা সবুজ উদ্ভিদের পাতা, কাণ্ড, ফুল, ফল, বীজ বা মূল খেয়ে জীবন ধারণ করে। এভাবে সবুজ উদ্ভিদে উৎপাদিত রাসায়নিক শক্তি প্রথমে তৃণভোজী প্রাণীতে পৌঁছায়। মাংসাশী প্রাণী যারা প্রথম স্তরের খাদকদের (তৃণভোজী প্রাণীদের) খেয়ে বাঁচে, তারাই দ্বিতীয় স্তরের খাদক। প্রথম স্তরের খাদক থেকে এভাবে রাসায়নিক শক্তি দ্বিতীয় স্তরের খাদকের দেহে স্থানান্তরিত হয়। একইভাবে দ্বিতীয় স্তরের খাদক থেকে রাসায়নিক শক্তি খাদ্য আকারে তৃতীয় স্তরের খাদকে পৌঁছায়। যদি তৃতীয় স্তরের খাদককে আরও উচ্চতর কোনো খাদক খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, তবে একই প্রক্রিয়ায় শক্তি সর্বোচ্চ স্তরের খাদ্যকে পৌঁছায়।

মৃত্যুর পর সব জীবের শক্তি গ্রহণ প্রক্রিয়া থেমে যায়। তখন ঐ মৃতদেহে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি বিয়োজকের কাজের ফলে ভেঙে জড় পদার্থ বা শক্তি আকারে আবার পরিবেশে ফিরে আসে। পরিবেশের বিভিন্ন জড় বস্তুর মধ্যে জমা হওয়া এই শক্তি তখন আবার উদ্ভিদের গ্রহণ উপযোগী হয়। আর এভাবে খাদ্যচক্রের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রে প্রাকৃতিক শক্তির প্রবাহ চলতে থাকে।

সব ধরনের খাদ্যশিকলেই প্রতিটি স্তরে কিছু অপচয় হয়। উৎপাদক সবুজ উদ্ভিদ থেকে তৃণভোজী প্রাণী

যতটা শক্তি গ্রহণ করে, তার শরীরে ততটা শক্তি জমা হয় না। আবার দ্বিতীয় স্তরে খাদক তৃণভোজী প্রাণীর দেহ থেকে যে পরিমাণ পুষ্টিদ্রব্য গ্রহণ করে, তার নিজের দেহে সে পরিমাণ পুষ্টি পৌঁছায় না, কিছুটা জড় পরিবেশে মুক্ত হয়। এভাবে এক জীব থেকে আরেক জীবে খাদ্যশক্তি স্থানান্তরের সময় বেশ কিছু শক্তি বাস্তুতন্ত্রের সাধারণ নিয়মেই এই তন্ত্রের বাইরে চলে যায়। এ কারণে খাদ্যশিকলে খাদ্যস্তরের সংখ্যা যত কমানো যায়, শক্তির অপচয় তত কম হয়।

ট্রফিক লেভেলের মধ্যে শক্তির সম্পর্ক :
খাদ্যশিকলের প্রতিটি স্তরকে ট্রফিক লেভেল বলে। সে হিসেবে উৎপাদক, প্রথম স্তরের খাদক, দ্বিতীয় স্তরের খাদক এবং চূড়ান্ত স্তরের খাদক প্রত্যেকেই এক একটি ট্রফিক লেভেল। বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক প্রথম বা সর্বনিম্ন ট্রফিক লেভেলের প্রতিনিধিত্ব করে। তৃণভোজী খাদক অর্থাৎ প্রথম স্তরের খাদক দ্বিতীয় ট্রফিক লেভেলের প্রতিনিধি। এভাবে নিম্ন স্তরের মাংসাশী প্রাণী তৃতীয় ট্রফিক লেভেল এবং উচ্চ পর্যায়ের মাংসাশী প্রাণী সর্বোচ্চ ট্রফিক লেভেলের প্রতিনিধিত্ব করে। কোনো খাদ্যশিকলের উৎপাদক বা সর্বনিম্ন ট্রফিক লেভেলে সূর্য থেকে যে শক্তি সংগৃহীত হয়, পরবর্তী প্রতিটি ট্রফিক লেভেলে তার কিছু অংশ তাপ হিসেবে বেরিয়ে যায়। এজন্য দেখা যায় যে উৎপাদক যে পরিমাণ শক্তি সূর্য থেকে সংগ্রহ করে তা দ্বিতীয় ট্রফিক লেভেলে এসে কমে যায়। তৃতীয় বা সর্বোচ্চ ট্রফিক লেভেলে এসে শক্তির পরিমাণ আরও কমে যায়। সাধারণত, যেকোনো বাস্তুতন্ত্রের কোনো একটি ট্রফিক লেভেলে যতটুকু শক্তি থাকে তার প্রায় 10% ঠিক উপরের ট্রফিক লেভেলে সঞ্চারিত হতে পারে। বাকি 90% তাপ হিসেবে পরিবেশে বিমুক্ত হয় কিংবা আংশিকভাবে অব্যবহৃত থেকে যায়।

শক্তি পিরামিডের ধারণা :
সমতল ভূমির উপর অবস্থিত যে ত্রিমাত্রিক বস্তুর শীর্ষদেশ ক্রমশ সরু, তাকে পিরামিড (pyramid) বলে। কোনো একটি বাস্তুতন্ত্রে ট্রফিক লেভেলের গঠন একটি পিরামিড আকারে দেখানো যায়। খাদ্যশিকলে যুক্ত প্রতিটি পুষ্টিস্তরের শক্তি সঞ্চয় ও স্থানান্তরের বিন্যাস ছককে শক্তি পিরামিড বলে। পিরামিডের সবচেয়ে নিচে উৎপাদক স্তরের শক্তির পরিমাণ পরবর্তী ট্রফিক লেভেলগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। উপরের ট্রফিক লেভেলের জীব নিচের ট্রফিক লেভেলের জীবদের চেয়ে শ্বসন এবং অন্যান্য কাজে ক্রমবর্ধমান হারে অধিক শক্তি তাপ হিসেবে হারায়। এজন্য উৎপাদক থাকে পিরামিডের ভূমিতে এবং চূড়ান্ত খাদক থাকে সবার উপরে।

খাদ্যশিকল সীমিত রাখতে শক্তি পিরামিডের প্রভাব :
শক্তির এই প্রবাহ সব সময়েই একমুখী। এ শক্তিপ্রবাহকে কখনো বিপরীতমুখী করা যায় না। প্রতিটি ধাপে প্রায় 90% ভাগ শক্তি কমে যায় বা ব্যবহারযোগ্যতা হারায়। শক্তির এ ক্রমবর্ধমান ক্ষয় খাদ্যশিকলের আকারকে 4 বা 5টি ধাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। খাদ্যশিকল যত দীর্ঘ হবে, ঊর্ধ্বতম ট্রফিক লেভেলে শক্তির পরিমাণ ততই কমতে থাকবে এবং একপর্যায়ে এসে আর কোনো শক্তিই অবশিষ্ট থাকবে না।

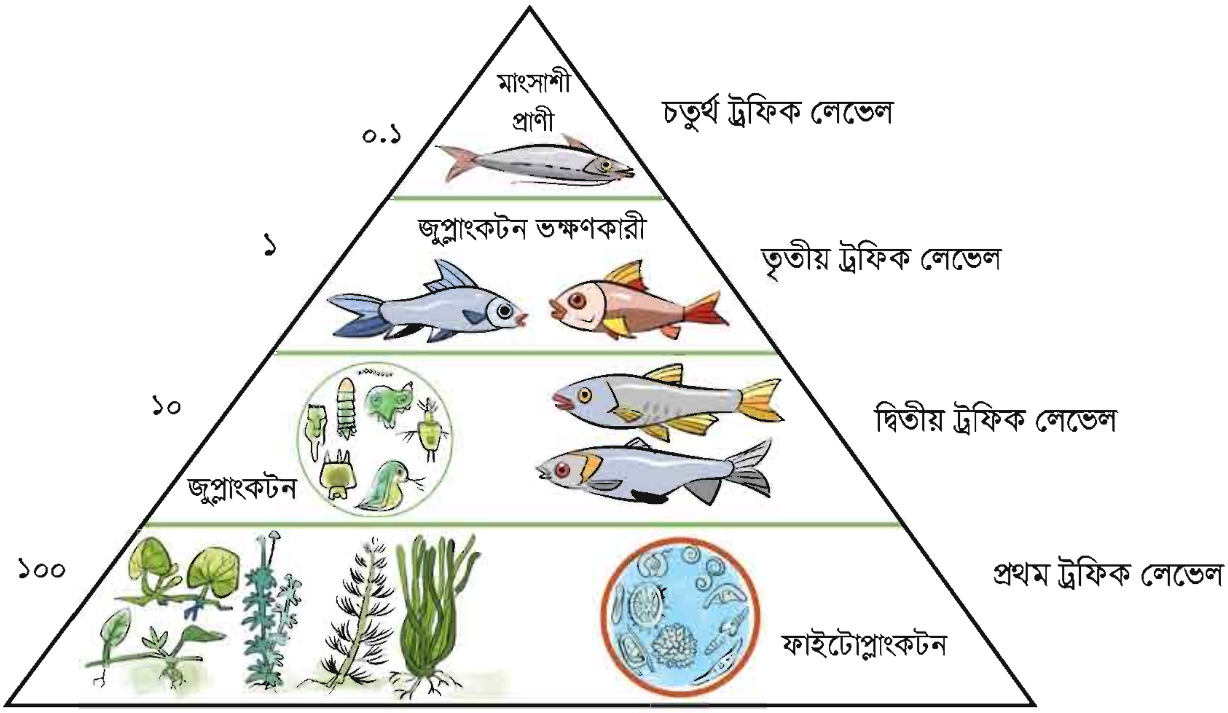
মাংসাশী প্রাণী
০.১
চতুর্থ ট্রফিক লেভেল
জুপ্লাংকটন ভক্ষণকারী
১
তৃতীয় ট্রফিক লেভেল
১০
জুপ্লাংকটন
দ্বিতীয় ট্রফিক লেভেল
১০০
ফাইটোপ্লাংকটন
প্রথম ট্রফিক লেভেল

চিত্র 13.06: শক্তির পিরামিড

13.5 জীববৈচিত্র্য (Biodiversity)

জড় ও জীব নিয়ে আমাদের পৃথিবীর পরিবেশ গঠিত। এখানে রয়েছে বহু রকমের জীব এবং অজস্র রকমের জড় পদার্থের সমাহার। আমাদের এই পৃথিবীতে কত ধরনের জীব আছে? এর সঠিক হিসাব দেওয়া খুব কঠিন, তবে প্রজাতি (যাদের দৈহিক ও জননসংক্রান্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পারস্পরিক সাদৃশ্যযুক্ত এবং যারা একই পূর্বপুরুষ হতে উদ্ভূত) তার হিসেবে একে উপস্থাপন করা অনেকটা সহজতর। এখন পর্যন্ত প্রায় তেরো লক্ষ প্রাণী-প্রজাতি এবং চার লাখের মতো উদ্ভিদ- প্রজাতির বর্ণনা এবং নামকরণ পাওয়া যায়। প্রতিটি প্রজাতি তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং সেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দিয়ে যেকোনো একটি প্রজাতি অন্যসব প্রজাতি থেকে ভিন্ন এবং শনাক্তকরণযোগ্য। যেমন কাঁঠাল একটি প্রজাতি এবং এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য দিয়ে একে অন্যান্য প্রজাতি থেকে পৃথক করা সম্ভব। জীবদের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকার কারণেই জীবজগৎকে লক্ষ লক্ষ প্রজাতিতে বিভক্ত করা সম্ভব হয়েছে। আবার মানুষ একটি প্রজাতি। বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় সাতশ কোটি মানুষের বাস। এরা সবাই হুবহু একই রকম নয়, কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্যে এরা পরস্পর পৃথক। অর্থাৎ একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যেও বৈচিত্র্য থাকে। তাই সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়, পৃথিবীতে বিরাজমান জীবগুলোর প্রাচুর্য এবং ভিন্নতাই হলো জীববৈচিত্র্য (Biodiversity)।

13.5.1 জীববৈচিত্র্যের প্রকারভেদ

জীববৈচিত্র্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, প্রজাতিগত বৈচিত্র্য (Species diversity), বংশগতীয় বৈচিত্র্য (Genetical diversity) এবং বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য (Ecosystem diversity)।

প্রজাতিগত বৈচিত্র্য: প্রজাতিগত বৈচিত্র্য বলতে সাধারণত পৃথিবীতে বিরাজমান জীবগুলোর মোট প্রজাতির সংখ্যাকেই বুঝায়। পৃথকযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কারণেই এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতি ভিন্নতর হয়। যেমন, বাঘের সাথে হরিণের আকার, স্বভাব, হিংস্রতা, সংখ্যা বৃদ্ধির ধরন ভিন্ন হয়ে থাকে। এক প্রজাতির সাথে অন্য প্রজাতির বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্নতাই প্রজাতিগত বৈচিত্র্য।

বংশগতীয় বৈচিত্র্য: একই প্রজাতিভুক্ত সদস্যগণের মধ্যেও অনেক বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন একই প্রজাতি কিন্তু তাদের গড়ন, আকার, রোগ-প্রতিরোধ এবং পরিবেশ প্রতিকূলতা সহ্য করার ক্ষমতা ভিন্ন। এই পার্থক্যগুলো তৈরি হয় তাদের জিন সংগঠনের সামান্য বৈচিত্র্যের কারণে। কারণ জিনের মাধ্যমেই জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের জন্য নির্দিষ্ট জিন থাকে। বিভিন্ন কারণে এই জিনের গঠন এবং বিন্যাসের পরিবর্তন হয়ে জীবের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় এবং নতুন প্রজাতির উদ্ভব হতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় জীবের মধ্যে যে বৈচিত্র্য ঘটে, তাকেই বলা হয় বংশগতীয় বৈচিত্র্য।

বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য: একটি বাস্তুতন্ত্রের ভৌত উপাদান, রাসায়নিক উপাদান এবং জৈবিক উপাদানগুলোর মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন দেখা দিলে সেখানকার বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটে। এসব পরিবর্তন অবশ্যই ধীর এবং ধারাবাহিক। এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য সেখানে বসবাসরত জীবের মধ্যেও পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে যে জীববৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়, তাকেই বলা হয় বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য। একটি ছোট পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে যেসব উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বসতি গড়ে উঠে তা নদীর বাস্তুতন্ত্র থেকে ভিন্নতর। বন, তৃণভূমি, হ্রদ, নদী, জলাভূমি, পাহাড়, সাগর, মরুভূমি প্রভৃতি বাস্তুতন্ত্রে গড়ে উঠে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ এক একটি জীব সম্প্রদায়।

বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের প্রভাব:

পরিবেশের উপাদানগুলো পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্যই এই জটিল সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিপুলসংখ্যক জীবের তৎপরতার মধ্য দিয়ে পরিবেশে এই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবেশের কেবল একটি বিশেষ প্রজাতির বিলুপ্তি বিরাট বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। সে কারণে পরিবেশ স্থিতিশীল রাখার জন্য জীববৈচিত্র্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবেশের যেসব জীব বা প্রাণীকে এক সময় অপ্রয়োজনীয় এবং অবাঞ্ছিত মনে করা হতো, সময়ের বিবর্তনে দেখা গেছে সেগুলোই পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এক সময় যুক্তরাষ্ট্রের চেসাপিক উপকূলে ছিল অসংখ্য ঝিনুক। সেগুলো মাত্র তিন দিনে গোটা এলাকার পানি পরিশুদ্ধ

করতে পারত। কিন্তু এখন সেই ঝিনুকের শতকরা ৯৯ ভাগ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে অবশিষ্ট ঝিনুকেরা এখন এক বছরেও ঐ পানি আর পরিশুদ্ধ করতে পারে না। এ কারণে ঐ উপকূলের পানি ক্রমশই কর্দমাক্ত হচ্ছে এবং পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। একটি পূর্ণবয়স্ক ব্যাঙ একদিনে তার ওজনের সমপরিমাণ পোকা-মাকড় খেয়ে ফেলতে পারে। এই পোকা-মাকড় আমাদের ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। কিন্তু নানা ধরনের কীটনাশক ব্যবহারের ফলে ব্যাঙ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পাখিদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে কীটপতঙ্গ। এর মধ্যে মানুষ এবং ফসলে জন্য ক্ষতিকর কীটপতঙ্গই বেশি। তাছাড়া পরাগায়নের ক্ষেত্রেও পাখির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পেঁচা, ঈগল, চিল এবং বাজপাখিকে আমরা শিকারি প্রজাতি বলে জানি। এরা ইঁদুর খেয়ে ইঁদুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখে। মানুষের বসতবাড়িতে বসবাসকারী একজোড়া ইঁদুর বিনা বাধায় বংশ বিস্তার করলে বছর শেষে ইঁদুরের সংখ্যা দাঁড়াবে ৪৪০ টিতে। কিন্তু একটি পেঁচা দিনে কমপক্ষে তিনটি ইঁদুর খেয়ে হজম করতে পারে। শকুন, চিল এবং কাক প্রকৃতির জঞ্জাল সাফ না করলে রোগ জীবাণুতে পৃথিবী সয়লাব হয়ে যেত।

সে কারণে কোনো জীবকেই অপ্রয়োজনীয় বলা যায় না। পরিবেশ থেকে কোনো প্রজাতি বিলুপ্ত হলে বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

চিত্র 13.07: শকুন, চিল এবং কাক নিয়মিতভাবে প্রকৃতির জঞ্জাল পরিষ্কার করে।

13.5.2 বিভিন্ন জীবের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া, আন্তঃনির্ভরশীলতা ও পরিবেশের ভারসাম্যতা

সাধারণত সবুজ উদ্ভিদকে স্বনির্ভর বলা হয়, কারণ তারা স্বভোজী (Autotrophic), কিন্তু পরিবেশতান্ত্রিক দিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যায়, সবুজ গাছপালাসহ কোনো জীবই স্বনির্ভর নয়। গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য জীবজন্তু একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত এবং কমবেশি নির্ভরশীল।

একটি সপুষ্পক উদ্ভিদ পর-পরাগায়নের জন্য (Cross pollination) কীটপতঙ্গের উপর এবং বীজ বিতরণের জন্য পশুপাখির উপর নির্ভরশীল। জীবকুল শ্বসনক্রিয়া দিয়ে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস ত্যাগ করে সবুজ উদ্ভিদকুল সালোকসংশ্লেষণের জন্য তা ব্যবহার করে। আবার সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যে অক্সিজেন (O_2) গ্যাস ত্যাগ করে, শ্বসনের জন্য জীবকুল সেটি ব্যবহার করে। তাছাড়া ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং বিভিন্ন প্রকার জীবাণু দিয়ে গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ

বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়। এক কথায় বলা যায়, পারস্পরিক সংযোগ ও নির্ভরশীলতাই জীবনক্রিয়া পরিচালনার চাবিকাঠি। কাজেই জীবজগতে বিভিন্ন প্রকার গাছপালা এবং প্রাণীদের মধ্যে বিদ্যমান জৈবিক সম্পর্কগুলোকে সহাবস্থান (Symbiosis) নামে আখ্যায়িত করা যায়। আর সম্পর্কযুক্ত জীবগুলোকে সহবাসকারী বা সহাবস্থানকারী (Symbionts) বলা হয়। এই সহাবস্থানকারী জীবগুলোর মধ্যে যে ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটে তাকে মিথস্ক্রিয়া বলা হয়। উপরের আলোচনা থেকে এটিও পরিষ্কার হয়েছে যে মিথস্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী জীবগুলো পরস্পর আন্তঃনির্ভরশীল, কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। পরিবেশবিজ্ঞানী ওডাম (Odum) বলেন যে এই আন্তঃনির্ভরশীল সম্পর্ক দুভাবে হতে পারে, যেমন:

(a) ধনাত্মক আন্তঃক্রিয়া (Positive interactions) দ্বারা

(b) ঋণাত্মক আন্তঃক্রিয়া (Negative interactions) দ্বারা।

(a) ধনাত্মক আন্তঃক্রিয়া (Positive interactions):

যে আন্তঃসম্পর্কে দুটি জীবের একটি অন্যটিকে সহায়তা করে, তাকে ধনাত্মক আন্তঃক্রিয়া বলে। এ ক্ষেত্রে সহযোগীদ্বয়ের একটি বা উভয়ই উপকৃত হতে পারে। লাভজনক এ আন্তঃক্রিয়ার দুটির প্রধান ধরন হলো মিউচুয়ালিজম (Mutualism) ও কমেনসেলিজম (Commensalism)।

(i) মিউচুয়ালিজম (Mutualism): সহযোগীদের উভয়ই একে অন্যের দ্বারা উপকৃত হয়। যেমন, মৌমাছি প্রজাতি, পোকামাকড় প্রভৃতি ফুলের মধু আহরণের জন্য ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায় এবং বিনিময়ে ফুলের পরাগায়ন ঘটে। অনেক পাখি এবং বাদুড় ফল খেয়ে বাঁচে এবং মলত্যাগের সাথে ফলের বীজও ত্যাগ করে। এভাবে বীজের স্থানান্তর হয় এবং উদ্ভিদের বিস্তার ঘটে। এ বীজ

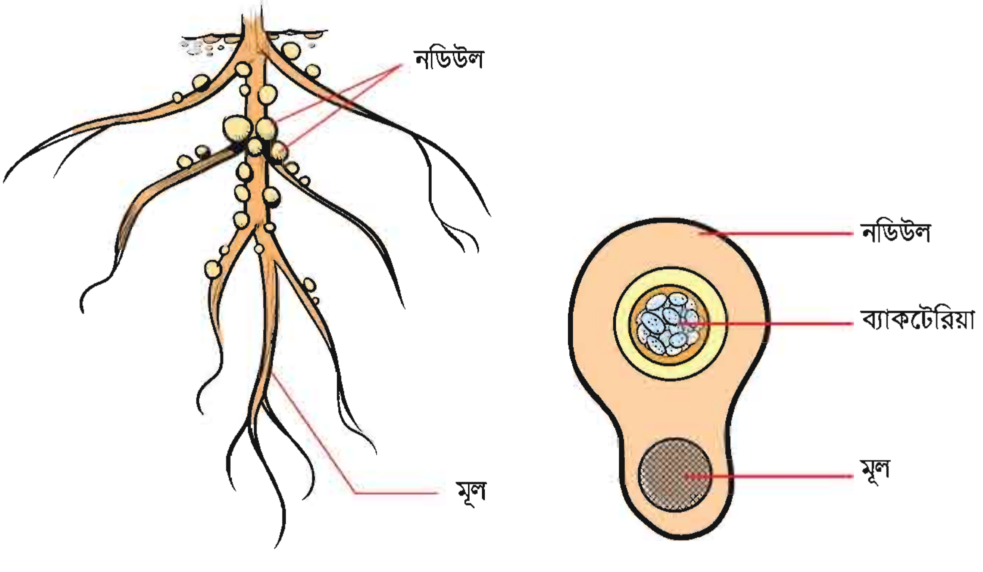

(ক) (খ)

চিত্র 13.08: মিউচুয়ালিজম

(ক) শিম জাতীয় উদ্ভিদের মূলে নডিউল (খ) লম্বচ্ছেদে মূল ও নডিউলের চিত্র

নতুন গাছ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। একটি শৈবাল এবং একটি ছত্রাক সহাবস্থান করে লাইকেন গঠন করে। ছত্রাক বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ এবং উভয়ের ব্যবহারের জন্য খনিজ লবণ সংগ্রহ করে। অপরদিকে শৈবাল তার ক্লোরোফিলের মাধ্যমে নিজের জন্য এবং ছত্রাকের জন্য শর্করাজাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। রাইজোবিয়াম (*Rhizobium*) ব্যাকটেরিয়া শিমজাতীয় উদ্ভিদের (Leguminous plant) শিকড়ে অবস্থান করে গুটি (Nodule) তৈরি করে এবং বায়বীয় নাইট্রোজেনকে সেখানে সংবন্ধন করে। ব্যাকটেরিয়া এই নাইট্রোজেন সহযোগী শিম উদ্ভিদকে সরবরাহ করে এবং বিনিময়ে সহযোগী উদ্ভিদ থেকে শর্করাজাতীয় খাদ্য পেয়ে থাকে।

(ii) কমেনসেলিজম (Commensalism): এ ক্ষেত্রে সহযোগীদের মধ্যে একজন মাত্র উপকৃত হয়। অন্য সহযোগী সদস্য উপকৃত না হলেও কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যেমন, রোহিণী উদ্ভিদ (apophyte) মূলের সাহায্যে নিজেকে মাটিতে আবদ্ধ করে এবং অন্য বড় উদ্ভিদকে আরোহণ করে উপরে উঠে। এরূপে অন্য বৃক্ষের উপর প্রসারিত হয়ে বেশি পরিমাণে আলো গ্রহণ করে। কাষ্ঠল লতা খাদ্যের জন্য আশ্রয়দানকারী উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে না এবং তার কোনো ক্ষতিও করে না। পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ (metabiont) বায়ু থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে, কিন্তু আশ্রয়দাতার কোনো ক্ষতি করে না। শৈবাল অন্য উদ্ভিদদেহের ভিতরে আশ্রয় নিয়ে বসবাস করে। কিন্তু আশ্রয়দাতার কোনো ক্ষতি করে না।

(a) রোহিণী উদ্ভিদ (b) পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ

চিত্র 13.09: (a) (b) কমেনসেলিজম

(b) ঋণাত্মক আন্তঃক্রিয়া:

এ ক্ষেত্রে জীবদ্বয়ের একটি বা উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঋণাত্মক আন্তঃক্রিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়— শোষণ, প্রতিযোগিতা ও অ্যান্টিবায়োসিস।

(i) শোষণ (Exploitation): এ ক্ষেত্রে একটি জীব অন্য জীবকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজের অধিকার ভোগ করে। যেমন: স্বর্ণলতা। স্বর্ণলতা হস্টোরিয়া নামক চোষক অঙ্গের মাধ্যমে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ থেকে তার খাদ্য সংগ্রহ করে। কোকিল কখনো পরিশ্রম করে বাসা তৈরি করে না। কাকের বাসায় সে ডিম পাড়ে এবং কাকের দ্বারাই তার ডিম ফোটায়।

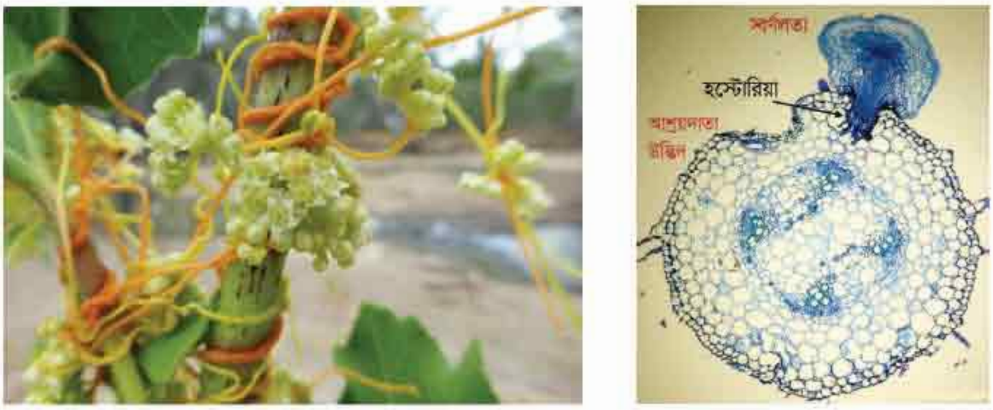

চিত্র 13.10: শোষণ

(ক) স্বর্ণলতা এবং পোষক উদ্ভিদ (খ) লম্বচ্ছেদে পোষক পরভোজী সম্পর্ক

(ii) প্রতিযোগিতা (Competition): কোনো নির্দিষ্ট স্থানে আলো, বাতাস, পানি ও খাদ্যের জন্য জীবগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। এ প্রতিযোগিতায় সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবসমূহ টিকে থাকে এবং অন্যরা বিতাড়িত হয়ে থাকে। এটি ডারউইনীয় আন্তঃপ্রজাতিক ও অন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রামের ভালো উদাহরণ।

(iii) অ্যান্টিবায়োসিস (Antibiosis): একটি জীব কর্তৃক সৃষ্ট জৈব রাসায়নিক পদার্থের কারণে যদি অন্য জীবের বৃদ্ধি এবং বিকাশ আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে বাধাপ্রাপ্ত হয় অথবা মৃত্যু ঘটে তখন সেই প্রক্রিয়াকে অ্যান্টিবায়োসিস বলে। অণুজীবজগতে এ ধরনের সম্পর্ক অনেক বেশি দেখা যায়। আলেক্সান্ডার ফ্লেমিংয়ের (1881-1955) পেনিসিলিন অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের পেছনে ছিল পেনিসিলিয়াম ছত্রাক কর্তৃক একই কালচার প্লেটে রাখা ব্যাকটেরিয়াগুলোর অ্যান্টিবায়োসিস।

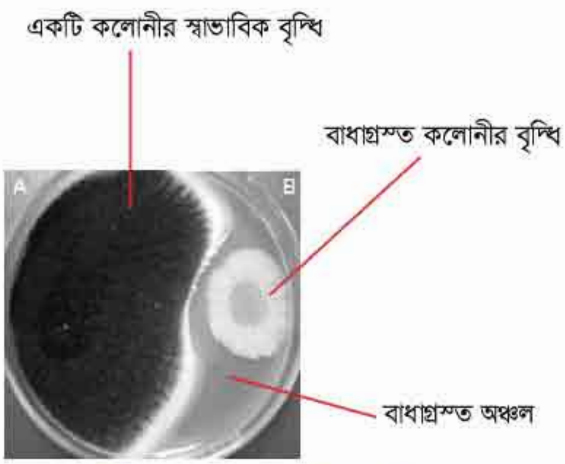

চিত্র 13.11: অ্যান্টিবায়োসিস

উপরের আলোচনা থেকে এটি বোঝা যায় যে পরিবেশে বিদ্যমান বিভিন্ন জীবের মধ্যে প্রতিনিয়ত ক্রিয়া-বিক্রিয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেকটি উপাদান পরস্পরের সাথে আন্তঃ সম্পর্কযুক্ত। এই সম্পর্ক দিয়ে কেউ লাভবান হচ্ছে আবার কেউ ক্ষতিগ্রস্তও হচ্ছে। আর এভাবেই তারা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে।

13.6 পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব ও পদ্ধতি

আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহটিকে জীবের বাসযোগ্য করে রাখার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ অপরিহার্য। এই পৃথিবীতে রয়েছে অসংখ্য জীব আর মাটি, পানি, বায়ুর মতো জীবনধারণের বিভিন্ন উপাদন। বর্তমান পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এ ধরনের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা মেটাতে গিয়ে এই সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সংকটজনক এই পরিস্থিতিতে পরিবেশসচেতন না হয়ে উঠলে বিপর্যয় আরও প্রকট আকার ধারণ করবে। আমাদের পরিবেশে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে বৃহদাকৃতির প্রাণী বা উদ্ভিদ কেউই অবাঞ্ছিত বা মূল্যহীন নয়। প্রকৃতির রাজ্যে সকল জীব এবং জড় পদার্থ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় একে অপরের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ। লক্ষ লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, মানুষ ইতাদি নিয়ে গড়ে উঠেছে জীববৈচিত্র্য, যার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে মানবজাতির কল্যাণ এবং অস্তিত্ব। অরণ্য, পাহাড়, জলাভূমি, সমুদ্র জীববৈচিত্র্যের অতীব প্রয়োজনীয় আধার। কাজেই পরিবেশ সুরক্ষিত থাকলে জীববৈচিত্র্য টিকে থাকবে। মনে রাখতে হবে, মানুষ ছাড়াই জীববৈচিত্র্য টিকে থাকতে পারবে কিন্তু জীববৈচিত্র্য না টিকলে মানুষ টিকে থাকতে পারবে না।

পরিবেশ সুরক্ষিত থাকলে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো, যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, ঔষধ, জ্বালানি, পানিসহ প্রয়োজনীয় উপকরণাদি পরিবেশ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যাবে। পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিশেষ করে বনাঞ্চল ধ্বংস হলে বৃষ্টিপাতের হার কমে যায়, চাষাবাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। গ্রিনহাউস গ্যাস (CO_2, CO, CH_4, N_2O ইত্যাদি) বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তাপমাত্রা বেড়ে যায়, যাকে গ্রিনহাউস এফেক্ট (Green house effect) বলে। গ্রিনহাউস এফেক্টের কারণে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে এবং উপকূল অঞ্চল তলিয়ে যাবে, আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে, বনাঞ্চল ধবংস হবে, বিভিন্ন রোগবালাইয়ের প্রভাবে ফসলের ক্ষতি হবে, মানুষের মধ্যে নতুন সব রোগের প্রকোপ দেখা দিবে, ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা বেড়ে যাবে। পরিবেশ সুরক্ষিত থাকলে গ্রিনহাউস এফেক্ট থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। তাই এখন থেকেই পরিবেশ সংরক্ষণের সর্বাত্মক প্রচেস্টা চালাতে হবে।

মানুষ বর্তমানে তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে পরিবেশ সংরক্ষণের কথা জোরেশোরে বলা শুরু করেছে। সুস্থ পরিবেশ রক্ষার জন্য সমগ্র বিশ্বকে এগিয়ে আসতে হবে। পরিবেশ সংরক্ষণবিষয়ক আন্দোলন গড়ে তোলাও জরুরি। বৃক্ষরোপণকে শুধু মাস বা সপ্তাহে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রতিদিন যে গাছ কাটা হবে ঠিক তার দ্বিগুণ গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তবে ইচ্ছামতো গাছ লাগালেই চলবে না, যেখানে যে

ধরনের গাছ উপযুক্ত বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় সহায়ক, সেখানে সে ধরনের গাছই লাগাতে হবে। কোনো এলাকার শিল্পকারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রভৃতি নির্মাণের পূর্বে সেই এলাকার পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব হতে পারে কি না তা বিবেচনা করতে হবে এবং বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করতে হবে। পরিকল্পিত নগরায়ণ করতে হবে। নগরায়ণের সাথে অবশ্যই বৃক্ষায়ন করতে হবে। জ্বালানি হিসেবে কাঠের পরিবর্তে সৌরশক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক মাটির গুণাগুণ নষ্ট করে, উপকারী জীবাণু, স্থলজ পোকামাকড় ধবংস করে, জলজ ও মাটির বাস্তুতন্ত্রকে নষ্ট করে। কাজেই জৈবসারের ব্যবহার বাড়াতে হবে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে হবে। মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা বিভিন্নভাবে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটায়। জনসংখ্যা সীমিত রেখে সচেতন এবং শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে হবে। পরিবেশদূষণ রোধে পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। প্রচারমাধ্যমকে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি গ্রিনহাউস গ্যাসের উৎপাদন হ্রাস করতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে ভূমিক্ষয় রোধ হবে। নদী খনন করে এবং প্রাকৃতিক জলাধারগুলো সংরক্ষণ করে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ অব্যাহত রাখতে হবে। এতে লবণাক্ততা এবং জলাবদ্ধতা দূর হবে, পানির বাস্তুতন্ত্র স্বাভাবিক থাকবে।

পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক এবং সেই লক্ষ্যে যে সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে, তাদেরকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করতে হবে। বায়ুদূষণ, পানিদূষণ, মাটিদূষণ, শব্দদূষণ যাতে না হয়, সে রকম সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশনীতিকে যথার্থভাবে অনুসরণ করতে হবে। প্রয়োজনে সরকার এবং নীতিনির্ধারক পর্যায়ে এ ব্যাপারে জোর দাবি উত্থাপন করতে হবে।

একক কাজ

কাজ : তোমার এলাকার পরিবেশগত উপাদানসমূহ দূষিত হওয়ার কারণগুলো কী কী তা নির্ণয় কর এবং একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

1. সিমবায়োসিস কী? ব্যাখ্যা কর।
2. প্লাংকটন বলতে কী বোঝায়?
3. পরজীবী খাদ্যশৃঙ্খল কাকে বলে?
4. অ্যান্টিবায়োসিস কাকে বলে?
5. মিউচুয়ালিজম কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

1. "বিভিন্ন জীবের মিথস্ক্রিয়া ও আন্তঃনির্ভরশীলতার মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে"। ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

1. কোনটি মৃতজীবী খাদ্যশৃঙ্খল?

ক. ঘাস → হরিণ → বাঘ
খ. মৃতজীব → বিয়োজক → অ্যামিবা
গ. জুপ্ল্যাংকটন → মাছ → বক
ঘ. সবুজ উদ্ভিদ → পাখি → শিয়াল

2. কমেনসেলিজমের মাধ্যমে—

i. সহযোগীদের মধ্যে একজন উপকৃত হয়
ii. সহযোগী সদস্য উপকৃত না হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না
iii. সহযোগীদের উভয়ই উপকৃত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

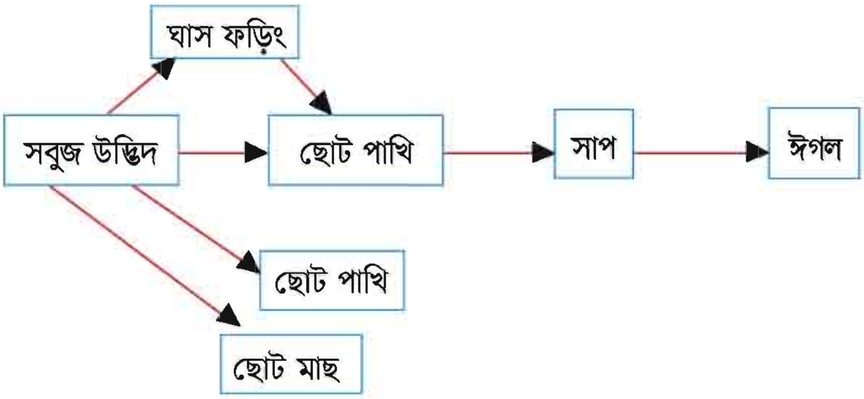
ঘাস ফড়িং
সবুজ উদ্ভিদ
ছোট পাখি
সাপ
ঈগল
ছোট পাখি
ছোট মাছ

উপরের চিত্রের আলোকে 3 ও 4 নং প্রশ্নের উত্তর দাও

3. উপরোক্ত চিত্রে কয়টি খাদ্যশৃঙ্খল আছে?

ক. 1টি খ. 2টি
গ. 3টি ঘ. 4টি

4. উদ্দীপকের আলোকে দ্বিতীয় স্তরের খাদক কোনটি?

ক. ছোট মাছ খ. সাপ
গ. খরগোশ ঘ. ঘাসফড়িং

সৃজনশীল প্রশ্ন

1.

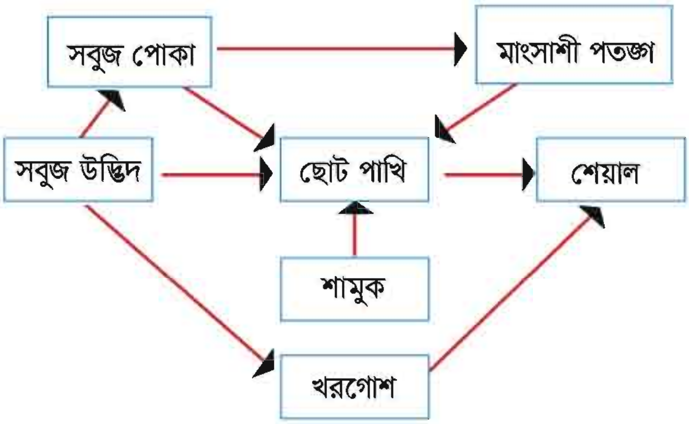
সবুজ পোকা
মাংসাশী পতঙ্গ
সবুজ উদ্ভিদ
ছোট পাখি
শেয়াল
শামুক
খরগোশ

ক. বিয়োজক কী?
খ. খাদ্যজাল কী বুঝিয়ে লেখ।
গ. উপরের খাদ্যজালের কোন খাদ্যশৃঙ্খলটিতে সবচেয়ে বেশি শক্তি ব্যয় হয়? কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উপরোক্ত খাদ্যজালে ছোট পাখির বিলুপ্তি ঘটলে বাস্তুতন্ত্রের কী পরিণতি ঘটবে তা বিশ্লেষণ কর।

2.

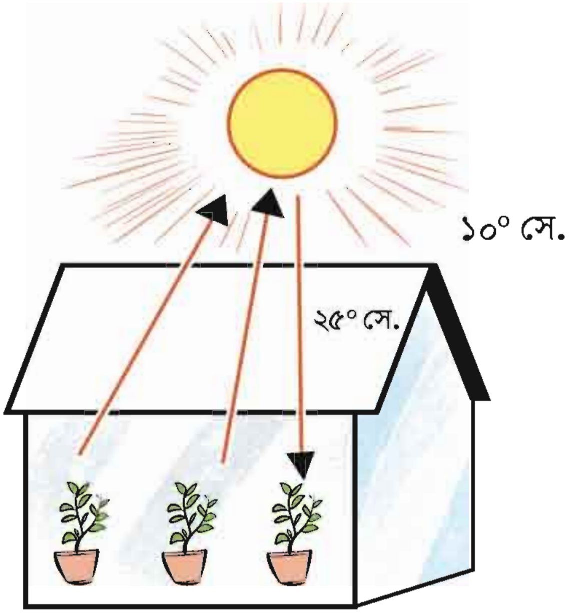

ক. জীববৈচিত্র্য কাকে বলে?

খ. কমেনসেলিজম কী বুঝিয়ে লেখ।

গ. চিত্রে তাপমাত্রা ভিন্নতার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্রে প্রক্রিয়াটির প্রতিক্রিয়া পরিবেশে কী প্রভাব বিস্তার করে বিশ্লেষণ কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

জীবপ্রযুক্তি

বাংলাদেশের জুট জিনোম প্রকল্প পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন করে উদ্ভাবন করেছে পাটের নতুন জাত রবি-১

জীবপ্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি (Biotechnology) জীববিজ্ঞানের একটি ফলিত (Applied) শাখা। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বংশগতিবিদ্যা নানাভাবে বিকাশ লাভ করতে থাকে। নানা তথ্যে সমৃদ্ধ হতে থাকে এর ভাণ্ডার। বংশগতির একক বা জিনের উপাদানের প্রকৃতি, রাসায়নিক এবং অণুর গঠন ও জৈবনিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো আবিষ্কৃত হওয়ার পর একটা জীবকোষ থেকে জিন আরেকটা জীবকোষে প্রতিস্থাপন করা যায়, সেটি নিয়ে জীববিজ্ঞানীরা গবেষণা শুরু করলেন। স্থাপিত হলো জীবপ্রযুক্তি (Biotechnology) নামে জীববিজ্ঞানের নতুন এক শাখা।

এই শাখাটি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বাস্তব সমস্যা সমাধানে এবং মানুষের স্বাস্থ্য উন্নয়নে, উন্নততর ফসল সৃষ্টিতে, ফসলের মান এবং পরিমাণ বৃদ্ধিতে, পরিবেশ সংরক্ষণে এই প্রযুক্তি ব্যাপক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা এই প্রযুক্তি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- জীবপ্রযুক্তির ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- টিস্যু কালচার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শস্য উৎপাদনে টিস্যু কালচারের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।
- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শস্য উৎপাদনে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।
- ইনসুলিন এবং হরমোন উৎপাদনে জেনিটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।
- জীবপ্রযুক্তির উপযোগিতা মূল্যায়ন করতে পারব।
- পশুর রোগ নিরাময়ে জেনিটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।
- জীবপ্রযুক্তি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যবহারের বিষয়ে পোস্টার অঙ্কন করতে পারব।
- আমাদের প্রতিদিনের জীবনে জীবপ্রযুক্তির অবদান উপলব্ধি করতে পারব।

14.1 জীবপ্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি (Biotechnology)

জীবপ্রযুক্তি দুটি শব্দ Biology এবং Technology-এর সমন্বয়ে গঠিত। Biology শব্দের অর্থ জীব সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান এবং Technology শব্দের অর্থ প্রযুক্তি। অর্থাৎ Biology এবং Technology-এর আন্তঃসম্পর্কিত বিষয়ই হলো জীবপ্রযুক্তি। 1919 সালে হাঙ্গেরীয় প্রকৌশলী কার্ল এরেকি (Karl Ereky) প্রথম Biotechnology শব্দটি প্রবর্তন করেন। এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে কোনো জীবকোষ, অণুজীব বা তার অংশবিশেষ ব্যবহার করে নতুন কোনো বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবের (উদ্ভিদ বা প্রাণী বা অণুজীব) উদ্ভাবন বা সেই জীব থেকে প্রক্রিয়াজাত বা উপজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়।

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় জীবপ্রযুক্তি কোনো নতুন সংযোজন নয়। মানবসভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ শুরু হয়েছে। গাঁজন এবং চোলাইকরণের (Fermentation and brewing) মতো প্রযুক্তিজ্ঞান মানুষ প্রায় 8000 বছর আগেই রপ্ত করেছে। 1863 সালে গ্রেগর জোহান মেন্ডেল কৌলিতত্ত্ব বা জেনেটিক্স-এর সূত্রগুলো আবিষ্কারের পর থেকে জীবপ্রযুক্তি নতুনরূপে অগ্রযাত্রা শুরু করে। 1953 সালে Watson এবং Crick কর্তৃক ডিএনএ ডাবল হেলিক্স মডেল আবিষ্কারের ধারাবাহিকতায় আজকের আধুনিক জীবপ্রযুক্তির শুরু।

জীবপ্রযুক্তির অনেক পদ্ধতির মধ্যে বর্তমানে টিস্যু কালচার (Tissue culture) ও জিন প্রকৌশল (Genetic engineering) পদ্ধতি কৃষি উন্নয়ন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

14.2 টিস্যু কালচার

উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে টটিপটেন্ট (totipotent) স্টেম কোষ থাকায় এর প্রায় যেকোনো অংশ থেকে হুবহু আরেকটি পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ জন্মানো সম্ভব, এটিই টিস্যুর কালচারের মূলনীতি। সাধারণত এক বা একাধিক ধরনের এক গুচ্ছ কোষসমষ্টিকে টিস্যু (Tissue) বা কলা বলা হয়। এই এক গুচ্ছ শেষ উৎপত্তিগতভাবে অভিন্ন এবং সম্মিলিতভাবে একই কাজ করে। একটি টিস্যুকে জীবাণুমুক্ত পুষ্টিবর্ধক কোনো মিডিয়ামে (Nutrient medium) বর্ধিতকরণ প্রক্রিয়াই হলো টিস্যু কালচার। টিস্যু কালচার উদ্ভিদবিজ্ঞানের একটি অপেক্ষাকৃত নতুন শাখা। উদ্ভিদ টিস্যু কালচারে উদ্ভিদের কোনো বিচ্ছিন্ন অংশ বা অঙ্গাবিশেষ (যেমন পরাগরেণু, শীর্ষ বা পার্শ্বমুকুল, পর্ব, মূলাংশ ইত্যাদি) কোনো নির্দিষ্ট পুষ্টিবর্ধক মিডিয়ামে জীবাণুমুক্ত অবস্থায় কালচার করা হয়। মিডিয়ামগুলোতে পুষ্টি এবং বর্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান সরবরাহ করা হয়। টিস্যু কালচারের উদ্দেশ্যে উদ্ভিদের যে অংশ পৃথক করে নিয়ে ব্যবহার করা হয় তাকে 'এক্সপ্ল্যান্ট (Explant)' বলে।

14.2.1 টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ধাপসমূহ

(a) মাতৃ উদ্ভিদ নির্বাচন: উন্নত গুণসম্পন্ন স্বাস্থ্যবান এবং রোগমুক্ত উদ্ভিদকে এক্সপ্ল্যান্টের জন্য নির্বাচন করা হয়।

(b) আবাদ মাধ্যম তৈরি: উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যকীয় খনিজ পুষ্টি, ভিটামিন, ফাইটোহরমোন, সুক্রোজ এবং প্রায় কঠিন মাধ্যম (Semi-solid medium) তৈরির জন্য জমাট বাঁধার উপাদান, যেমন অ্যাগার (Agar) সঠিক মাত্রায় মিশিয়ে আবাদ মাধ্যম তৈরি করা হয়।

(c) জীবাণুমুক্ত আবাদ প্রতিষ্ঠা: আবাদ মাধ্যমকে কাচের পাত্রে (টেস্টটিউব বা কনিক্যাল ফ্লাস্ক) নিয়ে তুলা বা প্লাস্টিকের ঢাকনা দিয়ে মুখ বন্ধ করা হয়। পরবর্তীতে অটোক্লেভ (Autoclave) যন্ত্রে 121° সে. তাপমাত্রায় রেখে, 15 lb/sq. inch চাপে 20 মি. রেখে জীবাণুমুক্ত করা হয়। তারপর কাচের পাত্রের মুখ পুনরায় বন্ধ করে নির্দিষ্ট আলো এবং তাপমাত্রা ($25+2^\circ$ সে.) সম্পন্ন নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বর্ধনের জন্য

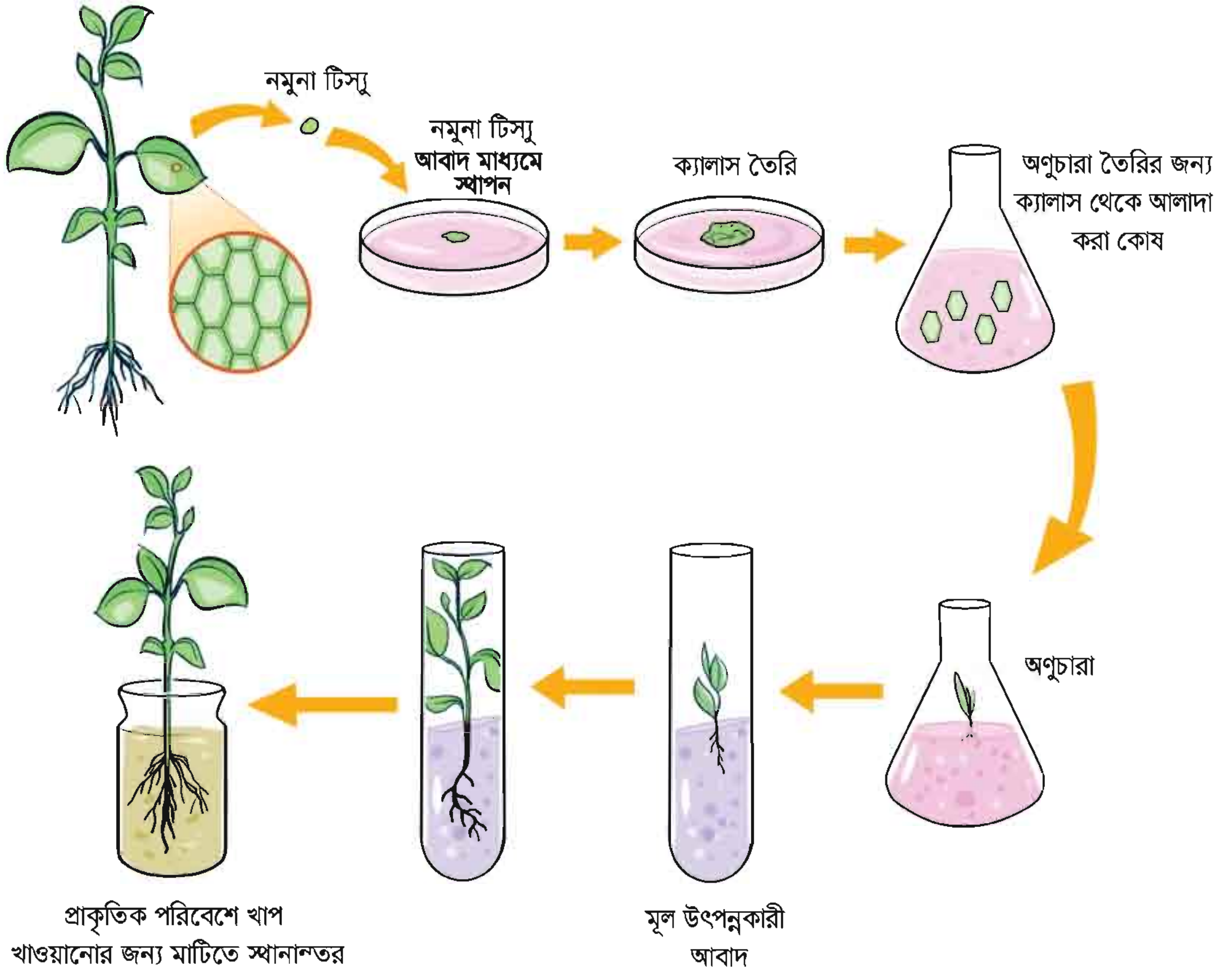
নমুনা টিস্যু
নমুনা টিস্যু আবাদ মাধ্যমে স্থাপন
ক্যালাস তৈরি
অণুচারা তৈরির জন্য ক্যালাস থেকে আলাদা করা কোষ
অণুচারা
মূল উৎপন্নকারী আবাদ
প্রাকৃতিক পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর জন্য মাটিতে স্থানান্তর

চিত্র 14.01: টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ার ক্রমিক পর্যায়

রাখা হয়। এই পর্যায়ে আবাদে স্থাপিত টিস্যু বারবার বিভাজনের মাধ্যমে সরাসরি অণুচারা (Plantlets) তৈরি হয় বা ক্যালাস (Callus) বা অবয়বহীন টিস্যুমণ্ডে পরিণত হয়। এই টিস্যুমণ্ড থেকে পরবর্তীসময়ে পর্যায়ক্রমে একাধিক অণুচারা (Plantlets) উৎপন্ন হয়।

(d) মূল উৎপাদক মাধ্যমে স্থানান্তর: এ সমস্ত উৎপাদিত চারাগাছে যদি মূল উৎপন্ন না হয়, তবে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা লাভের পর বিটপগুলো বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয় এবং তাদেরকে পুনরায় মূল উৎপাদনকারী আবাদ মাধ্যমে স্থাপন করা হয়।

(e) প্রাকৃতিক পরিবেশে তথা মাঠপর্যায়ে স্থানান্তর: মূলযুক্ত চারাগুলোকে পানিতে ধুয়ে অ্যাগারমুক্ত অবস্থায় ল্যাবরেটরিতে মাটিভরা ছোট ছোট পাত্রে স্থানান্তর করা যায়। পাত্রে লাগানো চারাগুলো কক্ষের বাইরে রেখে মাঝে মাঝে বাইরের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। পূর্ণাঙ্গ চারাগুলো সজীব এবং সবল হয়ে উঠলে সেগুলোকে এক পর্যায়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে মাটিতে লাগানো হয়।

14.2.2 টিস্যু কালচারের ব্যবহার

টিস্যু কালচার প্রযুক্তির কৌশলকে কাজে লাগিয়ে আজকাল উদ্ভিদ প্রজননের ক্ষেত্রে এবং উন্নত জাত উদ্ভাবনে ব্যাপক সাফল্য পাওয়া গেছে এবং এ ক্ষেত্রগুলোতে অপার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এর মাধ্যমে উদ্ভিদাংশ থেকে কম সময়ের মধ্যে একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অসংখ্য চারা সৃষ্টি করা যায়। সহজেই রোগমুক্ত, বিশেষ করে ভাইরাসমুক্ত চারা উৎপাদন করা যায়। ঋতুভিত্তিক চারা উৎপাদনের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। স্বল্পসময়ে কম জায়গার মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক চারা উৎপাদনের সুবিধা থাকায় চারা মজুদের সমস্যা এড়ানো যায়। যে সব উদ্ভিদ বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে না, সেগুলোর চারাপ্রাপ্তি এবং স্বল্পব্যয়ে দ্রুত সতেজ অবস্থায় স্থানান্তর করা যায়। বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ উৎপাদন এবং সংরক্ষণ করতে টিস্যু কালচার নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি হিসেবে স্বীকৃত। যেসব ভ্রূণে শস্যকলা থাকে না, সেসব ভ্রূণ কালচার করে সরাসরি উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায়। যে সকল উদ্ভিদে যৌনজনন অনুপস্থিত অথবা প্রাকৃতিকভাবে জননের হার কম, তাদের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যায়। নতুন প্রকৃতির উদ্ভিদ উদ্ভাবনে টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। ফরাসি বিজ্ঞানী George Morel (1964) প্রমাণ করে দেখান যে সিম্বিডিয়াম (Cymbidium) নামক অর্কিড প্রজাতির একটি মেরিস্টেম থেকে এক বছরে প্রায় 40 হাজার চারা পাওয়া সম্ভব। উল্লেখ্য, সাধারণ নিয়মে একটি সিম্বিডিয়াম উদ্ভিদ থেকে বছরে মাত্র অল্প কয়েকটি চারা উৎপন্ন হয়। থাইল্যান্ড টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে এক বছরে 50 মিলিয়ন অণুচারা উৎপন্ন করে, যার অধিকাংশই অর্কিড। এই ফুল রপ্তানি করে থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। 1952 সালে মার্টিন নামক বিজ্ঞানী মেরিস্টেম কালচারের মাধ্যমে রোগমুক্ত ডালিয়া ও আলুগাছ উদ্ভব করেন।

বর্তমানে মেরিস্টেম কালচারের মাধ্যমে কোনো কোনো ভাইরাস রোগাক্রান্ত ফুল ও ফলগাছকে (যেমন

আলুর টিউবার) রোগমুক্ত করা টিস্যু কালচারের একটি নিয়মিত কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে। মালয়েশিয়ায় Oil Palm -এর বংশবৃদ্ধি টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে চন্দ্রমল্লিকার একটি অঙ্গজ টুকরা থেকে বছরে ৪৪ কোটি চারা গাছ পাওয়া সম্ভব। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে জুঁই (*Jasminum*) সাস্পেনসান থেকে সুগন্ধি আতর বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। উড়োজাহাজ, রকেট প্রভৃতি ভারী ইঞ্জিন চলানোর জন্য এক রকমের তিমি মাছের (Sperm whale) তেলের প্রয়োজন হয়। এই তিমি মাছ ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। একমাত্র জোজোবা (jojoba) নামক গাছ হতে নিষ্কাশিত তেল বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু এই গাছ এক বিশেষ মরুভূমির পরিবেশ ছাড়া (যেমন Arizona, California) জন্মায় না এবং এদের বংশবৃদ্ধিও অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে এই গাছের দ্রুত বংশবৃদ্ধি করাই কেবল সম্ভব হয়নি, একে ভারতবর্ষের জলবায়ু উপযোগীও করে তোলা হয়েছে। বাংলাদেশে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে ইতোমধ্যে অনেক সাফল্য অর্জিত হয়েছে, যেমন, বিভিন্ন প্রকার দেশি ও বিদেশি অর্কিডের চারা উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। রোগ প্রতিরোধী এবং অধিক উৎপাদনশীল কলার চারা, বেলের চারা, কাঁঠালের চারা উৎপাদন করা হয়েছে। চন্দ্রমল্লিকা, গ্লাডিওলাস, লিলি, কার্নেশান প্রভৃতি ফুল উৎপাদনকারী বৃক্ষের চারা উৎপাদন করা হয়েছে। বিভিন্ন ডালজাতীয় শস্য, বাদাম ও পাটের চারার উৎপাদন করা হয়েছে। টিস্যু কালচার প্রয়োগ করে আলুর রোগমুক্ত চারা এবং বীজ মাইক্রোটিউবার উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

14.3 জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic engineering)

একটি জীব থেকে একটি নির্দিষ্ট জিন বহনকারী ডিএনএ খণ্ড পৃথক করে ভিন্ন একটি জীবে স্থানান্তরের কৌশল হচ্ছে জিন প্রকৌশল (Genetic engineering)। আরও সহজভাবে বলা যায়, কাঙ্ক্ষিত নতুন একটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য কোনো জীবের ডিএনএর পরিবর্তন ঘটানোকে জিন প্রকৌশল বলে। এই জিন যে কৌশলগুলোর মাধ্যমে স্থানান্তর করা হয়, তাদের একত্রে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ কৌশল বলে। এই কৌশল অবলম্বন করে একটি ডিএনএ অণুর কাঙ্ক্ষিত অংশ কেটে আলাদা করে অন্য একটি ডিএনএ অনুতে প্রতিস্থাপন করার ফলে যে নতুন ডিএনএ অণুর সৃষ্টি হয়, তাকে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ বলে। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তৈরির প্রক্রিয়াকে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি বা জিন ক্লোনিং বলা হয়।

এই প্রযুক্তির মাধ্যমে DNA-এর কাঙ্ক্ষিত অংশ ব্যাকটেরিয়া থেকে মানুষে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে, প্রাণী থেকে উদ্ভিদে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে উৎপন্ন নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবের কোনো কোনোটিকে বলা হয় GMO (Genetically Modified Organism) আর কোনোটিকে বলে ট্রান্সজেনিক (Transgenic)।

জিএমও এবং ট্রান্সজেনিক জীব এক নয়। জীবের জিনে মিউটেশনের মাধ্যমে বা অন্য যেকোনো উপায়ে যেকোনো ধরনের পরিবর্তন ঘটলেই সেটিকে জেনেটিক মডিফিকেশন বলে। মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে অর্থাৎ জেনেটিক্সের নিয়ম আবিষ্কারের আগে থেকেই কৃত্রিম নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জেনেটিক্যালি

মডিফায়েড কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নতুন জাত উদ্ভাবন করে আসছে। প্রকৃতিতেও অনুরূপ প্রক্রিয়া চলছে লক্ষ-কোটি বছর ধরে, যার নাম জৈব বিবর্তন। জীবপ্রযুক্তির কল্যাণে এই জেনেটিক মডিফিকেশনের ব্যাপারটি আরও নিয়ন্ত্রিতভাবে এবং কম সময়ে করা সম্ভব। এভাবে যে জীব উৎপন্ন হয়, সেটি জিএমও বা জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম। আর ট্রান্সজেনিক জীব বলতে সেসব জীবকে বোঝায়, যাদের জিনোমে এমন এক বা একাধিক জিন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা অন্য কোনো প্রজাতি থেকে নেওয়া।

14.3.1 জিএমও (GMO) বা রিকম্বিনেন্ট DNA প্রস্তুত করার ধাপসমূহ

মানুষের অন্ত্রে বসবাস করে একধরনের ব্যাকটেরিয়া, যার নাম *Escherichia coli*। এই ব্যাকটেরিয়ার উপর গবেষণা করে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধিকাংশ কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি নিচে উল্লেখ করা ধাপগুলো (চিত্র 14.02) অবলম্বন করে সম্পন্ন করা হয়:

(a) প্রথমে দাতা জীব থেকে কাঙ্ক্ষিত জিনসহ ডিএনএ অণুকে পৃথক করা হয়। এরপর এই জিনের বাহক বা ক্যারিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড ডিএনএ পৃথক করা হয়। প্লাজমিড হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া কোষের ক্রোমোজোমের বাইরে আরেকটি স্বতন্ত্র ডিএনএ অণু, যেটি বিভাজিত হতে পারে বা স্ваবিভাজনে সক্ষম।

(b) এ ধাপে প্লাজমিড ডিএনএ এবং দাতা ডিএনএকে এক বিশেষ ধরনের এনজাইম বা উৎসেচক দিয়ে খণ্ডিত করা হয়। দাতা ডিএনএ এর এসব খণ্ডের কোনো একটিতে কাঙ্ক্ষিত জিনটি থাকে।

(c) এ ধাপে লাইগেজ নামক একধরনের এনজাইম দিয়ে দাতা ডিএনএকে প্লাজমিড ডিএনএ-এর কাটা প্রান্ত দুটোর মাঝখানে স্থাপন করা হয়। লাইগেজ এখানে আঠার মতো কাজ করে। এর ফলে নির্দিষ্ট জিনসহ রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্লাজমিড তৈরি হয়। এই রিকম্বিন্টেন্ট প্লাজমিড এখন দাতা ডিএনএর খণ্ডিত অংশ বহন করে।

(d) এখন এই রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিডকে ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। খণ্ডিত ডিএনএ গ্রাহক কোষে প্রবেশ করনোর পদ্ধতিকে ট্রান্সফরমেশন বলে। ট্রান্সফরমেশনের ফলে নতুন জিন নিয়ে যে ব্যাকটেরিয়া বা জীবের উদ্ভব ঘটে, তাকে ট্রান্সজেনিক জীব বলে।

(e) এবার নির্দিষ্ট জিন বহনকারী রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড ধারণ করা ব্যাকটেরিয়াকে শনাক্ত করে আলাদা করা হয়। এরপর নির্দিষ্ট জিন বহনকারী ব্যাকটেরিয়াগুলোর ব্যাপক বংশবৃদ্ধি ঘটানো হয়। এই ব্যাকটেরিয়াগুলোর প্রত্যেকটিতে এখন একটি করে কাঙ্ক্ষিত জিন রয়েছে। এই পদ্ধতিতে জিন তৈরি করাকে বলা হয় জিন ক্লোনিং। জিনকে ব্যবহার করার জন্য প্লাজমিডকে আবার আলাদা করে নেওয়া হয়।

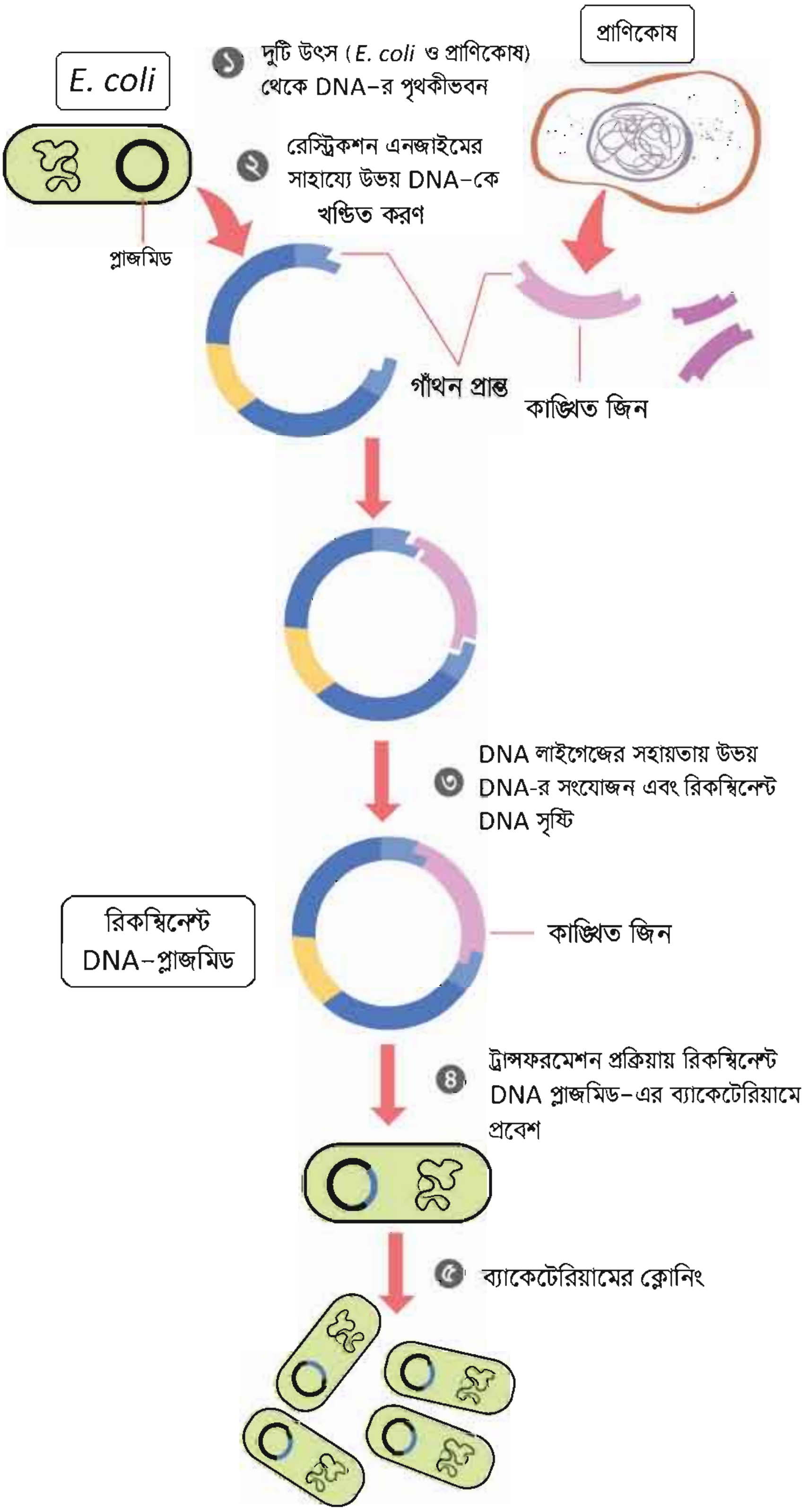
E. coli
প্লাজমিড
১ দুটি উৎস (E. coli ও প্রাণিকোষ) থেকে DNA-র পৃথকীভবন
প্রাণিকোষ
২ রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সাহায্যে উভয় DNA-কে খণ্ডিত করণ
গাঁথন প্রান্ত
কাঙ্খিত জিন
৩ DNA লাইগেজের সহায়তায় উভয় DNA-র সংযোজন এবং রিকম্বিনেন্ট DNA সৃষ্টি
রিকম্বিনেন্ট DNA-প্লাজমিড
কাঙ্খিত জিন
৪ ট্রান্সফরমেশন প্রক্রিয়ায় রিকম্বিনেন্ট DNA প্লাজমিড-এর ব্যাকেটেরিয়ামে প্রবেশ
৫ ব্যাকেটেরিয়ামের ক্লোনিং

চিত্র 14.02: রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি

আধুনিক জীবপ্রযুক্তি বা জিন কৌশলের মাধ্যমে জিন স্থানান্তরের প্রক্রিয়ায় কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য অল্প সময়ে সুচারুভাবে স্থানান্তর করা সম্ভব হয় বলে সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবক বা উদ্যোক্তাগণের নিকট প্রচলিত প্রজননের তুলনায় এ প্রযুক্তিটি অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে।

নতুন ফসল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রজননের তুলনায় জিন প্রকৌশল অনেক বেশি কার্যকরী, কারণ প্রচলিত প্রজনন প্রক্রিয়ায় জিন স্থানান্তর একই অথবা খুব নিকটবর্তী প্রজাতির মাঝে সীমাবদ্ধ, কিন্তু জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে নিকটবর্তী বা দূরবর্তী যেকোনো প্রজাতির মাঝে এক বা একাধিক জিন সরাসরি স্থানান্তর করা সম্ভব। প্রচলিত প্রজননে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। জিন প্রকৌশলের সাহায্যে খুব দ্রুত কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ, প্রাণী বা অণুজীব পাওয়া সম্ভব। প্রচলিত প্রজননে কাঙ্ক্ষিত জিনের সাথে অনাকাঙ্ক্ষিত জিনও স্থানান্তর হয়ে যেতে পারে এবং কাঙ্ক্ষিত জিনের স্থানান্তরও অনেক খানি অনিশ্চিত। জিন প্রকৌশলে অনাকাঙ্ক্ষিত জিন স্থানান্তরের সম্ভাবনা নেই এবং কাঙ্ক্ষিত জিন স্থানান্তরও নিশ্চিত। প্রচলিত প্রজনন কোনো রকম জীবনিরাপত্তা (Biosafety) নিয়ম পদ্ধতি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত নয় কিন্তু জিন প্রকৌশলের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জীবনিরাপত্তা নিয়ম-নীতি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। প্রচলিত প্রজননে বিষাক্ততা (Toxicity) পরীক্ষা করা হয় না, কিন্তু জিন প্রকৌশলে বিষাক্ততা (Toxicity) পরীক্ষা করা হয়।

14.3.2 জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যবহার

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি হলো সর্বাধুনিক জীবপ্রযুক্তি। এই প্রযুক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো নতুন ও উন্নত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব সৃষ্টি, যা দিয়ে মানুষ সর্বোত্তমভাবে লাভবান হতে পারে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ইতোমধ্যেই সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

(a) শস্য উন্নয়নে :
এই প্রযুক্তির সাহায্যে ক্ষতিকর পোকামাকড় প্রতিরোধী ফসলের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

Bacillus thuringiensis (Bt) নামক ব্যাকটেরিয়ার জিন শস্যে প্রবেশ করানোর কারণে জেনেটিকভাবে পরিবর্তিত শস্যসমূহকে Bt Corn, Bt Cotton ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হচ্ছে। একইরকমভাবে বিটি ভুট্টা, বিটি ধান (চীনে) ইত্যাদি উদ্ভাবিত হয়েছে। এসব ফসল লেপিডোপটেরা (Lepidoptera) এবং কলিওপটেরা (Coleoptera) বর্গের অন্তর্ভুক্ত ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষম।

এই প্রযুক্তির সাহায্যে ভাইরাস প্রতিরোধী ফসলের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। যেমন ভাইরাল কোট প্রোটিনে (Coat Protein) জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে টমেটো মোজাইক ভাইরাস (ToMV), টোবাকো মোজাইক ভাইরাস (TMV) এবং টোবাকো মাইল্ড গ্রিন মোজাইক ভাইরাস (TMGMV) প্রতিরোধী ফসলের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। রিং স্পট ভাইরাস (PRSV) প্রতিরোধে সক্ষম পেঁপের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। লেট ব্লাইট ছত্রাক প্রতিরোধী জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে লেট ব্লাইট প্রতিরোধী গোল আলুর

জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা চলছে।

জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে আগাছানাশক রাসায়নিক পদার্থের বিরুদ্ধে সহনশীলতাসম্পন্ন (Herbicide tolerant) ভুট্টা, তুলা ইত্যাদি ফসলের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া থেকে বিজ্ঞানীরা আগাছানাশক সহিষ্ণু জিন টমেটোতে স্থানান্তর করে আগাছানাশক সহিষ্ণু (Herbicide tolerant) টমেটোর জাত তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। একইভাবে সয়াবিন, ভুট্টা, তুলা, ক্যানোলা (Canola) ইত্যাদি আগাছা নাশক সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে একই উদ্ভিদে একাধিক বৈশিষ্ট্য (Trait) অনুপ্রবেশ করানো যায়। বাণিজ্যিকভাবে এখন এ ধরনের ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ সহজলভ্য হয়েছে। যেমন তুলা এবং ভুট্টার মধ্যে একই সাথে আগাছানাশক সহিষ্ণু (Herbicide tolerant) এবং পোকামাকড় প্রতিরোধী (Insect resistant) বৈশিষ্ট্য অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে।

জিনগত রূপান্তরের মাধ্যমে ফসলের পুষ্টিমান উন্নয়ন করা হয়েছে। যেমন, ধানে ভিটামিন A তথা বিটা-ক্যারোটিন জিন স্থানান্তর করা হয়েছে। এই ধানের চাল থেকে প্রস্তুত ভাত খেলে আলাদা করে আর ভিটামিন A খেতে হবে না। ধানে লৌহ বা আয়রন যোগ করারও প্রচেষ্টা অব্যাহত হয়েছে। লবণাক্ততা এবং খরা সহনশীল জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে জিনগত পরিবর্তন (Genetic modification) ঘটিয়ে বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে।

(b) প্রাণীর ক্ষেত্রে :

গবাদিপশু যেমন, গরুর দুধে আমিষের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য Protein C জিন স্থানান্তর করা হয়েছে। তবে এটা এখনো গবেষণা পর্যায়ে আছে।

আকার বৃদ্ধি এবং মাংসের উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে মানুষের বৃদ্ধির জন্য দায়ী হরমোনের জিন স্থানান্তর করে ভেড়ার জেনেটিক পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। ভেড়ার পশমের পরিমাণ ও গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য ব্যাকটেরিয়ার 2টি জিন, যথা CysE এবং CysM ভেড়ার জিনোমে স্থানান্তর করা হয়েছে।

(c) মৎস্য উন্নয়নে:

মাগুর, কমন কার্প, লইট্টা ও তেলাপিয়া মাছে স্যামন মাছের দৈহিক বৃদ্ধি হরমোনের (Growth hormone) জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে জেনেটিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় এসব মাছের আকার প্রায় 60 ভাগ বড় করা সম্ভব হয়েছে।

(d) চিকিৎসা ক্ষেত্রে:

জেনেটিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ইস্ট নামক ছত্রাক থেকে হেপাটাইটিস বি-ভাইরাসের ওষুধ (ইন্টারফেরন) তৈরি হচ্ছে।

মানবদেহের ইনসুলিন তৈরির জিন ব্যবহার করে জেনেটিকভাবে পরিবর্তিত *E. coli* ব্যাকটেরিয়া এবং ইস্ট থেকে বাণিজ্যিকভাবে ইনসুলিন তৈরি হচ্ছে, যা মানুষের বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

জেনেটিকভাবে পরিবর্তিত *E. coli* ব্যাকটেরিয়া এবং ইস্ট থেকে মানববৃদ্ধির হরমোন (growth hormne) এবং গ্র্যানুলোসাইট ম্যাক্রোফাজ স্টিমুলোটিং ফ্যাক্টর (GM-CSF) কলোনি উদ্দীপক উপাদান ইত্যাদি তৈরি করা হচ্ছে। এগুলো যথাক্রমে অস্বাভাবিক খাটো হওয়া রোগ (dwarfism), ভাইরাসজনিত রোগ, ক্যান্সার, AIDS ইত্যাদির চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

(e) পরিবেশ সুরক্ষায়:

পেট্রোলিয়াম ও কয়লাখনি এলাকা দূষণমুক্তকরণ, শিল্পক্ষেত্রে বর্জ্যশোধন, পয়োনিষ্কাশন ইত্যাদি পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সহজ এবং দ্রুত করার উদ্দেশ্যে এই প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়। জিন প্রকৌশলের উপর গবেষণা করে নতুন এক জাতের *Pseudomonas* ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে যা পরিবেশের তেল ও হাইড্রোকার্বনকে দ্রুত নষ্ট করে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করতে সক্ষম।

একক কাজ

কাজ: জীবপ্রযুক্তি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যবহার বিষয়ে পোস্টার অঙ্কন কর ও শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

একক কাজ

কাজ: বাংলাদেশে জীবপ্রযুক্তি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার সুযোগ সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরি কর ও শিক্ষকের নিকট জমা দাও।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

1. কীভাবে আবাদ মাধ্যম তৈরি করা হয়?
2. টিস্যুকালচার বলতে কী বোঝ?
3. এক্সপ্লান্ট কী?
4. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কী?
5. ট্রান্সজেনিক কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

1. উদ্ভিদ প্রজনন ও উন্নত জাত উদ্ভাবনে টিস্যুকালচার প্রযুক্তির ভূমিকা উল্লেখ কর।
2. শস্য উন্নয়নে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ভূমিকা আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. DNA কাটার জন্য বিশেষ এনজাইম কোনটি?

ক. লাইগেজ   খ. রেস্ট্রিকশন
গ. লেকটেজ   ঘ. লাইপেজ

2. জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ হয়—

i. গাঁজনে
ii. টিস্যুকালচারে
iii. ট্রান্সজেনিক জীব উৎপন্নে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. i ও iii   গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে 3 ও 4 নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

ইমতিয়াজ তার বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে খুবই ভালো জাতের একটি বেল গাছের সন্ধান পেল। সে হুবুহু একই বৈশিষ্ট্যের চারা উৎপাদনের জন্য গাছটির পার্শ্বমুকুল নিয়ে এলো এবং তার বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান ল্যাবে এর চারা তৈরি করল।

3. ল্যাবে ইমতিয়াজের গৃহীত প্রক্রিয়াটি কী?

ক. জিন স্থানান্তরকরণ খ. হরমোন প্রয়োগ
গ. এনজাইমের ব্যবহার ঘ. টিস্যুকালচার

4. ল্যাবে ইমতিয়াজের কার্যক্রমের ক্রমানুযায়ী ধাপগুলো কোনটি?

ক. আবাদ মাধ্যম তৈরি → এক্সপ্লান্ট স্থাপন → অণুচারা উৎপাদন → মূল উৎপাদন → প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থানান্তর
খ. আবাদ মাধ্যম তৈরী → অণুচারা উৎপাদন → মূল উৎপাদন → এক্সপ্লান্ট স্থাপন → প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থানান্তর
গ. মাতৃউদ্ভিদ নির্বাচন → আবাদ মাধ্যম তৈরি → এক্সপ্লান্ট স্থাপন → অণুচারা উৎপাদন → প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থানান্তর
ঘ. মাতৃউদ্ভিদ নির্বাচন → আবাদ মাধ্যম তৈরি → ক্যালাস তৈরি → এক্সপ্লান্ট স্থাপন → প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থানান্তর

সৃজনশীল প্রশ্ন

1. জিন প্রকৌশলী ড. হায়দারের বাগানের লেবু গাছগুলোতে প্রচুর লেবুর ফলন হলেও গাছগুলো দ্রুত রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তিনি লক্ষ করলেন তার বাড়ির পাশের জঙ্গলে একজাতের লেবুগাছ রয়েছে যাতে খুব একটা লেবু না হলেও গাছগুলো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। এ দুটি লেবুর জাত থেকে তিনি অধিক ফলনশীল রোগ প্রতিরোধী একটি জাত উদ্ভাবন করলেন। তিনি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এর চারা উৎপাদন না করে ল্যাবে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এর চারা তৈরি করলেন।

ক. জীব প্রযুক্তি কী?
খ. GMO বলতে কী বোঝায়?
গ. ড. হায়দারের লেবুগাছের জাত উন্নয়নের কৌশল ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ড. হায়দারের বিশেষ প্রক্রিয়ায় চারা তৈরি করার কারণ বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত

২০১৯
শিক্ষাবর্ষ
দাখিল
৯ম-১০ম জীববিজ্ঞান

"শিক্ষার শেকড়ের স্বাদ তেঁতো হলেও এর ফল মিষ্টি"–এরিস্টটল

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য